বর্ত্তমানের সূচী

(প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা)

বৈশাখ—১৩৫৪

নববর্ষে

জেনারেলের নিবেদন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বরযাত্রী (৪ সং) ২॥০ বসন্তে (২সং) ৩৲
বর্ষায় (৩সং) ৩৲ শারদীয়া (২সং) ৩৲
হৈমন্তী ৩৲ চৈতালী ৩৲ দৈনন্দিন ২॥০
নীলাঙ্গুরীয় (৪সং) ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲
বিশেষ রজনী ২৲ ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রতি খণ্ড ৪৲

শ্রীমতী বাণী রায়ের
প্রেম ৩৲ পুনরাবৃত্তি ২৲

নংগোপাল দাস, আই-সি-এস্-এর
নিঃসহ যৌবন ৩৲ তারা দুজন ২॥০
অনবগুণ্ঠিতা (২ সং) ৩৲
সাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
মহানগরী ৪৲ দুঃস্বপ্ন ২৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সমাজ ও যৌনসমস্যা ২৲
পায়ে চলার পথ ৩৲
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

ভাস্করের রচনা
মজলিস ১॥০ শুভশ্রী ১॥০
কথিকা ১॥০ লেখা ৩৲

অমলেন্দু দাসগুপ্তের
ডেটিনিউ ২৲

কমল দাসগুপ্তের
পরিচিতা ৩৲

*** সদ্য প্রকাশিত ***

মোহিতলাল মজুমদারের
জয়তু নেতাজী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲
কোপবতী (২ সং) ৩৲

ডাঃ সুশীলকুমার দের
ক্ষণ-দীপিকা ২৲

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের
আমাদের ইংরেজী শেখা ১॥০

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু গ্যেটে ১ম খণ্ড ৫৲
২য় খণ্ড ৪৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায়ের
ব্যক্তিগত ২৲

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ
অবধুত প্রণীত
ঈশোপনিষৎ ২৲

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষের
গীতা ও হিন্দুধর্ম্ম ৪৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲
ক্ষুধা ২॥০ শৃঙ্খল (৩ সং) ২॥০ মনের গহনে
(২সং) ২৲ বসন্ত রজনী (২ সং) ১॥০,
ঘরের ঠিকানা (২ সং) ২॥০ শতাব্দীর
অভিশাপ (৩ সং) ২॥০ হালদার সাহেব ২৲

শ্রীমতী রেণু মিত্রের
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

পরিমল গোস্বামীর
মহামন্বন্তর ৩৲ ঘুঘু (২ সং) ২৲
দুষ্মন্তের বিচার (২ সং) ১৷০
ট্রামের সেই লোকটি (২ সং) ২৲
ব্ল্যাক মার্কেট ২৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ২৲ সঞ্চারী ১৲

আমিনুল হকের
টাইগার হিল ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহের
সমী ও দীপ্তি ১৲ সমর্পণ ১॥০
ভুলের ফসল ২৲ অন্তর্যামী ১॥০

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
মরীচিকা ১৲ মরুশিখা ১৷০
কাব্য পরিমিতি ১৲

প্রমথনাথ বিশীর
গালি ও গল্প ১॥০ গল্পের মতো ১॥০
মৌচাকে ঢিল (২ সং) ২॥০

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)
জীবন সাহারা ১৷০

রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক
শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের
বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩ সং) ৫৲
বিস্মরণী (৩ সং) ৪৲ স্মর-গরল ৪৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲

সুবীর শিশু গ্রন্থমালা

মোহিতলাল মজুমদারের
রূপকথা (২ সং) ১৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিবাজী মহারাজ ১৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
বসন্তের রাণী ৷০

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লেখ-সূচী

-চিত্র-১৩-

কবিগুরু - রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বর্তমান

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ • ১৩৫৪

দু'খানি চিঠি

(১)

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন —

আমার যশকে যে অসাধারণ লাভ বলে গণ্য করেছেন এইটেই আমার পরম লাভ। নইলে আর কোনো কারণে যশ জিনিষটাকে বিশুদ্ধ সৌভাগ্য বলে গণ্য করতে পারিনে। মাথার উপর থেকে যেন ঝড়ে ঘরের চালটা উড়িয়ে দিয়ে গেল এখন সহস্র লোকের চক্ষুগোচরতার নীচে বাস করতে হবে — এতে শান্তি কোথায়? যাই হোক, অন্তত দূর পথ দিয়ে দেশের লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ করা গেল — যখন কাছে ছিলুম তখন হয় ত এত কাছে ছিলুম না, কিন্তু এই সমস্ত গোলে হরিবোলের মধ্যে অনেকটাই

ফাঁকা আওয়াজ—এতে তৃপ্তি নেই। বয়স যখন অল্প ছিল তখন হয়তো এতে নেশা ধরে যেত কিন্তু এখন সত্যের খোরাক না হলে দিন চলে না।

এখন কেবল ভয় হচ্ছে জীবনের সন্ধ্যাপ্রদীপটাকে জ্বালিয়ে তোলবার মত একটু আড়াল পাব না বুঝি—চারদিক থেকে কেবল হাওয়া দিচ্চে।

দেশের লোকের ভয় হয়েছিল আমার একটা নূতন পরিবর্ত্তন হয়েচে—কিন্তু দেশের লোক হয়ত জানেনা এ পরিবর্ত্তন আমার জন্মকালেই হয়েচে—বস্তুত আমি যদি য়ুরোপের স্পর্শে অচেতন থাকতুম, যদি দেখতুম এখানকার হাওয়ায় আমার কুঞ্জবনে কোন মুকুলই ধরচেনা, কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্চেনা তাহলেই বুঝতুম আমার পরিবর্ত্তন হয়েচে। আমার গান হচ্চে—

আমি সব নিতে চাই, সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

মানবজীবন নিয়ে এই যে পৃথিবীতে এসেচি এ পৃথিবীকে আমি খাটো করে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবনা—পশ্চিমদিকের উপর আড়ি করলেই যে পূর্ব্বদিকটাকে বেশি করে পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে—বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো।

C/o মেসার্স টমাস কুক এ্যাণ্ড সন
লাডগেট সার্কাস, লণ্ডন
১৯শে জুন, ১৯১৩।

[পত্রখানি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে লিখিত
এবং তাঁহার পুত্র শ্রীবিমলকুমার গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

(২)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। প্রত্যেক বীজ আপনার বিকাশের খাদ্য আপনার মধ্যেই ধরে রাখে—সেই খাদ্যটুকুর মধ্যেই তার ভাবীকালের প্রাণসঞ্চয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমাদের আত্মার অমৃত অন্ন আত্মারই গভীর কেন্দ্রে নিহিত—আত্মসমাহিত শান্তির মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। এখন তুমি যে শান্তির মধ্যে মগ্ন হবার অবকাশ পেয়েচ সেই শান্তির গভীরতাকেই

তুমি আপনার বাণী আপনি পাবে। মঙ্গলকর্ম্মের মধ্যেও এই শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মকে সম্প অহংমুক্ত করা বড় কঠিন। কর্ম্মশালার জানালা দরজা যত বড়ই হোক্ তবু তার মধ্যে বদ্ধতা থেকে য এইজন্যে কর্ম্মশালার বাইরে খোলা বাগানের দরকার হয়, যাঁরা কর্ম্মসন্ন্যাসী কর্ম্মের চক্রবাত্যায় আত্ম বাণীকে হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা তাঁদের যথেষ্ট আছে—এইজন্যে তাঁদের পক্ষেও কর্ম্মের চারিদিকে ব অবকাশকে প্রসারিত রাখা খুবই আবশ্যক—নইলে ভালো কর্ম্মও নেশা হয়ে উঠে অহংকে উগ্র ও আত্মা আবিষ্ট করে দেয়। কর্ম্মের সংসার থেকে তুমি ছুটি পেয়েচ এখন তুমি আদেশের জন্যে বাইরের দি তাকিয়ো না, অন্তরতম নিজের কাছে এসো—তার কাছ থেকে এখন সাড়া পাবে। যে গুরু নিজে ভোলান না বলেই অন্যকে ভোলান না সে রকম গুরু নিতান্তই দুর্লভ, অথচ যদি তাঁদের দর্শন মেলে তাঁদের মত সুলভ কেউ না। যার দরকার আছে তাকে না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন ন নইলে তাঁরা অকৃতার্থ হন,—ভরা মেঘ মরুভূমিতেও জল বর্ষণ না করে থাকতে পারে না সেইরকম গুরুই কতবার পৃথিবীতে এসেচেন, আর তাঁদের যা দেবার তা দিয়ে চলে গেছেন—না দি যাবার জো ছিলনা। ভেবে দেখ, ভাবতে এমন দিন ছিল যখন লিপি ছিলনা, গ্রন্থ আকারে ভাবপ্রকা করবার উপায় ছিলনা তবু যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা না দিয়ে যেতে পারেন নি। আমিতো তাঁদেরই এ একটি বাণীর মধ্যে গুরুর স্পর্শ পাই। আর কিছুনা, সেই বাণী শান্ত হয়ে শুনতে হয়—নিজের আত্মা বাণীর সঙ্গে তার সুর মিল করে তবে তাকে পাওয়া যায়। মন যখন শান্ত তখন একটিমাত্র শব্দই যথেষ্ট "সত্যং"— বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,—শান্তং শিবম অদ্বৈতং—কোথাও কিছু আ ফাঁক থাকেনা—কেননা কোলাহলমুক্ত হলে এই ধ্বনি আপনার মধ্যেই শোনা যায়। আনন্দরূপমমৃতং— অনন্ত দেশকাল আনন্দের অমৃতে নিবিড়, নিজের নিভৃত আত্মার মধ্যেই তার চরম সাক্ষ্য। সে সাক্ষ্য না পেলে বাইরের কথার কোনো মূল্য নেই। আমরা যখন গুরুকে মানি তখন গুরুকেই মানি সত্যকে না,—সত্যকে তখনি যথার্থ মানি যখন আত্মার কাছে তাকে পাই।

তোমাকে লেখা আমার যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে বেরিয়েচে তা পড়ে অনেকে আনন্দ পেয়েচেন। এই সম্বন্ধে আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ খুব সুন্দর পত্র পেয়েচি—সেটা আমার পক্ষে বড়ো সান্ত্বনার। নিজের ভিতরকার ঠিক কথাটি লেখা একেবারেই সহজ নয়,—তুমি আমাকে লিখিয়েচ বলেই লিখেচি—কোমর বেঁধে সাধারণকে উপদেশ দেবার জন্যে যদি লিখতুম তা হলে বানানো কথা হত—অন্তরের সহজ কথা বলতে পারতুম না। ইতি—২০ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত]

সহিত নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—হওয়াটাও যেমন বিচিত্র নয়, তেমনই, ঐ একটি ঘটনাই দৈবের মত তাঁহার চিন্তা ও ভাবধারাকে এমন পথে প্রবর্ত্তিত করিল যে, য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ অতিক্রম করিয়া তাহা হিন্দুচিন্তার অগম-গহনে, যেন অজ্ঞাতসারেই প্রবেশ করিল—সেই প্রকৃতিরও অন্তরালে এক বিরাট দুর্জ্জেয় শক্তির আভাস পাইল। তথাপি, য়ুরোপীয় কাব্য ও নব্য ভাব-চিন্তার সেই রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেম এ কাব্যের একটি প্রধান প্রেরণা হইয়াছে—ইহার কাব্যরসের প্রধান উপাদান হইয়াছে সেই প্রকৃতিপ্রেমের রূপ-বিহ্বলতা। কিন্তু এই কাব্যের অন্তরঙ্গরূপে যে প্রাকৃতিক শক্তির ভাবনা আছে তাহা সেই রূপরসের প্রকৃতি নয়—সকল রস, সকল হৃদয়-সংবেদনাকে স্তম্ভিত ও তুচ্ছ করিয়া, সেই প্রকৃতিরও অন্তরালে একটা বিরাট সত্ত্বা—একরূপ *Natura Naturans*, একটা মূলা-প্রকৃতি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই প্রকৃতিকে—ভারতীয় তন্ত্র বা শক্তিসাধনার সেই তত্ত্বকে - বঙ্কিমচন্দ্র যেন অজ্ঞানে, গূঢ়তর কবিপ্রেরণা ও প্রচ্ছন্ন হিন্দুসংস্কারের বশে—একটা ভাববস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ কাপালিক অতিশয় গৌণ ও তির্য্যকভাবে তাঁহার মনে সেই তত্ত্বটির আভাস দিয়া থাকিবে। তাই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের একাংশে প্রকৃতিপ্রভাবের সেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় লক্ষণ থাকিলেও, একটি বিপরীত লক্ষণই সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সে ঐ অপর প্রকৃতির প্রভাব; সে প্রকৃতি বাহ্য প্রকৃতির একটি কল্পিত আদর্শ-রূপ নয়, সে প্রকৃতি মনুষ্যজীবনেরই একটা উদারতর পটভূমিকা নয়—মনুষ্যহৃদয়ের সহিত তাহার কোন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নাই। ইহার সহিত তন্ত্রতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহা খাঁটি তন্ত্রতত্ত্বও নহে, সেই তন্ত্রতত্ত্বের একটা ভাবময় অনুবেদন মাত্র ইহাতে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, সম্ভবতঃ—এ সময়ে ত' নহেই, পরেও—তন্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে করেন নাই, বরং সজ্ঞানে, সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, তিনিও তন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, ঐ কাপালিক-চরিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতএব, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মনের সেই প্রশ্নই তাঁহাকে সজ্ঞানে এই কাব্যরচনায় প্রেরিত করিলেও, কাব্যসৃষ্টিকালে তিনি অন্যবিধ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিপ্রেম—সেই অতি গভীর রোমান্টিক প্রবৃত্তি—এই কাব্যে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুক। সেই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি যেমনই একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেন, তখনই এমন একটা তত্ত্বের সম্মুখীন হইলেন, যাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ হইয়া যায়,—মানুষের জীবন, তাহার কামনা-বাসনা, তাহার যত কিছু আত্মাভিমান, সকলই নিরর্থক ও হাস্যকর হইয়া পড়ে। সেই তত্ত্বই একটা ভাববস্তুর আকারে এই উপন্যাসের আদি-প্রেরণা হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইলে ঐ কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

যে ভাববস্তু এই পন্যাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ তাহার নিম্নপ্রান্তে আছে ঐ কাপালিক, কিন্তু আর সকলকে গৌণ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধপ্রান্তে বিরাজ করিতেছে এই উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা—কপালকুণ্ডলা। নরনারী চরিত্রে প্রকৃতি-প্রভাবের যে মনস্তত্ত্বঘটিত মতবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহা ঐ কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। এই চরিত্র সৃষ্টিকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় সেক্‌স্‌পীয়ারের মিরাণ্ডা (Miranda) চরিত্র স্মরণ করিয়াছিলেন। সেখানেও এক নির্জ্জন দ্বীপে পিতামাত্র-সহচর হইয়া এক নারীশিশু বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহার কোন সাক্ষাৎ সমাজ-সম্পর্ক নাই; একদিকে মুক্ত প্রকৃতির প্রভাব, অপরদিকে তাহার ঐ স্নেহময় পিতার সঙ্গ—এখা সম্ভবতঃ রক্তের আভিজাত্য গুণে, মিরাণ্ডা-চরিত্র যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সহজবুদ্ধিতে তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সেখানে প্রকৃতি-প্রভাবই অধিক বটে, তথাপি ঐ পিতার চরিত্রের প্রভাবও আছে, সে চরিত্রে সুকর্ষিত সামাজিক সংস্কারও বিদ্যমান। অতএব, মিরাণ্ডা, এই পিতার সংসর্গে, তাহার অজ্ঞাতসারে, মানবীয় শিক্ষা

ও সামাজিক সংস্কার কতকপরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহার পিতার মন্ত্রতন্ত্র-সাধনা ও ভূতপ্রেতের উপর আধিপত্য, তাহাকে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির বিষয়ে সচেতন ও অভ্যস্ত করিলেও, পিতার স্নেহ ও সহৃদয়তা সে সকলের প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিয়াছে। অতএব যে নিয়মে মিরাণ্ডার প্রকৃতি ঐরূপ হইয়াছে, সেই নিয়মেই কপালকুণ্ডলা-চরিত্র কিরূপ হওয়া সঙ্গত? প্রকৃতির এভাব যদি দুইয়ের পক্ষে সমানও হয়, প্রস্পেরো (Prospero) ও কাপালিকের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ; কপালকুণ্ডলার রক্তেও কোন বিশেষ বংশগত প্রভাবের অবকাশ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নায়িকাকে আরও মুক্ত ও অনাবৃতভাবে প্রকৃতির মুখে স্থাপন করিয়াছেন, এবং সমাজকে আরও বেশি করিয়া দূরে রাখিবার জন্য একটি অতিশয় অসামাজিক, এমনকি, সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের বিরুদ্ধাচারী, ঐ কাপালিকের সংসর্গে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রভাব এবং ঐ সংসর্গ, এই দুইয়ের মিলিত ফল, ঐ প্রকৃতিবাদের নিয়মে কি রূপ হইতে পারে? কাপালিকের সেই অতি নিষ্ঠুর আত্মসাধনা ও পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের সহিত আশৈশব পরিচয়ের ফলে কপালকুণ্ডলার চরিত্র তিনটি বিভিন্ন মুখে বিকাশ পাইতে পারিত; (১) সেও সেইরূপ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিত; (২) সেই নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তাহার চিত্ত অতিশয় স্নেহ-কোমল, প্রেমপ্রবণ হইতে পারিত; (৩) তাহার হৃদয় অসাড় হইয়া যাইত, কোন বৃত্তিরই স্ফুরণ হইত না। ইহার কোনটাই হয় নাই। দুর্ব্বল হইলে তাহা অসাড় হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু কবি এই নারী চরিত্রকে অতিশয় সুস্থ ও সবলরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা উদাসীন হইলেও নিষ্ঠুর নহে, বরং অপূর্ব্ব করুণাময়ী। ইহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। গভীরতর দৃষ্টির প্রমাণ এই যে, তিনি কাপালিকের ঐ প্রভাবের উপরে তাহার নারী-প্রকৃতিকে জয়ী করিয়াছেন,—নারীর প্রকৃতিগত মহত্বকে তান্ত্রিকের মতই স্বীকার করিয়াছেন। যে নির্ম্মমতা কেবল ঔদাসীন্যই নয়, যাহা আত্মত্যাগের অসীম শক্তি এবং সর্ব্বস্বার্থপূর্ণতার অপার করুণাও বটে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে, পুরুষ অপেক্ষা নারী-সুলভ বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন, এবং সেই শক্তিকেই তিনি কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন। কেবল সাগরের সীমাহীন তরঙ্গ-বিস্তার, আকাশ, অরণ্য ও নির্জ্জন বনভূমির মন্ত্র-গুঞ্জরণই যথেষ্ট নয়—প্রকৃতির সেই প্রভাব নানা কারণে মানবহৃদয়ের পক্ষে ব্যর্থ বিকৃত হইতে পারে; কেবল নারীই তাহার একটি বিশিষ্ট শক্তির বলে সেই প্রভাবকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। কপালকুণ্ডলা নারী বলিয়াই, সে নিজে সেই মহাশক্তির প্রতীক; এইজন্য সে প্রকৃতির গভীরতর প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া, ঐ কাপালিকের প্রভাবও জয় করিয়াছে। এই যে চরিত্র-বিকাশ ইহা বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বা তাহারই অনুরূপ কোন প্রকৃতিবাদের নিয়মানুমোদিত নয়। এ চরিত্র moral নয়, un-moral; Psychological নয়—mystical, Spiritual। য়ুরোপীয় কাব্যে এইরূপ চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়—সেখানকার প্রকৃতি-প্রেরণাই অন্যরূপ।

নারী-রূপা ওই শক্তি বা প্রকৃতিই সেই একই শক্তি—যাহাকে জয় করিয়া, আত্মবশ করিয়া, মূর্খ কাপালিক শক্তিমান হইতে চায়। এই কাপালিক-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রয়োজনমত গড়িয়া লইয়াছেন, তিনি সে চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কবি-কল্পনা-সুলভ সহানুভূতিযোগে, তাহার অন্তরবাসী মানুষটাকে আবিষ্কার করেন নাই; শাইলকের (Shylock) প্রতি সেক্‌স্‌পীয়রের যেটুকু সহানুভূতি আছে এই কাপালিকের প্রতি কবির সেটুকু পক্ষপাতও নাই; তার কারণ, তাহাকে তাঁহার পৃথক প্রয়োজন নাই, সে এই কাহিনীর একটা machinery বা অতিরিক্ত অথচ প্রয়োজনীয় অঙ্গ—সে ইহার ঘটনা-ধারাকে ধাক্কা দিবার বা সচল রাখিবার একটা উপায় মাত্র। আরও কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্রতত্ত্ব বা তান্ত্রিকসাধনার প্রতি

আদৌ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি শুধু কাহিনী বা ঘটনার প্রয়োজনই নয়, এই কাপালিক-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মূল ভাবকল্পনারও পুষ্টি-সাধন করিয়াছে—কপালকুণ্ডলাচরিত্রের উপরে তাহার গৌণ প্রভাব নানাদিক দিয়া সেই চরিত্রকে স্ফুটতর করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে একটা নিষ্ঠুর নির্ম্মমতার মূর্ত্তিরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন বটে; তথাপি, প্রথমদিকে তাহার সেই নির্ম্মমতার মধ্যেও এমন একটা আত্মস্থতা ও দৃঢ়তার আভাস আছে, যে বিতৃষ্ণাসত্ত্বেও আমরা কেমন যেন একটু আকৃষ্ট হই, ভয়ের মধ্যেও একটু শ্রদ্ধা অনুভব করি—শক্তিমানের প্রতি দুর্ব্বল যেমন করে। কিন্তু পরে তাহার সেটুকু মহিমাও আর রহিল না, অতিশয় সাধারণ স্বার্থপর মানুষের মতই তাহার মধ্যে একটা দুর্ব্বল, অসহায়, লোলুপ মূর্ত্তি দেখা দিল—হৃত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সে অতি হীন উপায় অবলম্বন করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপ সাধনার ঐরূপ পরিণামই যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু খাঁটি তান্ত্রিক সাধকের চরিত্র ঐরূপ নহে, সে চরিত্র আমাদের চক্ষে যতই ভ্রান্ত বা দুর্নীতি-কলুষিত হউক, তাহার একটা স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও তত্ত্ব-নিষ্ঠা আছে—প্রকৃত সাধক যে, সে ঐরূপ দুর্ব্বল, মোহগ্রস্ত হয় না। ঐ কাপালিক শেষে যে অবস্থায়, যে উপায়ে, যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সে আমাদের কৃপার পাত্র হইয়াছে। তান্ত্রিকের সাধনা সর্ব্বসংস্কারমুক্তির সাধনা—দেহ-মনের যতকিছু বন্ধন, যতকিছু অভিমান, যাহাকিছু আত্মাকে দুর্ব্বল করে, তাহাই উচ্ছেদ করিবার জন্য তান্ত্রিক ঐরূপ নির্ম্মমতার সাধনা করে। কেবল জ্ঞানের দ্বারা, উচ্চ তত্ত্বচিন্তার দ্বারা, ভাব-সাধনার দ্বারা স্বভাব-সংশোধন করা বড়ই দুরূহ; কারণ, সেই সকল চেষ্টার মূলে স্বভাবের ক্রিয়াই থাকিবে; ভিতরে ভিতরে সেই স্বভাবই মানুষকে ভুলাইয়া, অতি[illegible]য় সূক্ষ্মভাবে প্রবঞ্চনা করিয়া, তাহার সাধনা ব্যর্থ করি[illegible] দেয়; তাই স্বভাবকেও নিহত করিতে হইবে। এই জন্যই যোগপন্থা ও জ্ঞানপন্থা—বৈদান্তিক সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনায় এত প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাপালিক কেবল সেই নির্ম্মমতার একটা ভীষণ মূর্ত্তি মাত্র। তাহার ভবানীভক্তিও একটা অন্ধভক্তি বলিয়াই মনে হয়। তথাপি তাহার এই সাধন-মন্ত্রের দ্বারা, সে তাহার পালিতা কন্যার সারা চৈতন্য আবিষ্ট করিয়াছে; সে যাহাকে একটা অসম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং কতকগুলা অনুষ্ঠানের দ্বারা লাভ করিতে চায়—এখনও করে নাই, ঐ কন্যা তাহার নারীসুলভ অজ্ঞান-অনুভূতিতেই তাহাকে প্রাণে লাভ করিয়াছে, তন্ময় হইয়া গিয়াছে; সেই শক্তিকে—সেই দেবী-ভবানীকে সে বিশ্বময় দেখিতেছে, তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ইচ্ছাশক্তি নাই। কাপালিকের সাধনার মূলে যে সত্য ছিল, তাহা কাপালিকের চরিত্রে নয়—ঐ অপর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; এইজন্য কাপালিক চরিত্রের যাহা কিছু নীচতা ও দুর্ব্বলতা তাহাই যেন কপালকুণ্ডলা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কপালকুণ্ডলাও নির্ম্মম বা মমতাহীন; কাপালিক যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, সে তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই নির্ম্মমতার বলেই সে অপূর্ব্ব করুণাময়ী, কাপালিকের প্রতিও তাহার করুণার অন্ত নাই। কাপালিক তাহাকে অজ্ঞান অবোধ মনে করে, এমন কি তাহার সাধনার বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বলিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু সেও জানে না, যে-শক্তির সে আরাধনা করে সেই শক্তির সহিত তাহার ঐ কন্যা একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সহিত কাপালিক-চরিত্রের যোগে, উপন্যাসের ভাববস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সবিস্তার আলোচনা করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কপালকুণ্ডলা কাব্য হইলেও ইহার একপ্রকার নাটকীয় প্রকৃতিও লক্ষণীয়। ইহাও সত্য যে, ইহার ঘটনাধারা একটা নিদারুণ ব্যর্থতায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহাকে বিলাতী কাব্যশাস্ত্রের মতে ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাল করিয়া ভিতরে দৃষ্টি করিলে ইহাকে ঠিক সেই আদর্শের ট্র্যাজেডি

বলা যায় না। কারণ, ইহাতে—ভিতরে ও বাহিরে মানুষের জীবনগত কোন বৃহৎ সংঘর্ষ নাই, এবং কাহিনীতে মানুষের জীবন বা চরিত্র বিশেষ মর্য্যাদালাভও করে নাই—একটা দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তির সম্মুখে মানুষ মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াইতে পারে নাই। যাহাকে 'human interest' বলে তাহাও ইহাতে অল্প। ইহাকে প্রেমের ট্র্যাজেডিও বলা যায় না, কারণ, মতিবিবির প্রেমে সেইরূপ ট্র্যাজেডির আভাস থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা শোচনীয় না হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে এবং নবকুমারের প্রেমও পৌরুষের অভাবে নিতান্তই কৃপার যোগ্য হইয়াছে। অতএব কপালকুণ্ডলা সেই বিলাতী আদর্শের খাঁটি ট্র্যাজেডি নয়।

তথাপি ইহাতে একটা ভিন্নতর ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবন বা চরিত্রঘটিত যে নিদারুণ পরিণাম, তাহাই মহিমান্বিত হয় নাই বটে,—ইহা 'ওথেলো' 'ম্যাকবেথ' 'এ্যান্টনির' ট্র্যাজেডি নয়; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার 'হ্যামলেট' এবং বিশেষ করিয়া 'লীয়ারে' যে ট্র্যাজেডি-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন—সমগ্র মানব জীবন বা সৃষ্টির মূলে যে একটা নির্ম্মম বা অন্ধশক্তির লীলা, ও তাহারই কারণে মানুষের নিষ্ফল সংগ্রামের যে নিরাশ্বাস তাহাতে ঘনাইয়া উঠে—অথবা, ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির (Thomas Hardy) উপন্যাসগুলিতে যে ধরণের ট্র্যাজেডি আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়—'কপালকুণ্ডলা'র সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য আছে। তথাপি কপালকুণ্ডলা ঠিক সেই জাতীয় ট্র্যাজেডি নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে যে শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তাহার মহিমা এমনই যে, মানুষ তাহার তুলনায় আপন ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা স্বীকার করে—অভিভূত হইলেও হতাশ্বাস (demoralised) হয় না, পরাজিত হইলেও সে পরাজয়ে নিরাশ্বাস জাগিয়া থাকে না। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ দৃশ্য স্মরণ করিলেই ইহা নিঃসংশয় হইয়া উঠিবে। সেখানে সেই শক্তিরই প্রতীকরূপিণী মানবী-কপালকুণ্ডলা মানব নবকুমারের প্রেম যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং তাহার ফলে সেই হতভাগ্য পুরুষের জীবন-নাট্যে যে যবনিকা পড়িল, তাহা চিন্তা করিয়া পাঠকের হৃদয় যেমন মথিত হয়, তেমনই, সেই ভাবাকুলতার মধ্যেও একটি অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য বা শান্তরসের উদ্রেক হয়—ঠিক এই রস য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রস নয়। আবার নবকুমার এই উপন্যাসের নায়ক হইলেও, নায়িকা কপালকুণ্ডলাই তাহার অসাধারণ চরিত্র মহিমায় উপন্যাসের আর সকল চরিত্রের মত, ঐ নায়ককেও এমন ম্লান করিয়া দিয়াছে যে, এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডি মুখ্যতঃ তাহারই জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু তাহার সে আত্মবিসর্জ্জন, আমাদের চক্ষে যেমনই হৌক তাহার নিজের পক্ষে একটা পরম সিদ্ধিলাভ—'a consummation devoutly to be wished'; অতএব দুঃখ করিবার কিছু নাই।

এই সকল কারণে, কপালকুণ্ডলা ট্র্যাজেডি হইলেও একটা নূতন রসের ট্র্যাজেডি—ইহার প্রেরণাই স্বতন্ত্র। আমি পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। খাঁটি য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে নাই, একমাত্র কপালকুণ্ডলার চরিত্রই ট্র্যাজেডির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু সে চরিত্র সাধারণ মানব-চরিত্র নয়, তাই সে তাহার নিয়তিকে অনায়াসে, বিনা সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছে—তাহার পক্ষে কোন ট্র্যাজেডিই সম্ভব নয়। অপরগুলির মধ্যে কোথাও কঠিন প্রবৃত্তিবিরোধ বা দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি-বেগ নাই; মতিবিবির মধ্যে যাহা ছিল তাহা অর্দ্ধপথেই প্রায় নিরস্ত হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের পরে সে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। যেন সেই এক শক্তিই আর সকলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। সমুদ্রতীরের সেই মরু-ক্ষেত্র হইতে যে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে তাহার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই; সেই ঝড় অবাধে ও দ্রুতগতিতে সকল তুচ্ছ বাধা

অপসারিত করিয়া আপন ধ্বংসকার্য্য সমাধা করিয়াছে —শেষে ভাঙনধর্ম্মা নদীর কূলে, অপর এক শ্মশানে সে তাহার প্রাপ্য বলি আদায় করিয়া লইয়াছে। সেই বলিও নবকুমার নয়—কপালকুণ্ডলা, অর্থাৎ তাহার বলি সে নিজেই। নবকুমার সামান্য মানুষ মাত্র—বড় ক্ষুদ্র; তাই অন্তিমকালে সে সেই মহাশক্তিরূপিনীর নিকটে উন্মাদের মত প্রেম ভিক্ষা করিল, পাইল কেবল করুণা, সুমহতী ক্ষমা। অতএব এই ট্র্যাজেডিতে মানুষের প্রতি কৃপা আছে, সেই কৃপার মধ্যেই করুণ-রস আছে। কিন্তু মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহার সমাজ, তাহার সংসার, তাহার সুখদুঃখ, সম্পদ-বিপদ, তাহার ন্যায়-অন্যায়, তাহার সদসৎ, তাহার চরিত্র-নীতির অভিমান, এবং প্রেমনামক তাহার সেই পিপাসার যতকিছু বিকার—সকলই যে কিরূপ মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার নিদর্শন, এই কাব্যে তাহাই নির্ম্মমভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সেই ঝড়ের ঝাপটে যে নীড় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাও আকারে বা আয়তনে বড় নয়। কবির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। ইংরাজীতে যাহাকে Sublime বলে তাহারই রুদ্রকান্ত রূপের ধ্যানে কবি তন্ময়—সেই Epic Sublimityই এ কাব্যের প্রধান রস। তাই, ইহাতে মানুষের বিদ্রোহী আত্মার মহিমা-ঘোষণা নাই; তাহাকেও অতিক্রম করিয়া একটি বিরাট—বিশালের স্তুতি এই কাব্যের মূল প্রেরণা হইয়াছে। এ যেন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মতই—একটা ক্ষুদ্রতর পট-ভূমিকায়—আর এক প্রকার শক্তিরূপ-দর্শন। এ তুলনার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঐ তুলনা দ্বারা একটা বস্তু সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা এই যে,—এই কাব্যেও সেই এক ভারতীয় ভাবদৃষ্টির প্রেরণা রহিয়াছে; সে যে কি দৃষ্টি তাহা বুঝাইবার পক্ষে ঐ এক তুলনাই যথেষ্ট। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—নাটক-রোমান্স-উপন্যাস-ট্র্যাজেডী —যে গুণযুক্ত হউক, তাহা যে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই।*

*লেখক সম্পাদিত (যন্ত্রস্থ) 'কপালকুণ্ডলার ভূমিকা' হইতে।

"আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই, আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই, এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভাল মন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশ্যালিষ্ট। আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে, কিন্তু 'উর্বশী' কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্ক্‌সিজমের ছোঁয়াচ যদি কারও কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাতরেখে লাগে, তা হলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহ'লে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেম্ব্রিজের ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয়জয়কার করব, কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলবো না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হ'লেই হোলো।"—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পীর ক্ষোভ

বনফুল

মদন ঘোষাল যদিও জীবনে কোনও কবিতা লেখেন নি বা ছবি আঁকেন নি তবু তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বললে অন্যায় হবে না, কারণ তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটিকে শিল্পীজনসুলভ আনন্দসহকারে উপভোগ করেছেন। অনন্যতাও আছে তাতে।

রেশ খেলেছেন, কিন্তু টাকার লোভে নয়—ওর নাটকীয় উন্মাদনাটা উপভোগ করবার জন্যে। জীবনে নর্তকী-বিলাস করেছেন বহুবার কিন্তু নর্তকীকে স্পর্শ করেন নি কখনও। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব বড়লোকের বাড়িতে। ব্যাঙ্কের অঙ্ক তাঁকে মুগ্ধ করে নি, করেছিল জামাইয়ের লক্ষ্য ভেদের ক্ষমতা। অদ্ভুতরকম অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য ছোকরার।

শোনা যায় তত্ত্ব করবার সময় বেয়াই মশায়কে লিখেছিলেন—আমি গরীব মানুষ আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমার। বেশী কিছু পাঠাতে পারলাম না। একটি মাত্র মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছি, দয়া করে গ্রহণ করলে বাধিত হব।

বেয়াই মশাই চিঠি পড়ে চটে উঠছিলেন, কিন্তু মিষ্টান্নটি দেখে অবাক হ'তে হল তাঁকে। বিশাল একটা কড়ায় বিরাট একটা পানতোয়া প্রচুর রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। কড়ার আংটায় বাঁশ গলিয়ে ষোল জন লোক বয়ে এনেছে।

খবর নিয়ে জানতে পারলেন পানতোয়াটির ওজন একমণ।

ঘোষাল মশায় দানে চিরকাল মুক্তহস্ত। দানটা যত নাটকীয় হত তত আনন্দ হত তাঁর।

পাড়ার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন। মেয়েটি কালো; অনেক টাকা পণ লাগবে।

ঘোষাল মশাই অর্থ সাহায্য করলেন না, মেয়েটিকে একেবারে নিজের পুত্রবধূ করে' নিলেন।

শোনা যায় প্রথম যৌবনে নব-পরিণীতা বধূর কাছে চিঠি পাঠাবার জন্যে বহুবিচিত্রবর্ণের শিক্ষিত পারাবত পুষেছিলেন তিনি। পায়রার গলায় চিঠি বেঁধে দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিতেন এবং আশা-আশঙ্কা-দোদুল-চিত্তে চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে।

নানা গল্প প্রচলিত আছে ঘোষাল মশায়ের সম্বন্ধে। তাঁর যা কিছু ছিল খেয়ালের হাওয়ায় রঙীন ফানুসের মতো উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি সারাজীবন ধ'রে।

সেদিন ঘোষাল মশায় অতিশয় বিপন্নমুখে প্রতিবেশী হরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে টাকা নেই একথা কি বলা যায়, আর বললেই বা বিশ্বাস করবে কেন হরেন। চিরকাল টাকা পেয়ে এসেছে সে। কিন্তু সত্যিই আজ তাঁর হাতে টাকা নেই। যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। বাইরের ঠাট বজায় আছে কিন্তু ভিতর ফোঁপরা। সত্যিই আজ তিনি কপর্দ্দকশূন্য। অথচ হরেন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এসেছে।

শিল্পী মদন ঘোষাল নাটকীয় পরিস্থিতিটা বেশ উপভোগ করছিলেন মনে মনে। প্রার্থী হরেন চক্রবর্তীর জন্যে কষ্ট

হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু তার চেয়েও বেশী কষ্ট হচ্ছিল ফতুর মদন ঘোষালের জন্যে।

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে হরেনবাবু আর একবার বললেন—"অনেক আশা করে' আপনার কাছে এসেছি। বিশ্বাস আছে আপনি অন্তত আমাকে নিরাশ করবেন না। সত্যি বলছি, বড় কষ্টে পড়েছি ঘোষাল মশাই। ঘরে চাল নেই, কাপড় নেই, ছেলেটা অসুখে ভুগছে ওষুধ কেনবার সামর্থ্য নেই। স্কুলের মাইনে দিতে পারি নি বলে' বড় ছেলেটার নাম কেটে দিয়েছে। কি যে করব জানি না। বেশী নয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিন আমাকে দয়া করে—"

ফতুর মদন ঘোষাল অপ্রস্তুত মুখে বাইরের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা নেই একথা অবিশ্বাস্য। জানলার দিকে চেয়ে গুম্ফপ্রান্ত পাকাতে লাগলেন তিনি। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন শিল্পী মদন ঘোষাল।

লোকটা কি করে দেখা যাক।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর যখন রূঢ় সত্য কথাটাই মোলায়েম করে' বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফতুর মদন ঘোষাল, তখন রঙ্গমঞ্চে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

ময়লা-কাপড়-পরা গরীব-গোছের একটি লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

বলল—"আমি আপনার প্রজা। পঞ্চাশ টাকা খাজনা বাকী ছিল দিতে এসেছি।"

ফতুর মদন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ টাকাটা হরেনবাবুর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

সফলমনোরথ হরেন বাষ্পাকুল নয়নে অস্ফুটকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে' বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমস্যাটার এমন একটা অরোমাঞ্চকর সমাধান হওয়াতে শিল্পী মদন কিন্তু ভারী দমে গেলেন। প্রজাটির দিকে চেয়ে বললেন—"তোমার নাম কি?"

"জনার্দ্দন গোস্বামী।"

"তোমার নাম তো শুনি নি কখনও, কোথায় থাকা হয়?"

"আপনারই আশ্রয়ে।"

আরও প্রশ্ন হয়তো করতেন তাকে, কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে পুরোহিত মশাই প্রবেশ করলেন।

"সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, ঠাকুরঘরে ঠাকুর নেই।"

"অ্যাঁ, সে কি! সিংহাসনের পাশে পড়ে-টড়ে যায় নি তো?"

"না, আমি দেখিছি ভাল করে।"

"আর একবার দেখুন গিয়ে।"

পুরোহিত চলে গেলেন। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সোনার তৈরী জনার্দ্দন—সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হওয়াতে শিল্পী মদন ঘোষালের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল যেন।

গৃহদেবতা জনার্দ্দন ঠাকুর সিংহাসনে নেই, প্রজাটির নাম জনার্দ্দন গোস্বামী। ফতুর মদন ঘোষালের অবস্থা দেখে তবে কি স্বয়ং জনার্দ্দন—আর ভাবতে পারলেন না তিনি।

চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করে' উঠল, থরথর করে' কেঁপে উঠল নীচের ঠোঁটটা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন প্রজা জনার্দ্দন চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, না নেই—চলেই গেছে।

পুরোহিত মশাই ফিরে এলেন।

তাঁর মুখে হাসি।

ঠাকুর পাওয়া গেছে। গিয়ে দেখেন ঠিক সিংহাসনের উপরেই বসানো আছে।

হেসে বললেন—"আমার বিশ্বাস মণ্টুবাবু তুলে নিয়ে ছিলেন। জনার্দ্দনের ওপর ওঁর ভারী লোভ। আমার কাছে একদিন চেয়েও ছিলেন—"

মণ্টু মদন ঘোষালের নাতি, বয়স পাঁচ বছর। শিল্পী মদন ঘোষাল তখন উত্তেজনার তুঙ্গে আরোহণ করে' বসে আছেন।

বললেন -"মাধব গোমস্তাকে ডেকে দিন তো একবার।"

একটু পরেই মাধব গোমস্তা এল।

"মাধব, দেখ তো জনার্দ্দন গোস্বামী নামে কি আমাদের প্রজা আছে কোনও? আমার তো যতদূর মনে পড়ছে ও নামের কেউ নেই।"

"দেখি।"

মাধব চলে গেল।

পরবর্ত্তী দৃশ্যের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন মদন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগলো নাটকটা বেশ জমেছে, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়...।

মাধব ফিরে এসে বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ। জনার্দ্দন গোস্বামী নামে আছে একজন প্রজা দুর্গাপুর মহালে।"

"আছে? ভাল করে' দেখেছ তুমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তার পঞ্চাশ টাকা খাজনাও বাকী আছে।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন মদন:

"খাজনা বাকী আছে কি না তা তো দেখতে বলি নি তোমায়, ও নামের কোনও লোক আছে কি না।"

"আছে।"

'ভাল করে' দেখেছ তো?"

"দেখেছি।"

"আচ্ছা যাও তবে।"

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন মদন ঘোষাল। আজকাল আর নাটক জমে না। ঠিক সময়ে কিছুতেই যেন তালটি পড়ে না আজকাল। সবই কেমন যেন পানসে গেছে।

"ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইবে না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তে তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার।'

* * *

"তোমার কি হবে এ ভয় কখনও ক'রোনা, কারও উপর নির্ভর ক'রোনা। যখন তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত—বিবেকানন্দ

খণ্ডিত বাংলা ও অখণ্ড ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিবার পর উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গণ্যমান্য নেতা অনেক প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন; অনেকগুলি পুস্তিকাও ও সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদের জাতীয়তাবাদের গোড়াই কাটিয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মাবলম্বীদের লইয়াই যখন ভারতীয় নেশন গঠিত, তখন বিচ্ছেদের জন্য বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সোজা অর্থ এই যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক নেশন; এবং এক রাষ্ট্রের ভিতর তাহাদের পক্ষে শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। অতএব একজাতীয়তাবাদ যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আপাততঃ আমাদিগকে যতই অসুবিধা ভোগ করিতে হউক না কেন, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহা যথাসম্ভব নীরবে সহ্য করাই উচিত। সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। একদিন না একদিন আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয়তা-বাদের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; এবং তখন আমরা উভয়ে জাতীয়তার ধ্বজা তুলিয়া মহানন্দে গলা জড়াধরি করিয়া দিগ্বিজয় করিতে অগ্রসর হইব।

এই বিরোধী দলের মধ্যে যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদী তাঁহারা বলেন—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রাজনৈতিক ক্ষমতালুব্ধ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। নিপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর ধর্ম্মবিলাসের অবসর নাই। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের চেষ্টাতেই তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের একই অবস্থা। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজেদের কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টা করে। অতএব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনের অধিকার কৃষক ও শ্রমিককুলের হাতে তুলিয়া দাও, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লোপ পাইবে এবং দেশে চিরশান্তি বিরাজ করিবে। বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিকিৎসা করিতে যাওয়া আনাড়ীর লক্ষণ। যাঁহারা সুচিকিৎসক তাঁহারা রোগের মূল কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

যাঁহারা বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী তাঁহারা এ সমস্ত যুক্তির উত্তরে বলেন—তোমাদের সমাজতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হউক; তোমাদের জাতীয়তাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হউক—এ সব তো খুব আনন্দের কথা! কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করিতে গেলে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনাই যে নষ্ট হইয়া যায়! সমাজ-তন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কল্পনা যতই সুখদায়ক হউক না কেন, আজ যাঁহারা বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা যে সুযুক্তি শুনিয়া স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন সে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। স্বধর্ম্মীদের

মনে পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রবল করিয়াই তাঁহারা মন্ত্রীর গদি অধিকার করিয়াছেন; এবং যতদিন তাঁহাদের স্বার্থবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন যে তাঁহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিতে থাকিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারের ফলে আজ বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিকের মনে শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থবুদ্ধি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নেতৃবৃন্দের মতের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কোনও কার্য্যসূচী গ্রহণ করাইতে গেলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। কাজেই আপাততঃ বাংলাদেশের অর্দ্ধাংশকে যদি মুসলমান নেতৃবৃন্দের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সারা বাংলা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ বরং সুগম হইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষ তো এখনই বহু প্রদেশে বিভক্ত। ইহাতে যদি সারা ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে আর একটী নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইলেই বা মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে কেন? অধিকন্তু জগতে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে মানসিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মানুষের সমাজ গঠনে অর্থনীতির প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, আর্থিক সাম্যই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। সুতরাং অর্থসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও মানুষের মন হইতে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। অনিশ্চিতের আশায় বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করা মোটেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আপাততঃ বঙ্গ বিভাগ করিয়া দুঃখের মাত্রা হ্রাস করা যাক। সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে থাকুক। ইহার ফলে যদি মুসলিম লীগের মন হইতে ধর্ম্মান্ধতা ও অপরের উপর পাকিস্থান চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি লোপ পায় তখন আবার ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগাইয়া সমাজতন্ত্রবাদের জয়গান করিলেই চলিবে। আপাততঃ আত্মরক্ষাই পরম ধর্ম্ম।

১ কথার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন—ইহারই নাম defeatist mentality—পরাজিতের মনোভাব। হিন্দু ও মুসলমান যে একই মায়ের দুই সন্তান, একই রূপসীর দুটি নয়ন তারা, এ তথ্য তো অনেক মনীষী অপূর্ব্ব ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ সেই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ দেশে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বাস করিত। ইংরেজের ভেদনীতি মুসলমানকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ যদি আমরা লীগপন্থীদিগের অত্যাচারে অসহিষ্ণু হইয়া বাংলা বা পাঞ্জাবকে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত করিতে চাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমরা হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী। ইহার পর আর ভারতবর্ষে একটি যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের কথা নিরর্থক। যাহারা এক নেশন নয়, একটী যুক্ত-রাষ্ট্রের ভিতর যদি তাহারা বাস করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? মুসলমানেরা পাকিস্থান গড়িতে চাহিলে কোন্ যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইবে? এতদিন ভারতের জাতীয়তাবাদী দল এক নেশনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। আজ যদি কতকগুলি গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের ছুরিছোরার ভয়ে তাহারা অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই তো জাতীয়তাবাদের পরাজয় স্বীকার করা হইল!

উত্তর পক্ষ বলেন—এই জাতীয়তাবাদের কথা বহুদিন হইতেই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু ইহার স্বরূপ এ পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ যে এ দেশ শাসন করিতে আসিয়া নানাভাবে ভেদ নীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিহাসে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, সেরূপ সাফল্য যে আর কোনও ক্ষেত্রে লাভ করিতে পারেন নাই, তাহারও তো কারণ আছে! ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে Nationalism

উঠেন—এ সব যে সৃষ্টিছাড়া কথা। এ দেশে কি নেশন বলিয়া কিছুই নাই? সারা দেশটাকে কি তোমরা টুকরা টুকরা করিয়া একেবারে জাহান্নমে পাঠাইতে চাও?

উত্তর পক্ষ বলেন—অত চীৎকারের প্রয়োজন নাই, এবং সারা ভারতবর্ষ যদি এক নেশন না-ও হয় তাহা হইলে যে আমাদিগকে জাহান্নমে যাইতে হইবে তাহা মনে করিবারও কারণ নাই। এই দেশে এক কেন, বহু নেশনের বীজ উপ্ত হইয়া উঠিতেছে। নেশন শব্দটা ইউরোপে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে যদি সেই অর্থে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিহার, উড়িষ্যা, হিন্দুস্থান, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগুলি এক একটি নেশনের বাসস্থান। বাংলায় ও পাঞ্জাবে একাধিক নেশনের বাস বলিলেও দোষ হয় না। কোন কোন প্রদেশের মুসলমানেরা যদি আপনাদিগকে পৃথক নেশন বলিয়া মনে করেন তাহা হইলেও তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ নাই। তবে অপরের উপর অত্যাচার করিবার কাহারও অধিকার নাই—মুসলমানদেরও নাই। বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও অন্যবিধ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি মিলিয়া এক যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে ভারতবর্ষে নেশনের সংখ্যা যতই হউক না, ইহার ভৌগোলিক একত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীরা যদি আপনাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নেশন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারও নাই। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যদি আপনাদিগকে পৃথক্ নেশন মনে করিয়া বাংলায় দুইটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন, তো তাহাতে আর্ত্তনাদ করিবার কোন কারণ নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি আমরা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি লইয়া এক বা একাধিক প্রদেশ গঠন করি, এবং অধিবাসীদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক এক বা একাধিক নেশন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে তাহারা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পাকিস্থান গঠন করিতে চায়, তখন আমরা আপত্তি করি কেন? ইহার প্রধান কারণ—আত্মরক্ষার প্রয়োজন। বিদেশাগত তুর্ক বা আরবীর যে সমস্ত বংশধর এ দেশে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে এখনও বিদেশীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে আবার জয় করিয়া এখানে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলতান মামুদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসকবর্গ যে ছলে বলে কৌশলে হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ আছে। আজ আর সে চেষ্টার পুনরাবৃত্তি করিবার সুবিধা তাহারা যাহাতে না পান, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদিগকে সে ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আজ এ ব্যবস্থা যদি মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় মানিয়া লন, তো ভালই। আর তাহা না করিয়া যদি তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের নামে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চান, তাহা হইলে মহাত্মাজীর অহিংসামন্ত্র যে হিন্দুদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না।

গান্ধীজির লক্ষ্য

লীলাময় রায়

সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আরেক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকদের সঙ্গে বনিয়ে চলে তো গোলমাল বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পিছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্য সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধরে। ক্রমশ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশদেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সবদেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আরেক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হবে। বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে একশো বছর আগে থেকে চিন্তা করে গেছেন মার্ক্‌স। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবেচিন্তে তিনি এই বার করলেন যে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতিবিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হয়, যারা প্রতিবিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হ'য়ে বিপ্লবে নামে তারা আখেরে পরাজিত হয়। মার্ক্‌স্ তাঁর শিষ্যদেরকে মন্ত্র দেন দুই ভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিষ্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুর শ্রেণী। যজমানদের সংঘবদ্ধ করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সঙ্কটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও মিলিটারি। পুলিশ ও মিলিটারি হাতে এলে আর সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুরের সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়। রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের সংঘবদ্ধ করছে কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্ক্‌সের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, ষ্ট্যালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যে সব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে সব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মত সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পিছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি

রাশিয়া হাবে তো বুঝতে হবে পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে। পরম হিংসার কাছে হেরে গেছে।

গান্ধীজীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়ত আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মক হোক না কেন কোন অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারত তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্ব্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায়চিন্তা। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই। সমগ্র দেশ যখন ভয়ে আড়ষ্ট তিনি তখন অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্যায় করবেন না, তেমনি অন্যায় সইবেন না। এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে অসহযোগ। অসহযোগকে অহিংস করেছে তাঁর মানবপ্রেম। অসহযোগ ও অহিংসা দুটোই কেমন নেতিবাচক শোনায বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল আমারও। কিন্তু এ দুটি নেতিবাচক শব্দের মূলে কাজ করছে ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে। একটি সত্য ন্যায়বোধ, আরেকটি সত্য মানবপ্রেম। এই যুগ্ম সত্যকে এক কথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা; আপনার মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না, দৃশ্যত যে শত্রু সেও তাঁর আপনার লোক। একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই। যীশু যেমন শত্রুকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন গান্ধীও তেমনি বলছেন। দু'হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল যিনি যীশুর মতো শত্রুপ্রেমিক, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের ঋষিদের মতো সকলের মধ্যে আত্ম-দর্শী, আত্মার মধ্যে সর্ব্বদর্শী। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গান্ধীজীর সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে পরীক্ষা সব চেয়ে তাৎপর্য্যবান। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে। সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাকুঁড় সাফ করাও মহাধার্মিকের কাজ। এ কাজ করতে গিয়েই যীশুর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। অনধিকারচর্চ্চা করতে গিয়ে বহু মহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই, একদিন সন্দেহ ছিল। রাজনৈতিক সঙ্কটমুহূর্ত্তে তিনি যে ভাবে পলিসি নির্দ্দেশ করেছেন কোনো পেশাদার রাজনীতি-বিদ্‌ও তেমনটি পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটিসিয়ানও হতেন, তা হলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবেও যদি তাঁকে বিচার করা হয় তা হলেও দেখা যাবে তাঁর পরিচালনা নির্ভুল।

ইতিহাস তাঁকে প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো বড় শক্তির আবিষ্কারক তথা প্রয়োগকর্ত্তা রূপে। এমন এক শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার পাল্টা নেই, সুতরাং পাল্টা বিদ্রোহ এ দেশে ঘটবে না, প্রতিবিপ্লবের পথ বন্ধ বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত ওয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্লবী রাশিয়া যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল তবু শেষপর্য্যন্ত আণবিক যুদ্ধে জয়ী হয় কিনা অনিশ্চিত। কিন্তু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে যতই বিলম্ব হবে ততই কার্য্যসিদ্ধি হবে। কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্ত্তন। অন্তঃপরিবর্ত্তনের লক্ষণ আমরা দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনো দিনের আলোর মত প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি, ভোরের আলোর মতো পরিস্ফুট ও নয়। কিন্তু রাত শেষ হয়ে

আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে না আরো ক'বছর লাগবে অন্তঃপরিবর্তন জাজ্জ্বল্যমান হতে। আরো কবার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ তো বার ঘণ্টার রাত নয়, দু'শো বছরের রাত। দু'শো বছরের বেশীও বলতে পারি, কেননা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কেবল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধেও। স্বদেশী স্বার্থান্বেষীরা হাজার বছর আগেও ছিল। দেশের সাধারণ লোক হাজার হাজার বছর ধরে সুদ মুনাফা ও খাজনা জুগিয়ে আসছে, তাদের রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপস্বত্বভুক্ শ্রেণী। গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীটির রাজত্বকে স্বরাজ বলে ভুল করতেন তা হলে খদ্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুণগান করতেন। ইংরেজ চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চাননা বলেই তো গঠনের কাজ করতে সবাইকে বলছেন। গঠনের কাজ এমন ভাবে কল্পিত হচ্ছে যে সমগ্র দেশ যদি গঠনের কাজ করে তো কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, উপস্বত্বভুক্‌দের সঙ্গে সংগ্রাম করবার আগেই তারা সান্ধি করবে। ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রজার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের হবে, উপস্বত্বভোক্তারা প্রথম দিকে ন্যাসী হবে, অবশেষে উৎপাদক হবে

টলস্টয়, থোরো ও রাসকিন গান্ধীজীর গুরু। গান্ধীবাদের বারো আনাই এই তিনজনের মতবাদ। এঁরা না হলে গান্ধীজী হতেন না। গান্ধীজীকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভুল। তিনি একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক। কোটি কারমাও সে সাধনায় তাঁর পূর্ব্বগামী। ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর যৌবন কেটেছে। সেই সূত্রে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে। খাঁটি ভারতীয়রা তাঁকে কোনদিন বুঝবে না।

"আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আজকের মানুষের যে বিরাট দায়িত্ব অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে তার জন্য মানুষকে প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারে ধর্ম। ধর্মের উন্নততর অভিব্যক্তি শাস্ত্রপুথি নয়, পুরোহিততন্ত্রও নয় বা অনুষ্ঠানও নয়। এই ধর্মই মানুষের মনে বিশ্বাসের মনোভাব এনে দিতে পারে, যা, মানুষকে এখানে তার ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম ক'রে তুলতে পারে এবং পরকালেও তা রক্ষা করবার সামর্থ্য দিতে পারে। ধর্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্দ্বন্দ্বে এই সভ্যতা আধ্যাত্মিক ঐক্য হারিয়েছে এবং সমাজ অমানুষিক প্রতিযোগিতায় প্ররোচিত হয়েছে। মানুষ এর ওপর জয়লাভ করতে পারে তখন, যখনই সে নিজের সৃষ্টিমূল ও ভবিষ্যৎ, কোথা থেকে সে এল এবং কোথায় যাবে এসম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর স্তরে উন্নত হবে।"—ইকবাল

মহারাজ রায়ের অট্টালিকা

মনোজ বসু

প্রথম অধ্যায়

পৈতৃক নাম নীলরতন। অব্যবহারে সে নাম সকলে ভুলে গেছে। বোধ করি নীলরতন নিজেও। কিন্তু মহারাজ রায়ের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা কর—যে না সেই সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেবে।

বাড়ি নয়, অট্টালিকা। সাকুল্যে তিনখানা ঘর—খোড়ো চাল, মাটির মেজে, ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। কিন্তু নামকরণ হয়েছে মহারাজ রায়ের অট্টালিকা। খোড়ো ঘর ক'খানার জন্য নয় অবশ্য। সামনে একফালি ফাঁকা জমি—তাতে পাকা দালানের খিলান অবধি গাঁথা। দরজা-জানলা বসানো হয় নি—বসাবার জন্য ফাঁক রাখা আছে—ছুতার-মিস্ত্রি ডেকে মাপসই দরজা-জানলা গড়িয়ে বসালেই হল। দোতলা বাড়ি তোলবার উপযোগী প্রশস্ত সুদৃঢ় ভিত। চল্লিশ বছর কেটে গেছে, অনেকবার অনেক আয়োজনে গাঁথনি ঐ খিলান অবধি উঠেছে। গাঁথনির খোলে আড়াই হাত আন্দাজ মাটি তুলে ভরাট করা—খোয়া পিটিয়ে সিমেণ্ট লেপে পাকা মেজে হবে। এখন প্রভৃতি বর্ষাকালে কসাড় জঙ্গলে ঢেকে যায় জায়গাটা, অগ্রহায়ণ মাসে জঙ্গল কেটে মাটি কুপিয়ে মহারাজ মুলো-পালঙের বীজ ছড়িয়ে দেন। ভাল মূলোর ফলন হয় তোলা-মাটির উপর।

লোকে হাসি মস্করা করে, বলে, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর মহারাজের অট্টালিকার ভিত এক তারিখে খোঁড়া শুরু হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কবে সমাধা হয়ে গেছে, কিন্তু এ অট্টালিকা অত সোজা কাজ নয়—চল্লিশ বছরে খিলান অবধি হয়েছে, দোতলা হতে শ-দুই বছর তো লাগবেই।

কিন্তু মহারাজ দমেন নি। বাড়ি শেষ করবেনই। থেমে নেই তিনি। পাঁচ সাত বছর নিঃশব্দে আয়োজন চলে, তারপর একদিন দেখা যায় বাঁশ পুঁতে ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। কর্নিকে ইট কাটার শব্দ দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়। পাড়ার ছেলেমেয়েরা জুটে হাঁ করে দেখে। এর পর নতুন এক খেলা আরম্ভ হয়ে যায় ছেলেপুলের মধ্যে—দালান গাঁথার খেলা। সেই ভিত-পত্তনের আমলে যারা দালান গাঁথার খেলা খেলেছিল, তাদেরও চুল-দাড়ি পেকে যাবার মতো হয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করে, এবার কদ্দিন চালাবে মহারাজ দা?

ছাদ মেজে দেয়ালের পলস্তারা শেষ করে তবে মিস্ত্রিদের ছুটি। চিরকালটা ঐভাবে গেল, দুটো দিন স্থির হয়ে ঘর গৃহস্থালী করতে পারলাম না, গৃহ-প্রবেশের দিনটা তোমাদের দশজনকে ডেকেডুকে একটু আমোদ-স্ফূর্তি করব ঠিক করে রেখেছি।

তবু দিন পনের না যেতেই কর্নিকের আওয়াজ নীরব হল।

হল কি মহারাজ-দা?

ছোঁড়াটার ঘাড় ধরে নিয়ে জেলে ঢোকাল। কি করা যাবে? পুঁজি-পাটা নিয়ে ছুটতে হল কলকাতায়।

যে ছোকরার উল্লেখ করলেন সে আপন কেউ নয়—এই সহরের বাসিন্দা স্বর্গীয় হৃষিকেশ সরকারের ছেলে সত্যশিব। কলকাতায় পড়াশুনো করত, অসময়ে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে এল, ওয়ারেণ্টও পিছু পিছু তাড়া করে এল এদ্দূর অবধি। সত্যশিব তাঁকে কিছু বলে নি, ঘটনাটা কানে এলে কাউকে কিছু না জানিয়ে উপযাচক হয়ে তিনি ছুটেছিলেন। এ নিয়ে মহারাজকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে সরযূর কাছে।

সরযূর উপস্থিতি কাছাকাছি কোথাও অনুমান করে মহারাজ প্রবোধ দিতে লাগলেন এক হিসাবে ভালই হল ভায়া। বর্ষা এসে গেছে, এখন একদিন কাজ হবে তো তিন দিন হবে না, মিছামিছি মিস্ত্রির মাইনে গণে যাওয়া। ভাদ্র মাস কেটে গেলে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। আর দেরি নয়, নির্ঘাৎ শেষ করব এবার।

বর্ষাটা বিষম প্রবল হল। সুরকি নয়—কাদার কাঁচা গাঁথনি। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে এক পাশের দেয়াল এক রাত্রে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সম্প্রতি যা গাঁথা হয়েছে তাই শুধু নয়—সাবেক পুরাণো গাঁথনিরও অনেকটা ধ্বসে গেছে ঐ সঙ্গে। আবার গোড়া থেকে নতুন করে গেঁথে তুলতে হবে। মুশকিলের অন্ত নেই।

কি কুক্ষণে ভিত বসানো হয়েছিল, মুশকিল সেই থেকে একের পর এক চলছে। তখন আঠার উনিশ বছর বয়স, নীলরতন নাম বহাল আছে, স্নেহ করে সবাই নীলু বলে ডাকে। আজকে তিনি মহারাজ রায়, মাথায় স্বল্পাবশিষ্ট শনের মতো পাকা চুল, বলিরেখাঙ্কিত বীভৎস ভয়ানক মুখ, মুখের সমস্ত লালিত্য নিংড়ে শেষ করে ফেলেছে বয়স এবং সরকারি জেল। সস্নেহে নীলু বলে ডাকবার কেউ নেই এ জগতে, এখন তিনিই সকলের নাম ধরে ধরে ডাকেন, সবাই ছোট। এই সেদিন বয়সের হিসাব হচ্ছিল দত্ত-বাড়ির আড্ডায় বসে। এক কৈলাস কর্মকার মহারাজের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, কৈলাসকে বাদ দিলে মহারাজের বয়স স্ত্রী-পুরুষ সকলের চেয়ে বেশি এত বড় পাড়াটার মধ্যে।

সকালবেলা একটু আগেই সরযূর সঙ্গে খানিকটা বকাবকি হয়ে গেছে, অট্টালিকার ভিটেয় তিনি পেঁপের চারা পুঁতছিলেন বলে। মহারাজ হাঁ-হাঁ করে এসে পড়লেন, এটা কি হচ্ছে বলো তো? পেঁপে ফলতে এক বছর দু-বছর তো বটেই—তদ্দিনে ছাত উঠে যাবে, শান-বাঁধানো মেজে হবে এ জায়গায়।

সরযূ একনজর স্বামীর দিকে চেয়ে যেমন চারা পুঁতছিলেন, সারবন্দি তেমনি পুঁতে চললেন।

মহারাজ বললেন, নিজের হাতে আর্জানো গাছ—কেটে ফেলবার সময় কষ্ট পাবে। ভাদ্র মাসের পর আমি কিন্তু দেরি করছিনে আর এবার।

সরযূ বললেন, ছাতে-মেজের কাজ নেই ভাঙা দেয়ালটা গেঁথে তোল দিকি এবছরের ভিতর। বোশেখে গৌরীর বিয়ে দেবোই, নারকেল-পাতায় ছেয়ে দিলে বেহারা-বাজনদার থাকতে পারবে এখানে। পেঁপে গাছ কেটে ফেলো, আমি তাতে রাগ করব না।

অর্থাৎ এই ধ্বসে-যাওয়া দেয়ালটুকুও সাত-আট মাসে গেঁথে তুলতে পারবেন না, সরযূর এই স্থির বিশ্বাস। বিষম অপমানিত বোধ করলেন মহারাজ। স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, দালান কি আটকে থাকত? এমন দশটা দালান হয়ে যাবার কথা নয়? বলো, তুমিই বলো—

না—আটকে থাকবার কথা নয়। পাটের কারবার করে বাপ টাকাপয়সা রেখে গিয়েছিলেন, বত্রিশ বিঘে ধান-জমি বিক্রি করেও মোটা রকম হাতে এসেছিল। বাড়ি ছিল কালনার কাছাকাছি ছুতারহাটি নামক এক গ্রামে। বাপ চোখ বুজতে শরিকেরা উঠে পড়ে লাগল। একটা আম-চারার দখলি স্বত্ব নিয়ে মামলা-মোকর্দমার খরচ হল একুনে সাড়ে বাইশ শ টাকা—ঐ আমগাছের আম চিরকাল ধরে বিক্রি করেও এ টাকার সিকির সিকি উঠে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর সমস্ত হাঙ্গামা পোহাতে হত একলা মহারাজকে। ছেলে আলা-ভোলা মেয়ে

কুস্তি লড়ে বেড়াত ওদিককার যত নাম-করা পালোয়ান তাদের সঙ্গে। লেখাপড়া কিছু করেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সময় শরীর চর্চা নিয়ে থাকত। এই ছেলে নিয়েই আরও আতঙ্ক হয়েছিল মহামায়ার। ধান-জমি সমস্ত বিক্রি করে দিলেন, ইদানীং এক ছিটে ধানও পাচ্ছিলেন না। শরিকেরা ভাগ-চাষীদের বুঝিয়েছিল, বিধবা বেওয়া মানুষ আর অকর্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে—কিছু ওদের দেবার দরকার নেই। না দেবার প্রস্তাব সকলের কাছে মিষ্টি—চাষীরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিল এ পরামর্শ। মহামায়া এ সম্পর্কেও নীলরতনের কাছে উচ্চবাচ্য করেন নি, বরঞ্চ তার কাছে ফলাও হয়ে কথাটা প্রকাশ না পায়, এ নিয়ে তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। জানতে পারলে হয়তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসবে; সদর-আদালত অবধি যাবার সবুর সইবে না, ছুতারহাটির বাঁধের উপর একরকম বিচার-নিষ্পত্তি করে ফেলবে। তখন সদরে দৌড়তে হবে বিপক্ষ দলেরই।

ইতিমধ্যে দাদার চিঠি পেয়ে মহামায়া অকূল সমুদ্রে কিনারা দেখতে পেলেন। কালীনাথ এই শহরের কালেক্টরি অফিসে চাকরি করতেন। তিনি লিখলেন, আপনজনেরা শত্রুতা করছে—মাটির মায়ায় অমন জায়গায় পড়ে থেকে লাভ কি বোন? সমস্ত বেচে দিয়ে চলে এসো। এখানে ঘরবাড়ি বানিয়ে দেব, শান্তিতে থাকবে। জিনিষপত্র খুব সস্তা এখানে। নিলামে সস্তায় গাঁতিপটি কিনে দেবো, তাই ভাঙিয়ে চুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তোমার একটা ছেলের জীবন কেটে যাবে।

যে দাম পেলেন তাতেই মহামায়া ধান-জমি বিক্রি করে দিলেন। বসতবাড়ি বিক্রি করতে মায়া হল। শরিকেরা হাসাহাসি করবে, সে-ও একটা কারণ বটে। ভায়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন, এমনি ভাবে একদিন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ছেলের হাত ধরে গরুর গাড়িতে উঠে বসলেন। আসল উদ্দেশ্য কাউকে বললেন না। নীলরতনও জানে না, পৈতৃক বাস্তুভিটা ছেড়ে নদীখালে-ভরা ভাঁটির দেশ কায়েমি বসবাস করতে যাচ্ছে।

কালীনাথ বাজে কথা লেখেন নি। ছ-মাসের ভিতর বাকি করের দরুণ লাটবন্দি এক ছিটে তালুক কিনে দিলেন। আরও দিতেন। কিন্তু পায়ের উপর পা রেখে জীবন কাটানো অদৃষ্টে নেই যে নীলরতনের। সাড়ে চার বিঘার উপর বসতবাড়ি—এ জমিও কালীনাথ সুকৌশলে খরিদ করে দিয়েছিলেন মাত্র শ আষ্টেক টাকায়। শহরের উপর এতটা জমি—কত সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল হিসেব করে দেখ! চল্লিশ বছর আগে শহর অবশ্য ছিল শুধু নামেই—দুটো পাকা রাস্তা, সবসুদ্ধ গোটা বারো কেরোসিনের আলো জলত রাস্তায়—শুক্লপক্ষে নয়, কৃষ্ণপক্ষে সন্ধ্যা থেকে তিনঘণ্টা মাত্র। আজকের এত বাড়ি গাড়ি পিচ-দেওয়া রাস্তা বিদ্যুতের আলোর সমারোহের ভিতর সে চেহারা কিছুতে তোমাদের আন্দাজে আসবে না। কিন্তু চেহারা যত সামান্যই হোক, আভিজাত্য ছিল—দু-দুটো লালমুখ গাঁটি সাহেব এহেন জায়গায়—কালেক্টর মার্টিন সাহেব আর পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হ্যামিল্টন সাহেব।

ভায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে মহামায়া নিজের বাড়ি এসে উঠলেন। আপাতত কয়েকটা খোড়োঘর বেঁধে নিলেন। সেই ঘর কখানাই ছাউনি বদলে, খুঁটি বদলে, বেড়া বদলে চাল বদলে চল্লিশ বছর ধরে ভিটের উপর আজও খাড়া রয়েছে। পুকুর কাটা হল পিছনদিককার বাঁশঝাড় কেটে ফেলে। দুইরকম উদ্দেশ্য—পুকুরের জল খাওয়া ও পোনা ফেলে মাছ তৈরি করা যাবে। আর পুকুরের যে মাটি উঠল তাই দিয়ে ইট তৈরি হবে পাকা দালানের জন্য। মস্তবড় এক পাঁজা সাজানো হল, পাঁজা পুড়লো ভালই। কোন দিকে কোন রকম অসুবিধা ঘটেনি তখন পর্যন্ত। পাঁচ-ছটা তেঁতুলগাছ লেগেছিল পাঁজা পোড়াতে। হৃষিকেশ সরকারের জমিতে বহু পুরাণো প্রকাণ্ড এক গাছ ছিল—কালীনাথের মধ্যবর্তিতায় হৃষিকেশকে একরকম কায়দায় ফেলে সে গাছটাও কেটে আনা হল। সে এক ভিন্ন কাহিনী। পরবর্তী কালে

মহামায়ার অনেক সময় মনে হয়েছে, হৃষিকেশ কি সেই রাগের শোধ নিয়েছে এমন করে? পাঁজার ইটে ঘর তৈরি কিছুতে সমাধা করতে দিল না।

শুভক্ষণ দেখে ভিত খোঁড়া হল, কালীনাথ পাঁজি দেখে দিনস্থির করে দিলেন। পূজা অর্চনা হল, পট্টবস্ত্র পরে হাসতে হাসতে মহামায়া পঞ্চরত্ন পুঁতে দিলেন ভিতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এরফান খাঁ মিস্ত্রি ইট বসাল। সে এরফান বুড়ো থুথ্থুড়ো হয়ে কবে কবরের তলে গিয়েছে।

খান চারেক ইট মাত্র গাঁথা হয়েছিল সেবার। ভিতের জন্য কাটা নালা বর্ষার জলে ডুবে থাকত, কোলাব্যাং ডাকত গ্যাঙর-গ্যাঙর করে আকন্দ আর উলুঘাসে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত নালার চারি পাশ। এরফান মাঝে মাঝে এসে তাগিদ দিত ইদিকে কাজ চালালে হত মা-ঠাকরুণ। সবই গোছানো গাছানো।

মহামায়ার মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠত বলতেন, হবে বই কি মিস্তিরি। নীলু আমার ভাল হয়ে উঠুক।

সুরকি ভাঙিয়ে গাদা দেওয়া ছিল, বছরের পর বছর বৃষ্টিতে ধুয়ে কাদার গোলা এসে মিশে জঙ্গল উঠে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোনখানে ছিল জায়গাটাই এখন খুঁজে পাওয়া দায়, আর খুঁজে পেলেও ঐ সুরকিতে এখন কাজ হবে না কিছু। চুণও জমা আছে—দীর্ঘকাল পড়ে থেকে মাটির বর্ণ হয়ে গেছে। পশ্চিম পোতার ঘরের দাওয়ায় এক তক্তাপোশ পাতা আছে মানুষজন উঠা-বসা করে—তারই নিচে সেই চুণ। কাপড়-চোপড় ক্ষারে সিদ্ধ করবার সময় পাড়ার বউ-ঝিরা ঐ চুণ মুঠো মুঠো নিয়ে ক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এখন আর কেউ নিতে আসে না। কেবল রং নয়—চুণও মাটির সমান হয়ে গেছে। ও-চুণে একদম রাগ নেই।

ভিত বসানোর দিন দশেক পরে সন্ধ্যার কিছু আগে একদিন নীলরতনকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে এল। কর্ণিক ফেলে এরফান খাঁ উঠে এল, আর যারা জোগাড় দিচ্ছিল সকলে এল। আরও খানিক পরে কর্ণিক হাতে নিয়ে নিঃশব্দে এরফান বিদায় হয়ে গেল, এ বাড়িতে আর তাকে কর্ণিক ধরতে হয়নি।

অনেক ঝাপসা স্মৃতি। একদা এই জীবনে ঘটেছিল বলে সন্দেহ হয় মহারাজের নিজেরও।

কে বিশ্বাস করবে বলো—টাক ছিল না তাঁর মাথায়, কপালের উপর কুশ্রী ঐ কালো দাগটা ছিল না, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়নের চেহারা ছিল আর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বাংলা দেশকে কেটে নাকি দু-টুকরো করছে। 'হিতবাদী' কাগজের মারফতে খবরটা পৌছল। চুলোয় যাক। করছে, তা কি করা যাবে বলো? ওদের রাজ্য—শাসনের সুবিধার জন্য দুটো কেন দশটা ভাগে খণ্ডবিখণ্ড করুকগেনা। যার পাঁঠা সে যদি লেজে কাটে। খবরের কাগজেই পড়ল খবরটা, তারপর যথারীতি সকলে নাইতে খেতে ঘুমুতে গেল। উকিলদের লাইব্রেরি-ঘরে আলোচনা গভীরতর পথে চলে, ঐ যে বলেছে শাসনের সুবিধার জন্য—ওটা ধাপ্পা, ভিতরে গূঢ় মতলব আছে। বাংলা দেশেই প্রথম ওরা চেপে বসে, সাম্রাজ্য সারা ভারতে ছড়িয়ে যায় এখান থেকে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাঙালি ক্রমশ জোট বাঁধছে। ক্ষীণদেহ তীক্ষ্ণধী এই মানুষগুলো আজকে যা ভাবছে, আগামী কাল তাই হবে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাবনা। প্রবীণ ভারতের নিয়ামক হল সেকালের অনার্যভূমি নিতান্ত অর্বাচীন এই বাংলাদেশ।' এর প্রাণশক্তি বিচূর্ণ করবার জন্য জনবুল বঙ্গভঙ্গের এই ষড়যন্ত্র করেছে। দুটো টুকরা দুটি ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেবে, অখণ্ড বঙ্গ-সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে অন্য প্রাদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রমশ।

এমনি সব আলোচনা হত উকিল-মোক্তারদের লাইব্রেরিতে। আরও খবরাখবর আসে—তাজ্জব খবর। দেশের মানুষ চুপচাপ মেনে নেয়নি এ ব্যবস্থা। প্রতিবাদ

উঠছে, আবেদনের সুরটাই অবশ্য বেশি প্রকট তার মধ্যে। একদিন দেখা গেল, পতাকা উড়িয়ে 'বন্দে মাতরম' চিৎকার করতে করতে এখানকারই কয়েকটি ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রবীণেরা বলেন, পাগলা মাষ্টারের কাণ্ড। ভূভারতের যেখানে যা ঘটবে, তার একটুকু নমুনা এখানে এনে দেখাবেই। হৃষিকেশের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত প্রশ্রয় আছে এখানকার সকলের। ভাল হোক মন্দ হোক বন্দে মাতরমের এই নতুন হুজুগ আমদানি করে এ শহরের ইজ্জত তিনি রাখলেন, এইরকম একটা ভাব।

তারপর আর এক কাণ্ড—খুব স্বদেশীর ধুম পড়ে গেল সারা অঞ্চলে। বিদেশি জিনিষ কেউ কিনবে না, বিদেশি জিনিষ গায়ে রাখবে না। বোষ্টম ভিখারিদের মুখে মুখেও স্বদেশি গান—'ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী' গৃহস্থ বউরা কৃষ্ণলীলা না শুনে অতিরিক্ত চাল পয়সা দিয়ে এই সব শোনে। বয়কটের হিড়িক আগুনের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগল সুদূরবর্তী গ্রাম অবধি। হৃষিকেশ সরকার কি করবেন—এত বড় ব্যাপার স্বপ্নেও ভাবেন নি তিনি। নির্বাক বিস্ময়ে মাঝে মাঝে অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। লোকের মুখে মুখে রটনা হচ্ছিল প্রথমটা। এটা রাজ-বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়বে কিনা, সঠিক কারো ধারণা নেই। রাগ যদিচ ইংরেজের উপর, কিন্তু বয়কটের তালিকায় ভিতর রয়েছে বিদেশ থেকে যা আসে প্রায় সমস্তই। আমাদের উদ্ভিন্ন জাতীয়তাবোধ ধ্বংস করতে চাচ্ছ—আপাতত তোমাদের হাতে মারতে পারছি না, অতএব যথাসম্ভব ভাতে মারব—যতদূর আমাদের ক্ষমতা আছে রেহাই করব না—এইটেই হল আসল কথা। আত্মনির্ভর-শীল হবার সঙ্কল্পও আছে, সেইটাই বাইরে ঢাক পিটিয়ে প্রচারিত হচ্ছে। বিলাতি নুণ খাওয়া বিলাতি কাপড় পরা বিলাতি কাচের চুড়ি হাতে রাখা ঘোরতর অপমানের ব্যাপার হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

পুজো এসে গেল। আটখানা বিলাতি কাপড়ের দোকান তখন এই শহরে লাট্টু, রেলি-উনপঞ্চাশ ও আরও নানাবিধ ধুতি-শাড়ি আমদানি করে ঘর ভর্তি করেছে দোকানদারেরা। রকমারি মন ভুলানো পাড়—বাংলা কবিতা ছাপা হয়ে আসছে ম্যানচেষ্টার থেকে—'দেখ পাড়ের কি বাহার, জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার—'। নূতন তৈরি দেশি মিলের কাপড়ে 'বন্দে মাতরম্' লেখা থাকে, তারই উল্টো একটা কথা বিলাতি কাপড়ে লিখছে—'খুলে মাতরম'। অর্থহীন স্থূল রসিকতা। আটখানা দোকানে বিলাতি কাপড় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, কমে না। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে দু'একটা খরিদ্দার হয়তো যায় কিন্তু দিনের আলোয় কেউ ওদিককার ছায়া মাড়ায় না।

সকাল বিকাল বন্দুক কাঁধে সিপাহীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সিপাহি আগে এত কি ছিল, ওদের সংখ্যা ইদানীং অনেক বেড়েছে বলে মনে হয়। শোনা যাচ্ছে, তিরিশে আশ্বিন জাতীয় রাখিবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হবে এখানেও। এই আয়োজন বোধ করি তারই জন্য। কোন বাড়ি সেদিন উনুনে হাঁড়ি চড়বে না, শোক-দিবস। দেশের বুকে ছুরি মেরে দু-ভাগ করল, অশৌচের দিন এটা। উপবাসী থেকে আত্মশুদ্ধি ও কঠিন বাধার সামনে অবিচল থাকবার নিঃশব্দ ব্রত গ্রহণ করব আমরা! পরস্পরের হাতে রাখি পরাব। ঐক্যের প্রতীক হলদে রাখি—জবরদস্তি করে মাটি ভাগ করেছে, কিন্তু মানুষ আমরা, কোনদিন আমরা পৃথক হয়ে যাবো না। নানারকম জল্পনা সকলের মুখে মুখে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবেই ঐ দিনে। ছোকরারা সদম্ভে ঘাড় নেড়ে বলে, ঘটুক—তা বলে পিছিয়ে আসবে না কেউ।

এল সেই দিন—তিরিশে আশ্বিন। সকাল থেকে কি সমারোহ! তারপর কত কাল কেটেছে, কত মিছিল অন্যায়ের প্রতিবাদে কত রকম বিক্ষোভ দেখেছেন তিনি জীবনে। কিন্তু ভয়-ভাঙা উন্মুক্ত আলোয় প্রথম সেই বেরিয়ে আসার কি এক মহিমা মহারাজ রায়ের স্মৃতিতে আজো জলজল করছে। স্কুল-পাঠশালা বন্ধ—খানিকটা রোদ উঠতে রাস্তায় রাস্তায় নানা বয়সের মানুষের মিছিল।

সবাই এসে জড় হচ্ছে বাজারখোলার বটতলায়। তুমুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। থানা ওখান থেকে নজরে আসে; তার দেওয়ালগুলোও কাঁপছে বোধ করি ঐ চিৎকারে। শহরের পূর্বপ্রান্তে ঠাকুরদীঘি আর কালীবাড়ি। ঘণ্টাদুই পরে মিছিল ঠাকুরদীঘি অভিমুখে চলল। সমস্ত শহর অতিক্রম করে তবে পৌঁছবে সেখানে। জনারণ্য। এর মধ্যে এক একদল আবার খোল-করতাল নিয়ে এসেছে, কীর্তনের সুরে স্বদেশি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। গলির মোড়ে মোড়ে অগণ্য দর্শক। মেয়েরা শঙ্খ বাজাচ্ছে, উলু দিয়ে উঠছে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ছে যখন মিছিল।

আজকের সরযূকে দেখে চল্লিশ বছর আগেকার সরযূর কথা ভাবতে পারা যায় না। ষোল-সতের বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, গোলগাল গড়ন। কিন্তু শুধু চেহারায় তো বিয়ে হয় না—ওরা নৈকষ্য কুলীন, পালটি ঘর পাওয়া বড় মুশকিল, আর টাকা পয়সাও নেই সে রকম। তবে প্রত্যাশা আছে। বাপ দৈবচরণ গাঙ্গুলি বিপুল বংশগৌরব থাকা সত্ত্বেও লিটারেট কনেষ্টবল রূপে সুদীর্ঘকাল এক গ্রাম্য থানায় পচছিলেন, অনেক তদ্বির তাগাদা ও খোশামুদির পর সম্প্রতি প্রোমোশান পেয়ে এখানে ছোট-দারোগা হয়ে এসেছেন। গণ্ডগোল জমে উঠছে, এটাও শুভলক্ষণ। কর্ম্মদক্ষতা দেখাবার সুযোগ হবে এবং উপরি দু-পয়সা আসবেও।

সুপুষ্ট পেতের গোছার উপর খাঁকি কোট চাপিয়ে ব্যস্ত হয়ে দৈবচরণ থানায় ছুটছিলেন,—দেখতে পেলেন, রান্নাঘর ফেলে সরযূ কখন বেরিয়ে এসেছে, পাড়ার আর সকলের সঙ্গে সে-ও মিছিল দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অস্ত্রহীন হাজার হাজার মানুষ নিঃশব্দ প্রতিবাদে বেরিয়েছে—যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না সেই প্রবল প্রতাপ বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে। ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে, ওর আর রদ-বদল নেই—প্রকাশ, এমন ঘোষণার পরেও এরা আশা রাখে পাকাপাকি ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে।

ধমক দিয়ে উঠলেন দৈবচরণ। কাজকর্ম নেই? হাঁ করে কি দেখছিস, দেখবার কি আছে রে এর মধ্যে?

সরযূ এগিয়ে কাছে এসে বলে, নিমাইকে খুঁজতে এসেছিলাম। কোন ফাঁকে বেরিয়ে গেছে, টের পাইনি।

দৈবচরণ স্তম্ভিত হয়ে যান। নিমে জুটেছে বুঝি ঐ দলে? দুয়োর দিয়ে রাখিসনি কেন? বড্ড বাড় বেড়েছে—ধরতে পারলে বেতিয়ে পিঠের ছাল তুলব হারামজাদার।

কিন্তু নিমাইকে ধরতে যাবার আপাতত অবসর নেই, আজকের দিনে অসংখ্য জরুরি কাজকর্ম। যেতে যেতে দৈবচরণ মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে বলে যান, বাড়ি যা। ধিঙ্গি মেয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে—লোকে কি বলবে?

লোকে কি বলবে তার চেয়ে এখন বড় ভয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, থানার লোকে যদি টের পেয়ে যায় তাঁর ছেলে স্বদেশির দলের মধ্যে গিয়ে জুটেছে, মেয়ে সদর রাস্তায় হাঁ করে রাখিবন্ধনের মিছিল দেখছে। যা হিংসুটে পুলিশের লোকগুলা—কথায় কথায় হ্যামিল্টন সাহেবের কান অবধি পৌঁছে যেতে পারে, ব্যাপার তাহলে কদ্দূর গড়াবে ভাবতে হৃৎকম্প হয় দৈবচরণের।

জনতা ঝপাঝপ গিয়ে পড়ল ঠাকুরদীঘির জলে। ভিজা কাপড়ে এ ওকে আলিঙ্গনে বাঁধছে, হলদে সুতো পরাচ্ছে এ ওর হাতে……পায়ে পায়ে সরযূ বাড়ী ফিরল। রান্নাঘরে আর ঢুকতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু দেরি করাও চলে না। দৈবচরণ ফিরবেন দেড়টা দুটোয়। আজকে মনে রাগ রয়েছে, পান থেকে চুণ খসলে আজ আর রক্ষা থাকবে না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সরযূ হাঁড়িকুড়ি তুলে রাখছে, খুট করে পিছনে আওয়াজ। নিমাই।

সরযূ আগুন হয়ে বলে, শয়তান ছেলে, দলে গিয়ে মিশেছিলি? তোর জন্য বাবার চাকরি যাবে, না খেয়ে উপোস করে মরতে হবে আমাদের।

নিমাই বড় বড় চোখ মেলে সরযূর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথার মর্ম বুঝতে পারছে না এমনি ভাব।

সরযূ বলে, বাবা ক্ষেপে আছেন। ধরলে তোমায় আস্ত রাখবেন না।

নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে নিমাই বলল, ধরতে পারলে তো! তুমি চেঁচিও না। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি। শোন—

কাছে এসে সে সরযূর একখানা হাত টেনে নিল। বলে, তোমার হাতে রাখি পরাতে এসেছি দিদি। আমাদের বাড়ী কেউ তো আসবে না।

বড্ড আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমার—উ?

কিন্তু সরযূর রাগে নিমাই ভয় খায় না, টিপিটিপি হাসে, ধীরে ধীরে হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। সরযূ সভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কেউ দেখে না ফেলে।

তারপর আদেশের সুরে বলল, বোস, ভাত বেড়ে দিচ্ছি। খাসনি তো কিছু সকাল থেকে?

নিমাই অবাক হয়ে বলে, খাব আবার কি! আজকে অরন্ধন। এই দেখ, কিন্তু তোমার খেয়াল যাবে না দিদি।

সরযূ মনে মনে অপ্রতিভ হল। সত্যিই তো, একেবারে খেয়াল নেই। থাকবে কি করে? বাপ ষোড়শোপচারে আহারপর্ব্ব সমাধা করে উপরের ঘরে নাসাগর্জন করছেন,—বিকালেও ছুটোছুটি আছে, তার জন্য বলসঞ্চয় করে নিচ্ছেন। এ সংসারে কি মনে থাকে আর দশজনে কি করছে আজকের দিনে? সকল মানুষ থেকে আলাদা যে ওরা।

সরযূ স্নেহকণ্ঠে বলল, না খেয়ে রোদে রোদে ঘুরিসনে আর। বোস। বাবা আজ দেরি করে এসেছেন, ঘুম থেকে উঠবার দেরি আছে। সবরি কলা আছে, খেয়ে নে গোটাকতক। আর ডাব কেটে খা। খেয়ে জিরিয়ে নে একটুখানি।

নিমাই বলে, ওরে বাসরে। কত কাজ খবর রাখ?

কাজকর্ম তো চুকে গেছে, আবার কি?

মস্ত সভা হবে যে বিকালে [illegible]খোলায়। খবর রাখো না? কলাগাছ কেটে নিয়ে যেতে হবে চৌধুরিবাগান থেকে, গেট হবে। আমার উপর ভার।

সরযূ বলে, সভা হবে না।

নিমাই সবিস্ময়ে তাকাল। হবে না? কেন?

নতুন আইন হয়েছে বাবা বলছিলেন। সেই আইনে সভা বন্ধ। বন্দেমাতরম্ বলাও এখন বেআইনি। ঢোল পিটিয়ে সহরময় শুনিয়ে দিয়ে গেছে। তুই শুনিস নি?

আর আমি বসতে পারব না দিদি। ছেড়ে দাও—

নিমাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল উদ্যোক্তাদের খবর জানাতে। গিয়ে দেখল, পরামর্শ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে, সকলেরই কানে গিয়েছে। সভা হবে না সাব্যস্ত হল কিন্তু মিছিল বেরুবে। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না—অচল সংখ্যাতীত প্রস্তরখণ্ডের মত দৃঢ়-নিষ্ঠ জনতা নিঃশব্দে এগোবে। বিলাতি জিনিষপত্র যে পারে সংগ্রহ করে নেবে, সভাক্ষেত্রে বটতলায় থাকবে বিরাট অগ্নিকুণ্ড। সকলে দলে দলে গিয়ে বিলাতী জিনিষ আগুনে ফেলবে, আগুনে পোড়ানো হবে আমাদের কাপুরুষতা। একটি কথাও উচ্চারণ না করে আমাদের সবচেয়ে অমোঘ মন্ত্র বিলাতি শোষকদের উপর নিক্ষেপ করব এমনি ভাবে।

মিছিল যাচ্ছে। শহরের সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটা নরমুণ্ডে ভরে গেছে। সবাই শহরের লোক নয়—অনেকদিন থেকে ঢাক পেটানো হচ্ছে এই সভার ব্যাপার নিয়ে, বাইরে থেকেও অনেক লোক আসছে এই সভা দেখতে। গরুর গাড়ি করে গ্রামের মেয়ে-ছেলে অবধি আসছে। সভা হবেনা শুনে আশা ভঙ্গ হয়েছে, রাগও হয়েছে কর্তৃপক্ষের উপর—রাশে রাশে চলেছে বিলাতী জিনিষ, পুড়িয়ে খানিকটা শোধ নেবে। এক চাষীর পরণে ছিল বিলাতী কাপড়, গামছা পরে সে কাপড়খানা খুলে হাতে নিয়েছে আগুনে দেবে বলে। খুব বড় এক নিশান মিছিলের আগে—লাল শালুর উপর তুলোর বড় বড় অক্ষরে লেখা—বন্দেমাতরম্। ছোট বড় আরও অনেক নিশান মানুষের মাথা ছাড়িয়ে প্রজাপতির মত বাতাসে পত পত করে

উড়ছে। কাগজে বন্দেমাতরম্ লিখে অনেকে বুকের জামায় এঁটে দিয়েছে।

তিন দিক থেকে তিনটে রাস্তা বাজারখোলায় পৌঁচেছে। রাস্তার দু-পাশে পগার। পগারের ওধারে লাল ভেরেণ্ডা ও জিওলের কচা পুঁতে ক্ষেতের বেড়া আছে। তিনটে পথের মুখ। আটকে আছে পুলিশ। হ্যামিল্টন সাহেব নিজে উপস্থিত আছেন। বজ্রগর্জন ওঠে, হল্ট।

হৃষিকেশ এগিয়ে গেলেন হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

এ সমস্ত কি? নিরর্থক জনতাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। সভা হলে সেই সময় গ্রেপ্তার কোরো আর দেখতে পাচ্ছ, বন্দেমাতরমও কেউ বলছে না।

হ্যামিল্টন বললেন, বুকের উপর নিয়ে এসেছে ঐ যে।

বুকের ভিতরেও লেখা আছে সাহেব, সেটা চোখে দেখতে পাচ্ছ না বন্দেমাতরম্ নিশ্চিহ্ন হবে না, যত আইনই করো।

পুবের দিককার পথে বিষম গণ্ডগোল এমনি সময় প্রবল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। পতাকা কাড়তে গিয়েছে কতকগুলো পুলিশ। কিছুতে দেবে না—প্রাণ থাকতে দেবে না। কাড়াকাড়ি করতে ধাক্কা দিয়ে সামনের একজনকে ফেলে দিয়েছে পগারের মধ্যে। পতাকা তার হাত থেকে লুফে নিয়েছে আর একজন। সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল হল জনতা—তিন পথের সর্বত্র গর্জন উঠছে বন্দেমাতরম্। পুলিশ সামলাতে পারছে না, জনসমুদ্র আছড়ে পড়ছে বেষ্টনীর উপর, বাজারখোলায় সভাক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছবেই।

লাঠি পড়ছে নীলরতনের গায়ে মাথায়। লাঠির পর লাঠি। পতাকা সে দৃঢ় হাতে ধরে আছে। টানাটানি করছে পতাকার দণ্ড ধরে। তখন দু-হাতে সে বুকে চেপে ধরল। টলতে টলতে একটু এগিয়ে আমগাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে সে দাঁড়াল। হৃষিকেশ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছেন, আমার হাতে ছেড়ে দে ভাই বিশ্বাস করে। আমি অপমান হতে দেবো না পতাকার। চোখ বুজে স্থির হয়ে আছে নীলরতন, কানেই শুনছে না হয় তো। আবার লাঠি। গড়িয়ে পড়ল সে মাটিতে। হৃষিকেশ ছুটে এসে পতাকা ধরলেন, শ্লথ মুষ্টি থেকে নিয়ে নিলেন নিজের হাতে।

লোকের শব্দ পাওয়ায় সরযূ উপরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। দেখে সে অবাক। নীলরতনকে তাদের রোয়াকে এনে তুলেছে। কিছুতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, ধারা বয়ে যাচ্ছে রোয়াকের উপর দিয়ে রক্ত দেখে তার মাথা ঘুরে উঠল। অত লোকের মধ্যে নিচে অবধি যাবার সামর্থ্য নেই। জানালায় ঘন ঘন পথের দিকে তাকাচ্ছে, বাপ এসে পড়বার আগে এরা বিদায় হয়ে গেলে বাঁচে। নইলে রাগের মাথায় তিনি কি বলে বসবেন, উঠানের উপর এক কাণ্ড বেধে যাবে।

ইতিমধ্যে স্থানীয় ডাক্তারও একজন এসে গেছে। সরযূর শাড়ি ঝুলছিল ঘাড়ের উপর—মুখের কথাটাও কেউ জিজ্ঞাসা করল না। এক ছোকরা ফড়-ফড় করে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে পাগড়ির মতো নীলরতনের মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে। রক্ত বন্ধ হল অবশেষে।

যে ভয় হচ্ছিল—দেবচরণ এসে পড়লেন। দপকায় থমকে দাড়িয়ে রইলেন, চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

এখানে এনে তুলেছ কেন?

হৃষিকেশ বললেন, এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির কাছাকাছি পেয়ে গেলাম। ভয় নেই রক্তের দাগও রেখে যাবো না আপনার বাড়িতে। ছেলেরা ধুয়ে মুছে দিয়ে যাবে।

বাপকে দেখে সরযূ ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমার নতুন শাড়িটা ছিঁড়ে ওর মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে বাবা।

হৃষিকেশ করজোড়ে সামনে এলেন।

ও সত্যি। অনেক বিব্রত করা হয়েছে এতক্ষণ ধরে। কিন্তু ছেলেটার অবস্থা দেখুন। দারোগা হোন, যা হোন—দেশের মানুষ তো। এটুকু মাপ করে নিন আপনারা।

ক্রমশ

স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এতদিন সমস্যার বিষয় ছিল ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা পতিষ্ঠা করা যাবে কি করে। আজ আর তা সমস্যা নয়। ইংরেজ বলেচে চলে যাবে। কবে যাবে তাও বলেচে। তার রাজ-প্রতিনিধি এ-দেশে পা দিয়েই জানিয়েচেন ধুলো পায়েই তিনি বিদেয় নেবেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজের শেষ রাজ-প্রতিনিধি। তারা চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে? রবীন্দ্রনাথ দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলেন, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে একদিন ইংরেজকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবেই। কিন্তু সেদিন ইংরেজ যদি এদেশকে একেবারে তখনকার এই লক্ষ্মীছাড়া অনাসৃষ্টির মাঝে ফেলে রেখে যায়, তাহলে তা তার পক্ষে অপরিসীম লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। এ কথা তিনি বলেছিলেন ইংরেজের তখনকার মতি গতি দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। যে লক্ষ্মীছাড়া দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন, ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, আজ তার নগ্ন [illegible]তা আরো দুঃসহ হয়ে উঠেচে। আজ চলে যাবার [illegible] প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অনাবশ্যক জোরের সঙ্গে সে বলচে, আগামী পনেরো মাসের মাঝে যদি তোমরা তোমাদের ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলতে না পারো, তাহলে আমরা যার হাতে খুসি ক্ষমতা হস্তান্তর করে আসরে পাড়ি জমাবো। রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কাই করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এমন কথা ইংরেজ যদি বলে, বুঝতে হবে সত্যি সত্যিই সে ছোট হয়ে গেছে। যে দ্বন্দ্ব সে নিজে সৃষ্টি করেচে তার নিজেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সে দ্বন্দ্বের ফয়সালা করবার দায়িত্বও তার। যদি তাই করে সে যেতে পারে, তাহলে তার চলে যাওয়া তার গৌরব ঘোষণা করবে। আর কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গরজে রাজপাট গুটিয়ে সে যদি জাহাজ ভাসায়, তাহলে তা হবে তার অগৌরবের বিষয়।

কথা-বার্ত্তা শুনে এখনো মনে হচ্ছে আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে ইংরেজের নেই। তার স্বদেশের রাষ্ট্র-নায়করা যে-কোন কারণেই হোক্ আজ মনে করচেন স্বাধীন ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধ থাকে, তাহলে সাম্রাজ্য ত্যাগ করবার ক্ষতি তাদের পূর্ণ হবে। আমরা, ভারতবাসীরা, ইংরেজের দেওয়া অনেক আঘাত খেয়েও আজও সহজভাবেই ভাবতে পারছি স্বাধীন হবার পর ইংরেজের সংস্রব রাখা অথবা প্রীতির সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে না।

ইংরেজ যে নতুন দৃষ্টির অধিকারী হয়ে ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যজাল গুটিয়ে নিচ্ছে, সেই দৃষ্টি যতটা আন্-বৃটিশ, ততটাই ভারতীয়। বিজিত মানুষের জন্মগত অধিকার হরণ ব্রিটিশ কখনো নিন্দনীয় মনে করেনি। ভারতবর্ষ তা চিরদিনই নিন্দনীয় মনে করেচে। দিগ্বিজয় বলতে ভারতবর্ষ কোনদিনই কারো জন্মগত অধিকার হরণ বোঝেনি। ব্রিটিশ বিদেশে অভিযান চালিয়েচে শোষণ

করবার প্রবৃত্তি নিয়ে, কিন্তু ভারতবর্ষ অভিযান করেচে তার সম্পদ বিলিয়ে দেবার জন্যে। সে সম্পদ শুধু অধ্যাত্মবাদ নয়, তার জ্ঞান, তার বিজ্ঞান, তার শিল্প, তার অনুপম কালচার। এই সব নিয়েই ভারতবর্ষ বিদেশে গিয়েচে এবং সেই সব দেশের মানুষকে বন্ধুজ্ঞানে বুকে নিতে চেয়েচে। আজ যদি ইংরেজ সত্যি সত্যিই বুঝে থাকে শাসন ও শোষণের প্রবৃত্তিকে দমন করতে না পারলে তার কল্যাণ নেই, আর তাই বুঝে ভারতবর্ষকে পরবশতা থেকে মুক্তি দিয়ে সে যদি স্বাধীন ভারতের মৈত্রী কামনা করে, তাহলে স্বাধীন ভারত কেন তা প্রত্যাখ্যান করবে? মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনই ত ভারতের মিশন।

এই কথাটা প্রতি ভারতবাসীকেই সত্য বলে জানতে হবে এবং মানতেও হবে যে পৌনে দুইশত বছর ইংরেজের অধীনে থেকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভারতবর্ষ তার আত্মাকে হারায়নি। হারানো স্বাধীনতা সে আজ ফিরে পাচ্ছে বলে তাকে যে এখন হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে অথবা পদে পদে আছাড় খেতে হবে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। স্বাধীন ভারত সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারবে, এবং স্থির পদবিক্ষেপে চলতেও পারবে।

(২)

ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা একদম হতাশ নন, তাঁরাও কিন্তু বাংলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েচেন। তাঁরা বলেন যে বাংলা এতদিন ভারতের নেতৃত্ব করেচে, সেই বাংলার আজ তেমন কোন নেতা নেই। তাঁরা বলেন বাংলায় এত বেশী বাদবিতর্ক, এত অধিক দলাদলি যে, বাংলা ঠিক পথের সন্ধানও পাবে না, ঠিক পথ দেখিয়ে দিলেও একসাথে চলতে পারবে না। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁদের মাঝে অ-বাঙালীও আছেন বাঙালীও আছেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হয় বাংলাকে তাঁরা ভাদ্রের অনুঢ়া কন্যার মতোই গলগ্রহ মনে করেন। কিন্তু তাঁরা একটিবারও ভেবে দেখেন না, যে নেতৃত্ব বাংলা দিয়ে রেখেচে, তাকে অতিক্রম করে নেতৃত্ব দেবার মতো নেতা নিখিল ভারতে আজও দেখা দেননি। এমনকি মহাত্মাজীও বাংলার সেই নেতৃত্বকে অতিক্রম করতে পারেন নি। যে নেতৃত্ব পরমহংসদেব দিয়েচেন, যে নেতৃত্ব বিবেকানন্দ দিয়েচেন, রামমোহন দিয়েচেন, কেশবসেন দিয়েচেন, যে নেতৃত্ব শ্রীঅরবিন্দ দিয়েচেন, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু দিয়েচেন, রাসবিহারী সুভাষচন্দ্র দিয়েচেন, নিখিল ভারতকে স্বাধীন হবার পরও তাই নিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতকে বড় করবার অন্য পথ নেই। বাদ-বিতর্ক বাংলায় বেশী হবেই। কেননা বাংলাই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের দেশ। বিচার না করে কোন কিছুই সে গ্রহণ করে না। কিন্তু তাই বলে সে নিঃ জিন্নার মতো 'হিমরক্ত নৈয়ায়িক' নয়। বিচারের দ্বারা সে সত্যে উপনীত হতে চায় এবং সত্যের সন্ধান পেলে ন্যায়ের পুঁথি ফেলে দিয়ে সে সত্য-সিন্ধুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যদেব। বাঙালীর বিচার নেতি নেতি করে মায়াবাদে উপনীত হয় না, রক্তমাংসের মানুষে ভগবানের প্রকাশ দেখে। বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে সে অগ্রাহ্য করে না। সে একটা সিনথেসিস খোঁজে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মাঝে সে একই শক্তির বিকাশ দেখে। তাই সে কালীপুজোও করে, আবার শালগ্রামশিলাকেও গৃহ-বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। বাঙালী ঋষি মাতৃভূমিকে মা বলে বন্দনা করবার জন্য আনন্দমঠ রচনার উদ্দেশ্যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দেন, আবার সর্বত্যাগী শস্ত্রপাণি বাঙালী বিপ্লবী সেই মায়েরই বন্দনা করবার জন্য অহিংস সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়ায়। কোনটাই বাঙালী ভুল করে করে না। তার ভিতরে যে সিনথেসিস সন্ধানের প্রবৃত্তি রয়েচে, তারই প্রেরণায় করে। এই প্রবৃত্তির অধিকারী সে হয়েচে তার জল-মাটির, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং তার বিচিত্র ইতিহাসের নানা বিস্ময়কর বিবর্তনের, তার বিপুল অভিজ্ঞতার লব্ধ কালচারের প্রসাদে।

রাষ্ট্র মানুষের জীবনের বৃহত্তম বিষয় নয়। বাংলার সৌভাগ্য রাষ্ট্র কখনো বাঙালীকে পুতুল করে ফেলতে পারে নি। বাঙালী রাষ্ট্রের নানা রূপ দেখেচে, রাজ-চক্রবর্তীত্বও দেখেচে, গণতন্ত্রও দেখেচে, সমাজের নিম্নতম স্তরোদ্ভূত নৃপতির রাজগিও দেখেচে, স্বৈরাচারীর আস্ফালনও দেখেচে, আবার বণিকধর্ম্মী রাজশক্তির অনাচারও সে দেখেচে। কোনটাকেই সে স্বরাষ্ট্র বলে ভাবতে পারে নি। রাষ্ট্রনিরপেক্ষ একটা সমাজ গড়ে তুলে সে মানুষকে স্বরাজের অধিকারী করতে চেয়েচে। রাষ্ট্র যতদিন এই মানুষকে খর্ব্ব করতে চায়নি, ততদিন সে রাষ্ট্রকে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে দেখেনি। কিন্তু মানুষকে যখনি রাষ্ট্র খর্ব্ব করতে চেয়েচে, তখনি সে বিদ্রোহ করেচে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে পরম ঔদাসীন্যের নানা পরিচয় আছে, আবার বহু বিদ্রোহেরও বিবরণ আছে। কিন্তু বাঙালীর সমাজ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বরাটের সন্ধান পেয়েছিল বলেই বাঙালী রাজপুতও হয়নি, মারাঠাও হয়নি। রাজপুত হতে চায়নি বলে তাকে মানসিংহের মতো মুঘলের জন্য দেশজয় করতে হয়নি, আর মারাঠা হতে চায়নি বলে বর্গীর মতো উপদ্রবেও প্রবৃত্ত হতে হয়নি। রাষ্ট্র সম্বন্ধে বাঙ্গালী নিরপেক্ষ ছিল বলে মানুষ সম্বন্ধে উদাস ছিল না। রাষ্ট্র যতক্ষণ রাজস্ব নিয়ে তুষ্ট রয়েচে, মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেনি, ততক্ষণ সে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু রাষ্ট্র যখন বণিকের ভেতর দিয়ে তার সামাজিক ব্যবস্থাকে আঘাত হেনেচে, তখন সে প্রতিরোধ করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। বাংলার তাঁতীরা এক সময়ে নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে এবং অপর সময়ে নীলচাষীরা নীল বুনতে অস্বীকার করে যে দৃঢ়তার এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়ে শস্ত্রপাণি শাসকদের বণিকবৃত্তিকে সাফল্যের সঙ্গে আঘাত করেছিল, তা ভারতের কাছে ছিল একান্তই অভিনব। ইংরেজের ফাঁসিকাঠে সবার আগে বাঙালীই ঝুলেছিল এবং সাম্রাজ্য যে ফাঁস হয়ে ইংরেজের গলায় বসেচে, তাও বাঙালী-গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের মণিপুর অভিযান, ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে, ইংরেজকে না ভোলবার মতো করে বুঝিয়ে দিয়েচে। সুরাট কংগ্রেস থেকে বাঙালী বামপন্থী যে যাত্রা শুরু করেছিল, তার শেষ প্রকাশ দেখা দিয়েছিল মণিপুরে। কিন্তু সেখানেই যে তার শেষ হয়েচে, আজকের দিনে তা জোর করে কে বলতে পারে?

(৩)

বাংলার ইতিহাস বড় বিচিত্র ইতিহাস। ভারতের এবং ভারতের বাহিরের নানা জাতির রক্ত এবং কৃষ্টির মিশ্রণের ফলে বাঙালী জাতি গড়ে উঠে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেচে। তার ফলে বাঙালী ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে না পড়লেও একটা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েচে। সেই কারণে মাদ্রাজ বা মারাঠা, যুক্তপ্রদেশ বা বিহার যত তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রিক ব্যাপারে বা ধর্ম্মবিষয়ে একমত হতে পারে, বাংলা তত তাড়াতাড়ি তা পারে না। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা গোঁড়ামীতে যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের চেয়ে ন্যূন হয়না, কিন্তু বাংলার ব্রাহ্মণরা হয়। পেশোয়া—প্রাধান্য মারাঠায় যে অচ্ছুত সৃষ্টি করে, মাদ্রাজে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণরাও তাকে পরিহার করে চলে না। মহারাষ্ট্র গঠনে মাওলার ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে থাকলেও রাষ্ট্রের পুরোভাগে তারা স্থান পায়নি, বাংলায় কৈবর্ত্তও রাজ্য পরিচালনার সুযোগ করে নিয়েচে। বাংলা কাউকে অচ্ছুত করে রাখেনি। শ্রীরাজাগোপালাচারী যত তাড়াতাড়ি হিন্দি ভাষাকে (হিন্দুস্থানী ভাষাকে) রাষ্ট্রীয় ভাষা করবার জন্যে জবরদস্তি করতে পারেন, বাঙালী কোন রাষ্ট্রপতি তা পারেন না। আবার ওই শ্রীরাজাগোপালাচারী বাঙালীর জীবন-দানে সার্থক-প্রায় স্বাধীনতার ফল ভোগ করবার অধীরতায় বাংলাকে বাদ দেবার কল্পনাও করতে পারেন, কিন্তু বাংলা মাদ্রাজকে অথবা বর্গী-মারাঠাকে বাদ দিয়ে সে ফল হাতে পেতে চায় না, চাইতে পারে না। কারণ বাঙালীর জীবনের সঙ্গে বর্গী আর দ্রাবিড়ী রক্ত আর

কালচার মিশে রয়েচে, যেমন রয়েচে কনোজী আর মাগধীরক্ত আর কালচার। বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের শ্রদ্ধা পেয়েও ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু বাঙালী দীপঙ্কর তাকে রাজ-সাহায্য না নিয়ে সমগ্র পূর্ব্ব প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েচেন, নালন্দায় বাঙালী শীলভদ্র সমগ্র প্রাচ্যের জ্ঞান-কেন্দ্র গড়ে তুলেচেন। সপ্তদশ পাঠান বাংলা জয় করেছেন বলে ঐতিহাসিক যে কলঙ্কের কালো দাগ বাংলার ভালে এঁকে দিয়েচেন, তা সত্য বলে মেনে নিলেও এ-কথা ভুললে চলবে না যে, সেই পাঠানই মুঘলের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় তুলে দেবার সময় ধনরত্ন তুলে দিয়েছিল বাঙালীরই হাতে, আর মুঘলের ফকির-বাদশাহ জীবনের শেষ বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে যে সাম্রাজ্যবিধ্বংসী সমরানল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, তারও ব্যয় প্রধানত বহন করেছিল রাষ্ট্রের উত্থান পতনে নির্ব্বিকার বাঙালী। পাঠান, মুঘল, পর্ত্তুগীজ, মগ বাংলাকে আঘাত করেচে, বাংলা প্রতিরোধও করেচে। তাদের সংস্পর্শে যে-যে বাঙালী গিয়েছিল তাদের তারা বর্জ্জনও করেচে, আবার সমাজ জীবনে তাদের স্থান দিতেও বাধ্য হয়েচে। এ-সব কিছু সে একদিনে করেনি এবং একটি পরিকল্পনা নিয়েও করেনি। তাকে করতে হয়েচে। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাকে যা করতে হয়েচে, তার জন্যে আফ্‌শোষে সে ফোঁস ফোঁস করেনি—সহজভাবে গ্রহণ করেচে। তারই ফলে দেখা গিয়েচে একটা বিস্ময়কর একাকার—যার জন্যে বাংলার বাইরের হিন্দুরা বাঙালী হিন্দুদের হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। এবং সেই সন্দেহের সকল কারণ ব্যক্ত না করে শুধু 'মছলীখোর' বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু বাঙালী হিন্দু তাতে চটে না। বাঙালী হিন্দু জানে ধর্ম্মে ও কালচারে সে আর্যই রয়ে গেছে, অধঃপতিত হয়নি। অবশ্য বড়াই আর্য্যামির করে না।

(৪)

ইতিহাসের নানা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানুষের জীবনকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ করে পরিণতির পথে এগিয়ে নেবার যে ব্যবস্থা বাঙালী করেচে, তাই হচ্ছে বাংলার বিশিষ্ট কালচার। বাংলার কালচার ভারতীয় কালচার থেকে পৃথক নয়, বাঙালী শুধু তার রসের ভিয়েনে তাকে পাক দিয়ে মধুরতর এবং সহজপাচ্য করে তুলেছে। জীবনের সকল জটিলতার সহজ নিষ্পত্তিই হোচ্ছে বাংলার কালচারের বৈশিষ্ট্য। আর সবাই জীবনের সুতোয় শিক্ষার সভ্যতার কৃষ্টির পাক দিতে দিতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি সৃষ্টি করে মানুষকে এমন করে বেঁধে ফেলেচে যে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারচে না। কেবল বাঙালীই স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে মানুষের মাঝে দেখতে পেয়ে সবাইকে ডেকে বলেচে—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

মাটির ঘর, তাঁতের কাপড়, ক্ষেতের ফসল, খাল-বিল পুকুর-পাতকোর জল, খাবার থাকবার পরবার সহজ সরল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে বাঙালী মানুষে-মানুষে প্রতিযোগিতার দ্বন্দের, হিংসাত্মক সংঘর্ষের অবসর রাখেনি। বাঙালী তার বাড়ী ঘেরে রাঙা চিতার বেড়া দিয়ে, কাঁটা গাছ দিয়ে নয়। তার সহজলভ্য বাঁশ আর বেত দিয়ে সে আসবাব এবং মাটি আর কলাপাতা দিয়ে তৈজসের কাজ চালায়। তার জন্যে বন উজাড় করে অনাবৃষ্টির কারণ ঘটায় না, ভূগর্ভে শিরা কেটে ধরিত্রীর সম্পদ চুরি করে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং উন্নত করবার ছল করে সে ব্যবসায়ীদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাঙবার অবসর করে দেয় নি। লাখ কয়েক লোকের ভালো খাবার পরবার থাকবার ব্যবস্থা একটু উঁচু ধরণের করতে পারলেও কোটি কোটি বাঙালীর জন্যে সে ব্যবস্থা সে করতে পারবে না জেনে কোটি কোটি লোকের জন্যে যা করতে পারবে, তাকেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড করে নিয়েছে। আজ এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করবার জন্যে যে শিল্প-প্রসারের কথা শোনা যাচ্ছে, তাই করতে হলে ইউরোপের এতদিনকার চলার পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুতে হবে। ইউরোপের মানুষ যা করে যন্ত্র হয়েছে, দানব হয়েচে শোষক হয়েচে, কখনো কখনো পশুও হয়েচে, বাঙালী তা করবার জন্যে ছোটেনি বলে আফ্‌শোষ করবার কারণ নেই। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াবার উঁচু করবার জন্যে স্বাধীন ভারত যদি ইউরোপের চলার পথ ধরে অগ্রসর হয়, তাহলে

অতি নিকট ভবিষ্যতে তাকে অতি অসহায়ের মতো পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর না হয় কয়লা, তেল সংগ্রহের জন্য নখরকে তীক্ষ্ণ করে তাকে দিকে দিকে থাবা বাড়াতে হবে। চল্লিশ কোটি লোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং ইউরোপীয় মানদণ্ডে বাড়াতে হলে যে বিপুল অর্থের আবশ্যক তার যোগান দিতে হলে জাতীয় আয় আমেরিকার চারগুণ হওয়া দরকার। সে আয় করতে হলে সারা পৃথিবী শোষণ করবার মত শক্তির অধিকারী হতে হয়। কিন্তু বাঙালী জানে খড়ো ঘরে তার স্বাস্থ্য রক্ষা হবে, তাঁতের কাপড়ে তার লজ্জা নিবারণ হবে, সহজ লভ্য আসবাবে তৈজসে তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে। কি হবে তার প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরি করে, যে বাড়ীর মতো বাড়ী সকলে তৈরী করতে পারবে না? কি হবে তার সেই সুখাদ্যের দিকে লোভ প্রকাশ করে যা সকলের পাতে পরিবেশন করা যাবে না? বহুকে গৃহহীন করে একটি প্রাসাদ রচনা করা যায় না, বহুকে নগ্ন রেখে লাখ কয়েক লোকের বসন-বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করা যায় না। বাঙালী এই বহুর কথাই বড় করে দেখেছে।

(৫)

শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেও বাঙালী সার্ব্বজনীন করবার চেষ্টা করেছে গানের ভিতর দিয়ে, যাত্রার ভিতর দিয়ে, কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে, কথকতার ভিতর দিয়ে এবং আরো নানা রকম বাহন তৈরি করে তারই ভিতর দিয়ে। আজ দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্ম্মঘট করেছেন। গবর্ণমেণ্ট বলচেন, তাঁদের অভাব দূর করবার মতো অর্থব্যয় করবার সঙ্গতি গবর্ণমেণ্টের নেই। মনে রাখা দরকার যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় শতকরা দশটি লোকও বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন হয়নি। দেশের সকল লোককে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো দশ বারো গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকের সংখ্যাও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। গবর্ণমেণ্ট এখনকার শিক্ষকদের অভাব পূর্ণ করতে পারচেন না। সমস্ত লোককে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন করতে হলে যত শিক্ষকের যত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরকার হবে, তার ব্যয়ভার বহন করবেন কেমন করে? বলা হবে, দেশ স্বাধীন হলে দেশের লোকের আয় বাড়বে এবং দেশের লোকের আয় বাড়লে রাষ্ট্রেরও আয় বাড়বে। দেশের লোকের আয় বাড়াতে হলে ইউরোপ যে-পথে চলে দেউলে হয়েচে, সেই পথেই এগুতে হবে। তার পরিণতি ত দেখাই যাচ্ছে কাজেই শিক্ষার যে ব্যবস্থা বাঙালী করেছিল, ভারতবর্ষ যদি তাই না করতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজের ওপর তার ভার অর্পণ করতে না পারে, তাহলে দেশের সকল লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা সে কিছুতেই করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে চল্লিশ কোটি লোকের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব এক চীন ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশকেই করতে হয় না। তাই চীনে আর ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতেই হবে। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করা যায় ভালো কথা। কিন্তু অক্ষরজ্ঞানকেই শিক্ষার মাপকাঠি বলে মনে করে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। জ্ঞানকে যখন পুঁথির পাতায় ফলিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয় তখনই অক্ষর-জ্ঞান অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু আসলে জ্ঞান তো চোখে দেখবার জিনিষ নয়। তা হচ্ছে মনের বুদ্ধির, অনুভূতির, অভিজ্ঞতার জিনিষ। অক্ষরের সাহায্যে না নিয়েও তা মন থেকে মনান্তরে সঞ্চারিত করা যায়। পুঁথির পাতায়, লাইব্রেরীর শেলফে, স্কুল-কলেজের ক্লাশে, লেকচার থিয়েটারে যখনি জ্ঞানকেন্দ্র স্থির করে দেওয়া হয়, তখুনি তাকে সকলের অনধিগম্য করে তোলা হয়, তখুনি তাকে শ্রেণী-বিশেষের অধিগম্য করে রাখা হয়। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের কথা ভুলে বিশেষ একটি শ্রেণীর শিক্ষার এবং বিশিষ্ট শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যদি অর্থব্যয় করে, তাহলে রাষ্ট্র যে শুধু অন্যায় করে তাই নয়, রাষ্ট্র নিজেরও ক্ষতি করে। লোকশিক্ষার যে ব্যবস্থা বাংলা করেছিল, বিশিষ্ট শিক্ষার সে ব্যবস্থা করেনি। শিক্ষার্থী অর্থ ঢেলে দেবে, আর শিক্ষার পুঁটুলি বেঁধে ঘরে ফিরবে, এমন ব্যবস্থা বাঙালী

করেনি। বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য সে সাধনার পীঠ তৈরী করেছিল পল্লীর চতুষ্পাঠীতে। সেখানে কাঞ্চনমূল্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হোত না, মূল্যস্বরূপ দিতে হোত নিষ্ঠা, নিবেদন করতে হোতো জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রস্তুত হতে হোতো জীবন-ব্যাপী জ্ঞান অনুশীলনের জন্য। বিরাট জনগণ এ শিক্ষার জন্য আসত না। কিন্তু অতি স্বল্প যারা আসত তারা জনসমুদ্রে হারিয়ে যেত না, ধ্রুবতারার মতো জ্ঞানাকাশে উদিত থেকে জাতির কল্যাণের পথ নির্দেশ করত।

ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করল, তাতে কত অপচয়, কত অপব্যয়! বিশিষ্ট শিক্ষাদানের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ ফেলে দিলেই ডিগ্রীর দাবীদার হওয়া যায় বলে কী ভীড় সেখানে। এই ভীড় বলেই বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারী মানুষ তৈরীর ফ্যাক্টরি। লেকচার কটিন, সিলেবাস সবই কাটা ছাঁটা বাঁধা-ধরা, বিশিষ্ট শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হীন। তবুও যে প্রতি বছরই কিছু কিছু সত্যিকারের সাফল্যমণ্ডিত ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তার গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা দাবী করতে পারে না— পারে সেই অল্পসংখ্যক কৃতী ছাত্রদের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা। বিশ্ববিদ্যালয় যদি অনুকূল ব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে এই অল্প কৃতী ছাত্ররাই ভাস্বর হয়ে সূচীভেদ্য অজ্ঞানান্ধকার থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারত। ভীড় জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপব্যয় করতে হয়, তার ক্ষতি রাষ্ট্রকে বহন করতে হোত না।

বাঙালী শীলভদ্র বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলেন যেখানে সমগ্র এসিয়ার বিদ্যার্থীরা সমবেত হোতো। বৌদ্ধধর্ম্ম কেন্দ্রচ্যুত হোলো বলেই সে বিশ্ববিদ্যালয় লোপ পেল, একথা হয়ত সত্যি। কিন্তু শীলভদ্রের অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাঙালী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ফিরে পাবার পর অনুরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন গড়ে তুললোনা? বাঙালী তা গড়ে তুলতে ত চায়নিই, পরন্তু বিশিষ্ট শিক্ষাকে বিযুক্ত-কেন্দ্র করেচে শত সহস্র চতুষ্পাঠীকে বাহন করে। সমাজের বাইরে, সমাজ থেকে পৃথক রেখে বিদ্যার্থীদের বাঙালী বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী করতে চায়নি। বিদ্যার্থী চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করত হয়ত বেদান্ত, কিন্তু পাড়ায় গৃহস্থদের তিথি নক্ষত্রের, বারবেলার ফল, শুভাশুভ তাকে বলে দিতে হোতো, তাদের ব্রত-পূজায় অংশ গ্রহণ করতে হোত; দান প্রতিগ্রহ, ফলাহার কিছুই এড়াতে পারত না। এক কথায় বিদ্যার্থী তার নিজের গৃহ ছেড়ে আসত বলেই সমাজ ছাড়া হোত না। সমাজের সঙ্গেই তার যোগ থাকত, পরগাছা হোত না। চতুষ্পাঠী বিদ্যার্থীর ভিড় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝে গ্রাজুয়েট ম্যানুফ্যাকচার করবার তাগিদে ফ্যাক্টরী হোতো না বলে অধ্যাপক জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারতেন, বিদ্যার্থীও মন ভরে তা নিতে পারতেন। সময় হয়ত বেশী লাগত। কিন্তু তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হোত না। কেননা শিক্ষা নিতে তারাই আসত যাদের ডিগ্রী পাবার প্রতীক্ষায় তাদের বাড়ীর লোক হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকতনা। অভিভাবকরা জানত বিশিষ্ট বিদ্যার জন্যে যাদের তারা গুরুগৃহে পাঠিয়েচে, তারা যখন সমাবর্ত্তিত হবে, তখন পণ্ডিত হয়ে আসবে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের কায়দা-কসরৎ শিখে আসবে না। তার জন্যে তাদের আফ্‌শোষ হত না এই কারণেই যে, জেনে শুনে পণ্ডিত করবার জন্যেই তারা ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠাতো। আর ধার করে, অথবা আবশ্যকীয় ব্যয়-সঙ্কোচ করে, অথবা ঘুষ খেয়ে আয় বাড়িয়ে আখেরে সুরাহা হবে আশা করে তারা ছেলেদের পড়াতে পাঠাতো না।

ইংরেজ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্যে তার দেশে শিক্ষার একরকম ব্যবস্থা করলে আর আমাদের দেশে আর একরকম ব্যবস্থা করলে। কেরাণীর আর উকিলের দরকার হলো তার সব চেয়ে বেশী। কিন্তু তাদের শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করল যা সব কেরাণীর বা সব উকিলের না শিখলেও চলে। ওকালতীর তবুও সব বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানের দরকার, কিন্তু ক'জনা কেরাণীর সাহিত্য কাব্য দর্শন বিজ্ঞানের প্রয়োজন থাকে? ও-সব জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে? ওসব জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু ডিগ্রী

প্রয়োজন থাকে। অতএব চার বছর কোলকাতায় হোষ্টেলে থেকে অভিভাবকের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হোবু-কেরাণীকেও ডিগ্রী নিতে হবে। কিন্তু তার নিজের দেশে ম্যাট্রিকুলেট মাত্রেই সকল সিভিল সার্ব্বিসের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি-শিক্ষা পাবার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। আমাদের দেশের শতকরা অন্তত বিরনব্বই জন ডিগ্রি-প্রার্থীর শক্তির এবং অর্থের অপচয়ের জন্য দায়ী ইংরেজের ব্যবস্থা। বিড়ম্বনা যেমন ডিগ্রী-প্রার্থীদের, বিড়ম্বনা তেমন জাতির। এই ফালতু ভীড় যারা করে, তারা যদি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চাকুরিতে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে তাদেরও শক্তির এবং অভিভাবকদের আর রাষ্ট্রের অর্থেরও অপচয় হয় না। অল্প ডিগ্রী-প্রার্থীদের প্রকৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাতেও ত্রুটি থাকে যদি সমাজের সঙ্গে তাতেও ছেলেদের যোগ রাখার ব্যবস্থা করা না যায়। য়ুনিভার্সিটি শব্দটির আগে হিন্দু শব্দ জুড়ে দিলেই যে হিন্দু য়ুনিভার্সিটি হয় না ইংরেজের মোহে মজে থেকে আমাদের সেরা হিন্দুরাও তা বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানতেন বিশ্বের সারস্বতদের অধ্যাপক করে আনলেই তাঁর বিশ্বভারতী সার্থক হবে না, যদি না বাংলার সমাজের সঙ্গে সেই বিশ্বভারতীর যোগ থাকে। শ্রীনিকেতন যেমন বিশ্বভারতীর সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমন শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিফলিত নিছক বাঙালী জীবনের ধ্যান-ধারণা আচার-উৎসবও অপরিহার্য্য। কোনটাকেই বাহুল্য বলে বর্জ্জন করা যায় না। করলে বিশ্বভারতীও হিন্দু য়ুনিভার্সিটির মতোই ইংরেজী প্যাটার্ণে গঠিত একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন এবং সারাজীবন ধরেই বোঝাতে চেয়েচেন শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার রূপ না দেবার দরুণ কী অপচয়ই না হচ্ছে আর কতই না অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে!

বিশিষ্ট শিক্ষাকেও সমাজ-অঙ্গনে স্থান দিয়ে এবং লোকশিক্ষার বাহনরূপে গান, নৃত্য, নাটকে নিয়োগ করে (অর্থাৎ পুঁথিনিরপেক্ষ করে) শিক্ষার প্রভাবকে সার্ব্বজনীন করে তুলেচে। সেই কারণে বাংলার নিরক্ষর লোকেরাও মূর্খ নয়। বাংলার কালচার তাদেরও একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েচে। আর সে রূপ শিক্ষিতদের রূপ থেকে খুব বেশী স্বতন্ত্র ছিল না। ইংরেজের আমলে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা দেখে এক জাতির লোক বলে মনে করা কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু ইংরেজের আবির্ভাবের আগে পার্থক্য এত বেশী ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা এই যে ক্ষতি করেচে স্বাধীন-ভারতকে এর জন্যে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

লোকশিক্ষা প্রসারের জন্য গান, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি নিয়োগ করে বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কাজকে সার্থক করে তুলেছিল একথা যদি বলি তাহলে অনেকেই অত্যুক্তির অপরাধে আমাকে অপরাধী করবেন। কিন্তু সত্যিই তা অত্যুক্তি নয়। ও-গুলিকে শিক্ষার বাহন করা হয়েছিল বলেই সমগ্র জাতি ছন্দোবদ্ধ হতে পেরেছিল, জীবনের সংঘাতে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিল, সৌন্দর্য্যের সাধক হতে পেরেছিল, রসপিপাসু হতে পেরেছিল, মনকে ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত করতে পেরেছিল। গান, নৃত্য, নাট্য কেবলই অভিনয় নয়। ও-গুলো যেমন রস-সৃষ্টি, তেমন রস সৃষ্টির প্রেরণাও যোগায়; যেমন জীবনকে প্রতিফলিত করে, তেমন দর্শকজীবনে রস-সঞ্চারও করে; যেমন দর্শকদের রসাপ্লুত করে, তেমন দর্শকদের চিত্ত থেকে রস সংগ্রহ করে নিজেকেও সার্থক করে; যেমন সাধারণ মানব-জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে মানুষের বাসনা-কামনা আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয়, তেমন সাধারণ মানুষকেও বাসনা-কামনা আবেগ-অনুভূতির ঊর্দ্ধতর স্তরে টেনে তোলে। বাঙালী ওই গুলিকে লোকশিক্ষার বাহন করেছিল বলেই ত নিরক্ষর বাঙালীর রচিত কত গান, কত কাব্য সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে; গানে কাব্যে কত দার্শনিক দুরূহ তত্ত্ব সরস হয়েছে; চিত্তগ্রাহী হয়েচে; নিরক্ষর লোককে সৌন্দর্য্যের সাধক করেচে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষার শিক্ষা দিয়েচে, রস-সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েচে।

বাঙালী বাড়ী করবার জন্যে পাথর সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করেনি, কিন্তু কারু-শিল্পকে অক্ষয় রাখবার জন্যে বাংলায় দুর্লভ কষ্টি পাথর সংগ্রহ করে যুগে যুগে যে মূর্ত্তি খোদাই করেচে তার বিস্ময়কর বিচিত্র কত নিদর্শন বাংলার নানা মিউজিয়মেই সংগৃহীত হয়েচে, কতই না এখনো জলগর্ভে বা ভূগর্ভে অদৃশ্য রয়েচে। পল্লীর এই শিল্পীরা অরূপকে রূপ দেবার এই প্রেরণা কোথায় পেয়েছিল? কোন আর্ট ইস্কুলে পড়ে বাংলার মেয়েরা অবাস্তব টেকনিকে আলপনা দেবার কৌশল আয়ত্ত করেছিল? দারুশিল্পে, বেতের কাজে যারা বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে গেছে, তারা কোন্ শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিল? ময়ূরপঙ্খী নৌকা তৈরী কোন্ কারখানায় শিখেছিল? প্রতিমা গড়বার, চাল-চিত্র, দেয়াল-চিত্র আঁকবার বিদ্যা তারা অর্জ্জন করেছিল কার কাছে? কোন বিদ্যালয় থেকেও নয়, কারু কাছ থেকেও নয়—'আপন মনের মাধুরীই' তারা বাইরে ছড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল। মনে এই মাধুরী তাদের এলো কি করে? বাঙালীর লোক-শিক্ষার বাহন ওই গান, নৃত্য, নাট্য থেকে। মনের মাধুরী ওই থেকেই পেয়েচে, সৃষ্টির প্রেরণাও ওই থেকেই পেয়েচে। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কাজই হচ্ছে বিদ্যার্থীদের মনে ওই মাধুরী ঢেলে দেওয়া। সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়ে তোলা, বাকী যা তা ত স্রষ্টা নিজে করে নেবে। টেকনিক? তাও প্রতি স্রষ্টা নিজের সৃষ্টিকে সুন্দরতম করবার জন্যে আবিষ্কার করবে। তাইত শিল্প-সৃষ্টিতে এত বৈচিত্র। শিক্ষাকে সর্ব্বজনীন করবার জন্যে বাঙালী যে বাহন ব্যবহার করেছিল, সেই বাহনই বাঙালীর জাতীয়-শিক্ষার বাহন। তার জন্যে শিক্ষার্থীর অক্ষর জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না। তার জন্যে নানা স্তরের বিদ্যালয়ের দরকার হয় না, খাপ-ছাড়া স্কুলবাড়ী বোর্ডিং-হাউস তৈরী করতে হয় না। শিক্ষার্থীরা তোতাপাখী হয় না, চিনির বলদও হয় না।

ধর্ম্মের আভিজাত্যকেও বাঙালী মানুষের ওপর দৌরাত্ম্য করতে দেয়নি। তাকেও নিজের সঙ্গেই মিশিয়ে রেখেচে। বাংলায় আকাশস্পর্শী মন্দির নেই, গাছতলা, মাটির বেদী, মুক্ত প্রাঙ্গণে, খড়োঘর বা ইটের একতলা অনাড়ম্বর বাড়ী তার ধর্মস্থান। গৃহ-বিগ্রহ বাড়ীর লোকের মতোই থাকেন। তাই বাংলায় মোহন্ত পাণ্ডার উপদ্রব নাই। পুরোহিত বাঙালী পরমাত্মীয়। যে মুসলিম নায়করা আজ স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার হোয়ে উঠে দেশময় অশান্তি সৃষ্টি করছেন, তাঁরা বাঙ্গালী মুসলমানের অতীত ইতিহাস অগ্রাহ্য করচেন। কিন্তু একথা সত্য যে বাঙালী মুসলমানের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু বা কোচ। আরব হতে, তুর্কি হতে, পারস্য হতে বা আফগানিস্থান হতে যারা রাজ্য জয় করতে ভারতে এসেছিল বা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদেরই বংশবৃদ্ধির ফলে যে বাংলায় শতকরা প্রায় চুয়ান্নজন মুসলমান হয়েছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। এই শতকরা চুয়ান্ন জন মুসলমানের সকলেই কনভার্ট না হলেও অধিকাংশই কনভার্ট এবং সেই কনভার্টদের সকলেই হিন্দু বাঙালীর বংশধর না হলেও বাংলারই সন্তান। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বাঙালীর সন্তানরা বাংলার কালচারকে বর্জ্জন করেন নি। বাংলার সাহিত্যে, বাংলার নানাবিধ শিল্পে, জীবনের দৃষ্টিতে বাংলার কালচারকে ধারণও করেছেন, বিশিষ্ট রূপও দিয়েছেন। বাঙালীর কালচার বাঙালী হিন্দুকে আর বাঙালী মুসলমানকে প্রায় একত্র করে বাংলার সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিল। আজ বাইরের একটা ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিলেও এমন দিন কল্পনা করা অসম্ভব নয়, যখন আজকের বিশেষ ধরণের রাজনীতিক দাবী-দাওয়ার ফয়সালা হয়ে গেলে বাংলার কালচারই রাজনীতিক স্বার্থ-বোধকে রূপান্তরিত করবে। ফয়সালার বর্ত্তমান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলবার কারণ থাকলেও ফয়সালার যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করবার কারণ নাই। ইতিহাসই দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েচে। বাঙালীকে ইতিহাসের এই দাবী পূর্ণ করতে হবে। বাংলার কালচারই বাঙালীকে দিয়ে সেই দাবী পূর্ণ করিয়ে নেবে। পূর্ব্বে

বলেচি সমাজের সর্ব্বস্তরে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের মানুষের সু-সমঞ্জস পরিণতির সরল ইঙ্গিতই প্রকাশ করে বাংলার কালচার। মহাত্মাজী এটা জানেন। তাই তিনি বাংলা সম্বন্ধে অপর নেতাদের মতো হতাশা পোষণ করেন না। তাঁর চরকার প্রতি বিশ্বাস সেই বাঙালীর কাছে নতুন নয়, যে একদিন বলত "চরকা আমার ভাত-কাপড়, চরকা আমার পুতী, চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী"; মহাত্মার চাম্পারণও সেই বাঙালীর কাছে নতুন নয় যারা নীলকরদের বিষদাঁত ভাঙবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল। মহাত্মার 'প্যাসিভ রেজিসটেন্স'ও সেই বাঙালীর কাছে নতুন নয়, যারা হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ইংরেজ-বণিকদের একপ্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়েছিল। মহাত্মার হিন্দু-মুসলমান মিলনের আবশ্যকতাবোধও সেই বাঙালীর কাছে নতুন নয় যে বাঙালী হিন্দু পীরের পূজো, দরগায় সিন্নী, আর যে বাঙালী মুসলমান রামায়ণ রচনা এবং দুর্গোৎসবে যোগদান অন্যায় মনে করত না। মহাত্মাজীর সংগঠন পরিকল্পনায় যে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসনের আভাস পাওয়া যায় বাংলার সমাজে দীর্ঘকাল তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আজ স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে উপনীত জাতি বাংলার আদর্শকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারেনি এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, কেশবসেন, দেশবন্ধু, রবীন্দ্র, অরবিন্দের আদর্শ ফলিয়ে না তুললে বিশ্বের নেতৃত্ব দাবী করতে পারবে না।

"আমি বাস করি দূরের মধ্যে। কাছাকাছি নিকটে আমি নেই। আমি যে সেই দূরের অন্তরে—সুদূরের অভ্যন্তরে আছি—তা ভালো ক'রে বলা হয়নি। ঐ কথাই বলতে গিয়েছিলুম তাদের—যারা বলে যে একটা ইতিহাসের ভিতর থেকে কবিতার উদ্ভব। এই যে নূতন কিছু সামাজিক পরিবর্তন হোলো, এই থেকেই—কিছুতেই মন তা মানে না। আমার কবিতা কী-থেকে হোলো। একটা উৎস থেকে হয়েছে—বহুদূরের স্রোত থেকে; ইতিহাস থেকে নয়। এই জন্য কথায় কথায় আমি সেই দূরের বাণীকে প্রকাশ করছি। এই কবির কবিত্ব—এইখানেই তার মূল কথা। কোনো ইতিহাস তাকে বানায়নি—সকল ইতিহাসের মূলে সেই সৃষ্টিকর্তা বসে আছেন। কবি একলা—তাই হওয়া উচিত। একেবারে অন্তরীক্ষে, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।—রবীন্দ্রনাথ।

সীমা

লিঅন ফএখট্‌ভান্‌গার   অনুবাদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়

[লিঅন ফএখট্‌ ভান্‌গার প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। ১৮৮৪-এর ৭ই জুলাই ম্যুনিকের ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম। বার্লিন ও ম্যুনিকে দর্শন অধ্যয়নান্তর নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গ্রন্থবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস "জু হুস্", "জোসেফস্"—আর "আগলী ডাচেস্" বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৩৩-৭ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে জার্মান অধিকারের পর অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায় আমেরিকায় পালিয়ে এসেছেন।

বর্তমান উপন্যাস "সীমঁ" ১৯৪৪-এ যুদ্ধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় রচিত—বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য "সীমঁ"কে "সীমা"য় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

—অনুবাদক]

প্রথম ভাগ

—: প্রস্তুতি :—

শরণাগতের দল

আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সংকীর্ণ গলিপথ সহসা বাঁক নিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। এইটুকু পথ শেষ করার জন্য সীমার প্রত্যাশাভরা মন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। বড় রাস্তার চৌমাথায় গতকাল সর্বপ্রথম ও শরণাগতদের মিছিল লক্ষ্য করেছিল, আজ এতক্ষণে তারা হয়ত ছোটো খাটো গলি ঘুঁজির ভিতর ঢুকে পড়েছে।

তিন সপ্তাহ ধরে এই শরণাগতদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে আসছিল শুধু ডাচ্‌ আর বেলজিয়ানরা, এখন উত্তর ফ্রান্সের লোকেরাও অগ্রগামী শত্রুসৈন্যের হাত থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চলে আস্‌ছে—আস্‌ছে ত' আস্‌ছেই। সারা বার্গেণ্ডী শহরটাই ত' এখন এই দুর্গত শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। প্রতিদিনকার মতো গতকাল সাইকেলে বাজার যাবার সময় সীমাকে অতি-কষ্টে ভিড়ের ভিতর পথ করে নিতে হয়েছে—আর আজ ত' সে সাইকেল্‌ বাড়ীতেই রেখে এসেছে।

সীমা প্লানকার্ড্‌ যখন প্রথম এই শরণাগতদের কথা শুনেছিল তখন ওর কল্পনাপ্রবণ মনে একদল ভীত সন্ত্রস্ত পলায়মান লোকের ছবি জেগে উঠেছিল, সব বিষয়েই তাদের ব্যস্ততা আর ভয়। গত কয়েকদিনে যা দেখেছে তার ভিতর অবশ্য কিছু পরিমাণে স্বাভাবিকত্ব থাকলেও ভয়ংকরত্ব আছে। এই কথাই বারবার ওর মনে উদয় হয়েছে, ওকে উৎপীড়িত করে তুলেছে, রাতে ওর চোখে এতটুকু ঘুম নেই। যতবার শহরে যেতে হয়েছে ততবারই এই করুণ দৃশ্য সম্পর্কে মনে একটা আতঙ্কের ভাব জেগেছে,

কিন্তু প্রতিদিনই করুণা ও কোমলতায় বিগলিত হয়ে উৎকণ্ঠ আগ্রহে সীমা ওদের দেখেছে।

এতক্ষণে ও বাঁকের মুখে এসে পৌঁছেচে রাস্তার কিছু অংশ এইখান থেকে দেখা যায়—অবহেলিত সরু পথ, চিরদিনই জনহীন ও পরিস্কার, ও পথে মাত্র দুটি-বাড়ীওলা পার্বত্যগ্রাম নাইরেট ভিন্ন আর কোথাও যাওয়া যায় না, আজ কিন্তু যা ভয় করা গিছল তাই হয়েছে—এ পথেও মানুষের ভীড়। বিশাল জনাবণ্য এই পথেও এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

সীমা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল—পনের বছরের মেয়ে, সুন্দর দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, পরণে ফিকে সবুজ রঙের ডোরা কাটা ছিটের পোষাক বাজার করবার সময় এই পোষাকটাই ও পরে থাকে, মুখঢাকা একটি বড় বেতের ঝুড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটানো হাত ও পায়ের সুঠাম অনাবৃত অংশ পোষাকের বাইরে বেরিয়ে আছে—ছাইরঙের চুলে ঘেরা সীমার চওড়া তামাটে মুখখানি। গভীর নীচু অথচ প্রশস্ত কপালের নীচে একজোড়া কালো চোখে ধূলিধূসর পথে যা কিছু বিচরণশীল সীমা পরম আগ্রহভরে তাই দেখে। সেই পরিচিত দৃশ্য, মানুষ ও যানবাহনের হতাশাভরা মিছিল—গৃহস্থালীর টুকীটাকী জিনিষপত্র বোঝাই করে গাড়ীর পর গাড়ি চলেছে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল বিমানের মেশিনগানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে মোটর গাড়ীর ছাদে বিছানার গদি বিছানো হয়েছে, পরিশ্রান্ত মানুষ আর পশু একই ভাবে, একই সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে চলেছে।

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে সুগঠিত ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে সীমা দেখছে এই দৃশ্য। মেয়েটিকে সুন্দরী বলা অবশ্য ঠিক হবেনা, তবে ওর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকুল সুদৃঢ় মুখভঙ্গী আর কঠিন চোয়াল আর সুস্পষ্ট বার্গেণ্ডীয় নাক চেয়ে দেখার মতো। পুরো একমিনিট—তারও বেশীকাল ধরে, অপরাহ্ন বেলার উত্তাপ ও ধূলার ভিতর দাঁড়িয়ে সীমা এই পলাতকদের দেখতে লাগল।

অবশেষে ওকে পাশ কাটিয়ে সরে আসতে হ'ল। অনেক কাজ ওর—মাদাম অনেকগুলি কাজের ভার ওর ওপর দিয়েছেন। প্লানকার্ড পরিবারের আবাসগৃহ "ভিলা মন রেপোয়" সব রকম জিনিষ মজুত রাখতে হবে, তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আর দু তিন দিনের ভিতর বাজার হাট করা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই কারণেই মাদাম সীমাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে তালিকা করে দিয়েছেন তা আকারে দীর্ঘ। এই উত্তেজনা ও হট্টগোলের ভিতর সব কাজগুলি সারা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না। এই দৃশ্যের ভিতর আর আটক না থেকে সীমা দ্রুত পদক্ষেপে সোজা শহরের দিকে চলল।

সরু গলিটা যেখানে শেষ হয়ে ৬নং রুটে এসে পড়েছে, সীমা সেইখানে এসে পৌঁছল সেণ্ট মার্টিনের পার্বত্য কেন্দ্রের পাশে অর্ধবৃত্তাকারে এই পথটি ঘুরে গেছে এইখানটিতে যে দৃশ্য সীমার চোখে পড়ল, গত কয়েক দিনের ভিতর এতখানি করুণ দৃশ্য আর ও দেখেনি। পথের মোড়ে ঘুরতে গিয়ে একদল মোটর দাঁড়িয়ে গেছে, অন্যদিক থেকে আর এক সার মোটর এসে পথ জুড়ে আছে, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকার, বাইসিকল, গাধা, পথচারী সবাই মিলে একটা অদ্ভুত খিচুড়ি পাকিয়েছে—অসহায় জনগণের গন্তব্যহীন মিছিল। কেউ কিন্তু একটিও কটু কথা বলছেনা, এই জটিল গিঁট খোলার চেষ্টা করছে না, অস্বস্তিকর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সবাই সেই উত্তপ্ত ধূলিমলিন পথের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে,—ছেলেবুড়ো, নর ও নারী সৈনিক ও বে-সামরিক, আহত ও অক্ষত—সবাই স্বেদাক্ত কলেবরে হতাশাভরে বসে আছে

গভীর করুণাভরা চোখ মেলে সীমা সেই ধূলিমলিন সেই নিশ্চল ও বিস্ময়কর নীরব মিছিলের দিকে চেয়ে র'ল, এই প্রাণহীন জনমণ্ডলী যেন একটি বিশাল ছবির অংশ বিশেষ, সীমার করুণার্দ্র মুখখানিতে যেন বয়সের ছাপ পড়েছে। পনের বছরের ভিতরেই সে অনেক খানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, ভাবাবেগ সংবরণ করে নিজের

কাজ সেরে নেবার কথা স্মরণ করে এই জনতা ভেদ করে রাস্তা পার হবার জন্য সীমা সচেষ্ট হ'ল। ঝুড়িটি হাতে করে তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গাড়ির শেষ প্রান্তের ভিতর দিয়ে আরোহীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সীমা অতি কষ্টে পথটি অতিক্রম করল—ওকে তারা লক্ষ্য না করে স্থাণুর মতো নীরবে বসে গরমে ধুঁকতে লাগল।

অবশেষে রাস্তা পার হয়ে ও প্রাচীন পাথরের পথ ধর্‌লো, নবাগতের পক্ষে এ পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এই পথ এঁকে বেঁকে সর্পিল ভঙ্গীতে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে —এইখান থেকে এই প্রাচীন শহর বেষ্টনকারী দুর্গ-প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ও নিয়ত পরিবর্তনশীল তরুবীথিকা দেখা যায়। প্রতি বাঁকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সেরীণ নদীর তটভূমি দেখা যায়। উজ্জ্বল ও মনোহর দৃশ্যপট; বিস্তীর্ণ তটভূমি জুড়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাই ও বাদামগাছের ঝোপ—প্রতি শৈলশিখরে কিছু না কিছু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান, আর পূর্ব দিকে গর্বোন্নত ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়। সুসময়ে অসংখ্য যাত্রী এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে আসত। সীমার কাছে যতই পরিচিত ও পুরাতন হোক্ না কেন, চিরদিনই সে গভীর মনোযোগ সহকারে রসবোদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে এই দৃশ্যাবলী দেখেছে। কিন্তু আজ আর এ সবের জন্য ওর মনে এতটুকু অনুভূতি নেই। আজ সে বড় রাস্তার উপর সদ্য-দেখা দৃশ্য ভুলে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, পাহাড়ের কঙ্করকঠিন পথের বিশৃঙ্খলার ভিতরে অখণ্ড মনঃসংযোগ করতে হ'ল, এই কারণে সীমা মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলো। এক এক জায়গায় ওকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছে, অত বড় ঝুড়ি নিয়ে সে কার্য করা বড় সহজ নয়। এর পরে শহরে এলে সীমা পা-জামা পরে আসবে। অনেকে আবার এই যুদ্ধকালে মেয়েদের পক্ষে পা-জামা পরাটা অন্যায় মনে করেন, মাদাম নিজেই পাজামা পরা অপছন্দ করেন।

এইবার সীমা ওপরে পৌঁছে পোর্ট সেন্ট-লাজার দিয়ে শহরের ভিতর ঢুকে পড়ল। গির্জার সাম্‌নেকার সরকারী পার্ক ওকে পার হতে হল। অন্য সময় এই ছোট্ট জায়গাটুকু জনশূন্য ও শান্তিপূর্ণ থাকে। মাঝে মাঝে ভ্রমণকারী যাত্রীদল এইখানে দাঁড়িয়েই গির্জাঘরের বিখ্যাত পাথরের মূর্তিগুলি দেখতেন।

আজ পার্কটি ভিড়ে পরিপূর্ণ। অনেক শরণাগত ওপরে উঠে এসেছে, তবে মূর্তির দিকে তাদের লক্ষ্য নেই; ওরা পেট্রোল, খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খুঁজছে। এইখানে ও অন্যত্র সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরস্পরের ভিতর বিনিময় করা হচ্ছে। তীব্র ও তিক্ত ওদের অভিজ্ঞতা। প্রায় সকলেরই সব কিছু নেই, আর সেন্ট-মার্তিনেও কিছু পাওয়া যায় না, প্রায় সকলেরই মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে অল্পের জন্য অব্যাহতি মিলেছে। এইখানে এসে ওরা বসে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছে, আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শহরের অধিবাসীবৃন্দ (তার ভিতর সীমাও আছে) ওদের কাহিনী শুনছে।

পলাতকদের মন্দগতি মিছিলের ওপর জার্মান বিমান বহর বোমা ফেলেছে—বার বার জার্মান আক্রমণের মুখে ওদের পড়তে হয়েছে। যানবাহনবহুল পথের চৌমাথায়, ব্রীজের ওপর, বা রেল রাস্তার লেভেল-ক্রসিং-এর মুখে সর্বত্রই জার্মানরা ওদের বিব্রত করেছে। ওদের মধ্যে অনেকে হতাশাভরে বল্‌ল···"আমরা পালিয়ে এসে বড় ভুল করেছি, বাড়িতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে জার্মান বোমার জন্য প্রতীক্ষা করা ভয়ংকর বটে, কিন্তু পথের ভয়ংকরত্ব দশগুণ বেশী। এই পলায়নের সব কিছুই লোমহর্ষক।"

সীমা শুনতে লাগল, তবে এ সব কথা ও আগেও শুনেছে। প্রাচীন কালের সুন্দর বাড়ি "হল অফ জাস্টিস" ছাড়িয়ে সীমা চল্‌ল,—সে সহসা সেই প্রাসাদের দরজা দিয়েও লক্ষ্য করল, মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপর অসংখ্য পলাতক অসহায় ভঙ্গীতে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে শুয়ে আছে। এ দৃশ্য থেকে সীমা ওর চোখ ফিরিয়ে নিল, অন্তরে একটা অপরাধীর ভাব নিয়ে পথের ধারের বাড়িগুলির গা ঘেঁষে সীমা রু দ্য সন্তিনির দিকে চল্‌ল।

চমৎকার প্রাচীনবাড়িওলা শহরের প্রাচীন অংশের এই সংকীর্ণ পথ রু দ্য সভিনি শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। শরণাগতেরা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দোকানে কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপন ঝুলছে, 'রুটী নেই', 'মাংস নেই', 'পেট্রোল নেই', 'তামাক নেই'। সব দোকানেরই প্রায় ঝাঁপ বন্ধ, যে সব দোকানের একটা আধটা পাল্লা খোলা আছে সেখানে হয় কোনো বিজ্ঞাপন চিত্র নয়, অপ্রয়োজনীয় বস্তু সাজানো রয়েছে, যেমন চীনে মাটির 'লবণদানি', কিংবা বড় লণ্ঠন, তার ভিতরের বাতি পাওয়া যায় না। মঃ আর্মন্দের 'নাপিতের দোকানে' গন্ধ-দ্রব্যের একটি প্রকাণ্ড শূন্য বোতল সাজানো রয়েছে।

দোকান বন্ধ থাকলেও পিছনের প্রবেশ দ্বার বা কোন গলিতে দোকানদারদের সাড়া পাওয়া যায় তা সীমার জানা আছে। আর কারো জন্য না হোক মাদাম প্লানকার্ড বা তাঁর দূত সীমার জন্য তাদের দরজা সর্বদাই খোলা, প্লানকার্ড পরিবারের জন্য কিছু না কিছু থাকবেই।

'ভিলা মনেরেপো'র মজুত দ্রব্যাদির ওপর নানা প্রয়োজনীয় বস্তু সীমা আসন্ন দুদিনের জন্য সংগ্রহ করলো। এখানকার দোকান "লা এগ্রিয়েবল্ এট্ লা উতিল" একেবারে ফাঁকা। "মঁসিয়ে লা উতিল" ব'লে পরিচিত মঁসিয়ে কাপে স্টিয়ার পর্যন্ত চলে গেছেন, 'মঁসিয়ে লা এগ্রিয়েবল' বলে খ্যাত মঁসিয়ে লাফ্রেস্ শুধু উপস্থিত আছেন। সীমার জন্য তিনি একজোড়া মোজা আর বাগানে জলদেবার ঝারি রেখেছেন। মঁসিয়ে আর্মন্দের নাপিতের দোকানে মঁসিয়ে প্ল্যানকার্ডের জন্য কয়েকটা দাড়ি কামাবার সাবান রাখা ছিল। সীমা সহরের একমাত্র বিভাগীয় দোকান 'গ্যালেরী বুর্গীগননে' - পৌছতে পারল। দোকানটি ভালো করে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। এত বড় দোকানে মাত্র তিনটি কর্মচারী হাজির। তবু মাদমোয়াজেল জোলেফাইন মাদাম প্ল্যানকার্ডের জন্য কয়েকটি জিনিষ ও কিছু রিবন রেখে দিয়েছেন। সীমাকে জিনিষগুলি দেবার সময় উত্তেজিত ভঙ্গীতে তিনি কানে কানে জানালেন যে, দোকানের মালিক মঁসিয়ে এনিয়ট শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মুদীর দোকানের মঁসিয়ে রাইমু, ক্রেডিট লিওনের মঁসিয়ে লা রোস্ প্রভৃতি আর যে সব ব্যবসাদার, ব্যবহারজীবি বা ডাক্তাররা শহর ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের নামও তাঁর কাছে শোনা গেল।

তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করে সীমা শহরের এই প্রাচীন অঞ্চল ছেড়ে পোর্ট দ্য লাহর্লো ছাড়িয়ে এ্যাভিন্যু দ্য লা গারের নতুন অংশের দোকানগুলিতে ঘুরতে লাগল।

এই পথে শহরের সব চেয়ে বড় পার্ক প্লাস্ দ্যু জেনারেল গ্রামো পড়ে। এইখানে বার্ষিকী মেলা বসে, আর ১৪ই জুলাই তারিখে সাধারণের নাচগানের জন্য রঙীন আলোকমালায় জায়গাটি সাজানো হয়। মেলার সময় যা হয় না আজ তার চেয়ে বেশী মোটার আর ওয়াগানে জায়গাটি ভরে গেছে; অনেক পলাতক আরো দূরে যাবার আশা ছেড়ে, আগামী দিন ও রাত্রিগুলি এইভাবেই এইখানে গাড়িতে কাটিয়ে দিতে মনস্থ করেছেন। জেনারেল গ্রামোর মনুমেন্ট গাড়িঘোড়ার ভিড়ে দেখাই যায় না। জেনারেলের মাথা থেকে হাত পর্যন্ত দড়ি বেঁধে কারা তার উপর কাচা কাপড়-চোপড় শুকাতে দিয়েছে।

এ এক ভীষণ হট্টগোলের দৃশ্য—দুটো এম্বুল্যান্স কোনো রকমে এর ভিতর ঢুকে পড়েছে। সীমা তার মধ্যে একটির দরজায় উঁকি দিয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে যে মাথাটি দেখা গেল তাকে আর মানুষের মাথা বলা চলে না। হাসপাতালের লোকেরা পাদানিতে বসে ঝিমোচ্ছে। মালপত্রে বোঝাই প্রকাণ্ড বড় একটা ওয়াগান দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলি তখনও গাড়িতে জোতা রয়েছে, গাড়োয়ানের বস্বার জায়গায় একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক বসে আছে মালপত্রের ওপর বিপজ্জনক ভাবে বসে একটি বিশ্রী নোংরা ছোট ছেলে বেরাল কোলে করে কাঁদছে। গাড়িগুলির মাঝে কতকগুলি সৈনিক শুয়ে বা বসে আছে। অনেকে তাদের ইউনিফর্ম বা উর্দী খুলে

ফেলে বেসামরিক পোষাক ওভারকোট, হ্যাট এই সব পরেছে—অনেকে আবার পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে, সুদীর্ঘ পথশ্রমে পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে। ঠেলাগাড়ি বা ছোট ছেলেদের পেরাম্বুলেটরে অদ্ভুত জিনিষ পত্র বোঝাই করা রয়েছে সীমা দেখলো একটি মেয়ে অন্যমনস্ক অথচ ধীরভাবে গাড়ি থেকে কাদা তুলে ফেলছে, যেখানে কাদা উঠে যাচ্ছে সেখানে উজ্জ্বল ঘন নীল রঙ জেগে উঠছে পলাতকদের মধ্যে অনেকেই যেন বিশেষ অসুস্থ ও দুঃস্থ। অনেকেরই ছেঁড়াখোঁড়া নানাবিধ জিনিষের প্রয়োজন। কাপড়চোপড় বেশীর ভাগই ছিন্ন ও খুব উপযোগী নয়। যে সব জিনিষ বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাও আবার যে খুব প্রয়োজনীয় বা বহু মূল্য তা নয়, চলে আসার সময় যেটা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে সেইটেই তুলে আনা হয়েছে, যেমন একটা চম কার আরাম কেদারা বা প্রকাণ্ড একটা গ্রামোফোন।

ফিকে সবুজের ডোরাকাটা পোষাকে হাতে প্রকাণ্ড বেতের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে সীমা গাড়ি ও মানুষের এই বীভৎস ভিড় দেখতে লাগল—এই শোচনীয় দৃশ্য তাকে অভিভূত করে ফেলেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ আর আহার ও আবাসে পরিতৃপ্ত সীমা এবং এই জনসাধারণের মধ্যে কোথায় একটা ব্যবধান রয়েছে, নিজেকে পুনরায় ওর অপরাধী মনে হল।

এ্যাভিন্যু দু লা গারের পথে ও ধীরে ধীরে চলতে লাগল, কিন্তু শহরের এই নতুন অঞ্চলের সব দোকানই প্রায় বন্ধ, অনেক গুলিতে সীমা ঢুকতেই পারল না। বোঝা গেল মালিকরা পালিয়েছেন। যাই হোক্ ওর ঝুড়ি প্রায় ভরে এসেছে, তবে তখনও তালিকাভুক্ত অনেকগুলি খাদ্যদ্রব্যের অভাব রয়েছে। শেষ চেষ্টা হিসাবে সীমা স্থির করলো পুরাণো শহরের হোটেল দু লা পোস্ত-এ যাওয়া যাক্। সেই হোটেলের সরবরাহ ব্যবস্থা হয়ত এখনও ভালো, আর সেখান থেকে হয়ত কিছু পেলেও পাওয়া যেতে পারে। প্ল্যানকার্ড-পরিবারের সঙ্গে ওদের ব্যবসাগত সম্পর্ক থাকায় হোটেলটীতে প্ল্যানকার্ডদের খাতির আছে।

এই প্রসিদ্ধ হোটেলে দু লা পোস্ত-এর দরজায় যে কাগজ নির্ম্মিত রাঁধুনী আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকৃত আজ সেটি পথে বিশ্রীভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর হোটেলের অধিকারী মঁসিয়ে বার্থিয়ার আহার ও আবাসপ্রার্থী কয়েকটি শরণাগতের সঙ্গে তর্ক করছেন। এই হোটেল দু লা পোস্ত-এর ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। এল্‌বা থেকে ফেরার পথে নেপোলিয়ন এইখানে উঠেছিলেন। যে ঘরে সম্রাট নিশাযাপন করেছিলেন সেই ঘরটি আজো সেইভাবে সাজিয়ে রাখা আছে। যে বার্থিয়ার সম্রাটকে অভ্যর্থনা করেছিলেন মঁসিয়ে বার্থিয়ার তাঁর বংশধর, যে সব অতিথিকে মঁসিয়ে বার্থিয়ার পছন্দ করতেন বা যাঁরা একটু বেশী মূল্য দিতেন তিনি এই ঘরটি তাঁদের মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দিতেন। মঁসিয়ে বার্থিয়ার একজন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বার্গেণ্ডির হোটেলকীপার্স এসোসিয়েসনের তিনি সভাপতি। জনসাধারণের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি জানেন। কিন্তু এখন তিনি মাত্রা হারিয়ে ফেলেছেন—ঘর্মাক্ত, উত্তেজিত ও মরিয়া হয়ে উঠেছেন—অপর পক্ষও সমান উত্তেজিত। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে সত্যই কিছু নেই, কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বারবার তাই জানতে চায়।

এই উত্তেজিত জনতা অতিক্রম করে সীমা হোটেল বাড়ির অন্য প্রবেশপথে ঘুরে গেল। এ পথটি রু মালহার্বে—প্রাচীরঘেরা হোটেলের ছোট বাগানের ভিতর। এই দরজাটি সাধারণের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং তালাবন্ধ। সীমা কিন্তু জানে কি করতে হবে। এক টুক্‌রো ইট কুড়িয়ে নিয়ে সে থেমে থেমে মাঝে মাঝে সজোরে ঘা মারতে লাগল।

বাগানের পাঁচিলের ধারে দুটি লোক বসেছিল, একটি বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে, অপরটি মধ্যবয়স্ক। দুজনেই

ওকে লক্ষ্য করছিল—বয়স্ক লোকটি অন্যমনস্কভাবে আর বালকটি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। সীমা জানে শীগগীরই তত্ত্বাবধায়কের ঘর থেকে কেউ জানালা খুলে উঁকি মেরে মাথা নাড়বে আর এই ছেলেটি তার উজ্জ্বল চোখ মেলে দেখবে। ঠিক তাই হোল। বালকটি জানলার দিকে তাকালো, জানালা থেকে সীমার দিকে, সীমার বেতের ঝুড়ির দিকে, আর দেখলো দরজা খুলে গেল। সীমা বালকটির দিকে চাইতে পারলো না, কিন্তু দরজার ভিতর ঢোকার সময় কিছুতেই তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। সীমা দেখলো বালকটি ঝেদারের মত উজ্জ্বল চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে আছে, সীমা সেই কঠোর দৃষ্টি হজম করল।

হোটেলের রান্নাঘরে সীমা দেখ্‌লো তালিকাভুক্ত অনেকগুলি জিনিষ পাওয়া যেতে পারে। একপাত্র চমৎকার মাংসের পেষ্ট, একখণ্ড স্মোক্‌ড্ হাম্‌, আরো কত কি! ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গিছল, সীমাকে একখণ্ড রবেলকন্‌চীজ্ হাতে করে নিতে হল। বাইরে পাঁচিলের ধারে সেই দুটি শরণাগত সমানভাবে বসে আছে—সেই ভাবেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সহসা অত্যন্ত ভীরু ভঙ্গীমায় সীমা ওর রবেলকন্‌চীজের টুক্‌রাটুকু ছেলেটির হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটি অত্যন্ত রুষ্টভাবে ওর মুখের দিকে তাকাতেই সীমা তাড়াতাড়ি সে দিকে না ফিরে দেখে পালিয়ে এল, সে যেন একটা ভীষণ অন্যায় করেছে।

ওর কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল—যতক্ষণ না মোড়ের মাথায় সীমা মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ ওরা সেইরকম স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। সীমা একটু ভয় পেয়েছে। পলাতকরা যদি টের পায় ওর ঝুড়িতে কি আছে তা'হলে ওরা জিনিষগুলি কেড়ে নিতে পারে। সীমা ভীত হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে হ'ল—ওদের কোনো দোষ ধরা যায় না। ওর মনে হ'তে লাগল, আহা ওর যদি সত্যি ঝুড়িটা কেড়ে নেয় ত' ভালো হয়।

ভিলা মনরোপাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশে প্রতিপালিত। দশ বছর বয়সে বাপ মারা যাবার পর এ বাড়িতে দরিদ্র আত্মীয় হিসাবে কষ্টেই ও বাস করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে দাসীর কাজের ভার নিয়ে ওকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, এদিকে আবার পরিবারবর্গের সঙ্গে একত্রে আহার করে, তারাই ওর অভিভাবক। প্রস্‌পার খুড়োর হুকুম যে ওকে বাড়ীরই একজন হিসাবে যেন ধরা হয়। কর্ত্তব্য ও সুবিধা দুই-ই সে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মেনে নিয়েছে, ভিলা মনরোপার আচার ও ব্যবহার ওর কাছে দিন ও রাতের মতই অপ্রতিবাদ্য। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনোরূপ প্রতিবাদ না করেই ও প্রস্‌পার খুড়োর মা মাদামের সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করে। এই দুঃসময়ে একজন পাকা গৃহিণী যে তাঁর ভাঁড়ার ভর্তি করে রাখ্‌বেন এ ত' স্বতঃসিদ্ধ। তবু চেতনভাবে চিন্তাসূত্র না হারিয়েই সীমার মনে হতে লাগ্‌ল, যে মর্মবেদনা গত কয়েকদিন ধরে ওকে উৎপীড়িত করছে, তার সঙ্গে এই ঝুড়িটির সংযোগ রয়েছে।

ইদানীংকার এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করার জন্য সীমা উন্মুখ। এই সেদিন পর্য্যন্ত ম্যাজিনো লাইন আর শক্তিশালী সৈন্যদলের সংরক্ষণে ওরা গভীর নিরাপত্তা সহকারে বাস করেছে। যুদ্ধ সত্ত্বেও সর্বত্র বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নিয়মের প্রাচুর্যের ভিতর কেটে গেছে। তারপর সহসা রাতারাতি ম্যাজিনো লাইন ও সৈন্যদলের সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুসৈন্য দেশের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে, আর সারা ফ্রান্স দুর্দশা ও দুঃখে অর্দ্ধোন্মত্ত অসহায় শরণাগতদের দলে বোঝাই হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা ও দুঃখকাতর সীমা এই যুদ্ধের বছরে সবাই নির্বোধের মত নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছে এই কথা ভেবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। কি করে যে এই সব ঘটনা একযোগে সংযুক্ত হয়েছে একথা সীমা ভেবে পায়না, এ বিষয়ে ওর চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী কারো সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্ন

করে কিছু জানতে পারলে হয়ত ভালো হ'ত, কিন্তু প্রাণখুলে কথা কইতে পারে এমন কাউকেই ত' সে জানে না।

ওর বাবার সতাত ভাই প্রস্‌পার খুড়ো ওকে ভারী স্নেহ করেন। ওকে যে তিনি বাড়িতে রেখেছেন তার জন্য সীমা সত্যই কৃতজ্ঞ।

তিনি সদয় ও সহৃদয় ফরাসী ভদ্রলোক এবং অত্যন্ত স্বদেশহিতৈষী। যানবাহন সংক্রান্ত ওঁর ব্যবসা নিয়ে উনি আগের মতই ব্যস্ত আছেন, কাজটার অবশ্য গুরুত্ব আছে আর যদিও ইদানীন্তন ভয়ংকর ঘটনাবলীতে তিনিও বিব্রত আছেন তবু মনে হয় এই ব্যাপারে সীমা যেমন অভিভূত হয়ে পড়েছে তিনি ততটা হ'ননি। যাই হোক্ এই সব ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন সে সব কথা সীমা যা জানতে চায় তা নয়। সেই কথায় কোনো কিছুরই অর্থ পরিষ্কার হয়নি, তার মনের জটিলতা কাটেনি।

খুড়োর মা, মাদাম, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন নিজের বাড়ি ও নিজের সম্পর্কে তিনি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করেছেন, আর সব কিছু ব্যাপারেই 'ভিলা মনরোপা'র সম্ভাব্য মঙ্গল আর অমঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। যেমন আজ যদি কোনো পলাতক সীমার ঝুড়ি নিয়ে পালাত, তাহলে মাদাম তাকে সাধারণ দস্যু ও ঘৃণিত আসামী ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না, আর তাঁর সে ধারণার প্রতিবাদে সীমা কিছু বলতে গেলে মাদামের কাছে তা ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহের ভঙ্গী বলে বিবেচিত হ'ত। এমন কি এত সদয়চিত্ত হলেও এই সব ব্যাপারে প্রস্‌পার খুড়োর কোনো সহানুভূতি থাকত না।

এতকষ্টে সংগ্রহ করা একেলকন্ চীজটুকু যে সে শরণাগতদের ছেলেকে দিয়েছে সেকথা অবশ্য সে চেপে যাবে। ভিলা মনরোপাস্থ সীমার আত্মীয়বর্গ একথা শুনলে তাকে উন্মাদ বিবেচনা করবেন। আর সেই ছেলেটি ত' ওর দিকে রুষ্টভাবে চেয়েছিল। তবু ও পুনরায় হয়ত অনুরূপ কাণ্ড করে বসবে।

নানা চিন্তায় ওর মাথা পরিপূর্ণ, অন্যমনস্ক ভাবে দ্রুত পদক্ষেপে ও পার্বত্য পথে চলতে লাগল—ওর কাজ শেষ হয়েছে। এইবার ওকে প্রস্‌পার খুড়োর গ্যারাজে পেট্রোল পাম্পে কাজ করবার জন্য যেতে হবে। ইভিয়েনদের বাড়ীর রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে হবে। আহা। সে যদি এখানে থাকত বেশ হ'ত। সে এখন চ্যাতিলোর মেসিনের কারখানায় কাজ করছে। (ক্রমশঃ)

বর্তমান

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

অতীত মিলায় দূর ছায়াসম দিক্‌চক্রবালে,
ভবিষ্যের কূল-রেখা তেমনি যে নিরাশা-মলিন,
কাল হ'ল কূলহারা, ঘূর্ণাস্রোত বিরামবিহীন
বহে যেই—বর্তমান লুকায়েছে তারি অন্তরালে।
গঙ্গাধর নাহি ধরে গঙ্গা আর। যেন রুদ্র-ভালে
অস্ত গেছে অর্দ্ধশশী; কটি হ'তে রক্ত গজাজিন
খসিছে সন্ধ্যার মেঘে; শোনা যায় শুধু নিশিদিন
তাণ্ডবের পদধ্বনি করধৃত ডম্বরুর তালে।

নৃত্য করে মহাকাল—স্কন্ধে মৃত সতী দেহভার;
গ্রাসিছে যজ্ঞের ভাগ দক্ষালয়ে যত নিশাচর,
আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বজীব গণিছে প্রলয়;
বিধি তবু অপ্রমত্ত, হেরিছেন যোগ নেত্রে তাঁর—
উমারূপে সেই সতী বসে বামে, হাসে মহেশ্বর,
তীরে জাগে বর্তমান—দিগন্তরে জ্যোতির বলয়!

রবি-প্রণাম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সেদিন চম্পক বনে মর্ম্মরিত সুরভি নিঃশ্বাস,
রবির পরশ লভি' অন্তশ্ছিন্ন দলে স্বর্ণশোভা,
থরে থরে বিস্তারিয়া ফুল জন্মে আনিল আশ্বাস
বৃন্তে বৃন্তে পরিপূর্ণ সম্বৃত সৌন্দর্য্য মনোলোভা।

বসন্ত বিদায় নিল;—মঞ্জরিত চূতবল্লরীর
মৃদু গন্ধে আমোদিত বৈশাখের বৈরাগী বাতাস,
ক্ষণে ক্ষণে জাগে আশা ম্রিয়মান প্রাণে বল্লরীর
ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হয় মিলনের অপূর্ব্ব আভাস।
বৈশাখের খর রৌদ্রে রুদ্রবীণা ওঠে ঝঙ্কারিয়া
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঝরে অঙ্গুলির ক্ষিপ্র সঞ্চরণে,
শতাব্দীর সূর্য্য বুঝি পূর্ণ তেজে এল বাহিরিয়া
যুগের সে সন্ধিক্ষণে দেখা হোল জীবনে মরণে।

হে সূর্য্য, অমিতবীর্য্য, হে রবি বিশ্বের আদি কবি
ঊর্দ্ধমুখী ধরণীর অর্ঘ লহ প্রসন্ন আননে,
তব মন্ত্রে প্রকাশিত ভূমার এ অনিন্দিত ছবি
তোমার সঙ্গীতে মুগ্ধ বাণী তাঁর শ্বেতপদ্মাসনে।

হে রবি, শাশ্বত কবি, দিব্যজ্যোতি পুরুষ মহান
অ-মৃত প্রণাম লহ, মৃত্যুহীন অনশ্বর প্রাণ।

পঞ্চারতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঢং ঢং ক্রাং ক্রাং ওঁ শিব শঙ্কব,
ডগ ডগ বম্ বম্ বোম বিশ্বেশ্বব।
ঘণ্টা-কাংস-ঘন-পটহ-ধ্বননে
জাগো জাগো মহাশিলা প্রসন্ন আননে।
মন্দিবে মন্দিবে লহ এ আবাত্রিক,
পবমতীর্থ ওঁ ও মহাযাত্রিক।

দিপ্ দিপ্ পঞ্চপ্রদীপে দীপাবর্তন,
ঝিক্ মিক্ নভে নভে তাবকাব নর্তন,
হিমকুজ্ঝটি-ধূপধূম্রাচ্ছন্ন
তুঙ্গ গৌবীশঙ্কব মহাশৃঙ্গ,
নিষ্কামানলে কামানল নিশ্চঙ্ক
গৌবীপট্টালিঙ্গিত শিলালিঙ্গ,
লহ এ আবাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক।

ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ শিবসুন্দব,
ক্রাং ক্রাং ডগ-ডগ ওঁ ভুবনেশ্বব!
মেরুসাগবের পাণিশঙ্খের বারি ও,
মরু-আববের হোমকুণ্ডায় ডারি ওঁ,
কর্পূর-কস্তুরী-দহনগন্ধধাব
ধূসরিত নীলকণ্ঠের ধূর্জটাভার,
ওঁ ভালে সদ্য-বিগত অমাবস্যা,
সর্ব-অঙ্গে ওঁ উমার তপস্যা,

আর্য-অনার্যেব স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের
বাস্তুলোলুপ, যাযাবরী অবিমৃষ্যেব,
মানব দানব-দেব সবাব প্রণম্য,
রুদ্রে বৌদ্র ওঁ ওঁ সোমে সৌম্য,
প্রভাতে কুমারী চিতে ওঁ ব্রতবন্দন,
যুগলমিলনবাতে ও ভুজবন্ধন,
ওঁ মধ্যাহ্নেব প্রদাপ্ত যাজ্ঞিক,
ও বৈবাগ্যেব ধ্যান অপবাহ্ণিক,
কণ্টকাযিত ও বিল্বপাদপমূল,
শিশিব অশ্রুস্নাত ওঁ ধুস্তুবা ফুল,
ডম্বরু ডম-ডম পিনাকেব টঙ্কার,
বেনু বীণা মৃদঙ্গে সঙ্গীত ঝঙ্কাব,
ভাস্কব কবে ও ছেদনী ও হাতুড়ি,
শিল্পীব শৈলী ও কারুময় চাতুবী,
কোটি কোটি নগ্নকটিতে ওঁ বস্ত্র,
ভুজে ভুজে ভুজে ও ববাভয় অস্ত্র,
অন্নে দর্বী ওঁ ভিক্ষুকে ভিক্ষা,
ও গুরুগৌবব শিষ্য সমীক্ষা,
ওঁ রস বাক্‌ছন্দিত কবিচিত্তে,
আনন্দনিঝব-তনু ওঁ নৃত্যে,
লহ এ আবাত্রিক,
ওঁ মহাযাত্রিক!

ঢং ঢং ওঁ কৈলাসচূড়া ক্রাং ক্রাং—
হিমজটাগলিত গঙ্গা-য়্যাংসিকিয়াং,
হর হর হর খর গোমুখীপ্রপাতে
ভেসে-আসা পারিজাত পরে উমা খোঁপাতে,
কন্যাকুমারী ওঁ লবণ-সমুদ্রে
ভালে সিংহলী টীকা জপে মহারুদ্রে,
ওঁ নীলকণ্ঠের প্রশান্ত হৃদিতল
প্রবালের দ্বীপে গাঁথা হাড়মালা ঝলমল,
সপ্তসিন্ধুমুখী শত নদ নদী ওঁ,
সহস্রশাখাজটে প্রচ্ছায় বোধি ওঁ,
ওঁ যব সুমাত্রা বলী নগ-নাগময়,
ব্রহ্ম-শ্যাম ওঁ মালয় মলয়ালয়,
পূর্ব-উদয়াচলে ওঁ আগ্নেয় জ্বালা,
দুর্যোগমেঘে ওঁ মানস-হংসমালা,
ওঁ গোবি সুবিশাল হিমে ঢাকা বৈকাল,
সুমেরু-সমুখিত মহাতপা ইউরাল,
কৃষ্ণ কাস্পিয়ান ককেশসী আহ্বান,
ইরানী হিন্দুকুশ পামীর প্রশস্ত,
ওঁ পাপমর্দন জাহ্নবী-জর্দন,
আলাস্কা-প্রসারিত ওঁ শিবহস্ত,
লহ এ আরাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক !
ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ ধূপ ওঁ দীপ,
নমো শিলামূর্তয়ে জম্বুমহাদ্বীপ,
নমো শূলী শঙ্কর নমো প্রলয়ঙ্কর,
অযুত নির্য্যাতকে ক্ষমো ক্ষমাসুন্দর,
বম্ বম্ ডগ-ডগ অম্বর-পটহে
মৃত্যুঞ্জয়-জয়-ডঙ্কার রট হে,
মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য আরাত্রিক,—
ওঁ শিব ওঁ শুভ ওঁ মহাযাত্রিক !

কৃষ্ণা কালো মেয়ে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পিতৃহীন দুটী বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী
কালো অসঙ্গতিপন্ন। বিবাহের দেরী
হবেই তো, তবু যেন হয়, সে আশায়
সর্ব্বস্ব করিয়া পণ নানান্ শিক্ষায়
উভয়ে পালন করে দরিদ্রা জননী
হরিদ্রা ময়দা সর কখনো নবনী
মাখান তাদের মুখে।
গ্রামে বিদ্যালয়—
সে শিক্ষা হইলে শেষ উভয়ে প্রেরয়
উচ্চতর বিদ্যা লাগি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সেথা হ'তে নগরীর উচ্চ শিক্ষা লয়ে
উভয়ে ফিরিল ঘরে।
কাবেরীর রঙ
কিছু কম কালো, তার হাল চাল ঢঙ্
কথাবলা আধুনিক, বেশ বাস রুচি
ফিট্‌ফাট্ মডার্‌ণ্, সেলায়ের সূচী
চালায় দর্জ্জির মত, বাজায় এস্রাজ,
আঁকিতে গাহিতে নৃত্যে কিছুতে নারাজ
নহেকো, যদিও ছোটো, তবু তার বিয়ে,
—অবশ্য তাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীয়ে—
হয়ে গেল আগেভাগে। কিন্তু অতঃপর

কৃষ্ণার বিয়ের ফুল ফোটানো দুষ্কর
হইল দুর্ঘট কিছু। ঘটক তৎপর
হইল যদ্যপি সবে, তার যোগ্য বর
মেলা সুকঠিন কিছু। একে যোগ্য ছেলে
মেলে না, যদিবা মেলে কোষ্ঠী নাহি মেলে।
কেন্দ্রে রন্ধ্রে গ্রহ তারা নানা যোগাযোগ,
কাহারো অষ্টমে, রাহু অকাল-বিয়োগ,
যোটকের বহুবিধ অবৈধ ওজোর।
কিম্বা যদি তাও মেলে নাই ঘরদোর
শিক্ষা দীক্ষা চালচুলো।
তবু লজ্জা নাই,
অম্লান বদনে কেহ বলে, 'দেখ ভাই
নগদ হাজার দুই, ত্রিশ ভরি সোনা
আর বরাভরণের সে আর বলো না
ঘড়ি-চেন আংটি আর পাথেয় ধরিয়া
কত হবে বড়জোর শ'বারো করিয়া
ধরে নাও মোটামুটি। কি বলিলে? দিতে
পারিবে না ট্রেণ ভাড়া? আমারি কি নিতে
ইচ্ছা তাহা? জামাতারে পোষ্টে পাঠাইতে
পারিতাম ভি-পি করি, কিন্তু পদ্ধতিতে
এখনো চলেনি তাহা।'

কিছু কাল কাটে,
কৃষ্ণা রয় পড়ে যেন হাটের রেজাটে
নিকৃষ্ট বাছট-পড়া বিক্রয়ের শেষে
ঝুড়ির তলার মাল ; হতভাগ্য দেশে
মেয়ে আছে, ছেলে নাই ! মেয়েটীর গুণ
প্রচারিত মুখে মুখে, রন্ধনে নিপুণ,
মধুর কীর্ত্তন গায়, সৌজন্যে শিক্ষায়
সমকক্ষ নাহি তার তবু তারে হায় !
কেবা লবে ? সে যে কালো, নাহিক যৌতুক
কৃষ্ণারে বলিতে কৃষ্ণা সবারি কৌতুক !
রূপ নাই অর্থ নাই বৃন্তে নাই বল,
অকালে শেফালি ফুল চুম্বে ভূমিতল।
রূপ নাই গুণ নাই, অর্থ যদি থাকে,
শশীর মসীর মত সে কলঙ্ক ঢাকে
রৌপ্যশুভ্র চূণকামে। অর্থ না থাকিলে
'রায়ম্পোষ' হবে কিসে, সন্তোষ না মিলে
কাহারো 'নির্জ্জলা' গুণে।

ব্যর্থ হয় সবি
রূপ গুণ শিক্ষা শীল সব পরাভবি
প্রভাব প্রকাশ করে অর্থের অভাব
দারিদ্র্য পঙ্কিল করে সাধুরো স্বভাব,
প্রতিভার সুতীক্ষ্ণতা।

তাই ঘরে পরে
দরিদ্রেও দরিদ্রেরে দয়া নাহি করে,
সবাই শুষিতে চায়, যাতে অবহেলে
বিনা পরিশ্রমে অর্থ ততটুকু মেলে
যা'তে তার দিন কাটে, ঋণ হয় শোধ
তাহার দারিদ্র্য-দুঃখে চায় প্রতিশোধ
লইতে অন্যের পরে। গতানুগতি ক

এমনি চলেছে রীতি, চলেছে পথিক
চলার মসৃণ পথে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে
সেই ক্ষুদ্র সংসারের সুখ শান্তি খেয়ে
বেড়ে ওঠে, বিষবৃক্ষ মলিন উদাস
কালোবর্ণ কালোতর হয়, হতাশ্বাস
বক্ষে যত ধরে চেপে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে—
বছর বছর বাড়ে ; তার পানে চেয়ে
জননীর রক্ত জল, মুখে অন্নজল
রোচেনা, নয়নে তার ভরে উঠে জল
চাহিলে কন্যার পানে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে
শঙ্কিত কুণ্ঠিত প্রাণে দেখে চেয়ে চেয়ে
সমবয়সীরা একে একে হয় পার
তাহারি সে মন্দ ভাগ্যে না হয় উদ্ধার
কৃতকর্ম দুর্ব্বিপাকে দুর্ব্বিষহ ভার
দ্বাবিংশতি বৎসরের কালো অন্ধকার
কিছু নাহি কমে তবু।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে—
কিন্তু তার মুখ চোখ রূপসীর চেয়ে
সুগঠিত, পটোলের মত চোখ দুটী
টানা টানা ভাসা ভাসা ঠিক যেন ফুটি
উঠিয়াছে মুখে তার ইন্দীবরশোভা
অনিন্দিত ঢল ঢল শিল্পী মনোলোভা,
ক্ষীণ বিষাদের হাসি শুক্লা পঞ্চমীর
ব্রীড়ান্বিত কমনীয়, স্বভাবে সুস্থির
যৌবনের অকৃপণ দানে।

অহর্নিশ
প্রতিবেশিনীরা ঢালে মুখে মুখে বিষ,
বলে, 'বীজ রাখিয়াছে এ সোমত্ত মেয়ে!'
কেহ বলে, 'নেকাপড়া সহরেতে পেয়ে
হয়ে গেছে খ্রিবিশ্চান !'
হল বহুবার
যাওয়া আসা সাজাগোজা মেয়ে দেখাবার
প্রশ্নোত্তর বিড়ম্বনা ; হেঁট মুখ করি
যত সে থাকিতে চায় চিবুকেতে ধরি
অভিভাবকেরা তত তুলিয়া দেখায়,
নতমুখী কুমুদিনী লাজে মরে যায়
দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে। কালোমুখখানি
আরো কালো হয়ে যায়, প্রসাধন দানি
হয় না উজ্জ্বল কিছু।
তারা চলে যায়—
অনাদৃতা কালো মেয়ে সরমে শুকায়—
মরমে মরিয়া যায় অবহেলা পেয়ে,
ধনহীনা জননীর রূপহীনা মেয়ে—
সামান্যা সবার চোখে অসামান্যা নারী
দেখার শোনার দুঃখ সহে প্রতিবারই
নিরুপায় অসহায় মার মুখ চেয়ে—
নিজেরে করিয়া তুচ্ছ অমূল্য সে মেয়ে—
মায়ের চোখের মণি।
সে দিনো তেমনি
আসিল কে অকস্মাৎ, পড়িল অমনি
মেয়ে-দেখাবার পালা ; মেয়ে বলে মায়ে,
গোপনে, সজলচক্ষু, ধরি দুটী পায়ে,
"আমারে রাখিয়া দাও তোমার সেবায়
আবাল্য বিধবা ঘরে যতটুকু পায়
ততটুকু স্থান দিয়া।"

শিরে হাত রাখি
বক্ষে জড়াইয়া নিয়া চুম্বনেতে ঢাকি
সে করুণ মুখখানি কহে তারে মাতা,
"ও কথা বলিতে নাই" স্নেহে অশ্রুস্নাতা
জননী মমতাময়ী, "সে দিন স্বপনে
স্বর্গগত পিতা তব মধুর বচনে
আমারে বলেন—'ছাখো, কৃষ্ণা সুখী হবে
সোনার সংসার গড়ি গৃহিনী-গৌরবে
পরিপূর্ণ চরিতার্থ সুপবিত্র সুখে
বিবাহিত জীবনের'।" শুনি, তার মুখে
অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটে, আশার অঞ্জন
কে যেন মাখালো চোখে নয়নরঞ্জন
নবীন লাবণ্য-লেখা।
কাবেরীর স্বামী
রমানাথ, ট্রেণ হতে আসিয়াছে নামি,
এই মাত্র তারে লয়ে বাল্য বন্ধু তা'র,
কালো মেয়ে জেনে শুনে তবু দেখিবার
আগ্রহ অপরিসীম, সরোজেশ নাম,
কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ধাম
স্বনির্ম্মিত কাশীধামে।
পিতা পক্ষাঘাতে
পড়িয়া শয্যায় তার, জননীও বাতে
সকল সামর্থ্যহীন।
সুস্থ সুপুরুষ
সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি ললাটে পৌরুষ,
বলিষ্ঠ বিশালবক্ষ। সমীক্ষার ক্ষণে
কহিল কৃষ্ণারে ডাকি স্নেহার্দ্র বচনে,
"আমি আসিয়াছি আজি দেখিতে তোমারে,
পরীক্ষা করিতে নয়। রমা তো আমারে
বলেছে তোমার কথা, সব শুনিয়াছি,

আমার ঘরের কথা নিজে আসিয়াছি
জানাইতে তোমাদেব, তার মুখে শুনি
কমনীয় স্বভাবের গুণে তুমি গুণী
অপরাজিতার রূপ, শ্যামল সুশ্রীতা,
সুখে দুঃখে সংসাবেব তুমি সুশিক্ষিতা,
গৃহসুখ ত্যাগ করি সুপ্রসন্ন মুখে
তুমি কি বিদেশে যাবে স্বযাচিত দুখে,
লইবে সেবাব চর্য্যা জননী-পিতার,
অপোগণ্ড শিশুসম লইবে কি ভার
অসহায় তাহাদের বার্দ্ধক্যেব দিনে ?
দুগ্ধ-অলক্তক বর্ণ আমি সে চাহিনে,
চাহিনা সুন্দরী সূচীকর্ম নাচ গান,
চাহি শুচিতায় নিত্য সুনীতির দান
সানন্দ সুস্মিত মুখে। সংসারে আমাব
অকুণ্ঠিত চিত্তে বধূ গৃহিনী হবাব
যদি বাধা নাহি থাকে, যদি মন লাগে
লইতে মোদের ভাব সর্ব্ব-স্বার্থ-ত্যাগে
তোমার মাতাব মত পবিপূর্ণ স্নেহে
অসমৃদ্ধ গৃহে মোর, পবিশ্রান্ত দেহে
খাইতে ক্ষুধাব অন্ন পবি রুক্ষবাস
উদয়াস্ত ব্যস্ততায় রহি বারোমাস
আত্মীয় স্বজন ছাড়ি দূব দেশে গিয়া,
বহুদূর বাবাণসী, মোদের লাগিয়া
লইতে বরণ কবি, বহু দুঃখ ভাবে
সহযাত্রী হবে মোব তীর্থ করিবাবে
পবিত্র সংসার-পথে ?
তবে সত্য করি
সবল মনেব ইচ্ছা সঙ্কোচ পাসরি
কহ মোবে জীবনেব এই সন্ধিক্ষণে,
অস্বীকার কর যদি অকুণ্ঠিত মনে,
গ্রহণ করিব তা'ও সুস্থ ঋজুতায়,
আতুরাশ্রমের সেবা কেবা নিতে চায়
যাচিয়া সুদীর্ঘ দুঃখ না হইতে ম্লান
সদ্য ফুলশেজসজ্জা মাল্য পরিধান
বিড়ম্বিত পরিণয়ে !"
নিরুত্তর নীচু
কৃষ্ণার মুখেব কথা সবিল না কিছু
কৃতজ্ঞ সম্মতি মৌনে দুই ফোঁটা জল
প্রণতার নেত্র হ'তে ঝরিল কেবল।

মনিমালা

বিভূতি চৌধুরী

হেমন্তের রাত
নিঃশব্দে উঠিল কাঁপি যেন অকস্মাৎ—
যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে ছায়ার মতন,
সমস্ত পৃথিবীখানি ঘুমে অচেতন;
বাহিরে উড়িয়া গেল পাখা নাড়ি' একটি বাদুড়,
কুয়াশায় কেঁপে কেঁপে বাজে তা'র সুর।
সেই ছায়া—দাঁড়াল সে
মোর পাশে এসে
একেবারে হৃদয়ের সীমানার কাছে—
মনে হল চোখে তা'র অনেক জিজ্ঞাসা যেন আছে;
দেহেতে বুকেতে মোর নেমে আসে ভয়,
হেমন্তের মাঝ-রাতে সে এক বিস্ময়।
আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ জাগে,
দক্ষিণ সমুদ্রে এসে স্পর্শ তা'র লাগে।

আমি চেয়ে দেখিলাম সেই ছায়া—সোনার শরীর,
আমার শয্যার পাশে। মানুষের ভিড়
কিছু নাই এ দুপুর রাতে মোর ঘরে,
হেমন্তের ধূসরতা নেমে আসে ক্লান্ত তা'র স্বরে।
আমারে চিনিতে পার? ধীরে কহিল সে,
কুয়াশার মত ঠাণ্ডা বিছানায় উঠিলাম বসে
চেয়ে তা'র সেই মুখ সেই চোখ জিজ্ঞাসায় ভরা—
মৃত স্বপ্ন জাগে বুকে, স্পষ্ট তবু নাহি দেয় ধরা।
আমার চোখেতে শুধু নির্ব্বাক উত্তর।
আবার কাঁপিল তার স্বর:

এক দুই তিন চার—অনেক বছর তুমি একা
ঘুমায়েছ এই ঘরে, তোমার পাইনি আমি দেখা—
হৃদয়ে নেমেছে ব্যথা, দুই চোখে জল,
জানিতে এলাম আজ তোমার কুশল।
দিনে মোরে চিনিবে না, জেগে উঠি রাতের কবরে—
একটি ঝলক এল হিমেল বাতাস রুদ্ধ ঘরে।
তা'রপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতা,
আবার বাজিল কানে কথা:
নির্ব্বাক বিস্ময় কেন চোখে তব—আমি তো মানবী
তোমার সে মণিমালা, নহি ছায়াছবি।

রাখিতে গেলাম আমি হাতে তা'র হাত,
কোথায় মিলাল সেই ছায়া অকস্মাৎ।
এত মুঠো সাদা জ্যোৎস্না পড়ে আছে জানালার পাশে
চামচিকে বাদুড়ের স্বর কানে আসে,
ঘুমন্ত এ পৃথিবীরে মনে হয় স্বপ্নের কবর—
কোথা গেল মণিমালা, কোথা তা'র স্বর!
কি যে কথা কেঁদে মরে হেমন্তের রাতের বাতাসে,
কোন ফুল ঝরে গেছে—গন্ধ তা'র আসে
আমার নিঃসংগ ঘরে। চাঁদ ডুবে যায়
দূরের দিগন্ত পারে; আমার শয্যায়
নেমে আসে নীরবতা—পৃথিবী নিঃসাড়,
সাদা মেঘে জমে উঠে কুয়াশায় শবের পাহাড়।
তা'রা শুধু দুচোখের ঘুম কেড়ে লয়,
স্বপ্ন— মৃত্যু—মণিমালা—
এ জীবন—সে এক বিস্ময়!

বাংলার লীগ শাসনের ক'বছর

শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়

লীগ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বহু সমস্যা-ও সঙ্কট-সংকুল বাংলায় বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যে যে দিক থেকে প্রাদেশিক রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে এবং হতে পারে, সেগুলো সবই প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে বাংলা সবকারকে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যেব উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হ'তে হযেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও মধ্যে মধ্যে সাহায্য ক'রে আসছেন, তাছাড়া বাংলা সরকারের 'যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা'কে চালু করবার জন্য মোটা-অঙ্কের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সে টাকারও সদ্ব্যবহার হবে কি? বাংলা গবর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যাপারে দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতা দীর্ঘকাল ধরেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল ও অডিটার-জেনারেল বহুবার মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা সরকার বহু বিষয়েই ঠিকমত হিসাবপত্র রাখেন না এবং বিরাট পরিমাণ টাকার—বিশেষতঃ 'রিলিফে'র নামে ব্যয়িত—কোনও হিসাবই মেলে না। একাধিক দায়িত্ব-শীল কমিটি ও জন-প্রতিষ্ঠান উৎকোচগ্রহণ এবং অন্যান্য প্রকারের দুর্নীতির অভিযোগে বাংলা সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন, কিন্তু বাংলা সরকার দুর্নীতির এই ধ্বংসাত্মক ক্রমপ্রসারকে রোধ করতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নি।

তা ছাড়া, বাংলা সরকার শাসনব্যাপারের সর্ব্বক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং 'রিলিফ'-দান প্রভৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত অন্যায় উগ্র-সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করে আসছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সুবিচার এবং তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বাংলা সরকার যুদ্ধোত্তর-উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা বলে থাকেন, কিন্তু আসলে তাদের ও সম্পর্কে পরিষ্কার সুসম্বদ্ধ কোনও 'প্ল্যান'ই নেই। সুতরাং তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের নাম করে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে, তা একেবারে জলে যাবে।

এখানে আমি বাংলা সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা, তার গত কবছরের শাসননীতি ও কার্য্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত করবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত বাংলা সরকার এই বহুবিস্তৃত দুর্নীতির মূল উৎপাটিত করতে, খরচপত্রের হিসাব ঠিকঠাকমত রাখতে, তাদের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ত্যাগ করতে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সুস্পষ্ট ও যথাযথরূপে সংগঠিত করতে সত্যিকার চেষ্টা না করছেন, তত দিন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্যবাবদ তাকে যেন আপাততঃ আর টাকা দেওয়া না হয়।

১৯৪৭-৪৮ সালের বাংলা সরকারের বাজেট্ উপস্থাপিত করতে গিয়ে বাংলার অর্থসচিব নিজেই বলেছেন, 'বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যে একান্ত আশঙ্কাজনক পর্য্যায়ে এসে পৌচেছে, সে বিষয়ে চোখ বন্ধ ক'রে লাভ নেই। বছরের পর বছর 'ঘাটতি বাজেট্' নিয়ে চলা, এবং বর্ত্তমান বছরের বাজেট্ বারো কোটি টাকা 'ডেফিসিটের' সম্ভাবনার কথা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করা অসম্ভব।' বাংলার বর্ত্তমান

অর্থসচিবের মতে বাংলার বাজেটের এই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে দু'টো কারণে : (১) গত মহাযুদ্ধের ফল, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের অর্থসংক্রান্ত বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতা। কারণগুলি সত্যই এই বলে আমরা কিন্তু মনে করি না। বরং আমরা মনে করি, নিজেদের অজস্র গলদ অপব্যয় দুর্নীতি দূর করে নিজেদের ঘর আগে ঠিক করে না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে বাংলা সরকারের আর্থিক সাহায্য চাইবার কোন নৈতিক অধিকারই নেই। বাংলা সরকারের গত ক'বছরের আয়ব্যয় ও কার্য্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিচ্ছি, তা থেকেই আমাদের কথার মানে পরিষ্কার হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা প্রথম থেকেই স্মরণ রাখা দরকার। ১৯৩৭ সালে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার সময় থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাংলাতে মুস্‌লিম লীগ মন্ত্রীসভা প্রায় একটানাভাবেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে,—মধ্যে শুধু ১৯৪১এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩এর এপ্রিল পর্য্যন্ত বাংলাতে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ছিল এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে কিছু মাস ধ'রে তিরেনব্বুই ধারার শাসন চালু ছিল। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়। প্রকৃতপক্ষে প্রায় গত দশ বছর ধ'রেই বাংলাশাসনের দায়িত্ব লীগের হাতে রয়েছে। সুতরাং বাংলার বর্তমান ঘুণধরা অর্থনৈতিক কাঠামো, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মান ও মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি, এই সময়টা ভ'রে ক্রমবর্ধমান অন্যায়, অত্যাচার ও কেলেঙ্কারী,—এ সব কিছুর দায়িত্বই বাংলার মুসলীম লীগের।

রাজস্বের অপব্যয়

প্রথমে রাজস্বের ব্যাপারটা ধরা যাক্। যুদ্ধের পূর্ববর্তী বছর ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, আর ১৯৪৭-৪৮ সালে রাজস্ব থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা,—অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব আয়ের প্রায় চারগুণ। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪৭-৪৮ সালে সেখানে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩কোটি ৮৮ লক্ষ টাকায় অর্থাৎ চারগুণেরও বেশী। বাংলা সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চ'লছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম বছরেই (১৯৩৭-৩৮) বাংলার বাজেটে উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল। তারপর থেকেই লীগের হাতে ক্ষমতা আসে এবং বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে বেড়ে বর্ত্তমান বছরে বারো কোটিতে এসে ঠেকেছে। এ রকমটা কেন হ'ল?

গত ক'বছরের বাংলার বাজেট্‌গুলি একটু তলিয়ে লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে যে সরকারের রাজস্বের এই বিপুল বৃদ্ধির টাকাটা কোন জাতিগঠনমূলক কার্য্যের পেছনে খরচ করা হয় নি। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থ-সাধনার্থ একটা বিশেষ সম্প্রদায় ও দলের লোকদের জন্য কেবলই চাকুরী ও 'কন্‌ট্র্যাক্‌ট'এর ব্যবস্থা করার পেছনে, একান্ত সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থারই অনিবার্য্য অংশস্বরূপ বহুবিধ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে এই বিপুল বর্দ্ধিত রাজস্বের টাকা জলের মত বেরিয়ে গেছে। বাজেট্‌গুলির পর্য্যালোচনা করলে এও দেখা যায় যে নূতন কোন দিক্ দিয়ে আয়বৃদ্ধির আর পথ নেই—ট্যাক্সবসানোর নূতন আর রাস্তা নেই (অর্থাৎ একান্ত অন্যায় না ক'রে)। আগে যে সব ট্যাক্স ছিল, তা ছাড়াও ইতিমধ্যে কৃষি-আয়কর, বিক্রয় কর, মটর স্পিরিট্‌-বিক্রয়কর। কাঁচা পাটের উপর কর প্রভৃতি অনেক নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে। বিভিন্ন ট্যাক্স থেকে আয়ের পরিমাণ বর্ত্তমানে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ হ'য়েছে। এই বর্দ্ধিত ট্যাক্সের আয়েরও কি সদ্গতি হয়েছে?

১৯৪০ সালে ভূমি-রাজস্ব কমিশন মন্তব্য করে গিছলেন যে, অবস্থা বিবেচনায় দরকার হলে কৃষি-আয়কর ধার্য্য করা যেতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঐ কর বাবদ প্রাপ্ত সব টাকাই কৃষির উন্নতির পেছনেই খরচ করতে হ'বে। বাংলা

সরকার অবশ্য কখনও তা করেননি। অন্যান্য খাতে পাওয়া টাকারও একই হাল হয়েছে।

গত ক'বছর ধরে বাংলায় পুলিশ, দুর্ভিক্ষ, 'বিবিধ' প্রভৃতি খাতে খরচের অঙ্ক বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক বিভাগকে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। শেষোক্ত খাতে ১৯৩৯-৪০ সালে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৩'১ ভাগ খরচ করা হ'ত, আর বর্ত্তমান সালে (১৯৪৭-৪৮) খরচ করা হচ্ছে ২০'৬ ভাগ। অন্যদিকে, পুলিশ প্রভৃতি খাতে ১৯৩৯-৪০ সালে খরচ করা হ'ত মোট ব্যয়ের শতকরা ২১'৭ ভাগ, আর বর্ত্তমান বছরে খরচ করা হচ্ছে শতকরা ৬৮'৯ ভাগ। এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, 'উন্নয়ন' খাতে বাংলা সরকার এ পর্য্যন্ত যে টাকা খরচ করেছেন, তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের,—সুতরাং তা খরচের হিসাবে ধরা হয়নি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগকে এমনি ক'রে উপেক্ষা ক'রে পুলিশ প্রভৃতির খাতে এমনি বেপরোয়াভাবে খরচ বাড়ানোর দৃষ্টান্ত ভারতের আর কোনও প্রদেশে মিলবে না।

নিমেয়ার সিদ্ধান্তের অজুহাত

লীগ গবর্ণমেন্ট গত যুদ্ধকে আর নিমেয়ার সিদ্ধান্তকে বাংলার এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য দায়ী ক'রে থাকেন। আসলে, সত্যিকার কারণগুলোকে ঢাকবার জন্যই ও সব কারণের দোহাই পাড়া হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ও দু'টো কারণের একটাও এই দুর্গতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী নয়। নিমেয়ার সিদ্ধান্তের ফলাফল সকল প্রদেশের উপরই প্রায় একরূপ হয়েছে। বরং ঐ সিদ্ধান্তে যে যে প্রদেশের সুবিধে হয়েছে, বাংলা তাদের অন্যতম। বোম্বাই আর মাদ্রাজ তো কিছুই পায়নি। ঐ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা পেয়েছে: (ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলার ঋণ ছিল ২ কোটি টাকা, সেটা রহিত করা হয়েছে এবং তার ফলে বাংলার বছরে ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকছে; (খ) পাটশুল্কে বাংলার অংশ শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬২½ ভাগ করা হয়েছে; ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবমতে ওর ফলে বাংলার আয় বছরে ৪২ লক্ষ টাকা বেড়েছে; তা ছাড়া, (গ) আয়করেও অন্য সব প্রদেশের মত বাংলাকেও অংশ দেওয়া হয়েছে। বরং একটু বেশীই দেওয়া হয়েছে। সমগ্র আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বাংলা থেকে আসে না, তবু সম্ভবতঃ বাংলার বিপুল লোকসংখ্যা বিবেচনায় তাকে কেন্দ্র কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের দেয় অর্থের শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নিমেয়ার সিদ্ধান্তে বাংলার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, এ কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, এও লক্ষনীয় যে বাংলার সমগ্র পাটশুল্ক এবং আয়কর-ভাণ্ডারে তার দেয় অর্থের সবটাও যদি বাংলা পায় তবু তার বর্ত্তমান বাজেট-ঘাটতি পূরণ হবে না। কারণ, ঐ দুই খাতে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলা পেয়েছে ৭.৮ কোটি টাকা, এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে পাবে ৯½। ১০½ কোটি টাকা। অথচ, বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭ সালে হচ্ছে ১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে হচ্ছে ১২ কোটি টাকা।

যুদ্ধের অজুহাত

যুদ্ধের অজুহাতের আড়ালেও বাংলা সরকার পার পেতে পারেন না। মুদ্রাস্ফীতি এবং যুদ্ধের অন্যান্য কুফল শুধু বাংলাতে দেখা দেয়নি, সারা ভারতেই তা হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি ছিল ব'লে বাংলার ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হয়েছে, এ যুক্তির উত্তরে বলা চলে, আসাম তো রণাঙ্গণের আরও অনেক কাছে ছিল, তবু দেখা যাচ্ছে যুদ্ধশেষে তার আর্থিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত তো হয়ই নি, বরং উন্নয়ন-খাতেও সে বেশ কিছু টাকা খরচ করতে সমর্থ হচ্ছে। যুদ্ধের পেছনে বাংলাকে অনেক খরচ করতে হয়েছিল, এ যুক্তিও আর টেঁকে না। কারণ ঐ খরচের কিছুই বাংলা সরকারের পকেট থেকে যায়নি; হয় ব্রিটীশ

গভর্ণমেণ্ট নয় তো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও খরচটা বহন করেছেন।

বাংলার আর্থিক অবস্থার প্রসঙ্গে আর একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যাপার স্মরণীয়। স্বায়ত্ত-শাসন চালু হওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্য্যন্ত মোট বাজেট্-ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ২২ কোটি টাকা, আর এ কয় বছরে বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে দুর্ভিক্ষ বা সাহায্য বাবদ ঐ পরিমাণ টাকাই পেয়েছে! মন্তব্যের আর দরকার আছে কি?

বাংলার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর উদ্বেগের কারণ এই যে ব্যয়-বৃদ্ধি যে অনুপাতে হয়েছে, জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি সেই অনুপাতের বেশী হয়নি। ব্যয়-বৃদ্ধি তো তিনগুণেরও বেশী হয়েছে। পুলিশ, দুর্ভিক্ষ, বিবিধ এবং অতিরিক্ত চার্জ্জ ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের দরুণই জাতিগঠন-মূলক ও সমাজসেবামূলক বিভাগগুলোর পেছনে যথোপযুক্ত ব্যয় সম্ভব হয়নি'। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, তজ্জনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্রমপ্রসার, শাসনকার্যে বহুমুখী দুর্নীতি, এসবই হচ্ছে পুলিশ প্রভৃতি খাতে ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ। বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক ক'বছরের ব্যয়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী ক'বছরের ব্যয়ের এবং অন্যান্য প্রদেশের ব্যয়ের তুলনা করলে তা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হ'বে। খরচ বেড়ে গেছে প্রধানতঃ বহুপ্রকারের দুর্নীতির জন্যই। যেখানে সম্ভব, মুসলমানকে কন্‌ট্রাক্‌ট দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের নীতি। মুসলমানদের পক্ষে এজন্য কোন নির্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ডেরও বড় একটা প্রয়োজন হয় না। লীগ মন্ত্রীরা নিজেরা পর্য্যন্ত সব কন্‌ট্রাক্‌টের ভাগবাঁটোয়ারাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কাপড়ের কলের যন্ত্রাদি এবং চিনি প্রস্তুতের যন্ত্রাদি বণ্টন, জনসাধারণের ব্যবহার্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বহু কাঁচা মাল নিয়ন্ত্রণ, এসব গবর্ণমেণ্টই নিজ হাতে নিয়েছেন। এই ক্ষমতা লীগ গবর্ণমেণ্ট বহুক্ষেত্রেই নিছক দল বা আত্মীয়-পোষণ কার্যে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার ক'রে দুর্নীতির দ্রুত প্রসারে সাহায্য করেছেন। বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি তো প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'তে চলেছে।

বাংলা সরকারের নিছক সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে শুধু ১৯৪৬-৪৭ সালেই টাকা খরচ হয়েছে: (ক) দুর্ভিক্ষ সাহায্য—৫ কোটি ৫০ লক্ষ; (খ) দাঙ্গাসংক্রান্ত ব্যয়—২ কোটি ৩৮ লক্ষ; (গ) সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য পুলিশ খাতে অতিরিক্ত ব্যয়—১ কোটি—অর্থাৎ মোট প্রায় ৯ কোটি টাকা। সমগ্র শাসনব্যবস্থায় অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ফলে কি পরিমাণ খরচ বেড়েছে, তার হিসাব দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কারণ বহু বিভাগেরই ঐ একই হাল। ঐভাবে অপব্যয়ের পরিমাণও হবে অনেক। ১৯৪৬-৪৭ সালে অতিরিক্ত চার্জ্জ্ খাতে যে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ কোটি টাকা ব্যক্তিস্বার্থ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং কর্ম্মচারিদের অযোগ্যতার দরুণ খরচ হয়ে গেছে। খাদ্যশস্যের ক্ষতি বাবদও এ টাকার একটা মোটা অংশ খরচ হয়ে গেছে।

শাসন পরিচালনার ব্যয়

বাংলার সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনের খরচও অস্বাভাবিক রকমের বেশী। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে দুর্ভিক্ষের খাতে মোট ৩,৩০,৯২,৫৭০৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়। সে টাকা খরচ হয় এভাবে:

১।	বেতন ও দপ্তর খরচা	—	২,১৩,৪৭,৭৯৪৲
	(তন্মধ্যে বাজে খরচ	—	১,৫০,২৮,১৮৯৲)
২।	গ্র্যাটুইটী রিলিফ্	—	৬৪,৬৫,১২৫৲
৩।	বিবিধ	—	১১,২৮,৭৬৩৲
৪।	পুনর্বসতি-কার্য বাবদ	—	৪১,৪০,৮৩৪৲
	(তন্মধ্যে অফিসারদের বেতন দপ্তর-খরচা, ভাতা, বাজে-খরচ ইত্যাদি		২৬,৮০,৯৪৬৲)
৫।	ইংলণ্ডের চার্জ্জ	—	১০,০৩৭৲
৬।	বিনিময়কালে ক্ষতি	—	১৭৲
		মোট	৩,৩০,৯২,৫৭০৲

উপরের হিসাব থেকে দেখা যায়, ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা গ্র্যাটুইটী-সাহায্য বিতরণের জন্য কর্ম্মচারী প্রভৃতির

পেছনই খরচ হয় ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। চমৎকার নয় কি ?

তারপর ধরা যাক্ ১৯৪৭-৪৮ সালে চিকিৎসা খাতে বাজেট বরাদ্দ :

(ক) মেডিকেল কলেজ :	
অফিসারদের বেতন, দপ্তর খরচা, ভাতা প্রভৃতি বাবদ —	২,৭১,০০০
কিন্তু ঔষধাদি ও অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি বাবদ	২৪,০০০
(খ) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন্ :	
অফিসারদের বেতন, দপ্তর খরচা, ভাতা বাবদ	২,৪১,০০০\
কিন্তু ঔষধাদি ও অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি বাবদ	৪৫,০০০\
(গ) অন্যান্য মেডিকেল স্কুলগুলি :	
অফিসারদের বেতন দপ্তর খরচ, ভাতা প্রভৃতি বাবদ	৩,৫১,০০০
কিন্তু, ঔষধাদি এবং অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি বাবদ	৫,০০০

অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই দপ্তর খরচ আর অফিসার-কর্মচারিদের বেতন যোগাতেই টাকা শেষ হয়ে যায়,—আসল প্রয়োজনের জন্য বরাদ্দ-টাকার অল্পই অবশিষ্ট থাকে। উপরি-উক্তরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেকই দেওয়া যেতে পারে।

ঘুষ, দুর্নীতি, ও অব্যবস্থা

ঘুষ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা-কবলিত বাংলার শাসনব্যবস্থার চেহারা কি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা সরকারের কার্যাবলী তদন্তের পর বঙ্গীয় শাসনব্যবস্থা তদন্তকমিটি নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করেছেন :

২২৩ অনুচ্ছেদ : ভারতের অন্যান্য জায়গার মত বাংলাতেও নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে ছোটখাটো দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে। এই সব ছোটখাটো বিষয়ের ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলার সরকারী কার্য্যাদি ব্যাপারে আগে বিশেষ সুনাম ছিল। কিন্তু গত যুদ্ধের ক বছরে সে সুনাম অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত টাকা উপার্জনের নূতন কতকগুলো সুবিধার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, বহু জিনিষপত্রের সরবরাহ কমে যাওয়ায় সে সকল জিনিষের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার লাইসেন্স-প্রদানের নীতি গ্রহণের পর থেকেই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। উক্ত কারণে লাইসেন্স বিশেষ মূল্যবান্ হয়ে পড়ে এবং তা পাওয়ার জন্য অসাধু লোকেরা মোটা ঘুষ দিতে সুরু করে। বহু ক্ষেত্রেই অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত অফিসারদের হাতেই এসব লাইসেন্স মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। চাকুরীতে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা কম থাকাতে সে সব কর্মচারিদের অনেকের পক্ষেই ঐ লোভ সাম্‌লানো সম্ভব হয়নি।

২২৪ অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ এসে এভাবে সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অসৎ লোকদের পক্ষে এই অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জন এত সহজ হয়ে গেছল দুটো কারণে : (ক) শাসন কর্তৃপক্ষের অযোগ্য ব্যবস্থা, (খ) অপরাধ নির্দ্ধারণে এবং অপরাধিদের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যাপারে প্রচলিত আইন সমূহের অন্তর্নিহিত ত্রুটী।

২২৫ অনুচ্ছেদ : উপরি উক্ত দুটো বিষয় আবার পরপর ধরা যাক্। যে সব জিনিষপত্র সরবরাহ কমে গেছল, সেগুলো সম্বন্ধে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল নিম্নপদস্থ এবং অস্থায়ী কর্মচারিদের উপর কিন্তু কোন অবস্থায় কাদের লাইসেন্স দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় সরবরাহ কমে যাওয়ার দরুণ ঐ জিনিষের ব্যবসায়ে আগে থেকে লিপ্ত খাটি ব্যবসায়িদেরই প্রথমে লাইসেন্স দেওয়া উচিত। অনুরূপ অবস্থায় যেমন নাকি ইংলণ্ডে করা হয়েছিল, ঐসব ব্যবসায়ে ব্যবসায়িদের সংখ্যা না বাড়িয়ে কমানোই উচিত ছিল। সে রকম কিছু বাংলাতে করা হয়নি। ফলে, ওসব ব্যবসা কোন কালে করেনি এমন সব কুখ্যাত ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগে চোরা কারবার চালাবার সুযোগ দেওয়া হয়। অত্যন্ত মোটা মুনাফার সম্ভাবনা থাকায় এ সমস্ত লোক পারমিট পাওয়ার জন্য মোটা টাকা ঘুষ দিতে ইতস্ততঃ করেনি এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের কর্মচারিদের পক্ষে লোভ সাম্‌লানোও সম্ভব হয়নি।

২২৭ অনুচ্ছেদ : দুর্নীতি এত ব্যাপক হয়েছে এবং দমনের ক্ষেত্রে সরকার বর্তমানে এরকম পরাজয়সূচক (defeatist) মনোভাব অবলম্বন করে থাকেন, তাতে এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রতিকারের ইঙ্গিত

প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে তদন্তকমিটি বলেছেন :

২২৮ অনুচ্ছেদ : উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য শাসনবিভাগীয় তথা আইনগত ব্যবস্থা, দুইই অবলম্বন করতে হবে।

(১) পারমিট দানকারী অফিসার নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক হতে

হবে এবং কাকে কি সর্তে পারমিট্ দেওয়া হবে, সে সব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিয়ম তৈরী করতে হবে।

(২) যে সব কর্মচারীর চাকুরী এরকম যে সেখানে ঘুষের সুযোগ আছে, তাদের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) সন্দেহজনক ক্ষেত্রে এখনকার চাইতে অনেক বেশী কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের কাছে এমন প্রমাণ আছে যাতে মনে হচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে অফিসারেরা প্রাথমিক তদন্তের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে আগ্রহ দেখান না।

(৪) কেউ কোনো ঘুষ দিতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য কর্মচারিদের নির্দেশ দিতে হবে।

(৫) দুর্নীতির অভিযোগে দণ্ডিত সরকারী কর্মচারীকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করতে হবে। তাকে বা তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণবাবদ কোনরূপ সাহায্য দেওয়া চলবে না। অন্তত. এক ক্ষেত্রে ঐরূপ সাহায্য-দানের একটি ঘটনা আমাদের নজরে পড়েছে।

২২৯ অনুচ্ছেদ :

(১) যদি কোন সরকারী কর্মচারী বা তার আত্মীয়স্বজনের আর্থিক সম্পদ হঠাৎ বেড়ে যায় তবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে টাকা সদুপায়ে অর্জিত, নইলে তাকে দণ্ডদানের জন্য আইনে নূতন ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৪৫ সালে উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বর্তমান মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসীন হন ১৯৪৬ সালে, কিন্তু ঘুষ ও দুর্নীতি দমনার্থ কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

নৌকানির্মাণ-সংক্রান্ত বাংলা সরকারের কেলেঙ্কারীর কথা সকলেই জানেন। 'পোড়ামাটী নীতি' অনুসরণ করে ১৯৪২ সালে বাংলার উপকূল অঞ্চলের সব নৌকা ধ্বংস করা হয়। ১৯৪৩ সালে লীগ গবর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন, উক্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত জন-সাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য নৌকা নির্মাণ করা হবে। সরকারী ব্যয়ে ৪৪৩৫ খানা নৌকা তৈরী হ'ল। কিন্তু সেগুলো হ'ল এমনি চমৎকার যে একটাও জলে ভাসল না। তখন বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে বাংলা সরকারকে সে সব নৌকা জলের দামে বিক্রী ক'রে দিতে হ'ল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, নৌকা সরবরাহকারী ঠিকাদারেরা এমন-ভাবে চুক্তি ক'রে নিয়েছিল যে ক্ষতির জন্য তাদের কার্য্যতঃ দায়ী করা যায় নি'। একথাও মনে রাখতে হ'বে যে মন্ত্রীরা বা তাঁদের পত্নীরা ডিরেক্টার বা অংশীদার ছিলেন, এমন কতকগুলো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকেই কন্ট্রাক্ট্ দেওয়া হয়েছিল। এই সরকারী কেলেঙ্কারীতে চার দিকে হৈ চৈ বেধে যাওয়ায় তদন্তের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা কবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ-দত্ত সরকারী টাকার প্রায় তিন কোটি টাকা জলে যাওয়া সত্ত্বেও একটী লোককেও শাস্তি দেওয়া হয় নি।

খাদ্যশস্যাদির সরবরাহ এবং সরবরাহসংক্রান্ত টাকা-কড়ির হিসাবের ব্যাপারে বাংলা সরকারের বহুবিধ দুর্নীতির কিছু কিছু প্রমাণ সরকারী খরচপত্রের অডিট-রিপোর্ট থেকেই মিলবে। ১৯৪৪ সালের অডিট্-রিপোর্ট বলছে —সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যক্রয়-অফিসার বহু ক্ষেত্রেই মাসিক ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনারেলের কাছে পেশ করতেন না। যে মাল ক্রয় করা হয়েছে বা সরবরাহ করা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত তথ্যমূলক হিসাব রাখা হয় নি। যে সব প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গেছে, তাও যথাযথভাবে রাখা হয় নি এবং সেগুলো দেখে কোন বিশেষ দিনে মজুত মালের পরিমাণও বোঝা যায় নি। প্রতিযোগিতামূলক টেণ্ডার আহ্বান না করাতে খাদ্যশস্যাদি সব ক্ষেত্রেই যে নিম্নতম দামে কেনা হয়েছিল (অর্থাৎ চোরাবাজারীদের যে সুবিধে ক'রে দেওয়া হয় নি'), কাগজপত্র দেখে তা বোঝা যায় না। 'অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত' প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, এবং যে সব প্রতিষ্ঠান যে সব মাল পেয়েছে, তারা দালালকে কোনরূপ মুনাফার সুযোগ না ক'রে দিয়ে নিজেরা ক্রেতাদের মধ্যে তা যথাযথভাবে বণ্টন করেছে কিনা, তা ঠিকমত বোঝা যায় নি।

১৯৪৫ সালের অডিট রিপোর্ট

এই অডিট রিপোর্টে—১৯৪৩-৪৪এর দুর্ভিক্ষ-রিলিফ সম্পর্কিত খরচাদির হিসাব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করা হয়েছে

তার সারাংশ এই : কালেক্টারদের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে খয়রাতী দান ও টেষ্ট-রিলিফের কাজে যে খরচ হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিল মাত্র পেশ করা হয়েছে, ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। গবর্ণমেন্টের অনুমতি মিলবে এটা অনুমান করে নিয়েই কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী ক্ষমতাবলে ট্রেজারী থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। মোট খরচের একটা প্রকাণ্ড অংশেরই বিস্তারিত হিসাব মেলেনি। আগের কয়েক বছরে যেভাবে তোলা অর্থের খানিকটা অংশেরও হিসাব দেখানো হয়নি। মেদিনীপুর ও অন্যান্য বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খয়রাতী দানে ব্যয়িত ৮৪,৩৫,১৫৯৲ টাকার বণ্টন-সার্টিফিকেট পেশ করা হয় নি। কয়েকটী জেলার দুর্ভিক্ষ-রিলিফের হিসাব স্থানীয়ভাবেও পরীক্ষা করা যায় নি,—কারণ টাকা খরচের এক বছর পরও তার হিসাব তৈরী হয় নি। অন্য কয়েকটা জিলারও দুর্ভিক্ষ-রিলিফের হিসাব পরীক্ষায় দেখা গেছে, হাজিরার খাতা, ক্যাস্-বই ও মজুত মালের হিসাব হয় রাখা হয় নি, নয় তো অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণভাবে রাখা হয়েছে। মাইনের খাতায় বহু ক্ষেত্রে প্রাপকের নাম সই বা টিপসই কিছুই নেই, কোথাও বা টাকার অঙ্ক নতুন ক'রে লেখা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ অব্যয়িত বাড়তি টাকা ট্রেজারীতে জমা না দিয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কর্মচারীরা হাতে রেখে দিয়েছেন। কালেক্টারদের আদেশ ছাড়াই বণ্টনকারী অফিসারদের প্রচুর নগদ টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের ব্যয়ের কোন হিসাব দাখিল করা হয় নি।

১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আয়ব্যয়ের মধ্যে যে সব মারাত্মক গোলমাল ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে উক্ত ১৯৪৫ সালের অডিট্-রিপোর্টের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নগদ টাকা ও মজুত মালের যে হিসাব দেখানো হ'ত, তা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসন্তোষ-জনক ও অসম্পূর্ণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে গুদামের মাল ও নগদ টাকাকড়ির হিসাব কচিৎই দেখানো হ'ত। মালের ঘাটতির ব্যাপারে মাল-চলাচলকালে ঘাট্‌তি হয়েছে, না কোন সরকারী কর্মচারীর গাফিলতি সেজন্য দায়ী, বহু ক্ষেত্রেই সে সম্পর্কে কোন তদন্তই করা হয় নি'। অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাণ কোথাও কোথাও শুধু থলিয়ার সংখ্যা দিয়েই স্থির করা হয়েছে, মাল ডেলিভারী নেওয়ার কালে থলিয়াগুলি ওজন না করে দেখেই। কলিকাতা এবং জেলাগুলোর গুদামসমূহ খুব কম ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা হ'ত। তার ফলে মজুত মালের হিসাব যা-ও রাখা হ'ত, তা শুধু নামে মাত্র। কারণ মজুত মালের মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখে ঠিকমত হিসাব রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এরকম ব্যবস্থার ফলে ক্ষতির পুরো বিবরণ তখনই শুধু প্রকাশ পেত, যখন বাজারে খাদ্যশস্যের লেনদেন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যেত এবং সরকারী এজেন্টদের গুদামের মাল নিঃশেষ হয়ে যেত। এরকম ঘাট্‌তি ধরা পড়ে গেলে বহু স্থানে দেখা গিয়েছে, তার পরিমাণ সাংঘাতিক রকমের বড়,—কোথাও শতকরা ২২৫ ভাগ পর্য্যন্ত। তা ছাড়া, মজুত মাল বাংলার একস্থান থেকে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার ব্যাপারে, প্রেরক বা যার কাছে তা পাঠানো হ'ত, তারা কেউই অধিকাংশ সময়ে চালান কালে মালের কোন ক্ষতি হ'ল কিনা এবং হয়ে থাকলে তার স্বরূপ কি তা ঠিক করবার চেষ্টা করেন নি। দু' এক জায়গায় তা ধরবার চেষ্টা করাতে ফল যা জানা গিয়েছে, তা অতি বিস্ময়কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলিকাতা থেকে নৌকা-যোগে প্রহরাধীনে ঢাকা বিভাগের কোন জেলায় যে চাউল ও ধান পাঠানো হয়, তার ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৮ ভাগ থেকে ২৭ ভাগ। এক ক্ষেত্রে ২১০০ মণ ধান পাঠানো হয়, কিন্তু মাত্র ১৫৩১ মণ ২৭ সের গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে। এরকম শত শত স্থানে ঘটেছে তা ছাড়া, এ রকমও ঘটেছে যে, যে শ্রেণীর (quality) জিনিষ পাঠানো হ'ল বলে জানানো হয়েছে, জিনিষ গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলে দেখা গেছে, তা অনেক নিকৃষ্ট রকমের মাল। দোষীকে বের করবার জন্য উক্ত

ক্ষেত্রসমূহের প্রায় কোথাও তদন্তের ব্যবস্থা করা হয় নি।

অব্যবস্থা ও জনসাধারণের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মনোভাবের দরুণ কতো রকমের অপচয়ই না হয়েছে। চাউল করে দেওয়ার জন্য সরকার ধান মিলে পাঠাতেন। মিলে ধান থেকে যে চাউল হয়, সাধারণতঃ তার পরিমাণ হচ্চে শতকরা ৬৫ ভাগ। কিন্তু কয়েকটি জেলায় ভালো সরকারী তদারকের ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় কর্মচারীরা শতকরা ৫৪ থেকে ৫৮ ভাগ চাউলও নেন। এক জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তো শতকরা ৫৪ ভাগ চাউলই গ্রহণ করেন। এরকম আচরণের পেছনে কি রহস্য থাকতে পারে, তা শুধু অনুমেয়। তাছাড়া মিলে ধান ছাঁটাইয়ের ব্যাপারেও মিল-মালিকদের বহু ক্ষেত্রে প্রায় মুনাফার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রেরিত মাল বাবদ রেলওয়েরসিদ দেখালেই মাল-প্রেরকদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হ'ত অথচ মাল গিয়ে পৌছালে বহুক্ষেত্রেই দেখা যেত যে তার পরিমাণ এবং উৎকর্ষ মোটেই রসিদ অনুযায়ী নয়। ১৩৪৩ সালে এজেণ্ট মারফৎ ধান-চাল ডাল প্রভৃতি কেনবার ব্যবস্থা হয়। তাদের মারফৎ যে বাজারদরের চাইতে বেশী দরে হাজার হাজার মণ জিনিষ কেনা হয়েছে এবং ঐ ভাবে বাংলা সরকারের হাজার হাজার টাকা বেশী খরচ হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। তা ছাড়া, গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ধান চাল কেনার ভার নিয়ে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রচুর টাকা আগাম নিয়ে সে টাকার সুযোগে এজেণ্টরা বহু রকমের দুর্নীতির প্যাঁচ খেলেছেন এবং নিজেদের কাজ গুছিয়েছেন। উক্তরূপ বিভিন্ন প্রকারের শত শত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও অপরাধের তদন্ত বড় একটা করা হয়নি এবং দোষীরাও সাজা পায় নি।

আর্থিক ক্রমাবনতি

বাংলার সাধারণ লোক দ্রুত গতিতে দরিদ্র হয়ে পড়ছে। সংখ্যাতত্ত্ববিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মহলানবিশের রিপোর্টে আমরা পাচ্ছি, অপেক্ষাকৃত বেশী অর্থকরী বৃত্তি বা পেশা থেকে অপেক্ষাকৃত কম অর্থকরী বৃত্তি বা পেশা নিতে অবস্থাবিপর্যায়ে বাধ্য হয়েছেন, গত ক'বছরে বহু লোকের ক্ষেত্রেই এরকম ঘটেছে। এক বাংলার গ্রামাঞ্চলেই প্রায় সাত লাখ পরিবারের এরকম অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন আগে নেওয়া হিসাবানুযায়ী এখানে নিঃস্ব-দুর্গতের (destitute) সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮০ হাজার, তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার লোকের ঐ অবস্থা হয়েছে একেবারে সম্প্রতি এবং হঠাৎ। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। বাংলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু তাদের রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নি। সে রিপোর্টে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি ভাবে দ্রুত সর্বনাশের পথে চলেছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থেই নানাভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে,—ওদিকে জনগণ মরতে বসেছে এবং অর্থাভাবের চিরন্তন অজুহাত তুলে শিক্ষা জনস্বাস্থ্য শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগগুলিকে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। আয় বাড়াবার জন্য নূতন করে কর বসাবার আর পথ নেই। সুতরাং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ৬৯ কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তার মধ্যে ২৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে—তার উপরই বাংলা গবর্ণমেণ্টের এখন প্রধান নির্ভর। কিন্তু এই মোটা টাকাটার সাহায্যেও বাংলা যদি সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির পথে নতুন করে যাত্রা সুরু করতে না পারে, তবে এ টাকা ফুরিয়ে গেলে তার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠতে হয়। বাংলার জীবনে এত বড় সুবর্ণ সুযোগ আর কি আসবে? এই ৬৯ কোটি টাকা কি ভাবে খরচ করা হয় তার উপরই বাংলার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর স্বরূপ অনেকাংশে নির্ভর করবে।

কিন্তু আসলে পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের সুসম্বদ্ধ ও যথার্থ কোন পরিকল্পনাই

নেই,—তা সে বাংলার অর্থসচিব তাঁর ১৯৪৬-৪৭এর বাজেট্ বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন। উক্ত বাজেট্ বক্তৃতার পরিশিষ্টে আই-সি-এস্ কর্ম্মচারিদের কল্পিত কতকগুলো টুকরো টুক্‌রো, পরম্পরবিচ্ছিন্ন তথাকথিত উন্নয়ন-পরিকল্পনা আছে,—সেগুলো বাংলার প্রয়োজনানুরূপ কোন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা বিধৃত নয়। বাংলা সরকার এগুলো থেকে দু'একটা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য হাতে নেন, তার পেছনে অনেক টাকা খরচ করেন, তারপর একাধিক ক্ষেত্রেই মধ্যপথে সে প্রচেষ্টাও ছেড়ে দেন,- অর্থাৎ তা ক'রে ইতিমধ্যে ব্যয়িত টাকাও প্রায় সম্পূর্ণই নষ্ট হয়,—এই তো তাঁদের উন্নয়ন কার্য্যের স্বরূপ! পশুপালনব্যবস্থার উন্নয়ন, পুষ্করিণী-খনন ও উন্নতি-সাধন, কৃষি-উন্নয়ন, সিন্‌কোনা-চাষ, পিয়ারডোবায় কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, ইত্যাদি সম্পর্কে বহু তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনারই এই পরিণতি হয়েছে। তা ছাড়া, এই ব্যাপারেও লীগ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি একান্ত সক্রিয়। ঢাকা মেডিকেল স্কুলটাকে কলেজে পরিণত করার জন্য আগেই ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতার ক্যাম্বেল স্কুলটাকে কলেজে পরিণত করার জন্য আগের বছরের বাজেটে এক পয়সাও বরাদ্দ করা হয়নি এবং এবছরের বাজেটে মাত্র ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রেও একই কাহিনী ইস্‌লামিয়া কলেজটাকে মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য আপাততঃ ৪ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ঐ কাজে মোট এককোটী টাকা খরচের প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে! অন্যদিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চ্চার সম্প্রসারণের জন্য যে মোটে ১০ লাখ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার শেষপর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। কাজেই বাধ্য হয়ে সে পরিকল্পনাটাকে বাতিল ক'রে দিতে হয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে যে গৃহাদিনির্ম্মাণ বাংলা সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় একটা বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ওদিক্ দিয়েও কার্য্যতঃ যে কতটা কি হয়েছে, আমরা সবাই দেখছি। তবে এতে করে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী প্রদেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে অসাধু কন্‌ট্র্যাক্টর ও সুবিধাবাদিদের — তাদের দলভুক্ত ও আশ্রিত জনদের প্রচুর কন্‌ট্র্যাক্ট্ যুগিয়ে খুসী রাখবার সুযোগ পেয়েছেন অবশ্য।

আর এক কথা। বাংলা গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃই যেভাবে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে উন্নয়নের জন্য প্রাদেশিক সরকার কিছুই সঞ্চয় করতে পারবেন না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন ৬৯ কোটি টাকা এবং প্রাদেশিক সরকার ৩১ কোটি—এই মোট ১০০ কোটি টাকার মত করে উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করবার যে কথা বাংলার অর্থসচিব বলেছেন, তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ঐ ৩১ কোটি টাকা বাংলার দিতে পারার সম্ভাবনা দেখছিনে। সুতরাং বড় জোর উক্ত ৬৯ কোটি টাকার মত করেই উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করতে হবে, নইলে কাজ কিছুদূর এগিয়েই থেমে যেতে হবে, আর ঐ ৬৯ কোটি টাকাও নষ্ট হবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯৩৭ সালে নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী শাসনব্যবস্থা চালু হ'লে তাতে করে বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই সব চাইতে বেশী অবিচার করা হয়। বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা (অর্থাৎ ১৯৪১ সালের লোক গণনানুযায়ী—যদিও সে হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নানাকারণে এখন প্রশ্ন উঠেছে) মোট জনসংখ্যার ৫৪·৮ ভাগ। ব্যবস্থাপরিষদে তাদের মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৯টি, অর্থাৎ শতকরা ৪৭·৬টি আসন দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের সংখ্যা (ঐ লোকগননানুযায়ীই) মোট লোকসংখ্যার ৪৪·৮ ভাগ; কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছে মাত্র ৮০টি অর্থাৎ শতকরা ৩২টি আসন। ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা শতকরা ·০০৩ ভাগ, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছে ২৫টি আসন। দেখাই যাচ্ছে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে অবিশ্বাস্য রকমের

অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে ২৫টি ইউরোপীয় আসন মিলিত হয়ে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কায়েম করে রেখেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়কে একেবারে ধ্বংস করা। ক্ষমতার সুযোগে লীগ গবর্ণমেণ্ট বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে যে তাদের নিরাপত্তাবোধ একেবারে ঘুচে গেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতির ফলে উক্ত নীতি অধিকতর নিরঙ্কুশ হয়েছে। শিক্ষা ও রিলিফদান সম্পর্কে আরও দু'চারটে তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করলেই আমাদের বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হবে।

টোল হচ্ছে হিন্দুদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তেমনি মক্তব, মাদ্রাসা, ইসলামিক-ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে মুসলমানদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে এদের এভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল :

টোলসমূহ (৮১৭)	—	৪৫৭৪৬৲

(এর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়েছেন মাত্র ৭৪২০৪ আর বাকীটা মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহ থেকে পাওয়া গেছল।)

পক্ষান্তরে,

১।	মাদ্রাসা (৭৬৪)	—	৫৬৬ ৮৮
২।	মোল্লা ও কোরাণ স্কুল	—	৪৭৬৩৲
৩।	মক্তব (২৪৩৮৮)	—	৪৬৪৪৫৲
৪।	ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ	—	৪৯৩৭১৲
৫।	চট্টগ্রাম ইসলামিক ইণ্টার কলেজ	—	অজ্ঞাত
৬।	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলিকাতার ৩টী মুসলিম হাই স্কুল	—	অজ্ঞাত
৭।	সাখাওয়াৎ গার্লস্ স্কুল	—	অজ্ঞাত
			-৭৬৬৭৭২৲
৮।	মাদ্রাসাগুলির জন্য অতিরিক্ত সাহায্য	—	১৮৬৯৩৮৲
		মোট	১৯,৫৩,৭১০০৲

উপরের তালিকার বৈষম্যগুলি এত বেশী করেই চোখে পড়ে যে, আলাদা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অমুসলমানদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ও তাদেরই টাকায় চলছে। এখন সেগুলোকেও সাম্প্রদায়িক আওতায় ফেলে গবর্ণমেণ্টের মরজীপালনে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল-বোর্ডের অধীন। মুসলমানেরা যে সব এলাকায় সংখ্যাগুরু সেখানে সংখ্যালঘুদের পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা নিষিদ্ধ হয়েছে। ফলে সে সব অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মক্তবে পরিণত হয়েছে এবং অমুসলমানদের সেখানে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৪১ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই হিসাব দেওয়া হয়েছিল :

বৎসর	প্রাঃ বিদ্যালয়	ছাত্র	মক্তব	ছাত্র
১৯৩৬ '৩৭	৩৫৪১৮	১১৭৮০৯	৬৫৪৮	২০৩০৮২
৯৩৬ ৩৭ :	৩৫৭৭৮	১৪৭৮৬৮৮	০৫৭৩৯	৯৮১৮১৯

৯৪০ সালেই মক্তবসমূহে হিন্দুছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৭৪৩০৬ (ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মিঃ ফজলুল হক বলেছিলেন)। তারপর ঐ সংখ্যা আরও বেড়েই থাকবে। এখন, এ ব্যাপারটা হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সাধারণ স্বার্থের পক্ষে একান্ত আপত্তিকর না হয়ে পারে না। কারণ এসব মক্তবে শুধু যে কোরাণের নির্দেশ প্রভৃতি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয়, নামাজ, কোরবাণী প্রভৃতি মুসলমান-শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তা ছাড়া, মক্তবসমূহে সাধারণতঃ এমন সব বই পাঠ্য করা হয়ে থাকে, যাতে ইতিহাস ও বাংলাভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে এবং অমুসলমানদের আঘাত লাগতে পারে এমন সব জিনিষ রয়েছে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেই :

(ক) মোহাম্মদ মোবারক আলি প্রণীত 'মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য (১ম ভাগ) : 'পাক কোরাণের ইস্লাম একমাত্র সত্য ধর্ম।... কোরাণ শরীফ পড়িলে সওয়াব হয়, মন পবিত্র থাকে...বাটীতে কোরাণ শরীফ পাঠ করিলে বালামসিতে কাটিয়া যায়।'

(খ) খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক বি-টি প্রণীত 'প্রবন্ধমালা' : "প্রথম লোকমা মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরবারির আঘাতে মেহমানের ছিন্ন মস্তক দস্তরখানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।'

(গ) মৌলবী আব্দুল সাত্তার প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (মক্তবের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ও জুনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ্য): "আওরঙ্গজেব অতিশয় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইস্লাম্ ধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত রাজ্যব্যাপী হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে ও ইস্লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাসাধারণের উন্নতিকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার টেক্স উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র জিজিয়া ও যাকাত এই দুইপ্রকার কর আদায় করিতেন।" ইত্যাদি।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কুক্ষিগত করবার উদ্দেশ্যে লীগ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালে প্রথম কুখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উত্থাপন করেন। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার প্রতিবাদ এত শক্তিশালী হয়েছিল যে ঐ বিলই একাধিক মন্ত্রীসভার পতনের কারণ হয়। 'কায়েমী মেজরিটীর' জোরে শীঘ্রই অনুরূপ একটী বিল পাশ করিয়ে নেবেন বলে লীগ মন্ত্রীসভা দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থসাহায্যের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোবৃত্তির ক্রিয়া সুস্পষ্ট। গত বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে: পৌনঃপুনিক মঞ্জুরীকৃত—৫১৭৩৪৬৲, পৌনঃপুনিক প্রাপ্ত—৫৫০০০০৲, এককালীন মঞ্জুরীকৃত—১২২০০০৲। অন্যদিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন অঞ্চল অনেক বড় হলেও তাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র: পৌনঃপুনিক ২৫০০০৲ এবং এককালীন—৩০১২০০৲। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ব্যবস্থায় সাহায্যের ব্যাপারে লীগ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তির উল্লেখ আগেই করেছি।

সাম্প্রদায়িক কারণে নিয়োগ, পদোন্নতি, উপরের কর্মচারীকে উপেক্ষা ক'রে পদোন্নতি প্রভৃতির সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষাবিভাগেও এত বেশী যে এখানে তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িক-করণের অপচেষ্টা

শিক্ষার ব্যাপারে আর একটা সুদূরপ্রসারী বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্ত দরকার। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থার সব এই ইস্লামিক পদ্ধতি নামে একটা বিকল্প ব্যবস্থা আছে এবং তার পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ শিক্ষাকেও সাম্প্রদায়িককরণে ব্রতী হয়েছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষা এবং (গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী) তাদের জন্য দরকার মত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে সরকার অমুসলমান ছাত্রদের অসুবিধা করে মুসলমান ছাত্রদের জন্যই সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। এ' চারটা তথ্যের উল্লেখ এখানে করছি।

কতগুলো কলেজ—যেমন ইস্লামিয়া কলেজ—শুধু মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শুধু ১৯৩৮-৩৯ সালেই এই একটা কলেজের পেছনে সরকার ১৮৩৭৯৯ টাকা খরচ করেছেন। সরকারপরিচালিত প্রায় সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারপরিচালিত না হ'লেও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বহু প্রতিষ্ঠানে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা কতকগুলো করে আসন সংরক্ষিত আছে। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে শতকরা ৬০টী, চট্টগ্রাম কলেজে শতকরা ৫০টী, এবং অন্য যাবতীয় সরকারী আর্ট কলেজে শতকরা ২৫টী আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই হার শীঘ্রই নাকি শতকরা ৫০এ পরিণত করা হবে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও শতকরা ২৫টী আসন সংরক্ষিত আছে। সরকার-পরিচালিত ৩৫টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪টীতেই শতকরা ৫০টী আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য রক্ষিত, এবং

অন্যান্য স্কুলগুলোতেও কমবেশী পরিমাণে আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এমন কি মুসলমানেরা যে সব জেলাতে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও মুসলমানদের জন্যই আসন সংরক্ষিত।

ছাত্রছাত্রীদের সরকারী বৃত্তি দেওয়া ব্যাপারেও অনুরূপ সাম্প্রদায়িক বণ্টন ব্যবস্থা। মুসলমান ছাত্রাবাস বাবদ বহু টাকা মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু অমুসলমানদের জন্য সরকারী সাহায্যের ছিটে ফোঁটাও বড় একটা জোটে না।

দাঙ্গাদুর্গতদের সাহায্যদানে সাম্প্রদায়িকতা

এ বিষয়েও বহু তথ্য ও ঘটনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালীর আশ্রয়প্রার্থীরা বাঙ্গালী হ'লেও হিন্দু অন্য দিকে বিহারের আশ্রয়প্রার্থীরা অবাঙ্গালী হ'লেও লীগমন্ত্রীদের স্বধর্মাবলম্বী। এই দুই ক্ষেত্রে সরকারী আচরণে তাই তারতম্যও হয়েছে অত্যন্ত বিসদৃশ রকমে। নোয়াখালী সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার দু' চারটে দিক্ হচ্ছে এই। আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব। মাথাপিছু আশ্রয়-প্রার্থীর সপ্তাহে দু'সের ক'রে চা'লের বরাদ্দ—কিন্তু পাওয়া যেত তারও কম,—লবণ এবং মাঝে মাঝে ডাল,—এই শুধু। নোয়াখালী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো গত ১৫ই মার্চ্চ তুলে দেওয়ার কথা হয় এবং কংগ্রেসের পীড়াপীড়িতে ওগুলো আরও অল্প কিছু দিনের জন্য চালু রাখা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয়প্রার্থীদের নোয়াখালী ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রতি দুর্গত পরিবারকে মাত্র ২৫০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় পাইকারী জরিমানা বসানো হয়েছে, কিন্তু নোয়াখালীর দুর্বৃত্তদের ওপর সে রকম কিছু করা হয় নি। টেষ্ট-রিলিফের কাজে ৫০।৬০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫জন মুসলমান। অথচ দুর্গতেরা সবাই হিন্দু। হিন্দুদের, বিশেষতঃ হিন্দু নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। খয়রাতি সাহায্য তো আগেই বন্ধ করা হয়ে গেছে।

অন্য দিকে, বিহারী আশ্রয়প্রার্থিদের বেলায় তাদের সাহায্যের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের অত্যধিক আগ্রহ: বিহার সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলা সরকার কর্ত্তৃক তাদের প্রতিনিধি মিঃ খানকে বিহার পাঠানো। সে ভদ্রলোক গিয়ে বিহার থেকে মুসলমানদের বাংলায় আসতে প্ররোচিত করা ছাড়া আর কিছু করেন নি। বিহার আশ্রয়প্রার্থিদের মাথাপিছু সপ্তাহে খাদ্যবরাদ্দ হচ্ছে: চাউল ২ সের ১০ ছটাক, ডাল, সরিষার তেল লবণ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ দৈনিক তিন আনা। তাদের জন্য দশ হাজার টন খাদ্যশস্য বাঁচাবার জন্য বাংলার অধিবাসিদের র‍্যাশান বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের আটা-ময়দা সরবরাহের জন্য আমাদের আটা-ময়দার সঙ্গে বালি মিশানো হচ্ছে। তাদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলি তুলে দেওয়ার কথা পর্য্যন্ত কখনো ওঠানো হয় নি। বরং তাদের বাংলায় রাখবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ঘাঁটি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের সেখানে জমি দেওয়া হচ্ছে। মিঃ সুরাবর্দ্দী বলেছেন, তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের জন্য ১৯৪৬ ৪৭ সালের পরিবর্দ্ধিত হিসাবে ৫১ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবার প্রবন্ধটার সমাপ্তি করতে চাই। বাংলা সরকারের গত ক'বছরের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, অসাধুতা ও দুর্নীতির ইতিহাস অতি দীর্ঘ। সরবরাহ ও খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা এবং সরকারের সাধারণ ব্যবসানীতি এখানে কার্য্যতঃ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে করে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হয়ে পড়ছে, জনসাধারণের হয়রাণি বেড়ে যাচ্ছে, খাঁটি ব্যবসারীদের উচ্ছেদ ক'রে অসাধু ধনী চোরাকারবারীরা তাদের স্থান দখলের সুযোগ পাচ্ছে, ব্যবসাবাণিজ্যে অগ্রসর অমুসলমানদের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে কৌশলে উৎখাত করা চলছে। ভূমিসংক্রান্ত আইন সংশোধনের যে চেষ্টা সম্প্রতি

সরকার করছেন, আপাতদৃষ্টিতে তা প্রগতিশীল বলে মনে হয়। কিন্তু লীগ গবর্ণমেণ্টের অতীত ও সাম্প্রতিক কার্য-কলাপ বিবেচনায় সন্দেহ দৃঢ় হয়েই আমাদের মনে জাগছে যে, এক্ষেত্রে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পতিত জমিগুলো সরকারের তরফ থেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে সেখানে বিহারী আশ্রয়প্রার্থিদের সব উপনিবেশ স্থাপন করা।

লীগদলের হাতেই বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা রয়েছে। অথচ তারাই গত ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সুরু করেছিল। তার জের আজও মিটছে না, বরং আগুন স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়াচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা বলে আজকের বাংলায় আর কিছু নেই। পরিষদের গত অধিবেশনে বাংলা সরকারের একটা অভিনন্দন প্রস্তাবের যুক্তি দেখান, অথচ সে নোয়াখালি ত্রিপুরায় এত বড় বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল, সেখান থেকে নোয়াখালী-ত্রিপুরা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করেছেন।

পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কলিকাতা তথা বাংলার অন্যত্র যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে ও হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রেও ধরপাকড়, জামীনে মুক্তিদান, পুলিশকর্ম্মচারিদের নিয়োগ, দাঙ্গাদুর্গত-সাহায্যব্যবস্থা, পাইকারী জরিমানা বসানো, হিন্দুদের বাড়ীগুলি (হিন্দু) মালিকদের ফিরে পাওয়া, ১৪৪ ধারা এবং অন্য অনেক বিষয়ে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত এই আধা-সামরিক বাহিনীটাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দেওয়া, এসব ব্যাপারেও লীগ সরকারের বিশেষ বৈষম্যমূলক এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণ আজ সবার কাছেই দিবালোকের মত স্পষ্ট। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে রাজনীতিতে, চিন্তায় কর্ম্মে আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলে বিপুল গৌরবের অধিকারী, বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনেও এতবড় [illegible] প্রচণ্ড দুর্বিপাক আর আসেনি'। সে কি আজ আত্মস্থ হবে না, পূর্ণ ঐক্যের শক্তিতে দুর্জয় হয়ে অন্যায় ও অন্ধকারের দুর্গগুলোকে ভূমিসাৎ করতে পারবে না?

"আমরা বীর নই? হয়তো তাই। তুমিও না, আমিও না। কিন্তু আমরাও বীর হ'তে পারি, যখন বীর আমাদের হ'তেই হবে—তা ছাড়া উপায় আর থাকবে না। এবং তা ছাড়া আর উপায় নেই। দুই মৃত্যুর মধ্যে একটিকে আজ আমাদের বেছে নিতে হবে। হয় ম'রতে হবে কলঙ্কিত এবং শৃঙ্খলিত হ'য়ে, নয় মুক্ত এবং পরিতৃপ্ত হ'য়ে।"

—রোমাঁ রোলাঁ।

জ্যাক ও জিপ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অপূর্ব্ব টেলিগ্রাম পেয়ে মীরা মিনিট খানেকের জন্যে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেল। চোখের কোনে একবিন্দু জল চকচক ক'রে উঠলো। মনে পড়লো স্বর্গীয় বাবার কথা।

মা তাদের অনেক দিনই মারা গেছেন। বাবাকেই ওরা দুই ভাই-বোনে একসঙ্গে বাবা এবং মা ব'লে জানতো। অপূর্ব্ব আজ ফিরেছে আই, সি, এস, হয়ে। বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি আনন্দই না করতেন।

তার পরেই মনে পড়লো তাদের দিল্লীর বাড়ীর কথা। সে বাড়ী জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশীর তত্ত্বাবধানে তালাবদ্ধ প'ড়ে আছে। অপূর্ব মেম সাহেব বিয়ে ক'রেছে এ খবর মীরারা আগেই পেয়েছে। কিন্তু ওরা এসে উঠবে কোথায়? কে জানে বাড়ীর কি শ্রী হয়েছে। সেই কথা ভেবে মীরা আরও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তার একবার দিল্লী যাওয়া দরকার। তার স্বামীর অফিসটা যেমন হতভাগা, তাতে সে যে এ সময় ছুটি পাবে সে ভরসা কম। তবু তাহলে তাকে একলাই যেতে হবে। উপায় কি?

যাওয়া দরকার নানা কারণে। অনেক দিন পরে দাদাকে দেখবে, সে আগ্রহ তো আছেই। তা ছাড়া মারা যাওয়ার সময় বাবা যে সমস্ত দরকারী কাগজ পত্র দিয়ে গেছেন, সে গুলো তাকে হাতে হাতে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

তারপরে জ্যাক।

জ্যাক ছিল অপূর্বর অত্যন্ত আদরের। বিলাতে যাবার সময় এটিকে সে বাপের জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। না তাঁর কাছে, না মীরার কাছে, জ্যাকের অনাদর এবং অযত্ন কখনও হয়নি। এখন তাকে তার আসল মালিকের হাতে সমর্পণ করে দেওয়া উচিত।

সময় আর নেই। সন্ধ্যার সময় স্বামী অফিস থেকে ফিরতেই মীরা সমস্ত কথা জানালে। এবং যখন দেখলে এ সময়ে স্বামীর ছুটি পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব, তখন পরের দিন সে একাই দিল্লী রওনা হ'ল। অপূর্ব পৌঁছুবার অন্তত চার দিন আগে তো যেতে হবে। নইলে ঘর-দোর গোছ-গাছ হবে কি ক'রে? সঙ্গে গেল বিশ্বাসী এবং করিৎকর্মা ভৃত্য বুধিয়া আর জ্যাক।

সঙ্গে নবপরিনীতা মেমসাহেব নিয়ে অপূর্ব নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌঁছালো। মীরা ষ্টেশন থেকে ওদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এল। এইটুকু পথ মোটরে আসতে আসতেই প্যামেলার সঙ্গে মীরার খুব ভাব হয়ে গেল, যেন কত কালের চেনা।

মীরার বেশী বকা অভ্যাস। প্যামেলাকে পেয়ে মনের আনন্দে অনর্গল বকতে লাগলো:

—রাস্তায় তোমাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো? ঢেউএর দোলায় শরীর নাকি খুব খারাপ করে। সে রকম কিছু— কিছু না? খুব বাহাদুর তো! কিন্তু কি সুন্দর তোমার কুকুরটি বৌদি! কি নাম এর? জিপ? ভারী সুন্দর কুকুর! তোমার কুকুরটির কথা মনে আছে দাদা? জ্যাক?

প্রকাণ্ড কুকুর হয়েছে। বাবা মারা যাবার সময় (এইখানে মীরা একটু থামলে, গলা যেন ধরে গেল। একটু কেশে গলাটা ঠিক ক'রে নিলে।) আমার হাতে ওকে দিয়ে গেলেন। অযত্ন যে করিনি দেখলেই বুঝতে পারবে। এনেছি সঙ্গে করে। উনি বললেন, এইবার মালিকের হাতে কুকুরটি দিয়ে এস। বাড়ী গেলেই দেখতে পাবে। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারবে কি না কে জানে। দেখাই যাক চিনতে পারে কি না। কুকুরের প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। কি বল বৌদি? হাঃ হাঃ হাঃ!

মীরার হাসির একটা অদ্ভুত সংক্রমণশক্তি আছে। ওর খুশি এই সুন্দর হাসির মাধ্যমে চারিপাশের সবাইকে খুশি ক'রে তোলে।

ওর হাসিতে প্যামেলা এবং অপূর্ব দুজনেই হেসে উঠলো।

হাসতে হাসতে প্যামেলা বললে, জ্যাকের চিনতে দেরি হবে না দেখো। দেরি হবে অপুরই।

—সত্যি দাদা? পারবে না চিনতে?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে অপূর্ব বললে, কি জানি। দেখিই তো আগে।

প্যামেলা বললে, দেখা-দেখি নেই এর মধ্যে। ভৃত্যেরা কচিৎ ভুল করে। ভুল হয় প্রভুরই। প্রভুরাও যদি ভৃত্যের মতো বিশ্বস্ত হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীর বারো আনা অনর্থ ঘটতোই না।

অপূর্ব এর প্রতিবাদ করলে না।

শুধু বললে, এইবার আমরা এসে গেছি প্যামেলা। নামো। জ্যাকের চিনতে দেরি হ'ল না সত্যই।

ফটকের মধ্যে ওরা ঢুকতেই জ্যাক এক লাফ দিয়ে এসে অপূর্বর দুই পায়ের মধ্যে শোঁকাশুঁকি আরম্ভ করলে। তারপরে তার হাঁটুর উপর দুই থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখখানা তুলে ধরলে। ভাবখানা, কতদিন পরে এলে, আমাকে একটু আদর করবে না?

অপূর্ব দুই হাত বাড়িয়ে আদর করতে যেতেই জ্যাকের দৃষ্টি পড়লো জিপের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে ও যেন থমকে কি রকম হয়ে গেল। ওর চোখে ফুটে উঠলো একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন: ও কে? ও আবার কে?

প্যামেলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল জিপ। জ্যাকের দৃষ্টির বিনিময়ে সে শুধু একটা মৃদু গর্জন করলে, গর্‌ র্‌ র্‌।

প্যামেলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলো: বাঃ। চমৎকার কুকুরটি তো! কি নাম বললে? জ্যাক? জ্যাক! জ্যাক!

ওকে আদর করবার জন্যে প্যামেলা হাত বাড়ালে।

জ্যাক যে খুব খুশি হ'ল তা মনে হ'ল না। কিন্তু এটুকু সে বুঝলে যে এই মহিলা সামান্যা ব্যক্তি নন। ইনি কর্ত্রীস্থানীয়াই কেউ হবেন, এবং এঁকে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।

সুতরাং যথারীতি লেজ নেড়ে এবং প্যামেলার হাতে মুখ ঘ'ষে সে অল্পক্ষণের জন্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রেই অপূর্বর কাছে পুনরায় ফিরে এল।

না এসে উপায়ও ছিল না। কারণ প্যামেলার কাছে যেতেই জিপ আবার একটা মৃদু গর্জন করলে। ভাবটা, খবর্দার, এদিকে আদর কাড়বার চেষ্টা কোরো না।

জ্যাক ভড়কে গেল। কুণ্ঠিতভাবে কুঁই-কুঁই করতে করতে অপূর্বর কাছে ফিরে এল। পরক্ষণেই সমস্ত অপমান ভুলে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগলো। যেন ব'লতে চাইলো, বয়েই গেল! তোর মনিবের কাছে যাবার জন্যে আমার দায় কেঁদেছে! আমার অমন সুন্দর মনিব থাকতে তোর মনিবের কাছে যাবই বা কি জন্যে?

এবং মনিবের পিছু পিছু লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চ'লে গেল।

চমৎকার বলিষ্ঠ কুকুর!

ওর লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে ওঠার ভঙ্গির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে প্যামেলা বললে, চমৎকার কুকুর তোমার অপু! বুল-টেরিয়ার, না?

পিছন ফিরে জ্যাকের দিকে সহাস্যে চেয়ে অপূর্ব ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

তারপর বললে, ও যে এতদিন পরে আমাকে চিনতে পারবে ভাবতেই পারিনি। কী আশ্চর্য্য ওদের স্মরণশক্তি!

গম্ভীরভাবে প্যামেলা বললে, বললাম তো তোমাকে, ওরা প্রভুকে সহজে ভোলে না। আমার এই জিপ, একবার....

—এটি কী কুকুর ভাই?—মীরা জিজ্ঞাসা করলে। বড় বড় লোম-ওয়ালা এই কুকুরটিকে তার ভারী অদ্ভুত লাগছিলো। ওর চোখে-মুখে সব দেহে বড় বড় লোম ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ওর চলা-ফেরায় কেমন একটা অভিজাত ঔদাসীন্য। চোখে যোগীসুলভ বিষয়-বিতৃষ্ণা।

—এটি কী কুকুর ভাই?—জিপকে কোলের উপর তুলে নিয়ে মীরা জিজ্ঞাসা করলে।

—পমিনেরিয়ান!—প্যামেলা সংক্ষেপে বললে।

অপূর্ব পোষ্টেড হ'ল রাজসাহীতে। দিল্লীর বাড়ীখানির সুবন্দোবস্ত ক'রে দিন কয়েক পরে ওরা এল ক'লকাতায়। সেখানে দিন দুই মীরার বাড়ীতে হৈ চৈ ক'রে চ'লে গেল রাজসাহী।

চারটি প্রাণী, অপূর্ব আর প্যামেল, জ্যাক আর জিপ।

এ ক'দিন মীরা ছিল। সুতরাং জ্যাক কোন অসুবিধা বোধ করেনি। রাজসাহী গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সে অসুবিধা অনুভব করতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়া নয়, অন্য রকমের একটা অনির্বচনীয় অসুবিধা।

অপূর্ব তাকে আদর-যত্ন যথেষ্টই করে। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই সে থাকে অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিকেলে খেলা-ধূলা আছে, সন্ধ্যায় ক্লাব। এর উপর আছে স্বয়ং প্যামেলা। সুতরাং জ্যাক ওকে কতটুকু সময়ই বা পায়!

প্যামেলা, সেও লোক খারাপ নয়, দয়া-মায়া আছে। খাওয়া-শোয়া নিয়েও জিপের সঙ্গে কোনো তারতম্য করে না। কিন্তু তবু সে জিপেরই মনিব, জ্যাকের নয়। ওর উপর জ্যাকের তো সত্যসত্য কোনো জোর নেই।

এই 'জোর'টাই হ'ল আসল কথা।

এ বাড়ী যেমন জিপের মনিবের, তেমনি জ্যাকেরও। বরং জ্যাকের মনিবেরই বেশি। অপূর্বই হ'ল আসল মনিব। সে-ই খাটে-খোটে, রোজগার ক'রে আনে, তবে প্যামেলার নবাবি চলে। কিন্তু এ সবই হ'ল আইনের কথা। আসলে জিপের মনিবের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। এবং সেইটে উপলব্ধি ক'রে একদিকে যেমন জিপের গুমোর বেশি, অন্যদিকে তেমনি জ্যাকও কিছুতে জোর পায় না।

জ্যাক যে খুব একজেদী, দাম্ভিক, তাও নয়। মনে মনে সে জিপের প্রাধান্য স্বীকার করে। প্রকাশ্যেও মাঝে মাঝে জিপকে তোয়াজ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু জিপ যেন কী রকম! জ্যাককে সে 'এক দেশের' ব'লে স্বীকারই করে না। জ্যাক যদি কখনও ওর কাছে ভাব করতে আসে, জিপ হয় তাকে চোখ পাকিয়ে গর্জন ক'রে ধমকে দেয়, নয়তো কেঁচকে প্যামেলার কাছে পালিয়ে যায়।

জ্যাক বোকার মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে শোবার জায়গাটিতে গিয়ে দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢেকে ক্ষুণ্নচিত্তে শুয়ে পড়ে।

তা ছাড়া কীই বা করতে পারে সে!

হাজার হোক, জিপ মেমসাহেবের কুকুর।

জ্যাকের মনে সুখ নেই।

অপূর্ব একদিন জিজ্ঞাসা করলে প্যামেলাকে, জ্যাক রোগা হয়ে যাচ্ছে যেন!

প্যামেলাও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে চাইলে। বললে, কি জানি!

—খাচ্ছে?

—খাচ্ছে বই কি!

—তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই। অপূর্ব চা খেতে-খেতে বললে, উনার টেবিলটা আজ সকালে পৌঁছুচ্ছে খবর পেলাম। দাশরাণী পাঠিয়েছি, একটু পরেই এসে যাবে বোধ হয়।

প্যামেলা খুশি হয়ে বললে, তাই নাকি ?

তারপরে কোথায় টেবিলটা বসানো যায় তাই নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে রইল, যতক্ষণ না হাঁক ডাক ক'রে সেটা এসে পৌঁছুলো। জ্যাকের সম্বন্ধে অপূর্বর মনে উদ্বেগের লেশমাত্রও রইলো না।

বেচারা জ্যাক।

ওই যে বললাম, খাওয়া-শোওয়ার কোনো অযত্ন জ্যাকের নেই, কিন্তু এবাড়ীতে তার জোরটাই গেছে ক'মে। এ বাড়ীতে সে যেন অতিথি মাত্র। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, ক্লান্ত বোধ করলে শুয়ে থাকে।

মীরা এল ক'দিনের জন্যে বেড়াতে।

বললে, জ্যাকের শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন দাদা ?

—কি জানি ভাই। অথচ যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না।

জ্যাক মীরাকে দেখে খুশি হ'ল। তার কাছে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। ভাবটা, আমার অবস্থাটা দেখ দিদিমণি,—কি ছিলাম, কি হয়েছি।

ওর গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, শরীর নয়, স্ফূর্তিটা যেন ক'মে গেছে। এ জায়গাটা বোধ হয় ওর ভালো লাগছে না। ওকে আমি নিয়ে যাই, কি বল ? যাবি জ্যাক, যাবি ?

জ্যাক কি বুঝলো জানি না, কিন্তু মীরার আদরে গ'লে গিয়ে ভউ ভউ ক'রে শব্দ ক'রে উঠলো। তার পরিপূর্ণ কণ্ঠের এই ডাকটা স্ফূর্তির ডাক। এবাড়ীতে এই প্রথম সে এমনি শব্দ ক'রে ডাকলে।

সে আওয়াজে অপূর্ব খুশি হ'ল। পরম আদরে জ্যাককে নিজের দুই উরুর মধ্যে চেপে ধ'রে, তার মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে বললে, নিয়ে যাবি কি রে ? তাহলে আমি থাকব কি ক'রে ?

প্যামেলা একপাশে ব'সে সেলাই করছিল। বললে, তাই নিয়ে যাও বরং। আমি হয়তো ওর ঠিক যত্ন করতে পারছি না।

মীরা ক্ষুন্নকণ্ঠে বললে, সে কথা তো আমি বলিনি বৌদি।

অপূর্ব তাড়াতাড়ি বললে, সে কথা তো বলেনি প্যামেলা। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কি থাকতে পারে ?

—অভিযোগটা তবে কার বিরুদ্ধে ?

—কারও বিরুদ্ধে নয় বৌদি, তোমার বিরুদ্ধে তো নয়ই। জ্যাকের শরীর খারাপ হয়েছে। হয়তো জায়গাটা ওর ভালো লাগছে না। তাই ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। এর মধ্যে দোষের কি আছে ?

প্যামেলা বললে, বেশ তো, নিয়ে যাও না।

—যাবই তো।—মীরা জেদের সঙ্গে বললে,—আমি ওকে মানুষ ক'রেছি। আমি যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই, কে বাধা দিতে পারে ?

অপূর্ব হাসতে হাসতে বললে, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না তো মীরা। ইচ্ছে করলে তুই নিয়ে যেতে পারিসই তো।

প্যামেলা আর একটি কথাও বললে না। নিঃশব্দে সেলাই করতে লাগলো।

কথাটার মধ্যে রাগারাগি কিছু নেই। কুকুরের কেন, কুকুরের মালিকেরও শরীর নানাকারণে খারাপ হতে পারে, যত্ন সত্ত্বেও। তার জন্যে কারও কুণ্ঠিত, ক্ষুব্ধ অথবা ক্রুদ্ধ হবার কিছু নেই।

অথচ প্যামেলা ক্রুদ্ধ হ'ল কেন ?

কে জানে কেন। কিন্তু এই ক্রোধ মীরার ভালো লাগলো না। তার মনে সন্দেহ দেখা দিল। স্থির করলে, জ্যাককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। তার কেমন মনে হ'ল, ওকে এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

অথচ নিয়ে যেতেও পারলে না।

যে ক'দিন মীরা এখানে রইলো জ্যাক সর্বক্ষণ ওর পায়ে-পায়ে ঘুরলো, ওর গা ঘেঁসে বসলো আর কত রকমে

যে ওর আদর কাড়লো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যেই বুঝলো মীরা ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, অমনি কেমন আড়ো আড়ো ভাব দেখা দিল।

শেষ মুহূর্ত্তে যখন গলায় চেন বেঁধে মীরা ওকে নিয়ে যাবার জন্যে টানতে লাগলো, তখন ও একেবারেই বেঁকে দাঁড়ালো কিছুতেই যাবে না।

প্যামেলার মুখের মেঘ কেটে গিয়ে যেন এক ঝলক হাসির রোদ খেলে গেল। অপূর্ব হেসে ফেললে। রাগ করতে গিয়ে মীরাও হেসে ফেললে। জ্যাকের কান ম'লে দিয়ে বললে, নিমকহারাম কোথাকার।

অপূর্বকে ছেড়ে যেতে জ্যাক চায় না। আবার মীরাও এইখানে থাক, এই তার ইচ্ছা। তাহ'লে এ বাড়ীতে সে তার স্বাভাবিক জোর পায়। কিন্তু তাকে জোর পাওয়াবার জন্য মীরা যে চিরকাল এখান থেকে যেতে পারে না, সেটা সে বোঝে না।

সুতরাং মীরা চ'লে যেতে সে আবার মুষড়ে পড়লো। সমস্ত দিন তার বিছানায় নিঃঝুম হয়ে শুয়ে রইলো।

অপূর্ব বললে, দেখছ, মীরা চ'লে যেতে জ্যাক কি রকম দ'মে গেছে!

প্যামেলা উত্তর দিলে, কিন্তু এতই যদি টান তবে ও গেলই না বা কেন তার সঙ্গে?

—কে জানে।

প্যামেলা তিক্ত কণ্ঠে বললে, আমি বলছি তোমার এই জ্যাক সহজ কুকুর নয়। ও মাঝে-মাঝে এমন ক'রে আমার দিকে চায় যে ভয় করে।

অপূর্ব হা হা ক'রে হেসে বললে, না, না। জ্যাক বড় ভালো কুকুর।

—ভালো কুকুর! আমি কুকুর চিনিনে? ওর পেটে পেটে বহু দুর্বুদ্ধি খেলছে, একদিন টের পাবে।

অপূর্ব হাসতে হাসতে জ্যাকের মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। ওদের কথা জ্যাক বুঝতে পারলে কি না কে জানে, কিন্তু অপূর্বর অত আদরেও ও কি রকম অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো।

সে রাত্রিও জ্যাকের খুব মন-খারাপের মধ্যেই কাটলো। পরদিন সকালে শান্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। বিকেলে মনকে বুঝিয়ে ফেললে:

সত্যি তো, জিপ হল মেমসাহেবের কুকুর। জ্যাকের স্থান তার নীচে হ'তে বাধ্য। অপূর্বকে ছেড়ে যখন সে যেতে পারবে না এবং এই বাড়ীতে থাকতেই তাকে হবে, তখন জিপের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়াই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ। নইলে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হ'তে পারে, এবং দেহে মনে কষ্ট পেতে হবে তাকেই।

বিকেলে জিপ বাগানে একটা প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করছিল। জ্যাক স্থির করলে এ অবসরে জিপকে একটু তোয়াজ ক'রে আসা যাক।

বাগানের দিকের বারান্দায় প্যামেলা ব'সে ব'সে একখানা নভেল পড়ছিল।

জ্যাক অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিপের দিকে অগ্রসর হল। তার ইচ্ছা করছিল ... জিপের সঙ্গে ... প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করার খেলায় যোগ দেয়। এই ভেবে যেই ও জিপের কাছে যাবে, জিপ সেই সময়েই অন্যমনস্কভাবে ছুটে এসে জ্যাকের গায়ে পড়লো।

মীরা যে ক'দিন এখানে ছিল, জ্যাকের যেন পাঁচটা পা গজিয়েছিল। দেমাকে যেন সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। সে-রাগ জিপের ছিল। এখন মীরা নেই, জ্যাক অসহায়। জ্যাকের গায়ে গিয়ে পড়বামাত্র জিপের সেই রাগ যেন বোমার মতো ছিটকে পড়লো।

চক্ষের পলকে সে জ্যাকের মুণ্ডুটাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধ'রে ছিটকে ফেলে দিলে। এবং তৎক্ষণাৎ এক ছুটে গিয়ে প্যামেলার দুই পায়ের ফাঁকে ব'সে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

আক্রমণের আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে জ্যাক প্রথমেই চিৎকার ক'রে উঠলো, কিন্তু তখনই চুপ ক'রে গেল। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

প্যামেলা বইতে তন্ময় হয়ে ছিল। জ্যাকের আর্তনাদ সে শুনতে পেলে না। জিপ যে ভালোমানুষের মতো তার পায়ের কাছে গিয়ে বসেছে তা৺ টের পেলে না। সে যেমন নিবিষ্টচিত্তে বই পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগলো।

এমন সময় অপূর্ব ফিরলো আফিস থেকে।

প্যামেলা বইটা মুড়ে তার দিকে চেয়ে হাসলে। চাকর এসে অপূর্বর জুতো খুলতে লাগলো।

সাড়া পেয়ে জ্যাক৺ ধীরে ধীরে এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালো। তার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। তখনও রক্ত ভালো করে বন্ধ হয়নি।

তার দিকে চেয়ে অপূর্ব চমকে লাফিয়ে উঠলো।

—এ কি হয়েছে জ্যাকের?

চাকরটা ব্যাপারটা দেখেছিলো। বললে, জিপ কামড়ে দিয়েছে।

অপূর্ব এবং প্যামেলা দু'জনেই সমস্বরে বললে, জিপ! কী ভয়ানক!

জিপ ভালোমানুষের মতো যেখানে বসেছিল, সেইখানেই ব'সে রইল। তার মুখ দেখে কে বলবে, কয়েক মিনিট আগে সে-ই এত বড় কাণ্ড করেছে!

শান্ত গম্ভীরভাবে জ্যাক অপূর্বর কাছে এসে দাঁড়ালো। থমথম করছে তার মুখ এবং চোখ। আহা রে!

অপূর্ব এবং প্যামেলা দু'জনেই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তখনই এল গরম জল, ফর্সা ন্যাকড়া। অপূর্ব পোশাক ছাড়বারও ফুরসৎ পেলে না। তখনই ওরা দুজনে মিলে জ্যাকের ক্ষত ধুয়ে দিতে লাগলো।

জ্যাকের বাইরের ক্ষত শুকোতে দেরী হ'ল না। কিন্তু মনের ক্ষত সহজে শুকোতে চাইলো না। অপূর্ব কিংবা প্যামেলা কেউ যে এর মধ্যে জিপকে কঠিন রকম তিরস্কার করলে না, এটা জ্যাকের বুকে লাগলো।

তার ফল হ'ল এই যে, যতবার সে জিপকে দেখে ততবারই তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট গর গর শব্দ ওঠে।

প্যামেলা কিংবা অপূর্ব কেউ এটা লক্ষ্য করতে পারে না। কিন্তু জিপ পারে। সে সর্বসময় প্যামেলার কাছে কাছে থাকে। পারৎপক্ষে তার সঙ্গ ছাড়ে না।

প্যামেলা এবং অপূর্ব দু'দিন পরেই ব্যাপারটা ভুলে গেল। সামান্য দুটো কুকুরের ব্যাপার মনে রাখবার মতোও নয়। কিন্তু জ্যাক ভোলেনি এবং তার চোখের দিকে চেয়ে জিপ ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না।

দেখতে দেখতে জ্যাকের কি রকম যেন হ'ল। সে খেতে পারে না, শুতে পারে না, কেবল ছটফট ক'রে বেড়ায়। অপূর্বর সাড়া পেলে আগের মতো কাছে এসে দাঁড়ায়, লেজ নাড়ে, আদর করলে আনন্দে চোখ বন্ধ করে। কিন্তু সমস্ত সময় তার বুকের ভিতর কি যেন একটা কাঁটার মতো খচখচ ক'রে বিঁধতে থাকে। কিছুতেই সে স্বস্তি পায় না। জিপকে দেখলেই তার চোখে যেন একটা পিচেল শয়তানী বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে যায়।

আরও দিন কয়েক এমনি গেল।

তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো:

প্যামেলা অন্য দিনের মতোই বাগানের দিকে ঘেরা বারান্দায় ব'সে ব'সে বই পড়ছিলো। জিপ তার পায়ের কাছেই অন্য দিনের মতো নিঃশব্দে ব'সে ছিল।

তখন বিকেল তিনটে।

সামনের বাতাবি লেবুগাছ থেকে দুটো শালিক কিচির মিচির ঝগড়া করতে করতে ঝুপ করে এসে বাগানে পড়লো। স্বভাববশে জিপ ছুটে সেইখানে গিয়ে পড়লো।

শালিক দুটো উড়ে গেল। কিন্তু কোথায় ছিল জ্যাক, এই সুযোগ সে ছাড়লো না। বাঘের মতো লাফ দিয়ে এসে পড়লো জিপের উপর।

তারপরে—

সে কী ধ্বস্তাধ্বস্তি!

জিপের আর্তনাদে বই ফেলে ছুটে এলো প্যামেলা। ছুটে এলো যত চাকর-বাকর, বেয়ারা-বাবুর্চি লাঠি হাতে। কিন্তু কার সাধ্য জ্যাকের কবল থেকে জিপকে ছাড়ায়। লাঠির পর লাঠি পড়ে প্রচণ্ড বেগে জ্যাকের মুখে, মাথায়, পিঠে। তবু জ্যাক ছাড়ে না জিপকে। বাগানময় তাকে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।

অবশেষে যখন ছাড়লো তখন জিপ মুমূর্ষু এবং জ্যাকও কাবু হয়ে পড়েছে মারের চোটে।

প্যামেলা কাঁদতে কাঁদতে জিপকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল ঘরে। ধুঁকতে ধুঁকতে জ্যাকও গেল তার শোবার জায়গায়।

একটু পরেই এলো অপূর্ব।

নিচের ঘর তখন চাকর বাকরের ছুটোছুটিতে ডাক্তারের আবির্ভাবে এবং প্যামেলার ফোঁস ফোঁস শব্দে সরগরম।

—কি হ'ল? কি হ'ল প্যামেলা?—অপূর্ব ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

কিন্তু প্যামেলার তখন উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। একটা বেতের চেয়ারে ব'সে সে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরেই পরীক্ষা করছিলেন। এখন মুখ তুলে বললেন, It is dead. মরে গেছে।

অপূর্বর সব গোলমাল লাগছে।

—কে মারলে? কি করে ম'রলো?

চাকরটা বললে, জ্যাক মেরে ফেলেছে ওকে।

—জ্যাক। কোথায় জ্যাক।

অপূর্বর মাথায় খুন চ'ড়ে গেল। চাবুকটা নিয়ে সে ভিতরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে

কিন্তু তাকে আর যেতে হ'ল না।

দেখলে, জ্যাক আসছে টলতে টলতে তারও সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। কপালের কাছ থেকে একটা রক্তের ধারা চোখের কোণ বেয়ে নাকের কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

বোধ করি ক্লান্তির জন্যেই দরজার গায়ে এক সেকেণ্ডের জন্যে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। অপূর্বর দিকে একবার চোখ মেলে চাইলে। সে চোখে বিদ্বেষ নেই হিংসা নেই, কিছু নেই। তারপর কোনো দিকে না চেয়েই টলতে টলতে আবার এগুলো: দু'পা আবার দু'পা আবার...

তারপরে জ্যাকের দেহ অপূর্বর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো।

হাতের চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অপূর্ব একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে জ্যাকের আড়ষ্ট, অবশ মাথাটা কোলে তুলে নিলে। তখনও বোধ করি একটু জ্ঞান ছিল জ্যাকের; অপূর্বর দিকে একবার সে চোখ মেলে চাইলে। এক ফোঁটা জল সেই ঘোলাটে চোখ থেকে বেরিয়ে এসে রক্তের ধারার সঙ্গে মিশলো।

তারপরেই শেষবারের মতো জ্যাক চোখ বন্ধ করলে।

ভারতীয় শিল্পের নবযুগ

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। মহাযুদ্ধের সময় এদেশে বিদেশী পণ্য আমদানী একরকম বন্ধ ছিল, অতি সাধারণ ভোগ্যপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষের পক্ষে এই আমদানী বন্ধ কি মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে। এই সময়কার প্রচণ্ড অভাববোধের ভিতর দিয়ে ভারতবাসীর মনে প্রবল শিল্পচেতনার সঞ্চার হয় এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অস্বীকার করতে না পেরে ভারতসরকার এদেশের শিল্প প্রগতি সম্বন্ধে তাঁদের চিরকালীন উদাসীনতা কিছুটা পরিত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি তৈরী হয় না। যন্ত্রপাতির অভাবে শিল্পপ্রসার অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের মধ্যে শিল্পোৎসাহ বা মূলধনের অনটন না থাকলেও কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি মেলে নি বলে ভারতবর্ষ শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। তবে এরই মধ্যে যতটুকু পারা গিয়েছিল, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন শিল্পের প্রসার করতে চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নি। সিগারেট, ব্লিচিং পাউডার, সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ঔষধাদি নানা রাসায়নিক পণ্য, বৈদ্যুতিক ও সমরসংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, লণ্ঠন, চকোলেট ও জমানো দুধ, প্লাইউড, ববিন, এ্যালুমিনিয়াম, কাচ, প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের নূতন নূতন কারখানা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি না পাওয়া গেলেও চাহিদার চাপে পুরাতন ভারতীয় শিল্পাগারগুলির কাজকর্ম অনেক বেড়ে যায়। লোহ ও ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল, কাগজের কল, পাট কল প্রভৃতিতে এই সময় একরকম দিনরাত কাজ হয়েছে। শুধু কারখানার কাজ বাড়িয়ে যুদ্ধের মধ্যে পণ্য উৎপাদন কি ভাবে বাড়ানো হয়েছে ভারতের কাগজ শিল্প তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতে কাগজের কলের সংখ্যা ১৭। এই ১৭টি কলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯,৫০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়, [illegible] খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে [illegible]৩,০০০ টনের বেশী হয়েছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৩৮০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হত আর ইস্পাতের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন হত [illegible] ৭৭ ০০০ টন ইস্পাত, যুদ্ধের মধ্যে উভয়প্রকার পণ্যের উৎপাদনই আশ্চর্যরকম বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগেই কলে তৈয়ারী কাপড়ের পরিমাণ ৪৭০ কোটি গজ এবং উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ [illegible]১,১৫,[illegible]০০ টন দাঁড়ায়। এই সময় সমগ্রভাবে ভারতের কুটিরশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। এর উপর যুদ্ধের মধ্যে সব জড়িয়ে ভারতে আগের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ শিল্প প্রসার হয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এই শতকরা ৩০ ভাগের মত শিল্প প্রসার সহজ কথা নয় সত্য তবে এজন্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবারও কিছু নেই। প্রথমতঃ ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় এই শিল্প প্রসার

একান্ত নগণ্য। মুদ্রাস্ফীতি বা যুদ্ধকালীন সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সামান্য একটু বেড়েছে, প্রচণ্ড পণ্যাভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এখনও ভারতীয় শিল্পের বর্দ্ধিত উৎপাদনে ভারতবাসীর চাহিদা একেবারেই মিটছে না। যুদ্ধ শেষ হবার পর দু বৎসর অতীত হলেও এখনও বিদেশ থেকে যথেষ্ট পণ্য আমদানী হচ্ছে না বলেই ভারতীয় শিল্পের এই দৈন্য এতটা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় প্রসারিত শিল্পাদির দ্বিতীয় সমস্যা যন্ত্রপাতির অভাব। আগেই বলা হয়েছে চাহিদার চাপে যুদ্ধের ছয়েক বৎসর ধরে ভারতীয় কলকারখানায় একরকম দিনরাত কাজ হয়েছে, এইভাবে অত্যধিক কাজের চাপে শিল্পাগারগুলির যন্ত্রপাতি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুব বেশী। ভারতে এখনো যন্ত্রাদি উৎপাদনের যথেষ্ট সংখ্যক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা এখনও যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রায় সব দেশেই বজায় আছে বলে বিদেশ থেকে ভারতে দরকারমত যন্ত্রপাতি আমদানী উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ভারতে যেটুকু শিল্পপ্রসার হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর শিল্পপুনর্গঠন পরিকল্পনায় এদেশে বিমান, মোটরগাড়ী, জাহাজ, রেলইঞ্জিন, ইত্যাদি বহু জিনিষ তৈয়ারী করবার জন্য অনেকগুলি বড় বড় কারখানা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে, এছাড়া প্লাষ্টিক, সুরাসার, সংবাদপত্র ছাপার কাগজ (Newsprint) থেকে আরম্ভ করে কৃত্রিম রেশম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করবার চেষ্টা চলছে। যে সব শিল্প ইতিমধ্যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি প্রসারিত করার প্রস্তাবও পুনর্গঠন পরিকল্পনায় আছে। এত কলকারখানা চালু করতে হলে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আবশ্যক। এখন বিদেশ থেকে যে সামান্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী হচ্ছে তা দিয়ে চালু কারখানাগুলির ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সংস্কারই সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র যে আমদানী খুব বেশী বাড়বে অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। সুতরাং ভারতীয় শিল্পের যেটুকু উন্নতি হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও যেটুকু উন্নতি হবার আশা রয়েছে, এখনকার বিশৃঙ্খল অবস্থা একটু শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তা নিয়ে হৈ চৈ করা নিরর্থক।

ভারতের শাসনভার এতকাল বিদেশী আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছিল বলে এদেশের আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণে কোনকালেই ভারতসরকারের আগ্রহ দেখা যায় নি, বরং পারতপক্ষে তাঁরা বরাবর চেষ্টা করেছেন যাতে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটতে না পারে। ভারতবাসীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আপনা থেকেই হবে এবং শিক্ষিত ও স্বচ্ছল ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলে কোন বিদেশী জাতির পক্ষেই আর ভারতে শাসন সম্ভব হবে না,—এই ছিল ভারতসরকারের ধারণা। ভারতবাসীর বহু ত্যাগস্বীকারের ভিতর দিয়ে আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভারতীয় জননায়কদের দ্বারা গঠিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের হাতে এখন ভারতের শাসনভার এসেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, এই নবগঠিত সরকার ভারতের আর্থিক অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা না করে পারেন না। যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভারতের আর্থ-নৈতিক বনিয়াদ বিপন্ন হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ইতিমধ্যে এদেশের আর্থিক পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়ে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। গত ৫ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যসচিবদের এক সম্মেলনে আহ্বান করে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী খাদ্যপরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন। এখন ভারতবর্ষে যেভাবে লোক-

সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হিসাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারতের বার্ষিক খাদ্যঘাটতি হবে ৭০ লক্ষ টন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে এদেশে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘাটতি পূরণের মত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে কৃষির উন্নতির জন্য যে খরচ হবে, খাদ্যসদস্যের পরিকল্পনা অনুসারে তার শতকরা ২৫ ভাগ হিসাবে দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার এবং বাকী শতকরা ৫০ ভাগ কৃষক দেবে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ বৎসরে ৫০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করবেন। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্যও ভারতসরকার এখন নানাভাবে সক্রিয় আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ভারতের উপকূল বাণিজ্য পরিচালনায় এখন ভারতীয় জাহাজ শতকরা মাত্র ২৫ ভাগের মত অংশগ্রহণ করে, এই দৈন্য দূর করতে ভারতসরকার এদেশে জাহাজশিল্প সম্প্রসারণ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উদ্বৃত্ত দেশ থেকে জাহাজ কিনতে চেষ্টা করছেন। ভারতের কাঁচা মাল যাতে আগের মত অজস্র পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী না হয়ে ভারতীয় শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে, সেজন্যও ভারতসরকার এখন আগ্রহান্বিত। শিল্প-বিপ্লবের এই প্রথম অবস্থায় এদেশের শিশুশিল্পগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ভারতসরকার সংরক্ষণ সুবিধা বা অর্থসাহায্য দিয়ে এই শ্রেণীর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি তাঁরা বাঙ্গালোরের 'হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশন' নামক বিমান নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বাবদ ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জন্য অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। যে সব ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ-সুবিধা লাভের প্রয়োজন আছে, তাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ড এখন বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন। ইতিমধ্যেই বোর্ড ১৪টি আবেদনকারী শিল্প সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তাঁদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারতসরকার সাইকেল, সেলাইয়ের কল, স্ক্রু, সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি কতকগুলি দরকারী জিনিষ উৎপাদনকারী নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করেছেন। বোর্ড এ্যালুমিনিয়াম শিল্পকেও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেছিলেন, অবশ্য এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য ভারতসরকার একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেছেন। ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের পরিকল্পনার ব্যয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সাহায্য বাবদ পাঁচ বৎসরে ১,০০০ কোটি টাকা খরচ করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। পুনর্গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার জন্য তাঁরা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক পরামর্শদাতা বোর্ড (Advisory Planning Board) নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি এই বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে ভারতে কোন কোন শিল্পের প্রসারের সুযোগ আছে এবং কোনগুলির উপর কিভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার বলবৎ থাকা দরকার সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে কাজ হলে এদেশে বহু প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হবে এবং ভারতবর্ষ প্রথম শ্রেণীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠবে। ভারত সরকার অতঃপর ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা প্রভৃতি সুযোগ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে কার্পণ্য করবেন না, একথা অন্তর্বর্ত্তী সরকারের দায়িত্বশীল সদস্যবৃন্দ বারবার ঘোষণা করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ের এক সম্মেলনে বাণিজ্যসদস্য মিঃ আই, আই, চুন্দ্রীগড়কে ভারতসরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চুন্দ্রীগড় যা বলেন, ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ভারতসরকারের চিরকালীন উদাসীনতায় মনক্ষুন্ন সকলেই তাতে আশ্বস্ত হবেন। মিঃ চুন্দ্রীগড় ভারতীয় শিল্প-সংরক্ষণে ভারত-

সরকারের আগ্রহ ঘোষণা করে উপসংহারে বলেছেন, "পশ্চাৎপদ প্রত্যেক দেশেরই দেশীয় শিশুশিল্পগুলিকে এমনভাবে রক্ষা করা উচিত যাতে এই সব শিল্প শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করে নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।"*

ভারতে শিল্পপ্রসার করতে হলে যন্ত্রপাতির দরকার এবং উপস্থিত সেই সব যন্ত্র আনতে হবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে। এই যন্ত্রাদির দাম হিসাবে ভারতবর্ষকে অবশ্যই প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। অর্থ বলতে এখানে নোট বা টাকা বুঝলে চলবে না, সোনা বা যন্ত্র সরবরাহকারী দেশে প্রেরিতব্য ভারতীয় পণ্যের দাম বুঝতে হবে। যুদ্ধের জন্য গরীব দেশ ভারতবর্ষ আরও গরীব হয়ে পড়েছে, সোনা তার হাতে নেই বললেই চলে। আগের মত কাঁচা মাল রপ্তানী করে অনুকূল বাণিজ্যিক গতি সৃষ্টি করা এখন আর ভারতের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। এক্ষেত্রে শিল্প সম্প্রসারণের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হলে সেই সব যন্ত্রের মূল্য সংগ্রহ করা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যই একটা বড় রকমের সমস্যা। তবে ব্রিটেনের কাছে ভারতের যে ১,৮০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা রয়েছে, সেগুলো ফেরৎ পেলে উপস্থিত এই সমস্যার সমাধান হয়। যুদ্ধের মধ্যে ভারতবাসীর চরম স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে এই ষ্টার্লিং পাওনা জমে উঠেছে, এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের প্রয়োজনের সময় পাওনা ষ্টার্লিংগুলি আদায় হয়ে যাওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে অবিলম্বে ঋণ পরিশোধের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ একদল লোক এবং একশ্রেণীর ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভারতের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেবার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন। আশার কথা, অন্তর্বর্তী সরকার ষ্টার্লিং পাওনা যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সরকার যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৪৪০ কোটি ডলারের নূতন ঋণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে বাহিরের দেনা পরিশোধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে ব্রিটেন অবিলম্বে আলোচনা চালাবে এবং দেনার একাংশ বাতিলের চেষ্টা করবে। এই সর্ত্তানুসারে ভারতের পাওনার একাংশ বাতিল করতে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করবার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন ষ্টার্লিং পাওনার একপয়সা ছাড়তে সম্মত নন এবং তাঁরা জানিয়েছেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় দেনাপাওনার ব্যাপারে ইঙ্গমার্কিণ ঋণচুক্তির কোন ধারাই তাঁরা কোনরূপ অসুবিধা স্বীকার করে মেনে নেবেন না।† ভারত সরকারের এই দৃঢ়তার ফলে সম্ভবতঃ শীঘ্রই ষ্টার্লিং পাওনা আদায় হবে এবং এই অর্থ দ্বারা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এসে ভারতে শিল্পসংস্কার ও শিল্পপ্রসার সম্ভব হবে।

অনেকের ধারণা শিল্পপ্রসারের ফলে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী কমে যাবে। এই ধারণাবশতঃই এতকাল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পপ্রগতির পক্ষে নিত্যনূতন বাধা সৃষ্টি করে

* "It is the duty of every country which is backward, to protect its infant industries, so that those infant industries might be able to stand on their own legs against competition from foreign countries, which have had long and better experience in the line."

† ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ভারতসরকারের দৃঢ় মনোভাব নিম্নোক্ত ঘোষণায় ব্যক্ত করেছেন :—

"I want to make it absolutely clear that whatever agreement may have been arrived at between the U.S.A. and the United Kingdom in connection with the Anglo-American loan, we are not bound by it. We were not a party to it and if it is mentioned as one of the terms that there shall be a scaling down of balances India is not certainly bound by it and we do not accept that proposition."

এসেছেন। ধারণাটা যে সত্য নয়, আজ একথা বোঝবার দিন এসেছে। তাছাড়া ইতিহাসও সাক্ষ্য দেবে যে, এরকম আশঙ্কা মিথ্যা। ভারতবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হলে যে ক্রয় ক্ষমতা তাদের বাড়বে, ভারতীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তার দরুণ বিদেশী মাল ভারতের বাজারে আগের তুলনায় অনেক বেশীই বিকোবে। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে ১২৫ কোটি ইয়েন মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয় এবং এই বৎসর সেদেশে পণ্য আমদানী হয় ৭২ কোটি ৯০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন জাপানী পণ্যের মূল্য যখন ৬১০ কোটি হয়েছে পৌছায়, সে বৎসর আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়ে ২১৭ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮০ কোটি ডলার মূল্যের দেশীয় শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন হয়েছিল, এই বৎসর সেখানে আমদানী হয় ৮৫ কোটি ডলার মূল্যের মাল; ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন শিল্পাগারগুলি উৎপন্ন পণ্যাদির মূল্য যখন ৩৫০ কোটি ডলার হ'ল, আমদানী তখন পরিমাণে বেড়ে গিয়ে সে বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ থেকে চালান হ'ল ৪০৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ভারতের বেলা তা নিশ্চয়ই মিথ্যা হবে না। সুতরাং ভারতে শিল্পপ্রসার হলে ব্রিটিশ স্বার্থসংরক্ষকদের চিন্তার কোনই কারণ নেই। রাজনৈতিক মতবিরোধ যদি মিটে যায়, যে কোন বাইরের দেশের চেয়ে ব্রিটেনের সঙ্গেই যে ভারতের সম্প্রীতি সব চেয়ে বেশী বজায় থাকবে, তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলেই এতকাল এতবড় দেশে অত্যন্ত সংকীর্ণ পণ্যের বাজার দখল করে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমাদের এসব কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের শিল্পবিপ্লব যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং তা যখন কিছুতেই ঠেকানো সম্ভব নয় তখন ব্রিটেনের বুদ্ধিমানের মত নিজস্বার্থে এখন ভারতীয় শিল্প-প্রসারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসাই যুক্তিসঙ্গত। আজকাল বহু চিন্তাশীল ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ভারতীয় শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভ্রমাত্মক প্রতিকূল মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করছেন। ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট অফ এক্সপোর্টসের মত দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত ব্রিটেনের রপ্তানীবাণিজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতে শিল্পপ্রসারের তথা ভারতবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সাহায্য করতে উপদেশ দিচ্ছেন। এইসব উপদেশ বা সমালোচনা বৃথা যাবে বলে মনে হয় না এবং বৃথা না গেলে ব্রিটেন থেকে ভারতীয় শিল্পাদির সংস্কারের বা প্রসারের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানী অতঃপর বেড়ে চলবে বলেই আশা করা যায়।

উত্তমাশা অন্তরীপ

জ্যাগমুন্ত নভাকভ্স্কি অনুবাদক হিরন্ময় ঘোষাল

[লেখক Zygmunt Nowakowski আধুনিক পোলিশ সাহিত্যে একজন দিকপাল। বর্তমান গল্পটি তাঁর বাল্যস্মৃতিবিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও শুধু ছেলেদের জন্যে লেখা নয়। ছোট ছেলের মন নিয়ে ছেলেদের ভাষায় লেখা কত সুন্দর হতে পারে এই গল্পটি তার নিদর্শন। —অনুবাদক]

জানজিবারের সুলতান। মাথায় প্রকাণ্ড শাদা পাগড়ী। আর নীলরঙের স্পেনের রাজা। রাজার বয়েস খুব বেশী হলে সতেরোর বেশী নয়। অর্থাৎ বড় জোর বালকের চেয়ে সাত বছরের বড়। কেন জানি না, আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে, আমি সেই রাজার মুখের দিকে প্রায়ই তাকিয়ে দেখি। ওর চোখ দুটো বড় বড়, মনে হয়, ও ভারী দাম্ভিক। কিন্তু একটু বেশীক্ষণ চেয়ে দেখলে ধরা যায় ওর মনে বিদেশের একটা ভয় গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে। হয়তো আমার চোখের ভুল, আমার কিন্তু তাই মনে হয়। কারণ ইতালীদের রাজা হুম্বের্তো, যার ছবি ওদের সব ডাকটিকিটে আর যার মুখের দুপাশে ইয়া বড় বড় একজোড়া গোঁফ, তাকেও বিদ্রোহীরা খুন করে ফেলেছে। মহারাণী এলিজাবেথকেও, ইস্কুল খোলবার কিছুদিন পরেই বলেক্ আর য়ানেকদের ইস্কুলে ছুটী দিলে। ওরা ভারী খুসী। বলে, ভাগ্যিস্ ছুটীর সময়ে কাণ্ডটা ঘটে নি। একটু আগে, এই দিন তিন-চার আগে, তাকে খুন করলে ছুটীটা একেবারে মাঠে মারা যেতো। একটা দিন একটা দিনই সই। ওদের দুজনেরই ক্লাসের ছেলেরাও ভারী খুসী। কেবল দিদিমা বলে, ছেলেগুলোর ঐ রকম খুসী হওয়াটা একেবারেই শোভন নয়, যদিও এলিজাবেথ অষ্ট্রিয়ার মহারাণী। তাছাড়া তার বাড়ী বাভারিয়ায়। আমার কিন্তু ঐ এলিজাবেথের কথা ভেবে একটু দুঃখ হয়, ভারী সুন্দর তার চেহারা। বলেক্ বলে, আমি যদি ইস্কুলে ভর্তি হতাম, তাহলে ও-কথা বলতাম না। হতেও পারে।

যাই হোক্ ঐ স্পেনের রাজার কিছুই করবে না বোধ হয় ওরা। ওর বয়েস যে ভারী অল্প। হয়তো সতেরোও পেরয় নি।

পোপের রাজত্ব ভ্যাটিকান বলেক্ তার ক্লাসে বেচে দিলে অর্থাৎ একটা দামী সুদান দুটো হণ্ডুরাস্ আর একটা বলিভিয়ার সঙ্গে বদলাবদলি করলে। বলে, ভারী জিতেছে কারণ ঐ ভ্যাটিকানটার দাম প্রায় কিছুই নেই। তাছাড়া এ্যালবামে ঠিক ঐ রকমই একটা আছে — ওতেও ঐরকমই মুকুট আর চাবির ছবি, কেবল নীচের দিকে একটু তফাৎ এই যা। ঐ পোপের রাজত্ব শুনতে যেন কেমন লাগে। যখন ওটা তৈরী হয় তখন দিদিমা নাকি ইতালীতে। আমি শুধু ঐ একটা কথা বুঝতে পারি না। পোপ কেন আর রাজত্ব ছেড়ে পা বাড়াতে চায় না, যদিও তাকে ছেড়ে দিতে কারো আপত্তি নেই। এমন কি, সবাই খুসীই হয় যদি পোপ একটু বাইরে যায়। কিন্তু ওর ঐ গোঁ। ও বাইরে যাবেই না, কিছুতে না। সেখানে নাকি চমৎকার চমৎকার বাগান আছে, তবুও ঐরকম এক জায়গায় সারা জীবন বসে থাকা। তা হোক্ না বাগানে।

নিশ্চয় ওর ভীষণ আত্মসম্মান, আর তেমনি একগুঁয়ে সে। কী নিয়ে রাগ করেছে ব্যাস্ তার আর রাগ নেই। নিশ্চয়ই ওকে যখন তখন বেরতে বলে ব'লেই। ওকে এখন আর বেরতে না বলাই ভালো। এমন ভাব দেখানো উচিৎ, যেন না বেরুলো তো বয়েই গেলো। ও নিজেই তখন সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে। ওকে বেরু

করবার একমাত্র উপায় হলো তাই। দিদিমাকে ও-কথা বলাতে তার সঙ্গে আমার একটু চটাচটি হয়ে গেলো।

আমার তো ভারী বয়েই গেল। ভালোই হলো, এইবার নিজে নিজেই ডাকটিকিটগুলো দেখতে পারবো। তাছাড়া এমন অনেক জিনিষ আমার চোখে পড়ে যা ওরা কেউই আমায় বুঝিয়ে দিতে পাবে না। তাই আমিও কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। সারা দিন ধরে আমি ঐ ডাকটিকিটগুলো নিয়ে খেলতে পারি। একবার আমি মিছামিছি অসুখ করার ভাণ করলাম, সকালে এমন কাশতে লাগলাম যে মা আমায় বিছানা থেকে উঠতে বারণ করে দিলে, সুতরাং আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম, আর ওরা আমার এ্যালবামখানা দিয়ে গেলো। বান্তা আমার খাবার দিয়ে যেতেও ভুলে গেলো, কিন্তু আমি একটি কথাও বললাম না। আমার ভারী ভালো লাগছিল তারপর রাত্তিরবেলা আমি পার্সিয়ার স্বপ্ন দেখলাম। সমস্ত দেশটা যেন বড় বড় শাদা আর কালোতে ছক কাটা, আর ছকগুলোর উপরে হাতীর দাঁত আব প্রবালের তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কী সব জন্তু হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী রকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত এক-পা-ওলা ঘোড়া আড়াই পা করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আর সমস্ত পার্সিয়াটার এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত গজগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটোছুটি করছে। লম্বা একসারি বোড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে পার্সিয়ার শাহ, মাথায় ভেড়ার লোমের টুপী, ঠিক ডাকটিকিটের ছবিটার মত। মা'কে যেন বলছে: "কিস্তি, মন্ত্রী সামলাও।"....

পার্সিয়া!....পার্সিয়া নানান্ রকমের হয়। হল্‌দে, সবুজ, লালও। সালভাদর-এর রঙ আশমানী। সালভাদরএর ঠিক মাঝখানে আগ্নেয়গিরি, আর এগারোটা কী রকম রকম অদ্ভুত তারা, ঠিক একরকম দেখতে। গুণে দেখলাম। আগ্নেয়গিরিটা থেকে কেবলই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দিদিমার সেই কৌটোটার আঁকা ভিসুভিয়াসের ছবিটার মতন।

মেক্সিকোর টিকিটে ঈগল আর সাপ, গোয়াতেমালায় টিয়াপাখী। সুদানের টিকিটে উট, বোর্ণিওতে গরিলা, আর জাপানে সূর্য। তিন কোণা হাইতিতে পামগাছ, অস্ট্রানিয়ায় কমলালেবুর গাছ। সিংহলে চায়ের বদলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া। নিশ্চয়ই তার অনেক পয়সা। কিন্তু কেমন যেন বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বসে আছে, দেখতে ভালো লাগে না। মনে হয় যেন ইস্কাবনের বিবি, অবশ্য বয়েসে তার চেয়ে বড়। ওর চেয়ে আমার ওলন্দাজদের মহারাণীকে বেশী পছন্দ হয়, যদিও দেখতে ঐরকমই গম্ভীর। দিদিমা বলে নাকি, নিশ্চয়ই দেখতে আরো কুৎসিত, শুধু ডাকটিকিটের জন্য ঐরকম একটু মেজে ঘষে সুন্দর করা হয়েছে তার চেহারাটাকে।

ঐ ভিক্টোরিয়া কিন্তু সর্বঘটে। ইংল্যাণ্ডে, ভারতবর্ষে, হংকঙে, সোমালিল্যাণ্ডে, সেণ্ট হেলেনায়, সিয়েরা লিয়নে। সর্বত্র। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, সব জায়গায়। ওতেও ওর আশ মেটে না। এইবার এসে বসেছে ট্রান্সভালে। ট্রান্সভাল হেরে গেলো, যদিও ওদের সেই বাব পীটার ম্যারিৎস্ খুব লড়েছিল। একজামিনের পর বলেক্ ইস্কুল থেকে বইখানা পেয়েছিল নাকি ভাল করে পড়াশোনা করার জন্যে। আমি কিন্তু ওকে কখনো পড়তে দেখিনি, য়্যানেকৃও পড়ে না। ওরা দুজনেই বলে, ওরা নাকি সব জানে, তাই ওদের বাড়ীতে না পড়লেও চলে। অবশ্য ঐ টাস্কগুলো একটু আধটু করলেই হলো। সেগুলো করবার সময়ে ও বলে—"এসব গাধাদের জন্যে।" পনেরো মিনিটেই শেষ করে ফেলে। আমায় কিন্তু দেখাতে চায় না। বলে আমি ওর কিছুই বুঝবো না।

যাই হোক্ কিছুদিন আগেও ট্রান্সভালে ছিল ঢাল, আর নঙর মাঝখানে, চারিদিকে নিশান, আর সবার ওপর ঈগল। আর এখন শুধু একটা নড়বড়ে সিংহাসনে বসে আছে মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ট্রান্সভালে সোনা

আর হীরে পাওয়া যায়, তাই নিশ্চয়ই আর একটা মুকুট তৈরী করতে দেবে। যাতে কখনো কখনো পুরোণো মুকুটটা বদলে পরতে পারে।

ঐ একজন মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে কী করে অত গুলোকে সামলায় তা জানি না। সবাই যে ওর কথা শোনে তাই আশ্চর্য। শাদা মানুষ, নিগ্রো, হলদে মানুষ, এমন কি ভারতবাসীরাও। সবাই অবশ্য ওর কথা শোনে, কিন্তু ওদের নিশ্চয়ই খব লজ্জা করে। আমাদের দেশে, পোল্‌স্কায়, শুধু পুরুষমানুষে রাজত্ব করে। অবশ্য রাণী যাদ্‌ভীগা ছাড়া। তাও সে বেশীদিন রাজত্ব করতে পারে নি। প্রায়ই তার কাছে যাই। শাদা পাথরের তৈরী, মনে হয় যেন ঘুমিয়ে প'ড়ছে। কখনো কখনো কেউ কেউ তার পায়ের কাছে ফুল রেখে আসে, সে কিন্তু একবার ফিরেও তাকায় না। গির্জেয় যাবার পথে ডান দিকে, রাজাদের কবরগুলোর পিছনে রাণী যাদ্‌ভীগা।

পোল্‌স্কার ডাকটিকিট একটাও দেখতে পাই না। আমরা অস্ট্রিয়ার ডাকটিকিট ব্যবহার করি। সেগুলো অবশ্য জমাইও না, কারণ সেগুলো যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। অবশ্য নিগ্রো কিংবা চীনেদের ক্রীতদাসত্ব থেকে উদ্ধার করবার জন্যে জমানো যেতে পারে। তাতে অবশ্য অন্য কোন লাভ নেই।* য়ানেক্‌ আর বলেক্‌ একবার ওগুলো জমিয়েছিল, একটা নিগ্রোকে ক্রীতদাসত্ব থেকে উদ্ধার করবে বলে। ওদের মৎলব ছিল, নিগ্রোটাকে খৃস্তান বানিয়ে কাছে কাছে রাখবে, যাতে সে ফাই-ফরমাসটা খাটতে পারে। সে নাকি ওদের বিশ্বস্ত ভৃত্য হবে, ওদের সব কাজ করে দেবে। কিন্তু তার কী নাম রাখা হবে তাই নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেলো। তাছাড়া বলেক্‌ তাকে শুধু নিজের জন্যে রাখতে চাইলে। তাই নিগ্রোও এলো না, আর আগের মতোই বাক্সা-ঝিই রয়ে গেল।

দিদিমা যে চিঠিগুলো পেতো তার সেই উক্রাইনা থেকে, তাতে থাকতো রুশী ৎসার। দিদিমা কী সব বলতো আমাদের দেশ ভাগাভাগির কথা, বিদ্রোহের কথা। সব শুনতে হলো। তাছাড়া বছরখানেক হলো আর চিঠি আসে না। দিদিমা বার চার-পাঁচ লিখেছিল, উত্তর আসেনি। তাই আর লিখে না। বোধহয় সেখানে আর কেউ থাকে না।

সব টিকিটগুলোর চেয়ে সুন্দর হলো উত্তমাশা অন্তরীপের। সোনালি রঙ, সেখানে কে একটি ভারী সুন্দর চেহারার মেয়ে লম্বা ফ্রক পরে বসে আছে। নোঙরের উপরে তার পা-দুটি রাখা, বাঁদিকে মুখটি ফেরানো, যেন সেই দিক থেকে কে তার কাছে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে, তাই সে মনে মনে মুচকে মুচকে হাসছে। মানচিত্রের ওপর ঐ অন্তরীপটাকে খুঁজে বের করলাম। একেবারে নীচের দিকে। সেখান থেকে একটু দূরে অষ্ট্রেলিয়া দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার টিকিটে শাদা রাজহংস। ঐ রাজহংসটা নিশ্চয়ই উত্তমাশা অন্তরীপের সেই সুন্দর মেয়েটির কাছে ভেসে আসবে।

মানচিত্রে অষ্ট্রেলিয়ার রং গোলাপী। আফ্রিকার নীচের দিকটা হলদে, তার কাছের সমুদ্রটা নীলকান্ত-মণির মত। ঐ সমুদ্রের ওপর সেই শাদা রাজহংসটা ভেসে আসবে। অনেকখানি পথ তবু নিশ্চয়ই আসবে সে। ও তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে, কারণ অষ্ট্রেলিয়ার দিকে চেয়ে ওর মুখের হাসিতে খুশী ভরে ওঠে। নিশ্চয়ই ওর মনে কী এক উত্তম আশা..

---

* ইউরোপের অনেক দেশের ছেলেদের মধ্যে বিশ্বাস ডাক টিকিট বা ট্রামের টিকিট জমিয়ে পাদ্রীদের দিলে নাকি একজন নিগ্রোকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা যায়।—অনুবাদক

বড়ো সাহিত্য ও গণ-সাহিত্য

শ্রীপ্রমথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে সাধারণভাবে প্রথমেই বলা যেতে পারে, সব সাহিত্যিকের সাহিত্যই, সব বড়ো সাহিত্যই—তা সে স্পষ্টভাবে সমাজ-সচেতন হোক বা না হোক—গতির সাহিত্য, প্রগতিশীল সাহিত্য। কারণ সব বড়ো সাহিত্যেই মানুষের আত্মার দিব্য চেতনা [illegible] বিস্তৃত ক'রে দেখবার [illegible] হয় বলা [illegible] প্রেম বিরহ এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা [illegible] মানবজীবনের অবলম্বনে একটি সুবৃহৎ আনন্দলোক, একটি দেশকালনিরপেক্ষ অখণ্ড সৌন্দর্য্য-[illegible] হয়। কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন,—সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের যে একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করতে ভালোবাসেন কিন্তু ঐ একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। চারিপাশের মানবসমাজ এবং বিশেষ ক'রে সমসাময়িক যুগের অন্তরতম নাড়ীর স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভব ও প্রকাশের চেষ্টা করেন। তাই, তিনি তাঁর পূর্ণতম মুহূর্তে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশের সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, গতিশীল ক্রম-বিকাশমান জীবনের মূলতম রহস্যের নিবিড়তম আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। এই সুগভীর অর্থে সব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকেরাই—কালিদাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, সেক্সপীয়ার, গোটে, হোমার, ডান্টে, টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, হিউগো, রোলাঁ, হুইটম্যান, এমার্সন, ওমর খৈয়াম, ডিকেন্স, হার্ডি, এরা সবই একই সঙ্গে—বড়ো সাহিত্যিক এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিক। কিন্তু আজকের জগতের বিশেষ রাষ্ট্র ও সামাজিক পটভূমিকার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যের বিশেষ একটি মানে দাঁড়িয়েছে, [illegible] হচ্ছে। কিন্তু সে কথা পরে বলা।

যেমন উপরে বলেছি,—সব বড়ো সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য, সাধারণ অর্থে হিসেবে একথা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। সেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ, গোটে বা টলষ্টয়ের বইগুলো খুললেই আমরা দেখব তাঁদের সৃষ্ট জগতের বড়ো বর্ণোজ্জ্বল বিশালতা, কতো [illegible] বৈচিত্র্য, নৈর্ব্যক্তিক অথচ চিরকালের সৌন্দর্য্যের ধারায় সেখানে হর্ষ-বেদনা-সংগ্রাম-মুখরিত জনগণের জীবন-কাহিনী জীবনের স্বপ্ন এবং সমস্ত বাধা ও অন্ধকার শক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য গৌরবময় চেষ্টা ও বিপুল প্রাণের কথা রূপায়িত হয়েছে। জীবনকে যে সাহিত্য নব নব রেনেসাঁসের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়, উজ্জীবিত করে তোলে,—সেই সাহিত্যই বড়ো সাহিত্য। সে অর্থে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এবং সাধারণভাবে বৈষ্ণব মহাজনগণ রচিত পদাবলী সাহিত্য, এবং বাংলাদেশের কোণে-কোণে গোধূলির আবছায়াকোমল আলোয় নিঃসঙ্গ সব রহস্যগন্ধী ফুলের মত ছড়িয়ে থাকা অজস্র গান ও লোকসঙ্গীত, যে সবের মধ্যে এ কথাটাই সব চাইতে সুন্দরভাবে ও সরবে ঘোষিত হয়েছে যে

'মানুষের চাইতে বড়ো সত্য আর কিছু নেই',—এসব; তারপর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', শ্রীমধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' এবং সাধারণভাবে জীবনের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ-জীবনবাদীর দৃপ্ত বিদ্রোহের পৌরুষপূর্ণ সুর যা নাকি বাংলা সাহিত্যের আত্ম তথা টেক্‌নিক্‌কে নূতন বিপ্লবাত্মক অগ্রগতির মধ্যে দ্রুত উন্নীত করেছিল,—তারপর বঙ্কিমের সাহিত্যে বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্যের নব জন্ম, জাতীয়তার নব ঋক উচ্চারণ; শরৎ-সাহিত্যে নারীর নূতন রূপ, মূল্য ও মর্য্যাদার স্বীকৃতি, অত্যাবশ্যক সমাজ বিপ্লবের প্রাথমিক বনিয়াদ সৃষ্টি এবং পথের দাবীর মত বইয়ের গূঢ় ব্যঞ্জনা,—এবং সবার উপরে, পরিমাণে তথা ঐশ্বর্য্যে মহাসমুদ্রের মতো প্রায় পারহীন রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি বড়ো সাহিত্যের রূপ ও স্বাদ এবং সামাজিক পটভূমিকা তথা মানুষের কৃষ্টি ও রসবোধের ক্রমবিকাশের পথে শ্রেঃ সাহিত্যের দান কী অসীম ও অপরূপ। ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখি, মানুষকে দরদ দিয়ে দেখবার, সত্য করে দেখাবার কী বিপুল চেষ্টা সেখানে। নামের দৃষ্টান্ত আর দিলুম না বাহুল্য বোধে। অতীতের এসব সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রগতিশীলসাহিত্য বলে আলাদা লেবেলের দরকার সেখানে হয় নি। তবে আজকের জগতে এর বিশেষ প্রয়োজন কেন ঘটল?

এর উত্তরটা প্রধানতঃ এই যুগের বিশেষ ধর্ম্ম ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আধুনিক বাস্তব-ধর্ম্মী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমালোচনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে, প্রতি যুগের সাহিত্য ও শিল্পই সে যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোজাত বিশেষ জীবনধারা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। তবু, আজকের জগতের সাহিত্যের পক্ষে এ কথাটা অত্যন্ত বেশী ক'রে,—অত্যন্ত মারাত্মক সত্যরূপে—খাটে। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়মে, গূঢ় সমাজ-শক্তি-সমূহের পারস্পরিক সংঘাতে আজ বাস্তব আদর্শ-বাদের দিক থেকে সারা দুনিয়ার মানুষ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একদিকে চলেছে পুঁজিবাদী ধনীর দল এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহই, যারা মুমূর্ষু—ক্যাপিটালিজ্‌মকে অর্থ ও কৌশল প্রয়োগে জিইয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করছে, অসীম হিংস্রতা নিয়ে ইতিহাসের অব্যর্থ ধারাকে ব্যর্থ কর্‌বার জন্য তীব্র প্রয়াস পাচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে, শ্রমিক সম্প্রদায়, কিষাণ মজুর, মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং অগণিত আদর্শবাদী ছাত্র যুবকের দল। অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা নিরেনব্বুই জনেরও বেশী নরনারী, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধাপ্পা, সুবিধাবাদ, বংশগত ও অর্থগত আভিজাত্যের অন্যায় সুবিধাগুলোকে যারা বিদায় দিতে চায়, যুদ্ধকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করতে চায়, যাবতীয় নরনারীর জন্য সম্ভাবনার দ্বার সহস্র দিক দিয়ে যারা উন্মুক্ত করে দিতে চায়, পুরোহিত পাদ্রী ও মৌলভীরা যে 'স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে নামানোর কথা বার বার বলে আজো নামাতে পারে নি' (অর্থ নৈতিক-ভিত্তিনিরপেক্ষভাবে শুধুই ধর্মশাস্ত্রাদির অনুশাসনের পথে যা আসবার নয়), পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই জন্য সেই আনন্দ, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ধরণীর আবির্ভাবকে যাঁরা চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, সংগ্রাম দিয়ে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর অপেক্ষার মূল্যে, শোণিত ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আপন হাতে সৃষ্টি করছেন, নিয়তির হাত থেকে মানব-ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদকে সকলের জন্য ছিনিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম শ্রেণীতে লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু হাতে দীর্ঘ কাল ধ'রে ক্ষমতা থাকার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘাঁটীগুলোর অধিকাংশই আজ এদের হাতে রয়েছে। বিভিন্ন কারণে একশ্রেণীর প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক শিল্পী এবং সাংবাদিকের সাহায্যও এঁরা পেয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই হিট্‌লারের 'মাইন্ ক্যাম্ফ্'এর পাশাপাশি লেখক রোজেনবার্গ্ 'মাইথাস্' লিখলেন। তাইতো দেখেছি

গোয়েবল্‌স ইত্যাদির মতো শক্তিমান্ জার্মান-মনীষী এবং ড' য়্যানান্‌জিও'র মতো প্রতিভাশালী ইটালিয়ান লেখক ও কবি ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের ভাব-প্রসারণে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন। তাইতো বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিপ্‌লিঙের মতো বিশ্ববিখ্যাত কবিকে এবং সম্প্রতি জার্মান্ এঞ্জেল ইত্যাদির মতো শক্তিমান লেখককে সাম্রাজ্যবাদের জয়গান করতে শুনেছি। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় সাহিত্য অধিকাংশ জনগণের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তাছাড়া, মুষ্টিমেয় একটী শ্রেণীর উগ্র স্বার্থ ও ক্ষমতাপ্রিয়তার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য এ ধরণের সাহিত্যের অন্তর্দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অসার্বজনীন হতে বাধ্য, পাঠকের রসবোধকে বিকৃত করতে বাধ্য। কিন্তু এ জাতীয় সাহিত্যের আজ কতগুলো দেশে সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই এর সঙ্গে পার্থক্যের পরিষ্কার সীমারেখা টানবার জন্য গণসাহিত্য বা প্রগতিসাহিত্য এই কথাটা ব্যবহার করবার আজ বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত আন্দোলনের সঙ্গে এবং তা থেকে বর্তমান রাশিয়ার বিচিত্র নব জীবনস্রোতের সঙ্গে এ সাহিত্যের কিছু নাড়ীর সম্বন্ধ স্বভাবতঃই ঘটেছে।

কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি,—যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী, যা নাকি উপরিউক্ত অর্থে সমাজ-সচেতন না হয়েও আমাদের প্রতিটী খণ্ড ব্যক্তিত্বের বা শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থের ক্ষুদ্রতার আবহাওয়া থেকে মুক্তি দেয়, দেশকাল-নিরপেক্ষ অতলস্পর্শী সৌন্দর্য্যের অনির্বচনীয় স্পর্শ, ব্যঞ্জনা আমাদের মনে সঞ্চারিত করে, তা সর্ব্বদাই নিঃসন্দেহে বড়ো সাহিত্য।

সেক্সপীয়ারের অনেক নাটক, গোটের 'ফাউষ্ট', ওমর খৈয়ামের কবিতা, ইমার্সনের অনেক প্রবন্ধ, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা, রবীন্দ্রশরতোত্তর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী'—'অপরাজিত' প্রভৃতি অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি—তথাকথিত অর্থে আদৌ সমাজ-সচেতন নয়। সুতরাং আজকের দিনেও গণসাহিত্য রচনার চেষ্টা না করেও বা স্পষ্টরূপে সমাজসচেতন না হ'য়েও বড়ো সাহিত্যিক হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর। কিন্তু তীব্ররূপে সমাজ-সচেতন হ'য়ে, প্রধানতঃ অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত বহু সমস্যা, সংঘর্ষ ও আন্দোলনের জট-পাকানো বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রত্যক্ষ জীবনধারাকে অত্যন্ত বাস্তবরূপে আশ্রয় ক'রে বিশ্বজোড়া নিপীড়িত, শোষিত, গরীব মানুষদের স্বার্থেই নিজেদের লেখনী ও তুলিকে অস্ত্রের মত ব্যবহার ক'রেও যদি বড়ো সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া যায় তো অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আজকের দিনে তাঁরা যেন প্রধানতঃ তা-ই করেন, যুগের অধিকাংশ মানুষের এই দাবী কি তাঁরা অনুভব করছেন না? এই পথেই যদি আজ বড়ো সাহিত্য রচিত হয়, তবে একই সঙ্গে লেখকের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও অত্যন্ত সার্থকরূপে পালিত হ'বে। তাঁরা তাঁদের আর্টের ক্ষতি না ক'রেও সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে শতকরা নিরেনব্বই জন লোককে স্থায়ীভাবে নীচের তলায় রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের ন্যায্য আসনলাভের লড়াইকে, তাদের নিজস্ব বেদনা—অভিযোগ—মর্য্যাদাবোধকে যদি এমনভাবে সাহায্য করতে পারেন, যা আর কেউ পারে না, তা কি তাঁরা করবেন না? বড়ো সৃষ্টিই বা এদিক দিয়ে কেন হবে না? এই নব-কল্লোলিত গণ-জীবনের সহস্রমুখী জীবনাবর্ত্তকে, কাব্যে অনাস্বাদিত তাদের গরীব জীবনের অলক্ষিত বৈচিত্র্য-গুলিকে, তাদের উপকরণমাত্র ক'রে যে সমাজ-বিপ্লব স্বপ্রভাবী হ'য়ে উঠ্‌ছে তাকে—আশ্রয় ক'রে রচিত সাহিত্য উচ্চতম সাহিত্যের 'সাব্‌লিমিটি'তেই বা পৌঁছুতে পারবে না কেন?

এই পথের সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা পেয়েছি রাশিয়ার গর্কি, শোলোকভ ও এহ্‌রেণবুর্গকে, পেয়েছি শেষের দিকের রোমাঁ রোলাঁকে, পেয়েছি ইংলণ্ডে আওয়েন, র‍্যালফ ফক্স প্রভৃতিকে, পেয়েছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

একাধিক খ্যাতনামা লেখককে। একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি এদের মধ্যে দু'একজনের বেশী কেউ আজ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। কিন্তু আসলে সেটা স্রষ্টার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। সেজন্য এক্ষেত্রে উপকরণের দোষ দেওয়া বৃথা, বিষয়বস্তুকে দায়ী করার চেষ্টা যুক্তিহীন। এদিক্ দিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরের আবির্ভাব আজও বেশি সংখ্যায় না হয়ে থাকলেও ভবিষ্যতে যে হবে না, একথা বলা অর্থহীন। আওয়েন প্রথম মহাযুদ্ধে মারা যান—যুদ্ধবিরতির অল্প ক'দিন আগে মাত্র। যুদ্ধের সত্যিকারের স্বরূপ এবং যে গলদভরা সমাজব্যবস্থা যুদ্ধকে বার বার সম্ভব করছে, তার স্বরূপ আওয়েনের কবিদৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছিল। র‍্যালফ্ ফক্স্ ছিলেন জাতবিপ্লবী আদর্শবাদী ইংরেজ। জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী স্পেনের গণতন্ত্রের সপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তিনি তাতে যোগ দেন এবং স্পেনের মাটিতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি ছিল, তা অপূর্ণ রয়ে গেল। আরো কতো ইউরোপীয় কবি ও লেখক এমনি ক'রে স্পেন তথা অন্যত্র গণতন্ত্রের লড়াইয়ে জীবন দিয়েছেন, আর্ণেষ্ট টলারের মতো হিটলারের Concentration Camp এতে অমানুষিক নির্য্যাতন সয়ে শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন করেছেন অকপট আদর্শ-বাদের ঋণ শোধ্‌তে গিয়ে। কিন্তু তাঁদের লেখা রয়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা সে সব সাহিত্য সর্ব দেশের প্রগতি, স্বাধীনতা ও শোষণাবসানের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। 'I will not Rest' এবং অন্যান্য অসাধারণ বইয়ের অক্লান্ত মানবপ্রেমিক লেখক রোলাঁ, নাটকের আর অনবদ্য গ্রন্থভূমিকাগুলোর মধ্য দিয়ে তীব্র কশাঘাতে যিনি সমাজকে রোগমুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন সেই বার্ণার্ড শ, সমাজ ও রাষ্ট্রচৈতন্যের উজ্জীবনের জন্য যিনি গদ্যে পদ্যে অশ্রান্তভাবে কলম চালিয়ে গেছেন সেই ওয়েলস্, আমেরিকার মহীয়সী লেখিকা পার্ল বাক্, নাৎসীবাদকে অস্বীকার করার অপরাধে নির্বাসিত বিখ্যাত জার্ম্মাণ কথাশিল্পী টমাস ম্যান, সভ্যতার সংকটে বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণকারী, পথনির্দেশকারী রবীন্দ্রনাথ, নূতন জীবন ও নূতন পৃথিবীর সত্য-স্বাক্ষরিত বলিষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্যের স্রষ্টা গর্কি শোলোকভ, অ্যালেক্সী টলষ্টয়, এহ্‌রেণবুর্গ প্রভৃতি রাশিয়ান্ লেখক,—এদের এবং বিংশ শতাব্দীর অনুরূপ অন্যান্য লেখকদের কাছে এই শতাব্দীর সংগ্রামরত সাধারণ মানুষদের ঋণ অপরিসীম। (যদিও সংজ্ঞার চুলচেরা বিচারে এঁরা সবাই হয় তো গণ-সাহিত্যের স্রষ্টা নন)।

আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এই নব-জীবনোচ্ছলতার সুর যথেষ্ট গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে কি? ভারতবর্ষের পায়ের শিকল আজও খুলে পড়েনি', তবে তা অনেকটা ঢিল হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার দিকে যতো এগোচ্ছে, ইংরেজ-হস্তান্তরিত ভারত-শাসনতন্ত্র এবং দেশের সম্পদসৃষ্টির যন্ত্র ও পথগুলোকে একান্তভাবে কবলিত করবার জন্য দেশের পুঁজিপতিরা তত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এরই ফল স্বরূপ দেশের শ্রমিক-কৃষক-কেরাণীদের আন্দোলন-গুলোকে, গরীব ও মধ্যবিত্তের রুটী ও ন্যায্য অধিকারের লড়াইকে পিষে মারবার তোড়জোড়ও সুরু হয়েছে বড়ো বড়ো কথার আড়ালে। দেশের জীবনের অনুরূপ বিরাট পরিবর্তনের ক্ষণে এরকমই প্রথমটা ঘটে, ইতিহাস বলে। ভারতবর্ষেও সেই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, সংঘর্ষপূর্ণ, বিরাট ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত প্রায় সমাগত। চারিপাশের গরীব মানুষদের জীবনের দুঃখকে আশাকে ন্যায্য দাবীর লড়াইকে, তাদের বিরুদ্ধে নিজ দেশেরই বড় লোকদের ক্রমবর্দ্ধমান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ক্রমবর্দ্ধমান গতিকে জলন্ত ভাষার আখরে জীবন দিয়ে কি আজকের দিনের ভারতীয় লেখক ও শিল্পী একাধারে তাঁদের আর্টগত সমাজগত কৃষ্টিগত ও নৈতিক দায়িত্ব নিঃসন্দেহরূপে পালনের অকপট প্রয়াস করবেন না? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ও গৃহযুদ্ধের উসকানীদাতাদের, চোরাকারবারীদের, কালোবাজারী টাকার জোরে ফেঁপে ওঠা হঠাৎ-নেতাদের, দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন রফাকারিদের বিরুদ্ধে তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টি, লেখনী ও তূলি কি আজ গর্জে উঠবে না জ্বলে উঠবে না? গর্জে যে উঠবেই, জ্বলে যে উঠবেই, আমাদের বাংলা সাহিত্যে এবং কিছু কিছু অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেও তার প্রমাণ মেলা সুরু হয়েছে। ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও নব জীবনের বন্যা যে আসবেই, আসছেই,—নতুন সাহিত্য ও শিল্পকারদের নতুন মূল্যবোধ ও নতুন বনিয়াদের জন্য সন্ধানী মনে তার নিশ্চিত আভাস ধরা পড়ছে, তাদের রচনায় তা বিকিরিত হচ্ছে। কিন্তু তারা আরও সচেতন হোন। ভারতের সাম্প্রতিক ঝড়ো হাওয়ার পূরো অর্থ এবং আসন্ন ভবিষ্যতে শ্রেণীস্বার্থের অনিবার্য্য সংঘাতে ভরা তীব্র সময়টাকে তাঁরা অনুভব করুন। তাঁদের দায়িত্ব পালনে তাঁরা প্রখরতর হ'ন, প্রবলতর হ'ন, ত্বরিততর হ'ন।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী এমন কি আঙ্গিকেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন বর্তমানে যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, সাহিত্যকে জীবন্ত ও গতিশীল থাকতে হ'লে কাল হতে কালান্তরে তার রকম ও ঢংএর পরিবর্তন হ'তেই হ'বে, এই সাধারণ আর্টগত প্রয়োজন ছাড়া ও অন্যতর প্রয়োজনে। বড়োলোক, অভিজাত সমাজ, বড়জোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকথা নিয়েই সব দেশে এ পর্য্যন্ত খুব বেশীর ভাগ সাহিত্য রচিত হয়েছে। মানবজাতির ভগ্নাংশমাত্র হ'য়ে দেশে দেশে যে অগণিত জনসাধারণ যুগের পর যুগ তাদের নগণ্য জীবনযাত্রার অগণ্যতায় আবৃত থেকে কোনমতে প্রাণধারণ করেছে, সাহিত্যে যাদের ছবি আঁকবার কথা কারও মনেই বড় একটা হয়নি, সেইসব শোষিত মানবমণ্ডলীর, সেইসব কৃষক মজুর নিম্নমধ্যবিত্ত এবং অত্যন্ত সাধারণদের সাধারণ জীবনের অসাধারণ কাহিনীকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আজ সাহিত্যিকের। বাস্তব জীবনে যেমন তাদের অবহেলা ও অত্যাচার করার দিন শেষ হয়ে আসছে, সাহিত্যেও তেমনি আজ তারা নিজেদের কথা শুনতে চায়, নিজেদের দেখতে চায়। তাদের এ দাবী অত্যন্ত ন্যায্য। তাদের নিজেদের ইচ্ছার দিক্ থেকে, তথা সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক্ থেকে। সাহিত্যিক, কবি যখন জীবনের কোনো কিছুকে তুচ্ছ বলে সাহিত্যের সিংহদ্বার থেকে আর ফিরাতে পারেন না, এদের কথা তিনি, বিশেষ ক'রে আজিকার বিশেষ কালের পারিপ্রেক্ষিকে—ভুলবেন কি ক'রে? অবশ্য বলাই বাহুল্য, সাহিত্যে যখন এদের জীবনের সুখদুঃখ, আশানন্দ, সমস্যাকে স্থান দেওয়া হ'বে তখন তাকে সাহিত্যরূপেই করা হ'বে,—প্রোপাগাণ্ডা বা অন্য কিছুরূপে নয়। শুধু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নয়, তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর নয়, পরন্তু সকল মানুষের মর্ম্মমুকুরই আজ হোক্ সাহিত্য। নবযুগের নব প্রাণশিখা সেখানে স্পন্দিত হোক্। এখানে লেনিনের একটা উক্তি স্মরণ করি:

"Art belongs to the people. It must let its roots go down deep into the very thick of the masses. It must unite the feeling, thought and will of the masses, uplift them. It must awaken the artists mong them and develop them. Must we provide fine cakes for a small minority while the masses of warkers and peasants still lack black bread?"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চাপে নির্য্যাতিত হচ্ছিল যারা সেই সব নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী, সেইসব শোষিত কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার ও পূর্ণ মর্য্যাদা ফিরে পাওয়ার আন্দোলনের শেষ পর্ব্ব আরম্ভ হয়েছে দেশে দেশে,—অগ্রসরী শিল্প সাহিত্যেও সেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা। সারা পৃথিবীতে যে ঝড় উঠেছে, এর পারে আছে নূতন

জীবনের আশ্বাস,—সমস্ত মানুষের জন্য। ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা আজ সত্যকার অর্থে গণাভিমুখী হ'য়েই রসোত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস পাক। সেই পথেই তা ভাবতের শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রের আন্দোলনের সঙ্গে এক সাথে চলে আমাদের সুন্দরতম সত্যতম লক্ষ্যস্থলে উত্তীর্ণ ক'রে দেবে। কারণ গণসাহিত্যেরই মধ্য দিয়েই আমরা অনুভব করি যুগের বিশেষ প্রতিভাসিত, বিশেষ সত্যটীকে এই ক্রমবিচিত্রীয়মান গণ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আজকের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি, সাহিত্যিকেরা অগ্নিদ্যুতিময়, জনগণের অন্তরের ভাষায় সেই বিশেষ জীবনের বলিষ্ঠানটীকে রচনার পথ ও প্রেরণা যোগাচ্ছেন,—সেই নূতন পৃথিবীর জন্মকে অনিবার্য্য ও আসন্ন করছেন, যার যুগযুগসঞ্চিত স্বপ্ন আশ্বাস দিয়েছে দেশে দেশে কোটি কোটি নির্য্যাতিত মূক জন সাধারণকে প্রতিক্ষণে যে, মানবাত্মার পক্ষে ক্লেশ- ও অপমান-কর এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিন তাসের প্রাসাদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তার জায়গায় আসবে সকল মানুষের জন্য তৈরী বিশাল-উজ্জলতাময়, সত্যকারের সুন্দর ধরণী।

"আমরা যখন যারা গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করি, আমাদের জানা উচিত যে, এ থাকবে না। এ কালের স্বাদ অন্যকালে অগ্রহণীয় এ হোতে বাধ্য। কেননা, স্বভাব বাঙনার যে রসের সৃষ্টি করি আমরা, যুগে যুগে তার বদল হচ্ছে। রস থাকতে পা'রে যদি সেটা জীবনের দান হয়। যদি Convention এর দান হয়, তবে থাকবে না। যখন জীবনের সৃষ্টি, তখন তার মার নেই,—কিন্তু যখন বিশেষ কালের বিশেষ ভাবালুতার সৃষ্টি—তার আর উপায় নেই।"—রবীন্দ্রনাথ

উলুখড়

নবেন্দু ঘোষ

আজিজ চুপ করেই রইল। জোহরাকে সে চেনে, সে জানে যে জোহরা যখন রেগে যায় তখন তাকে কিছু না বলাই ভাল, এমনকি সে যদি অন্যায় কথাও বলে তবু তা নীরবে শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে যারা বড় হয় তারা দুঃখে, অভাবে, স্বপ্নশেষের ব্যর্থতায় মাথা ঠিক রাখতে পারে না। জোহরারও ঠিক সেই অবস্থা। শৈশবে, কৈশোরে সে লায়লা মজনুর শিরি ফরহাদের কাহিনী পড়েছিল, পড়েছিল আরব্য-রজনী ও হাতেম-তাইএর কাহিনী, আর সেই সব কাহিনী পড়ে পড়ে সে মনের মধ্যে হাওয়াই কেল্লা তৈরী করেছিল, অনেক অসম্ভবকে তার জীবনে সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বেচারা আজিজ, ট্রামের কনডাক্টর আজিজের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর থেকে সেই হাওয়াই কেল্লা হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছে, সেই সব বহুবিচিত্র স্বপ্ন আজ ধোঁয়ার মত কোথায় উড়ে গেছে।

তবু চলছিল। বাস্তব যতই রূঢ় হোক, অসহ্য হোক, বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে। কঠিন পরিশ্রমের পর, বস্তীর একঠা স্বল্প-পরিসর নোংরা ঘরে, কেরোসিনের ডিবার ধোঁয়াটে অস্পষ্ট আলোতে জোহরার অতীত স্বপ্ন আজিজের চোখেই ঘনায়। আজিজ অবাক হয়ে যায়। একি স্বপ্ন দেখছে সে! জোহরা কি সেই সব বিচিত্র কাহিনীরই কোনো একটি নায়িকা! আর তার পাশে তার মেয়ে রাবেয়া যেন বেহেস্তের একটা ছদ্মবেশী পরী। আশ্চর্য্য! আর জোহরা! অবশ্য স্বপ্ন দেখে না সে, অল্প আয়ের সংসারে রখুঁটিনাটি তো আজিজ তার চেয়ে বেশী জানে না. সে শুধু জোহরাই জানে যে তিনটি পেট চালাতে আজকাল-কার এই বাজারে কি বেগ্ পেতে হয়। তবু চলছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে, থিতিয়ে থিতিয়ে, বেঁচে থাকাটাকেই একটা বড় ব্যাপার মনে করে, পরস্পরকে ভালবেসে।

কিন্তু হঠাৎ সেই বেঁচে থাকার ব্যাপারটাই সন্দেহজনক হয়ে উঠল এবং তা সন্দেহজনক হওয়ায় ভালবাসাটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল, মনে হল যে যাদের আজিজ ভালবাসবে তাদের সে যদি পেটভরে না খাওয়াতে পারে তাহলে সে ভালবাসা যেন একটা অপরাধ। কেন? ষ্ট্রাইক—ধর্ম্মঘট! ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছে। কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাফিলতী আর অবিচার আর সহ্য করা যায় না, আর সহ্য হয় না দীনভাবে তাদের হীন প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা।

ধর্ম্মঘট চলছে। একদিন দু'দিন করে আজ দু'মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। দিনের পর দিন কাটল, সঞ্চিত যা কিছু ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল, অবশেষে দিন পনেরো বাদে পেটে টান পড়ল। তখন অনন্যোপায় হয়ে আজিজ একটা কাজ শুরু করল। যা কিছু শেষ সম্বল ছিল তাই দিয়ে সে কিছু মনিহারী জিনিষ কিনে শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে ফুটপাথের ওপর বিছিয়ে বসল, হিসেব করে দেখলে যে দৈনিক টাকাখানিক লাভ হলেই তার চলে যাবে বেশ। তাছাড়া উপায় কি, ধর্ম্মঘট যে অনেকদিন চালাতে হবে তা তারা বুঝতে পারছে, তাছাড়া অন্যান্য সবাই

কিছু না কিছু একটা উপার্জ্জন করার চেষ্টায় আছে। বাঁচতে হবে তো, অন্ততঃ এই ধর্ম্মঘটটায় জিৎবার জন্যই বাঁচতে হবে।

তবে মাঝে মাঝে মনে একটা প্রশ্ন জাগে—কতদিন? মালিকেরা এবার ভেবেছে যে যতদিন লাগবার লাগুক, না খাইয়েই শমিকদের তারা শায়েস্তা করবে। তাই প্রশ্ন—জাগে মনে ক'দিন? আর আজ জোহরা যে সব কথা উত্তেজিত ভাবে তাকে বলছে তারও মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে কতদিন আর কতদিন?

জোহরা হঠাৎ থামলে, কি ভেবে ভুঁরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কাল বিশ তারিখ, হ্যায় না?"

"হাঁ।"

"কাল সবকো বাসমে শরিফ হোনে ওয়াস্তে কম্পানী মে নোটিশ জারী কী হ্যায়?"

"হাঁ"—আজিজ জোহরার কথার মোড় ঘুরে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"তব তুম্ যা রহে হো না?"

মাথা নাড়ল আজিজ কথার মোড় আবার ঘোরাবার জন্য সে রাবেয়াকে ডাক দিল, "বেটি—এদিকে আয়, আয়—"

পাঁচ বছরের রাবেয়া তখন একটা কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। বহুদিনের পুরান পুতুল, ছিঁড়ে গেছে, তবু তাই নিয়েই খুশী আছে রাবেয়া। সেই পুতুলকে নিয়েই তার সময় কেটে যায়, সারাক্ষণ সে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে বাপ তাকে চোখের মণির চেয়েও দুর্মূল্য মনে করে তাকেও অনেক সময় ভুলে যায় রাবেয়া। আজিজ হাসল মেয়ের আত্ম-সমাহিত ভাব দেখে।

"এদিকে আয় বেটি—ইধার আ"—আজিজ আবার ডাকলে।

কিন্তু জোহরা স্বামীর মাথা নাড়ার অর্থ বোঝে নি। এমনভাবে মাথা নেড়েছিল আজিজ যার অর্থ একসঙ্গে 'হ্যাঁ' এবং 'না' হতে পারে। বাঁকা ভুরু দুটোকে আরো কুঁচকে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ক্যা, তুম নেহি যাওগে?"

আজিজ এবার সোজা তাকাল স্ত্রীর দিকে, মৃদুকণ্ঠে বলল, "নেহি।"

"লেকিন কিঁউ?"

মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আজিজ বলল "কিউ তুম তো জানতি হো?" ("তোমরা হার মানবে না এই তো?")

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ক'দিন চলবে এমনিভাবে? ক'দিন?"

"যতদিন চলবার চলুক—যতদিন ওরা হার না মানে ততদিন।"

"তব খাওগে ক্যা?" জোহরা এবার চেঁচিয়ে উঠল যেন চেঁচিয়েই সে স্বামীকে হার মানাবে, টাম কোম্পানী কাছে তার স্বামী হার মানে না বলে যে তার কাছে ও হার মানবে না একথা ভাবতে জোহরার রাগ আরো বেড়ে যায়। সে না হয় বুঝল সব কিন্তু কথায় হ্যাঁ মানতে দোষ কি?

কিন্তু জোহরার চিন্তাটা তো সরব নয় তাই আজিজ ওধার দিয়ে গেল না, বলল, "কেন তোমার কি না খাইয়ে রেখেছি?"

জোহরা অবাক হবার ভান করলে, "এমনিভাবে রাস্তায় রাস্তায় জিনিষ বিক্রি করে বেড়াবে—পেট ভরবে তাতে?"

আজিজ হাসল, "না হয় আধপেটা খাবে।"

কথা খুঁজে পেল না জোহরা, খানিকক্ষণ ক্রোধে সে চুপ করে রইল, দুটো চোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল তার তারপরে বলল, "তব তুমহরা যো খাইস্ করো—ভি মংগো, ভুখ্ খে মরো—দিলমে যো হ্যায় বহি করো"—বলেই সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে নয়, গেল রান্নাঘর বলে যে খুপরীর মত ছোট্ট ঘর সেখানে। সেটাই জোহরার গোসাঘর।

বিবির যাওয়ার ভঙ্গী দেখে নীরবে হাসল আজিজ। রাগ করতে সে পারল না, একটা কথা বলে জোহরার রাগকে আরো বাড়াবার মত দুঃসাহসও তার হল না। তাই সে শুধু হেসেই থেমে গেল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল "কি বেটি তোর পুতুল কেমন আছে ?"

ঘাড় বাঁকিয়ে রাবেয়া গম্ভীরভাবে বলল "ভাল।"

মেয়ের দিকে পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকাল আজিজ, পুতুলের মতই রাবেয়ার জামা আর পাজামাটা ছিঁড়ে গেছে, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রুক্ষ চুলগুলো দেখে বুকটা হুহু করে তার। ছোট একটা নথলাগানো ময়লা মুখটায় একজোড়া জলজলে তারার মত দুটো চোখ। আর দুটো লালচে ঠোঁট। আজিজের দরিদ্র সংসারে একটামাত্র ঐশ্বর্য্য ঐ মেয়েটা। প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল রঙীন দিনগুলো আর নেই, তখন জোহরাই ছিল সব। আজকাল রাবেয়াই সব। অথচ—

"বেটি—"

"আব্বাজান ?"

"তোর একটা নতুন পুতুল হলে বেশ হয়, তাই না ?"

"হ্যা"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলল রাবেয়া।

"দেব শিগগীরই এনে দেব তোকে। যেদিন আমাদের সংগ্রাম থামবে সেদিন আমার প্রথম কাজ হবে তোকে একটা নতুন পুতুল এনে দেওয়া, বুঝলি ?"

রাবেয়ার দু'চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে ব[illegible] "সত্যি ?"

"হাঁ বে[illegible]ব। আচ্ছা তখন এই পুরানো পুতুলটা দিয়ে কি করবি ? ফেলে দিবি ?"

রাবেয়া চট করে জবাব দিল না। সে তাকাল ছেঁড়া পুতুলটার দিকে, একবার হাত বুলোল তার গায়ে, পরে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু নেহি। এও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।"

এতদিনকার পুতুলটা—সুখদুঃখের কত মুহূর্তের সঙ্গী। আজ একটা নতুন পুতুল এলেই কি এর দাম কমে যাবে ! উঁহু। রাবেয়া অকৃতজ্ঞ নয়। না, পুরানোটাও থাকবে, নতুনটাও থাকবে।

"আচ্ছা বেটি—তুই খেলা কর, আমি এবার যাই।"

"কঁহা আব্বাজান ?"

"কুছ রুটি রোজগার কা বন্দোবস্ত করনে"—তারপরে সে তার হারেমের গোসাঘর মানে সেই খুপরীর মত রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে মচকি হেসে বলল, "আ জি শুনতি হো ?"

জবাব এল "নেহি।"

"খাপা না হো বিবি—মাৎ চলনা—"

জবাব নেই।

"শুনা জী—রাবেয়া কা বাপনে চলা আব—"

জবাব এল "যায় নেহি শুনি—"

আজিজ সশব্দে হেসে চলল "বাস বাস কাফি শুনি—অব যায় চলা।"

ঘরের কোণ থেকে ছোট বড় পোটলা মত তাস নিয়ে সে একবার মেয়ের চিবুকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ পেছন পেছন জোহরা এগিয়ে এল না, কিন্তু পাঁচ বছরের রাবেয়া তার ছেঁড়া পুতুলটাকে বাঁহাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে এল দরজা পর্য্যন্ত। দরজায় হেলান দিয়ে সে ঠিক মায়ের ভঙ্গীতেই তাকাল বাপের গমন পথের দিকে। তার কচি মুখে একটা গম্ভীর ভাব, যেন তার বয়স নেহাৎ কম নয়, যেন মানুষের দুঃখ কষ্টের সমস্ত ইতিহাসই সে জেনে ফেলেছে।

চলতে চলতে একবার পিছন ফিরে তাকাল আজিজ। নেহাৎই অভ্যাস। তাকিয়ে সে যা দেখল তাতে তার বুকটা ফুলে উঠল, দুলে উঠল, চোখে জল এল। তার আর দুঃখ করার নেই। অনেক দুঃখ পেয়েছে সে, অনেক লড়াই করেছে, হয়ত আরো দুঃখ পাবে, আরো লড়াই করতে হবে। কিন্তু সমস্ত দুঃখের মাঝে একটা অপরূপ ফুল ফুটেছে তার জীবনে। ঐ মেয়েটা। তার দেহেরই একটা অংশ।

কাঁটার বেদনাকে যেমন একটা রক্তগোলাপ ভুলিয়ে দেয় তেমনি ভাবে এ মেয়েটা তার দুঃখদীর্ণ জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। জোহরার পর আর একজন তবে দেখা দিয়েছে যে আজিজকে ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

শিয়ালদা আর বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে বাঁদিককার ফুটপাথের একপাশে আজিজ বসল, পোটলাদুটোকে খুলে বিছোল, জিনিষপত্রগুলোকে সাজাল। পেন্‌সিল, ব্লেড, সাপথালিন, ছুঁচ, বোতাম, খেলনা, বল, উর্দুতে লেখা ছোট ছোট গান আর গল্পের বই, চিরুণী, জুতোর কালি, ফিতছোলা এমনি নানা জিনিষ। লাইসেন্স নেই তবে পাহারাদার পুলিশদের দু'এক আনা দিলেই সব ঠিক থাকে।

তার আশেপাশে আরো নানা রকমের বিক্রেতা। জুতো পালিশ করনেওয়ালা দু'জন একজন ব্রাশ বিক্রেতা, দু'তিনজন কমলালেবু বিক্রী করছে, একজন একঝুড়ি ডাব নিয়ে বসেছে, এমনি আরো অনেকজন আছে। সারা জীবন ধরে, দিনের পর দিন ওরা এমনি ফুটপাথে বসে জিনিষ বিক্রী করে, সংসার চালায় এমনি জীবিকাকে অবলম্বন করে ওদের কোনো ঘর নেই মাথার ওপর নেই কোনো আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের আগুন আর বর্ষার জল দেখে ওদের জীবন-সংগ্রাম থেমে যায় না। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে, ভেঙ্গে চুরে, ওরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

খেয়ে দেয়ে এসেছে আজিজ। একেবারে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরবে বলে ওপাট সে চুকিয়ে বেরিয়েছে। এখন অফিসটাইম। জনস্রোত ক্ষিপ্রগতিতে বয়ে চলেছে। মানুষের জীবন-নদীর এ এক বিচিত্র রূপ। বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে সবাই, জায়গায় কুলোচ্ছে না। সে অবস্থাতেও গেলে তো হোত কিন্তু তাই বা হচ্ছে কোথায়। বেশীর ভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে। প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতেই বলা চলে। কেন? আগে তো এমন হোত না, শতকরা প্রায় নব্বইজন লোকই কোনো না কোনো কিছুতে চড়ে যেত। তবে? আজিজ তাকাল রাজপথের দিকে। ট্রামলাইন। দু'মাস আগে সেগুলো চক্‌চক্ করত এ সময়টাতে, তার খাঁজে খাঁজে আজ ময়লা, আজ তার দীপ্তি অন্তর্হিত। আজিজ তার বুকের ওপর হাত রাখল। সেফটিপিনে আঁটা একটা লাল কাগজ—তাতে লেখা 'ধর্ম্মঘটী ট্রামশ্রমিক'। আজ ট্রাম চলছে না, দু'মাস ধরে চলছে না। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের সেবা করেও তারা সসম্মানে বাঁচতে পাবছে না বলে আজ ট্রাম চলছে না। আজ ইলেক্‌ট্রিকের তারে বিদ্যুতের আগুন জ্বলছে না, পিচের পথ কাঁপছে না, শব্দ উঠছে না—ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘণ্টা বাজছে না—টং টং টং। আজ সব শান্ত, স্তব্ধ। শুধু বাসগুলো এক তাল সামলাতে গিয়ে ক্ষ্যাপার মত ছুটোছুটি করছে, রিকসা-ওয়ালারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে, ঘোড়ারগাড়ী আর ট্যাক্সি যা ইচ্ছে তাই দর হাকছে। আজ সব নীরব। ট্রাম চলছে না। এবং তাদের সম্মান না করলে ট্রাম চলবেও না, একটাও না।

জিনিষপত্রের সামনে চুপ করে বসে থাকে আজিজ। বড় অদ্ভুত লাগে তার এই নতুন বৃত্তিটাকে। অন্যমনস্কভাবে সে তাকায় চারদিকে। অনতিদূরে শিয়ালদা স্টেশন। তার ওপরকার আকাশে কালো ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ। শিয়ালদা ট্রামডিপোর দেয়ালের পাশে একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপন—তাতে একটা সুদর্শনা নারীর মুখ। ও ফুটপাথের একজন ফলওয়ালা তার আপেলগুলোকে মুছচে। বেলা বাড়ছে। চৈত্রমাসের রোদ যেন উত্তপ্ত ছোরার মত।

"ওহে, পেন্‌সিলগুলো কত করে?"

আজিজের চমক ভাঙ্গল। একজন ক্রেতা।

এমনি আরো অনেকে আসে।

'ব্লেডের প্যাকগুলো কত করে—ঐগুলো?"

এক টাকা—"

"এক টাকা! বল কি হে—এঁ্যা?"

এমনি আরো অনেক ক্রেতা আসে। কেউ কেনে কেউ কেনে না।

সময় কেটে যায় একটা দুটো জিনিষ বিক্রি করে আজিজ, আবার অন্যমনস্ক হয়ে তাকায় চারদিকে। বেলা বাড়তে থাকে। অফিস টাইমের ভীড় একটু কমেছে—তবু জনতা কম নয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে রৌদ্রের প্রাখর্য্য আরো বেড়ে যায়, তেলের মত ঘাম বেরোয় সারা গা দিয়ে, জ্বালা করে, কানদুটো গরম হয়ে ওঠে। সংগ্রাম। একটা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্যই এই সংগ্রাম করছে আজিজ এবং তার সহকর্মীরা। কুড়ি তারিখ। কোম্পানী নোটিশ দিয়েছে যে ঐ তারিখে যারা যারা যোগ দেবে না তারা বরখাস্ত হবে। নীরবে হো হো করে হাসে আজিজ। তাকায় পেছনকার দেওয়ালের দিকে, যার ওপর প্রাচীরপত্রে লেখা আছে যে দালাল দিয়ে ট্রাম চলবে না, ট্রাম জ্বলবে। মিবাহুদকে ভয় করে না তারা, দরকার হলে ঐ লোহার লাইনের ওপর রক্তের বাঁধ তৈরী করবে তারা। সত্য জয়-যুক্ত হবেই, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই।

"দো দো আনা লে যানা, মিঠা কেঁওলা খা যানা—'

আজিজ তাকাল। একজন কমলালেবু-বিক্রেতা সুর করে আউড়ে যাচ্ছে—ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। বেশ বড় আর মসৃণ কমলালেবু। আজিজ একটা কিনবে তার মেয়ের খাবার জন্য। কি রকম খুশী হবে মেয়েটা! কল্পনা করে আজিজ

"মুসলমানভি হার মানা, শ্বশুরবাড়ী লে যানা, দো দো আনা লে যানা"—একভাবে সুর করে আওড়াচ্ছে লোকটা আর রাস্তার লোকেরা হাসছে তার কথায়।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো আজিজের মাথায়। এই সব জিনিষ বিক্রি করে তার যা আয় হয় তাতে আর চলে না। অথচ ধর্ম্মঘট যে কতদিন চলবে তার স্থিরতা নেই। আরো কিছু উপার্জ্জন করতে হবে। কি করে? আচ্ছা, ঐ লোকটার মত সেও যদি কমলালেবু বিক্রি করে? হঁ, মন্দ হবে না। সে হয়ত চেঁচাতে পারবে না অমনভাবে, তবু কিছু তো বিক্রি হবেই। ঠিক, তাই করবে সে। স্থির করে ফেলল আজিজ।

লুঙ্গি বিক্রেতা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে ছিল, তার আজ তেমন বিক্রি হচ্ছে না। আজিজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বড় গরম, না মিঞা?"

"হাঁ—"

"হু"—লোকটা স্বল্পভাষী

খট্ খট্ খট। হঠাৎ একজন পুলিশ এসে দাঁড়াল পেছনে। কেউ তাকে আসতে দেখেনি, তাই হঠাৎ তাকে দেখে সবাই একটু হকচকিয়ে গেল। পুলিশের এই আকস্মিক উপস্থিতি বড় সন্দেহজনক ব্যাপার তাদের কাছে। আর সব চেয়ে বেশী ঘাবড়াল আজিজ।

পুলিশটি বোধ হয় আজিজের মুখ দেখেই টের পেল ব্যাপারটা, সে সোজা তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "কেঁও মিঞা, লাইসিন্ হ্যায়?"

আজিজ নিরুত্তরে তার বুকের ওপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করল, যেখানটায় একটা লাল কাগজের উপর ছাপা ছিল, 'ধর্ম্মঘটী ট্রামশ্রমিক'। তারপরে সে হাসল, খুব বিষণ্ণ ভঙ্গীতে, যেন সেই লাল কাগজের টুক্রো আর হাসি দিয়ে সে পুলিশকে জয় করবে।

কিন্তু পুলিশটি বিগলিত হল না রূঢ়ভাবে সে আবার বলল, "উসব না জানেহে, লাইসিন্ দিখ্‌লাও না তো—

অসহায় দৃষ্টিতে আজিজ এদিক ওদিক তাকাল লুঙ্গি বিক্রেতার সঙ্গে তার একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। হঠাৎ লুঙ্গি বিক্রেতা এগিয়ে এল।

"এ সিপাইজী—"

"ক্যা—"

'এই দেখেন লাইসেন্স—"

"উতো তুম্হারা - "

"হাঁ, এই জিনিষও যে আমার। ও আমার কর্ম্মচারী—'

পুলিশটি কট্‌মট্ করে খানিকক্ষণ তাকাল লুঙ্গি বিক্রেতার দিকে, তারপরে আজিজের দিকে, তারপরে বিড়বিড় করে কি বলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

আজিজ নিঃশব্দে একবার তাকাল লুঙ্গি বিক্রেতার দিকে, তারপর তার একটা হাত চেপে ধরল, তার চোখে কৃতজ্ঞতার আলো জ্বলে উঠল। লুঙ্গি বিক্রেতা মৃদু হাসল আর মাথা নাড়ল কিন্তু কিছু বলল না।

সমস্ত পৃথিবী যেন অপরূপ হয়ে উঠল আজিজের কাছে। না, তারা একা নয়। তারা জিৎবে। সে তাকাল। একটা বাস থেমেছে। একজন ট্রাম শ্রমিক চাঁদা সংগ্রহ করছে একটা টিনের কোটো নিয়ে। দিচ্ছে, লোকেরা সাহায্য করছে। আজিজ হাসল। জিৎবে, তারা জিৎবে। ইংরেজ মালিক তাদের বিরুদ্ধে, স্বজাতি ও স্বদেশী মন্ত্রীরা ... বিরুদ্ধে, তবু তারা জিৎবে। কত নির্যাতন আর শোষণ করবে ওরা? দুনিয়ায় গরীব আর মজুরই বেশী, তাদের কতদিন দাবিয়ে রাখবে? ধীরে ধীরে তাদের মত সবারই চোখ খুলবে, তাদের সংগ্রাম সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে, শেষে একদিন তারাই গড়বে নিজেদের ভাগ্য। আলবৎ জিৎবে আজিজেরা, আলবৎ।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরল আজিজ। বৈঠকখানা অঞ্চলের একটা বস্তীর মধ্যে তার ছোট্ট ঘরটা। ঘরের ভিতর কেরোসিনের ডিপো জ্বলছে। গন্ধযুক্ত কেরোসিনের ধোঁয়া আর স্বল্প আলো। তার মাঝে আজিজ ইন্দ্রজাল ঘটতে দেখে। একটা দড়ির খাটিয়া, মালা, ছেঁড়া বিছানা, দু'একটা উর্দ্দু বই, দুটো পুরোনো ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালের দড়িতে কয়েকটা পাজামা, লুঙ্গি, সার্ট ও ইউনিফর্ম, দুটো টিনের বাক্স আর কয়েকটা বাসন, কোণে একটা জলের কলসী আর দুটো মগ, একটা বদনা। ইন্দ্রজাল দেখে আজিজ। কোন্ একটা ভুলে যাওয়া দেশের শাহজাদা সে, এই তার রঙমহল, শীষমহল আর ঐ কেরোসিনের ডিবাটা যেন হাজার মোমের বাতির চেয়েও ভাস্বর।

"রাবেয়া"—আজিজ ডাকল।

ছোট ছোট পায়ের শব্দ ধ্বনিত হল, ছুটে এল মেয়েটা তার রুক্ষ চুল দুলিয়ে।

"আব্বাজান্"—মেয়েটা বলল হেসে।

"দেখ্, কি এনেছি বেটি—"

"কি?"

"চুপ করে দাঁড়া তবে—কেমন?"

"আচ্ছা—"

পকেট থেকে কমলালেবুটা বের করল আজিজ, তাকালে মেয়ের দিকে, তার চোখের ঔজ্জ্বল্যকে লক্ষ্য করে হাসল, তারপর মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল সে।

"লে বেটি লে—"

কিন্তু মেয়েকে স্পর্শ করেই চমকে উঠল আজিজ। রাবেয়ার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, গরম বালুর মত।

"বেটি?"

"আব্বাজান।"

"কি হয়েছে তোর?"

জোহরা এসে ঘরে ঢুকল, মেয়ের হয়ে জবাব দিল, বুখার- আজ বিকেল থেকে হয়েছে—'

হঠাৎ যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল আজিজ মেয়েটার একটা কিছু হলেই সে কাতর হয়ে পড়ে, তার চোখের সামনেকার সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসে।

"বুখার! তাহলে কি হবে জোহরা?"

জোহরা স্বামীকে চেনে, সে কাছে এসে স্বামীর গায়ে হাত রাখল, হেসে বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, ছেলেমেয়েদের কি বুখার হয় না? হয়েছে, আবার সেরেও যাবে—"

"ডাক্তারের কাছে যাই?"

"এখনি? এই খেটে এলে আর—ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কাল সকালে যদি বুখার না থামে তখন না হয় হাকিমকে বলো।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে পড়ল আজিজ, তাকাল মেয়ের দিকে। রাবেয়া কমলালেবুটা নিয়ে ব্যস্ত।

"বেটি—"

"উঁ?"

"খুব তক্‌লীফ হচ্ছে ?"

"উহুঁ—"

"আচ্ছা বেটি, তোর পুতলা কোথায় ? কি করছে সে এখন ?"

"সে এখন নিদ যাচ্ছে, ওরও তবিয়ৎ খারাপ। আমার তবিয়ৎ ঠিক না থাকলে তারও খারাপ হয়ে যায়—"

আজিজ আর জোহরা হাসল।

মেয়ের একপাশে বসল আজিজ আর একপাশে বসল জোহরা। বসে বসে তারা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা বল্‌ল। সংসারের খুঁটিনাটির কথা, অভাব অভিযোগের কথা।

হঠাৎ জোহরা এক সময়ে প্রশ্ন করল, "তাহলে তুমি কাল কাজে যোগ দেবে না ?"

"না জোহরা"—আজিজ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

"লেকিন্‌—"

আজিজ জোহরার একটা হাত চেপে ধরল, "জোহরা—"

জোহরা থেমে গেল, তারপরে মৃদু হাসল, বুঝেছি, কিছু মনে করো না, লোভী, বড় লোভী আমি।"

জোহরার হাতে মৃদু একটা চাপ দিল আজিজ আর একটু হাসল।

"যাই, রুটি বানাইগে"—হঠাৎ জোহরার অসমাপ্ত কাজের কথাটা মনে পড়ল।

"জোহরা—"

"কি ?"

"তুমি কি এখনো রাগ করে আছো ?"

"না।"

জোহরা চলে গেল, মেয়েকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইল আজিজ। জোহরার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। সাধারণের জীবন-দর্শন। কিন্তু সে কি করে জোহরাকে বোঝাবে যে আর সহ্য করা যায় না, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানেরা কোটি কোটি লোককে বঞ্চিত ও হতভাগ্য করে রেখেছে। সে কি করে জোহরাকে বোঝাবে যে তারা সেই সব রাজা আর নবাব বাহাদুরদের, মালিক আর জমিদারদের ধ্বংস করবে।

পরদিন সকালে রাবেয়ার জ্বর কমল না, বরং বাড়ল। আজিজ দৌড়োল হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে। হাকিম তাকে আশ্বাস দিল যে ব্যাপার এমন কিছু নয়, ও সেরে যাবে। এক শিশি ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল আজিজ মেয়েকে খাওয়াল, তার পাশে এসে বসল, নানা কথায় মেয়ের মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তারপরে একসময়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল

"খাবে ?" জোহরা প্রশ্ন করল

"হুঁ—"

"বোস।"

খেতে বসল আজিজ।

"কোথায় যাবে এখন ?" আড়নয়নে তাকাল জোহরা। সে তার স্বামীকে চেনে। সে জানে কি জবাব দেবে সে, কোথায় যাবে আজিজ। তবু মুহূর্ত্তের জন্য ভাবতে ভালো লাগল তার যে আজিজ হয়ত বলবে যে সে কাজে যোগ দেবে, সে জোহরার উপদেশকেই মেনে চলবে আর তার এই আনুগত্য প্রকাশিত হলে জোহরার হৃদয়টা অদ্ভুত একটা আত্ম-তৃপ্তিতে ভরে উঠবে, চোখে মুখে ঝলসে উঠবে বিজয়িনীর গর্ব্ব।

কিন্তু আজিজ যা বলল তা এই, "কোথায় যাব আবার, শিয়ালদার মোড়ে -আজ আবার কিছু কমলালেবুও বিক্রী করব—বেশ লাভ হয় ওতে। গরমের দিন, লোকে পিয়াসের জ্বালায় কিনবেই এক আধটা। কাল আমি করিম মিঞার সঙ্গে কথা বলেছি—একশ কমলালেবু সে আমায় বিক্রী করতে দেবে - জমা লাগবে না কিছুই।"

বল্‌তে বল্‌তে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল আজিজ।

জোহরা তাকাল স্বামীর দিকে। সে কি নিরাশ হল ? স্বামী তার কথায় কান দিচ্ছে না বলে সে কি আবার রেগে যাবে আজ ? কিন্তু না, কোন জ্বালাই তো সে অনুভব করছে না। তার স্বামী সমস্ত বাধাকে জয় করে সৈনিকের

মত অবিচলিত রয়েছে জেনে, তার কাছে সে হার মানল না দেখে জোহরা হঠাৎ খুশীই হল। স্বামীকে হারাবার আত্মগর্ব্বের থেকে স্বামী যে অপরাজেয় এই স্বামী-গর্ব্বই তার যেন বেশী হল। নিজের মনকে দেখে খুশী হল জোহরা আশ্বস্ত হল। তবু তর্ক করার ঝোঁকটা সে এড়াতে পারে না যে।

সে বলল, "কিন্তু লীগের মন্ত্রীরা যে কথা বলেছেন তা কি মিথ্যে ?

আজিজ মুখ তুলল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "সব মিথ্যে জোহরা সব ঝুটা। ওরা পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের কথা ভাবছে ভাবছে নিজেদের পেট মোটা করার কথা নিজেদের জবরদস্ত আর দৌলৎমন্দ করার কথা। পাকিস্তান কথাটা শোনায় ভালো, হলে ওদেরি লাভ, আমরা যে কে সেই থাকব। যখন মুসলমানেরা দেশের মালিক ছিল তখনো আমরা গরীব, এখনো তাই থাকব। তাই ওসবে ভুললে আমাদের দুঃখ কোনদিনই দূর হবে না জোহরা—"

"তাহলে তোমরা কি করবে ?"

"যা করছি—লড়াই। গরীবেরা এক জাত—তাতে হিন্দু মুসলমান নেই—'

জোহরা চুপ করে গেল।

খাওয়া শেষ করে উঠে গেল আজিজ।

পোঁটলা নিয়ে সে যখন বেরোবার উপক্রম করছিল এমনি সময়ে ডাকল রাবেয়া।

"আব্বা—"

"হাঁ বেটি—"

"শুনো—"

"হাঁ হাঁ বোলো বেটি"—রাবেয়ার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আজিজ, "ক্যা বাৎ হ্যায় বেটি ?"

"বোলুঁ ?"

"বোলো—বোলো" -মমতায়, স্নেহে কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এল আজিজের। মেয়ের জ্বরোত্তপ্ত ললাটের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

রাবেয়া তাকালো, ক্ষীণ হাসি হেসে বলল, "নয়া পুৎলা আজ লাও গে ?"

"আজ বেটি—আজ ?"

"আজ না হোয় তো কাল ?"

"হাঁ হাঁ—লাউঙ্গা —"

আজিজ ছোট একটা চুমু এঁকে দিল মেয়ের ললাটে, তারপরে উঠে বলল, "আনব বেটি—এবার তুমি ঘুমোও, কেমন ?"

"আচ্ছা"—মাথা নাড়ল রাবেয়া। নতুন পুতুল আসবে, আর কি চাই। মুখে তার হাসির আভাস দেখা গেল দেখা গেল একটা চাপা উত্তেজনা।

জোহরা তাকিয়ে তাকিয়ে বাপ-মেয়ের এই ছবিটি দেখল। তার চোখ দুটো একটা অপরিচিত অনুভূতিতে জ্বালা করতে লাগল। ছোটবেলার রূপকথা তার জীবনে সত্য হয়েছে—হয়ত অন্যভাবে, তবু তা সত্যই হয়েছে। তার পুরুষ, তার ঐ ননীর মত, চাঁদের মত মেয়েটা—এরা কি কত ঐশ্বর্য্য। নয়, জোহরার দুঃখ করার নেই।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

চলতে চলতে সে তাকালো চারিদিকে। আবার সেই ছবি। অফিসমুখী জনতা। ভর্ত্তি বাস্। দ্রুত পদক্ষেপ। আর ওদিকে লোহার লাইনে চাকচিক্য নেই, তার খাঁজে খাঁজে ধুলো। বিদ্যুতের তারে আগুন জ্বলছে না, শব্দ হচ্ছে না ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘট্, বাজছে না টং টং টং। ট্রাম চলছে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে তা থেমে গেছে। অন্যায় দূর হলেই আবার তা চলবে। লীগ ? মন্ত্রীসভা ? হাসল আজিজ। সে খুব চিনেছে তাদের। মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে তারা। নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্য সাধারণ মুসলমানের হাতে তারা ধারালো ছোরা গুঁজে দিয়েছে। শুধু আজিজের মত শ্রমিকেরাই তাদের সেই ছোরাকে গ্রহণ করেনি। তারা জানে ওদের মৎলব কি। তাই ওসব ভাঁওতায়

তারা ভুলবে না। আজ কুড়ি তারিখ। কোম্পানীর নোটিশ। কিন্তু কার সাধ্য ট্রাম চালাবে? শেয়ালদার ট্রাম ডিপোতেই আজ আজিজের ডিউটি। সে তার জিনিষপত্র বিক্রি করবে আর লক্ষ্য রাখবে। যদি কেউ চালায় তবে বাধা দেবে। ইউনিয়নের নির্দ্দেশ সে কাল রাতে পেয়েছে। যদি দরকার হয় তবে খুন ঢালবে আজিজ। জানোয়ারের মত দিনের পর দিন বেঁচে থাকার চেয়ে বাহাদুরের মত খুন ঢালা ঢের ভালো।

খুব খুশী মনে বাড়ী ফিরল আজিজ। কুড়ি তারিখের সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল সে। তারা জিতেছে আজ। সংগ্রাম শেষ হয়নি তবু আজ একটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তারা তাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। আজ একটা ট্রামও চলতে পারেনি। একটাও না। সাধারণ মুসল-মানদের দাঙ্গার নামে উস্কে তাদের ধর্ম্মঘটকে মাটি করতে চেয়েছিল সদাশয় দেশী সরকার—কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল তাদের আসন্ন বিজয়ের দিকে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে মনের আলোটা দপ করে নিভে গেল।

মুখ শুকনো করে রাবেযার পাশে বসে আছে জোহরা। স্বামীকে দেখে যেন স্পন্দন ফিরে পেল সে।

"কি হয়েছে বিবি—এঁ্যা?" আজিজ শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্ন করল।

ঠোঁট নড়ল জোহরার, বলল, "রাবেয়া—"

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। চোখ বুজে ঘুমের মত শুয়ে আছে রাবেয়া। বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

"কি হল রাবেয়ার—এখন জ্বর কি রকম?"

শুষ্ককণ্ঠে জোহরা বলল, "জ্বর আরো বেড়েছে, শির ধুইয়ে দিয়েছি তবু জ্বর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—"

"সকালের দিকে তো একটু কম ছিল—"

"হুঁ—"

"তাহলে—কি করি?"

"হাকিমের কাছে যাও—"

"তাই—তাই যাই—তুমি, তুমি ততক্ষণ একটু জল-পটি দাও ওর শিরে, কেমন?"

"আচ্ছা—"

উত্তেজিতভাবে আবার ঘর থেকে বেরোল আজিজ। হাকিম নিজামুদ্দিনের কাছে গেল। হাকিম আবার তাকে অভয় দিল। এমন কি ব্যাপার আজিজ, ঘবড়ো মৎ বেটা, ঠিক হো জায়েগা। আরো দুটো শিশি দিলে হাকিম। দাম এক টাকা। ট্যাকের সব কিছু বের করে দিয়ে থুয়ে রইল ছয় আনা। আজ লাভ হয়েছিল পাঁচ সিকা মত। কালকের দু'আনা ছিল। রাবেয়ার পুতুল কেনা এখন অসম্ভব। আহা বেচারী নিজে মুখ ফুটে চেয়েছিল। দিতে হবে কোনো মতে পরে, খুদা'বটা কসুর।

কিন্তু চার পাঁচদিন পরেও জ্বর কমল না। সকালের দিকে জ্বর কম থাকে, আশা হয় যে একেবারেই ছেড়ে যাবে, কিন্তু যেই বেলা বাড়তে থাকে জ্বরও তেমনি ওপরে চড়তে থাকে।

হায়রাণ হয়ে পড়েছে আজিজ। মেয়ের এমন অসুখ কিন্তু পয়সা পায় কৈ? বাড়ীতে জোহরা একা ঘাবড়ে যায় কিন্তু থাকবার উপায় কৈ? পোঁটলা নিয়ে আর ঝুড়ি নিয়ে তাকে শেয়ালদার মোড়ে গিয়ে বসতে হল। মনিহারী জিনিষ আর কমলানেবু। এই বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হবে, রাবেয়াকে সুস্থ করতে হবে, নিজেদের ধর্ম্মঘটকে চালু রাখতে হবে জিৎ না হওয়া পর্য্যন্ত।

সেই কমলানেবুওযালার মতই অভ্যস্তকণ্ঠে সেও হাঁকে—'দো দো আনা লে যানা—মিঠা কেঁওলা লে যা যানা—"

সেই লোকটা হাসে, বলে, "এ ইয়ার ট্রেয়াম কোম্পানী—"

"হাঁ ইয়ার ?"

"ই তো মেরা বাৎ হায়—"

"বেশখ—বড়া মিঠা বাৎ হায়—"

লোকটা আর আপত্তি করে না, কেবল হাসে, তারপর বলে, "আচ্ছা, আও দোনো মিলকে চিল্লাবেঁ—"

লুঙ্গিওয়ালা বিড়ি টানতে টানতে সায় দেয়, "হুঁ—তাই ভালো- কাজিয়া করো না "

ওরা একসঙ্গে হাঁকে—"হাঁ দো দো আনা লে যানা, রস্‌গুল্লা ভি হার মানা—"

সন্ধ্যা হলে দ্রুতপদে বাড়ী ফেরে আজিজ। দুরুদুরু বুকে। হয়ত আজ রাবেয়ার জর থেমেছে। হয়ত।

কিন্তু 'হয়ত'টা হয় না। রাবেয়ার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে থাকে। হাকিম নিজামুদ্দিনকে পয়সা দিয়ে যে ওষুধ কিনেছে আজিজ, তার ফল একটুও ফলে না দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে বস্তির বুড়ো আহ্‌সান আলির কাছে পরদিন গেল সে। "কি করি চাচা ?" মেয়ের কথা বলে পরামর্শ চাইল আজিজ।

বুড়ো আহ্‌সান অনেকক্ষণ ভাবল, পরে বলল, "তুমি পটলডাঙ্গার মোড়ের ডগ্‌দার রায়কে দেখাও বেটা —লোকটার জ্ঞান আছে।"

"হাঁ ?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা।"

ইউনিয়ন ফাণ্ড্ থেকে গোটা তিনেক টাকা পেয়েছিল আজিজ। তার ওপর ভরসা ক'রে মেয়েকে কাঁথায় জড়িয়ে, কোলে নিয়ে সে ডাঃ রায়ের ওখানে গেল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখল রাবেয়াকে, তারপরে বলল, "জ্বরটা খারাপ হে মিঞাসায়েব—প্যারাটাইফয়েড—"

"জী ?"

"ঘাবড়ো না—ভালো ভাবে চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।"

"সারিয়ে দিন ডাগ্‌দারবাবু—দোহাই"—ছেলেমানুষের মত হাত জোড় করল আজিজ।

ডাক্তার হাসল, "তুমি কি পাগল নাকি হে, অত ভয়ের কিছু নেই—ভালো করে চিকিৎসা হলেই বিপদ কেটে যাবে—"

পকেট উজাড় করে ওষুধ কিনে বাড়ী ফিরল আজিজ।

রাস্তায় কানের গোড়ায় রাবেয়ার ক্ষীণ কণ্ঠ ধ্বনিত হল, "আব্বাজান—"

"বেটি—"

"মেরি নয়া পুতলা ?"

নতুন পুতুল। লজ্জা পেল আজিজ। কিন্তু কি করবে সে? হাকিম ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যেই তো সব বেরিয়ে যাচ্ছে, পুতুল কেনে কি করে ?

তবু মেয়েকে আশা দিতে হবে—সত্য কথায় মেয়েটা খুশী হবে না। ওর এতটুকু আশা, এত ছোট একটা দাবী যদি না মেটে তাহলে দুঃখ পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

"দেব দেব বেটি, নিশ্চয় দেব।"

হ্যারিসন রোড ধরে এগোচ্ছিল আজিজ। এমনি সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করল যে রাস্তায় যেন লোক চলাচল হঠাৎ অতিমাত্রায় দ্রুত হয়ে উঠেছে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গাড়ী ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না, বাস চলছে না, ট্যাক্সিগুলো সবেগে ছুটে যাচ্ছে আর মানুষেরা অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে দ্রুত হাঁটছে।

"ব্যাপার কি ?"

পার্শ্ববর্তী লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া ভাই ?"

লোকটি বোধ হয় হিন্দু, সে চলতে চলতে কটমট করে তাকাল আজিজের দিকে, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "কি আবার—দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা !" কুড়ি তারিখে যা কত্তে পারেনি কর্তারা সেই দাঙ্গা লেগে গেল। হঠাৎ আজিজের মনে পড়ে

গেল যে আঠাশে তারিখের সাধারণ ধর্ম্মঘটকে পণ্ড করল এই দাঙ্গা।

বিবর্ণ হয়ে সে বলল, "আবার দাঙ্গা।"

লোকটি শ্লেষভরে বলল, "হ্যাঁ উপায় কি, তোমরাই তো ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছ মিঞা—"

আজিজ মাথা নাড়ল, নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখাল বুকের ওপরে যেখানে লাল কাগজে লেখা আছে 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। ম্লানভাবে হাসল সে, যেন বলতে চাইল যে আমরা অন্য লোক ভাইসব আমরা হিন্দুস্থানেরও নই, পাকিস্থানেরও নই, আমরা ভুখা মজদুর, আমরা বিত্তহীন শ্রমিক, আমরা গরীব উলুখড়। যারা ছোরা চালায় আর ছোরা খায় তারাও তাই, শুধু ওরা কেউ জেনেও জানে না যে এ রক্তপাতে ঘাতক আর নিহতের কোনো লাভ নেই, লাভ শুধু কয়েকজন তক্তওয়ালাদের যারা উপরে বসে দূরবীণ দিয়ে যুদ্ধের মানচিত্র দেখে আর দুষ্টগ্রহের মত মূর্খ জনগণকে সর্ব্বনাশের দিকে তাড়না করে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল আজিজ। রাবেয়া। কোন উন্মুক্ত রক্তলোভাতুরের মুখোমুখী দাঁড়ানো তার চলবে না।

জোহরা সামনে এসে দাঁড়াল, "না, আজ তোমার যাওয়া চলবে না।"

"মানে—কেন?" বুঝেও না বোঝার ভাণ করল আজিজ।

জোহরার মুখে চোখে শঙ্কার ছাপ, বিরক্ত হয়ে তিক্তকণ্ঠে সে বলল, "কেন অমন করছ বলতো?"

"তুমিইবা কেন অমন করছ?"

"দাঙ্গা লেগেছে তার মধ্যেই যাবে?"

"না গেলে চলবে কি করে?" রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে আজিজ বলল, "মেয়েটার অসুখের কথা মনে নেই? আর এদিকে পকেটও যে শূন্য তাওতো জান।"

"তা হোক—তবু—"

"তুমি পাগল জোহরা—"

"আর তুমি উন্মাদ—"

"মানলাম, তব আমাকে যেতেই হবে। আমি অনাহারে থাকতে রাজী আছি কিন্তু আমার ঐ চিরাগকে আমি ভুখ আর বিমারীতে মরতে দিতে পারিনা বিবি। না আমায় তুমি আটকো না। আল্লা আমার মদৎগার আর—আর দশ বছরের পুরানো মজদুর আমি আমায় কেউ মারবে না। কারণ সবাই জানে যে আমরা একতরফা কারো সুখ চাই না—আমরা চাই সবার সুখ, সবার শান্তি—"

জোহরা মুগ্ধ হয়ে গেল। কড়া পর্দ্দা না থাকলেও সে পর্দ্দা মানে। বাইরের পৃথিবীটা ছোট হয়ে তার এই ছোট ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। বড় বড় নেতাদের সে নাম শুনেছে কিন্তু কারো বক্তৃতা শোনেনি। আজ একসঙ্গে আজিজের এতগুলো কথা যেন তাকে অভিভূত করে দিল। কিছুই আর বলতে পারল না সে শুধু নির্ব্বাক হয়ে দেখল যে মেয়ের দিকে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পৌটলা গুলো নিয়ে আজিজ বেরিয়ে গেল।

আজিজ বেরিয়ে গেল।

বস্তীর লোকেরা উত্তেজিত আলোচনা করছে। দল বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে। দু'একজনের হাতে লাঠি সোটাও দেখা গেল।

বুড়ো আহসান আলি পেছন থেকে ডেকে বলল, "এই দাঙ্গায় কোথায় যাচ্ছিস বেটা?"

আজিজ মৃদু হেসে বলল, "আমি তো দাঙ্গাবাজ নই চাচা, ঘরে বসে থাকলেও খেতে পাব। তাছাড়া আমার বেটির অসুখ, আজ কিছু রোজগার করতেই হবে।"

এগিয়ে গেল আজিজ। পেছনে কয়েকজন একটা কঠিন মন্তব্য করল কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

হ্যারিসন রোডে পড়ল সে। রাস্তা প্রায় জনহীন বলা চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে ঝড়ের মত। গলির মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলী জনতা। শিয়ালদার মোড়ে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ এসে ঘাটি করেছে। দুই ফুটপাথ দিয়ে অল্প অল্প লোকজন চলাচল করছে।

ডান ফুটপাথে হিন্দুস্থান, বাঁ ফুটপাতে পাকিস্থান। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাঘাট, থম্‌থম্ করছে সব। খর রৌদ্রতাপে আকাশ মরুভূমির মত, রাস্তা গরম তাওয়ার মত, বাতাস লু'এর মত। সেই বাতাসে টের পাওয়া যায় মানুষের বন্য হিংস্রতাকে, রক্তমাখা ছোরাকে দেখা যায় শূন্যতার দর্পণে। আর অদৃশ্য তুষার-স্রোতের মত নিরন্তর ভেসে আসছে কুৎসিত ভয়ের স্রোত, তার স্পর্শে চেতনায় সাইরেণের মত আর্ত্তনাদ উঠেছে, পা অসাড় হয়ে পড়েছে।

জোর করে তবু এগোল সে শিয়ালদার মোড়ে, বাঁদিক ঘেঁষে সে বসল। উত্তেজিত কোলাহল ভেসে এল রাজা-বাজার আর মাণিকতলার দিক থেকে। সশস্ত্র পুলিশ-বাহী লরি চলে গেল কয়েকটা। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তীরের মত একটা ফায়ার ব্রিগেড ডান দিকে চলে গেল। ডানদিকের একটা গলিতে তিনচারটে ছেলেমেয়ে তখনো খেলা করছে। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর কোনো ভয়ডর নেই। রাবেয়ার অসুখ। একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু কোত্থেকে দেবে সে? কোত্থেকে?

নাঃ, রাস্তা ক্রমশঃ আরো জনহীন হয়ে পড়ছে। কোলাহল। একটা মোটর ভ্যানে ঘোষণা করে গেল যে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল আটটা পর্য্যন্ত কারফিউ জারী হোলো।

উঠল আজিজ। বাড়ী না ফিরে আর উপায় নেই। মোট বিক্রি হয়েছে দু'টাকা। লাভ আনা ছ'য়েক। মাথা ঘুরে যায় তার। যদি দাঙ্গা এমনি ভাবেই চলে তাহলেই হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। স্বার্থপর অন্ধদের কল্পনা। সাম্য-বিরোধী ধর্ম্মান্ধদের লড়াই। নিরীহের প্রাণহরণ করে তাদের সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরী করছে। কিন্তু কতকাল? কতকাল?

বাড়ীর দিকে ফেরে আজিজ। চলতে চলতে এদিক ওদিক, সামনে পেছনে তাকায়। সন্দেহজনক কেউ নেই তো! চলতে চলতে বুকের ওপরকার সেইখানে হাত রাখে যেখানে সেপটিপিন দিয়ে আঁটা লাল কাগজের ওপরে লেখা আছে, 'ধর্ম্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'। যেন একটা অক্ষয়-কবচ ওটা, যেন ভূত প্রেত দৈত্য দানা আর তাদের মত অস্বাভাবিক মানুষেরা ওটাকে দেখেই পালিয়ে যাবে।

দু'দিন কাটল, জ্বর কমেনি রাবেয়ার। দু'দিন কেটেছে অথচ দাঙ্গা থামেনি। মনে হচ্ছে আরো বাড়বে, বাড়তে বাড়তে ষোলোই আগষ্টের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। দু'দিন কেটেছে আর এই দু'দিন আজিজ কিছুই উপার্জন করতে পারেনি। কেবল ঘরের মধ্যে নিষ্ফল হতাশায় পায়চারী করেছে, মেয়ের পাশে গিয়ে বসেছে, বস্তীর লোকদের উত্তেজিত ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে সতর্ক করেছে যেন তারা ভুল না করে, জ্ঞান না হারায়। এই বস্তীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। তার কথায়, আহ্‌সান আলির সদুপদেশে ফল ফলেছে, তারা কোনো গোলমালে যোগ দেয়নি।

কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কি করবে আজিজ? ডাক্তার? ডাক্তারের কাছে যাবে কি করে?

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল আজিজ। রোগশয্যায় মিশিয়ে আছে রাবেয়া, তার পাঁচ বছরের চিরাগ, তার বেদনাকণ্টকিত জীবনের রক্ত-গোলাপ। পুতুল—একটা নতুন পুতুল চেয়েছিল মেয়েটা অথচ—না, ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে কোনমতে।

একটা ধুতি পরে সে বেরিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট বাদে, অতি সন্তর্পণে সে ডাঃ রায়ের বাইরের ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার রায় চমকে উঠল, বলল, "তুমি!"

"জী—"

"কি চাই?"

"বেটীর অসুখ আরো বেড়েছে ডাক্তারবাবু—"

"বেড়েছে?"

"জী—ওকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাগ্‌দারবাবু—দোহাই আপনার—"

"হুঁ -দাঁড়াও—"

সব শুনে প্রেসক্রিপশন লিখল ডাক্তার রায়, তারপরে আজিজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার তাড়াতাড়ি চলে যাও—এ পাড়ায় আসতে তোমার ভয় হোল না?"

"লেড়কির জন্য—ইয়ে—তাছাড়া আমি তো মজদুর ডাগদারবাবু"—ম্লানভাবে হেসে সে নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

ডাক্তার রায় হাসল, "ওসব কথা ভুলে যাও, এখন লোকেরা ওসব বাছবিচার করে না—"

ম্লানভাবে হাসল আজিজ, তারপরে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক্তার রায়কে সেলাম জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর থেকেই আজিজ শুনতে পাচ্ছিল ওদের আলোচনা। রাস্তায় ওরা জটলা পাকাচ্ছিল।

জোহরা বিবর্ণমুখে বলল, "এত লোক খুন জখম হয়েছে। এঁ্যা। বস্তীতেও আগুন ধরানো হচ্ছে?"

আজিজ শুষ্ককণ্ঠে বলল, কুত্তাশালারা এইসব করছে—খুনের নেশা। সরাবের নেশার মত, নেশা না কাটলে ওরা বুঝতে পারবে না যে কি করছে ওরা। কিন্তু ওকথা থাক বিবি, এখন মেয়ের দিকে তাকাও—"

জোহরা নিৰ্ব্বাক হয়ে গেল, স্বামীর বেদনার্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সত্যি, বড় রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা।

মেয়ের রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজের দু'চোখে জল এল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে রাবেয়ার সারা দেহ, চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গীতে পড়ে আছে সে, যেন একটা আহত পাখীর ছানা। তার দুচোখের কোলে গাঢ় কালো ছায়া, গলাটা একটু ভেঙ্গে গেছে, হাতপা-গুলো শীর্ণ। তার রুক্ষ চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আজিজ কেঁদে ফেলল।

মেয়ের কাণের সামনে মুখটাকে নিয়ে সে ডাকল—"বেটি রাবেয়া—মেরা মাই—"

রাবেয়া চোখ মেলল, বাপকে দেখে শীর্ণ হাসি হাসল, বাপের চোখের জল দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "রোতে কিউ আব্বাজান?"

জোহরা মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে আর এদৃশ্য সহ্য করতে পারছে না, তারো বুক ঠেলে কান্না আসছে।

আজিজ মাথা নেড়ে জবাব দিল, "আঁখমে কুছ গিরা হোগা—আচ্ছা বেটা, ক্যায়সি হো আভি?"

মাথাটা বাঁ দিকে কাৎ করে ললাটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে রাবেয়া বলল, "আচ্ছি হুঁ—"

তারপরে হঠাৎ কি মনে পড়ায় আবার হেসে বলল, "আব্বাজান—"

"হাঁ বেটি?"

"মেরা নয়া পুৎলা?"

লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে সবেগে মাথা নাড়ল, "লাউঙ্গা—তুম্হারা নয়া পুৎলা আযাযগা বিটিয়া—"

'আচ্ছা"—আশ্বস্ত হয়ে রাবেয়া চোখ বুজল।

মেয়ের দিকে তাকাল আজিজ। একটা পুতুলের দাবীকে সে মেটাতে পারছে না। তার রাবেয়া, তার চিরাগ, তার দুঃখদীর্ণ জীবন-বৃক্ষের একটি মাত্র ফুল। যদি হঠাৎ রাবেয়া মরে যায়। ছিঃ—একি ভাবছে সে। কিন্তু সত্যি, যদি রাবেয়া তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তাহলে তো তার এই নতুন পুতুলের সাধটা অপূর্ণ হয়ে থেকে যাবে। তাই কি হবে, তাই কি হতে পারে কখনো?

সে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ?" জোহরা প্রশ্ন করল।

"আসছি।"

গেল সে আহসান আলির কাছে। কয়েকটা টাকা ধার করবার জন্য।

শিয়ালদয়ের মোড়ে কতকগুলি দোকানে দরজাগুলোকে একটু ফাঁক করে রেখেছিল। দু'একজন নিতান্ত অভাবে পড়ে জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে সে একটা পুতুল চাইল। দোকানী তাকে দেখে সন্দেহের চোখে আড়নয়নে তাকাতে লাগল

পুতুল বের করতে করতে। নানা রকমের পুতুল। নানা দামের—তারি মধ্যে একটা মেয়ে-পুতুল সে দেড় টাকা দিয়ে কিনল, বেশ পছন্দ হল তার পুতুলটা। রাবেয়াও নিশ্চয় খুশী হবে। এর আগের পুতুলটার দাম ছিল মাত্র ছ'আনা, এর দেড় টাকা। আসমান-জমিন তফাৎ। পুতুলটা পেলে রাবেয়ার রোগশীর্ণ মুখটা কেমন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে তাই কল্পনা করে খুশী হয়ে উঠল আজিজের মন। না, রাবেয়া ঠিক সেরে উঠবে। খোদা, তোমার দয়ার সীমা নেই, তুমি রাবেয়াকে সুস্থ কোরে তোলো।

সাবধানেই আসছিল। হঠাৎ যেন মনে হল যে, ওপাশের ফুটপাথ থেকে কে একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবেগে। থমকে সরে দাঁড়াবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল তা। আকস্মিক।

একটা ছোরা আমূল বসে গেছে আজিজের পিঠে, সেই অবস্থাতেই ছোরাটাকে ছেড়ে দিয়ে আততায়ীটি আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করলে আজিজ। দূরে যারা দেখতে পেয়েছিল তারা হৈহৈ করে উঠল। ত্রস্ত পদক্ষেপ।

ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল আজিজ, পিঠে আর বুকে একটা প্রচণ্ড জ্বালা, বেদনা। পিঠে হাত দিতে গিয়ে হাতের পুতুলটা ছিট্‌কে পড়ে গেল। বেদনায়, যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। পড়ে গিয়ে তাকাল পুতুলটির দিকে, এগিয়ে সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পুতুলটি ছিট্‌কে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছে। হতাশ, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে সে একবার পুতুলটার দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকাল, হাত রাখল সেই জায়গাটায় যেখানে সেফটিপিনে আঁটা লাল কাগজটার ওপর লেখা আছে 'ধর্মঘটী ট্রাম শ্রমিক'।

যেন সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। অসহ্য যন্ত্রনায় সব কিছু একেবারে অন্ধকার হবার আগে অস্পষ্ট গোঙানীর সঙ্গে সে একটু পাশ ফিরল আর বুকের উপরকার সেই লাল কাগজটা তার নিজেরি রক্তে আরো লাল হয়ে উঠল।

এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলন

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে রবিবার ২৩শে মার্চ্চ ১৯৪৭ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এসিয়ার প্রথম আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী সম্মেলনের বিরাট অধিবেশন আরম্ভ হয়। বত্রিশটি দেশের প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

এই সম্মেলনে যুদ্ধোত্তর জগতে এসিয়ার নিজস্ব অধিকার এবং স্থান সম্বন্ধে বিবিধ পর্য্যালোচনা, এসিয়ার দেশগুলির সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে মত-বিনিময় এবং এসিয়াবাসীদের মধ্যে পরস্পরকে বুঝিবার, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া হৃদ্যতাপূর্ণ কথোপকথন ও গবেষণা চলে।

রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় পুরাতন কিল্লায়—বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক বিশাল মণ্ডপে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

মনে হয় ইতিপূর্ব্বে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের পাটলিপুত্র, অথবা শাহান-শাহ আকবর, শাহজাহান প্রভৃতির সময়ে দিল্লীতেও এরূপ সুদূরস্থিত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত প্রতিভূস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের এবং সদস্যবৃন্দের—জনবহুল সভা আর কখনও সমাহূত হয় নাই।

তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গকে দিল্লী পৌছিতে ঘোড়া, মোটর-কার, রেল এবং বিমানযোগে,—পূর্ণ ২১ দিন সময় লাগে, আবার চীনের প্রতিনিধি মিঃ চেঙ্গ ই উ ফুন প্রভৃতি নানকিঙ হইতে নয়া দিল্লী মাত্র ৩ দিনে বিমানযোগে আসিয়া পৌছান।

সভারম্ভে— অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীরাম —তাঁহার স্বাগত-সম্ভাষণ পাঠ করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সভা উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন।

আমন্ত্রিত দেশসমূহ

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার দেশসমূহ—যথা: সোভিয়েট রিপাব্লিকসমূহ, চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ভুটান, আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান, আরব, তুর্কি, পালেষ্টাইন, আর্ম্মেনিয়া,—ব্রহ্ম, মালয়, ভীটনাম,—ইন্দোনেসিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল প্রভৃতি এসিয়ার সমস্ত দেশকেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়। মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থান হইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও পর্য্যবেক্ষক (Observer) হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়।

বেসরকারী এবং অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড্ অ্যাফেয়ার্স এই সম্মেলনের আয়োজন করেন।

এই সম্মেলনে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনা বর্জ্জন করিয়া এসিয়ার দেশ-সমূহের সাধারণ অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী আলোচিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই জাতীয় এবং সামাজিক বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত থাকায় সভামঞ্চের দৃশ্য বহু বর্ণে বিচিত্র এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঐতিহাসিক জনতা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত, মন কৌতূহলান্বিত এবং আত্মা জাগ্রত ও উন্নীত হইয়া উঠে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে মুগ্ধ-চক্ষু যেন ক্যামেরার মত আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়া স্মৃতির পটে অবিস্মরণীয় চিত্রাবলী চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখে।

২। চীন ৩। ইন্দোনেসিয়া ৪। লেবানন্ ৫। ফিলিপাইন ৬। তুরস্ক ৭। সাউদি আরব ৮। ট্রান্স্-জর্ডানিয়া ও ৯। ইয়েমেন থাকে

ইহাদের ঠিক একস্তর নিম্নে একদিকে আর্মেনিয়া, ভুটান, আজার-বাইজান, তাজাকিস্থান, নেপাল এবং অপর দিকে—কোচিন-চায়না, কাজাকি-স্থান, মালয়, উজবেগিস্তান এবং তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গের ৫ টী করিয়া ১০ টী আসন করা হয়।

মঞ্চের পটভূমির সর্ব্ব-পশ্চাতে এশিয়ার প্রকাণ্ড মানচিত্র এবং তাহার উপরে ইংরাজিতে A S I A

সম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন দেশীয় প্রতিনিধিবৃন্দ।

নামটী নিওন-লাইট আলোক-অক্ষরে ঝলমল করিতে থাকে

সভা-মণ্ডপ

সভামণ্ডপের উচ্চ মঞ্চের উপর সভানেত্রীর উভয়পার্শ্বে এশিয়ার প্রধান প্রধান ১৮ টী দেশের প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই ১৮ টী দেশের প্রতিনিধিবর্গের আসনের পশ্চাদ্ভাগে তত্তদ্দেশের ১৮টী বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত জাতীয়-পতাকা আলম্বিত থাকে। সভানেত্রীর দক্ষিণ দিকে ১। আফগানিস্থান ২। সিংহল ৩। মিশর ৪। ইরান ৫। মোঙ্গোলিয়া ৬। শ্যাম ৭। ভীটয়েনাম ৮। ইরাক ও ৯। সিরিয়া এবং তাঁহার বাম দিকে : ১। ব্রহ্ম

সম্মেলনের সভানেত্রী এবং প্রতিনিধিদলগুলির নেতৃবৃন্দকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরেই এই সমিতির প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সম্মেলনের জন্যে গোলটেবিল গঠন ও বিশদরূপে কার্য্য-তালিকা নির্দ্ধারণ করা হয়।

জাতীয় আন্দোলন, লোক-বিনিময় ও জাতি-সমস্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং

নারী সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার জন্য পাঁচটী বিভিন্ন গোলটেবিল গঠিত হয়।

এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরের ধ্বংসস্তূপের উপর এই সম্মেলনের মণ্ডপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে মনে হয় এই সম্মেলনের জন্য এই স্থানই যোগ্যতম—যেখানে দাঁড়াইয়া ইতিহাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে—'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা ?' শুধু তাই নয়, তাহার পর—বৌদ্ধ-জৈন পাঠান মোগল সংস্কৃতির কত বিজয়-বৈজয়ন্তী এই মহানগরীর উপর বিক্রম প্রকাশ করিয়া অবশেষে ইহারই ধূলায় মিলাইয়া গেল তাহার কে ইয়ত্তা করিবে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যাইত না আজ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চতম চূড়াও সেই মহানগরীর পবিত্র ধূলায় আপন আত্মা বিলীন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

লীগের অসহযোগিতা

দুঃখের বিষয় এই বিরাট আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলনে মুসলীম লীগ সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন, যদিও মুসলিম এবং অ-মুসলিম বহুদেশ হইতে বহু মুসলিম প্রতিনিধি আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রশস্ত এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী বর্জ্জন করিয়া কেন যে তাঁহারা কূপ-মণ্ডুকের আদর্শ গ্রহণ করিলেন তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সকল মুসলিম দেশই তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ছিলেন।

মিশর হইতে মুস্তাফা মোমিন, মিস্ করিমা সৈয়দ, ইরাণ হইতে ডাঃ গোলাম হোসেন সাদিকি আসিয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার সকল প্রতিনিধিই মুসলিম ছিলেন, কেবল একজনমাত্র ক্রীশ্চান,—তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন ডাঃ আবু হানিফা। মালয়ের প্রতিনিধিও মুসলিম—ডাঃ বরহানুদ্দীন। আরব-লীগের পক্ষে—মিঃ ঠাঙ্ ফরুদ্দীন। ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিও বহুসংখ্যক ছিলেন—তাঁহারা আলিগড ও নিজামের ষ্টেট হইতে আসিয়াছিলেন। ডাঃ জাকির হোসেনের নামও ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের অবদান

স্থান কাল পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব অনুধাবন করিয়া এশিয়ার এই আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনে—এই সাংস্কৃতিক ভাবধারার ভগীরথ এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা এবং অধ্বর্য্যু—রবীন্দ্রনাথের মহাবাক্যই ইহার উদ্বোধন মুহূর্ত্তের প্রথমেই মনে পড়িল—

> হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

জগতের লোক-সংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যক নবদেবতাকে একত্র করিবার সাধনায় যে সিদ্ধি আজ লাভ হইল 'উদার-ছন্দে পরমানন্দে',—মহাকবি তাহার প্রণাম বন্দনা-বাণী গান করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

> 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।'—* * *
> 'হে রুদ্র বীণা, বাজো বাজো বাজো,—
> ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
> বন্ধ নাশিবে তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে',
> 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে—
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ঋষি-চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া কবি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

> 'দুঃসহ ব্যথা হবে অবসান, জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
> পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

আজ তাই 'সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে'—মার অভিষেকের মঙ্গলঘট পূর্ণ করিবার সময়—মহাকবিকেই প্রথমে স্মরণ করি। অতীতের দিকে চাহিয়া তাঁহারই ভাষায় মনে হইল, এতদিন যেন—

> 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু, দৈত্য সম পুঞ্জ মেঘ ভার
> ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্য্যের দুয়ার;

অভিভূত আলোকের মূর্চ্ছাতুর ম্লান অসম্মান
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি পানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণবাস চির প্রাচীনতা
শুব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা
ক্লান্তি ভারে আঁখি পাতা বন্ধপ্রায়। শূন্যে হেন কালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

*   *   মনে ভাবি—
পুরাণার দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবী
নূতন বাহিরি এল"।

এই প্রাচীনের জীর্ণ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া নূতনের বিজয়-কেতনের চীনাংশুক উড়াইয়া যে মুক্তি মন্ত্র তিনি গান করিয়াছিলেন সেদিন, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজ **দিল্লীর পুরাণো দুর্গের দ্বারে**—এই অনাদি কালের জীবন্মৃতকে যে মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করা হইল তাহা প্রধানতঃ তঁাহারই তপস্যায়।

বিশ্বমানবের অন্তর জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনায় তিনি সৃষ্টি করিলেন তাঁহার মহাকাব্য, তিনি গড়িয়া তুলিলেন তাঁহার বিশ্বভারতী (The International University) বিশ্বের সকল সংস্কৃতি একত্র করিয়া,—এবং তাঁহার সেই একত্রীকরণের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল এতদিনে এই সাংস্কৃতিক মহা সম্মেলনে। তাঁহার বিশ্বভারতী তাঁহারই ভাষায়ঃ—"Represents India, where she has her wealth of mind which is for all. Visva Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

দীর্ঘ নিদ্রা ও দীর্ঘসূত্রতার জড়িমামুক্ত এশিয়ায়—নবযুগের সূত্রপাত ও নূতন প্রাণ-স্পন্দন শুরু হইল মহাকবির তপস্যায় এবং ভারতবর্ষই এই মহা সম্মেলনের আতিথেয়তার গৌরবময় কর্তব্যভার গ্রহণ করিল। যে কোন কারণেই হউক, মহাকবি সম্বন্ধে এই কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করায়—দিল্লী সম্মেলনের এক মহান ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ভিন্ন পথে ভিন্ন প্রণালীতে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিকতার অগ্রদূত হিসাবে বোধহয় রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখ করা সর্বাগ্রেই কর্তব্য

কোরিয়ার প্রতিনিধি পণ্ডিত ... ... দিচ্ছেন

ছিল এবং তাঁহার পরেই স্বামী বিবেকানন্দের। তাহার পর দেশবন্ধু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম Pan Asiatic Conference এর পরিকল্পনা করেন।

অন্যান্য দ্বাদশ সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শকের সম্মুখে সদ্য-নির্মিত সুন্দর ও সুসজ্জিত এক বিরাট প্যাণ্ডেলে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সম্বর্দ্ধনা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীরাম সর্ব্বপ্রথমে সকল প্রতিনিধি ও সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন:

সমগ্র এসিয়ায় এক বিশাল কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্ত দেশ ও জাতি সকলের অভাব অনটন, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অনেকটা একই রকমের সুতরাং সেই সকল জাতি ও দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপিত হইলে সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে .. এই সম্মেলন ভিন্ন ভিন্ন জাতির গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে সরকারীভাবে হইতেছে না পরন্তু এক অবিভক্ত মহাদেশের হিতৈষণায় তদ্দেশের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বে-সরকারী ভাবে হইলেও এই সংঘবদ্ধ সম্মেলনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সকলকে সকল গভর্ণমেণ্টই সম্মান করিতে এবং সম্ভব হইলে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইবে।

পরিশেষে তিনি বিদেশীয় প্রতিনিধিবর্গকে সম্মেলনের কার্য্য শেষ করিয়া আরও কিছুদিন থাকিয়া এই দেশের শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে ও দ্রষ্টব্য স্থান সকল পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার অভিভাষণ দান করিতে উঠিলে সমগ্র সভামণ্ডপের অন্যূন দ্বাদশ সহস্র সদস্য এবং লোহিত সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়ার প্রায় আড়াইশত প্রতিনিধিবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন।

তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন :

বিজ্ঞানের এই মারাত্মক আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্য এশিয়াকে একযোগে এক সংঘবদ্ধ মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ রাখিতে হইলে এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ শক্তি উলিয়া যাইতেছে। যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দ্রুতবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

তিনি 'এক জগৎ' (One-World) এর আদর্শের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন :—

এই আদর্শকে আমাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিয়া রূপ এবং অবয়ব দান করিতে হইবে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সহিত এই আদর্শ ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাহাকেই আমরা সমর্থন করি। আমরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাহি না। জাতীয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদের পোষকতা করা প্রত্যেক দেশেরই অবশ্য কর্তব্য হইলেও স্বাধীনতা লাভের পর ইহাকে আক্রমণশীল ও আন্তর্জাতিক উন্নতির পরিপন্থী হইতে দেওয়া চলিতে পারে না।

এশিয়ায় ইউরোপের প্রভুত্ব

এশিয়ার গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া পরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন :

গত দুইশত বৎসরের মধ্যে এশিয়ার বহু অংশে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং বহু দেশই বিদেশী শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সহিত উত্তর পশ্চিম, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের দেশগুলির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক [illegible] ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে এবং আমাদের [illegible] শাসকগোষ্ঠীর সহিত তাহার আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে।

বর্তমানে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ [illegible] আমাদের চতুষ্পার্শের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। [illegible] যাতায়াতের সুযোগ হওয়ায় এবং বিমান চলাচলের প্রসার হওয়ায় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা পুরাতন বন্ধুরূপে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছি। আমাদের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষা এই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শান্তি, অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্ডিতজি বলেন :

অন্য কোন দেশ বা মহাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ বা আক্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া এই সম্মেলনকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়ার মিলিত আন্দোলন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কাহারও বিরুদ্ধে এরূপ কোনও দুরভিসন্ধি আমরা পোষণ করি না। আমরা চাই সমগ্র জগতে শান্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে। ইহাই আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। আমরা চাই আত্মনির্ভরশীল হইতে। পাশ্চাত্য দেশের দরবারে আমরা বহুদিন ধরিয়া আবেদন নিবেদন করিয়া অরণ্যে রোদন করিয়া আসিয়াছি। আমরা চাই যে এখন হইতে ইহার অবসান হউক। আমাদের সহিত যাহারা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত আমরা সহযোগিতা করিব—কিন্তু অন্যের ক্রীড়নক হইয়া আমরা আর থাকিব না। জগতের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে—এশিয়া আর অন্যের কথায় উঠিতে বসিতে

ইচ্ছুক নহে সে তাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিজস্ব নীতি পালন করিয়া চলিবে।

তিনি বলেন :

যদিও বর্ত্তমান সম্মেলন এশিয়ার দেশগুলিকে একত্র করিবার একটি সামান্য প্রয়াস মাত্র তথাপি এইরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অনন্যসাধারণ। এই সম্মেলনে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু সম্ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আমাদের সময়ের ইতিহাস যখন বিরচিত হইবে তখন এই সম্মেলন এশিয়ার ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটী সীমারেখা টানিয়া দিবে। এই ইতিহাস রচনায় আমাদের সহযোগিতা থাকায় আমরাও সেই ঐতিহাসিক গৌরবের কিয়ৎ পরিমাণে অংশভাগী হইব।

এক গোষ্ঠী

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাহার আবেগময় এবং উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণে সম্মেলনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন :—

"আমরা চাঁদ ধরিয়া দিবার জন্য শিশুর মত আবদার করিব না। আমরা স্বীয় শক্তিবলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে আমাদের আদর্শ আমাদের লক্ষ্যের চাঁদকে উৎপাটন করিয়া, করতলগত করিয়া, এশিয়ার স্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পণ করিব। মহামারী, মৃত্যু, বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের কবল হইতে এই জগৎ যাহাতে শান্তিসুখময় সুস্থ এবং সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সমগ্র এশিয়ার পক্ষ হইতে সংকল্প করিবার জন্য আহ্বান করেন।

প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠাই এশিয়ার আদর্শ, এশিয়ার শাশ্বত এবং মহান্ আদর্শ। এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে, নানা ভাষা, নানা আচার এবং নানান্ পরিধেয় সত্ত্বেও এক গোষ্ঠীতে পরিণত করিতে হইবে, এক যোগ-সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। এই আদর্শ 'নেতি'—বাদ-মূলক নহে, সংগঠনমূলক সৃষ্টির প্রেরণা প্রাণশক্তি ও আনন্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং আনন্দেই ইহার প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর ভারত ও বিদেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। তন্মধ্যে জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব, ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারীর, আরব লীগের সেক্রেটারী আজম পাশা ও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর পত্র পঠিত হয়।

তারপর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ আবদুল মজিদ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন : যদি আমাদের বাঁচিতে হয়,—তাহা হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একতাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত বাঁচিবার উপায়ান্তর নাই। তাহার পর সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া ও আজার-বাইজানের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন।

—ফটো সিমকণি

সম্মেলনে আগত সোভিয়েট প্রতিনিধিবৃন্দ

ভুটানের প্রতিনিধি এবং নেতা মিঃ ডরজি বলেন—আমি ভুটান হইতে সরল শুভেচ্ছাপূর্ণ হিমালয়ের পার্ব্বত্য বাতাসের অভিনন্দন আনিয়াছি। তাহার পর ব্রহ্মের প্রতিনিধি জেনারেল আউঙ্ সাঙের বাণী প্রদান করেন। তাহার পর ইন্দোচীনের প্রতিনিধি, চীনের প্রতিনিধি—

চেন্ ইন্ ফান্—সিংহলের প্রতিনিধি মিঃ বন্দরনায়ক বক্তৃতা করিলে পর মিশরীয় প্রতিনিধি মিঃ মোস্তাফা মোমিন্ বলেন, এশিয়াই মানব সভ্যতার শৈশবের দোল্না স্বরূপ। তিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

এই মহাসম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষ হইতেও প্রেক্ষাকারী (Observer) উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ক্যাটলিন এবং ডাঃ পি, এন্, এস্ মানসের্গ (লণ্ডনের Royal Institute of International Affairs হইতে) উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পক্ষে মিঃ ও মিসেস্ রিচার্ড ষ্ট্যাডলফ (Institute of Pacific Relations হইতে) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বেশভূষা, নরনারীর বিভিন্ন মুখাবয়ব, মহিলাদের বিচিত্র সাড়ী,—পশ্চাদ্ভাগে বিবিধ বর্ণালীসমন্বিত এশিয়ার সম্মিলিত দেশ সমূহের জাতীয় পতাকা,—তিব্বতের প্রবহমান পরিচ্ছদ, ব্রহ্মার শিরোপিধান প্রভৃতির সমবায়ে যে বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে মনে হইল যে পৃথিবীর অন্য কোনও ভূভাগে এইরূপ কোনও মহতী সভা সমাহূত হইলে তাহাতে বেশভূষা, ভাষা এবং মুখাবয়বের এত বিভিন্নতার ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে—এত গভীর আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও চিন্তাধারার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া বোধ হয় কোনমতেই সম্ভব হইত না। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা সকলকে একছাঁচে ঢালিয়া এক করিতে চায়। এসিয়ার সভ্যতা সর্ব্বপ্রকার আপাত বৈষম্য ও বিভিন্নতাকে মানিয়া লইয়া এক বিরাট কন্সার্ট পার্টির মত ঐকতান বাদন করে, যাহাতে প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অটুট এবং অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মানব-সভ্যতার মৈত্রীর মূল সুরটীর ছন্দ ও শ্রুতি-মাধুর্য্যের কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

মহা-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রথমে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন। শরীর অসুস্থ বোধ করায় সভা শেষ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সভাপতির পদে বসাইয়া শ্রীযুক্তা নাইডু চলিয়া যান। পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসিলে স্যার রাধাকৃষ্ণণের অনুরোধে তিনি সভার কার্য্য পরিচালনা করেন।

উজবেগিস্তানের প্রতিনিধি, তাঁহাদের জাতীয় প্রথা অনুযায়ী, সভাপতি পণ্ডিত নেহরুকে একটী জমকালো লাল-সোনালি সিল্কের গাউন, একটী নীল সিল্কের উত্তরীয় ও একটী লাল সিল্কের টুপি (ইহাই উজবেগি জাতীয় পরিচ্ছদ) তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলে সভায় কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, যখন ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিরা স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সভার কলহ সভাতেই মিটাইয়া লইয়া, পরস্পরের সহিত করমর্দ্দন করেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানান, তখন সভাস্থ সকলেই সভার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

আজ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে প্রথমে, মিশরীয় মহিলা সম্মেলনের পক্ষ হইতে মিস্ করিমা সৈয়দ বলেন :

এই সম্মেলন প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে সংযোগিতা গড়িয়া তুলিবে। ভারত এবং মিশর জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তন্নিবন্ধন রাজনৈতিক উৎপীড়নে পরস্পরের সহিত মৈত্রী ও সহানুভূতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরের স্বাধীনতা লাভের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট তাহাদের যোগ্য মর্য্যাদা দাবী করিবে। মিশর এবং ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে গত যুদ্ধের বিজয় গৌরব লাভকরা কদাপি সম্ভব হইত না।

ডাঃ তাই চি তাও (President of the Executive Yuan of China) পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে বাণী

প্রেরণ করেন শ্রীযুক্তা নাইডুর অনুরোধে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাহা পাঠ করেন :

মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে। এশিয়ার প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ ভুলিয়া যাইবার ফলেই এই সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কেবল মাত্র পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও শুভেচ্ছার মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

জার্জ্জিয়ান্ সোভিয়েট রিপাবলিকের প্রতিনিধি মিঃ কুপরাজ দে জর্জ্জিয়ার জনগণের পক্ষ হইতে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ আবু হানিফ বলেন :

এই সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি এই হিসাবে বিশেষ অর্থপূর্ণ যে এই প্রথম আমরা আমাদের তথাকথিত অভিভাবক ও উপদেষ্টাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশীরা ইন্দোনেশিয়ায় আসিয়াছে।.. ইহাদের মধ্যে ভারতীয়গণ এবং তাহাদের ন্যায় অপর কেহ কেহ সদুদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে। আবার ওলন্দাজগণ এবং জাপানীরা স্বার্থপরবশ হইয়া শোষণ করিবার জন্য আসিয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়ার যাহা কিছু মূল্যবান সম্পদ তাহা নিজেদের দেশে চালান করিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণ চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। যদি ইন্দোনেশীয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে তাহারা ওলন্দাজদের সহিতও বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্তা নাইডুর অনুরোধক্রমে ডাঃ হানিফ সুলতান শারীয়াবের বাণীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনান। সুলতান শারীয়ার বলিয়াছেন :

এই সম্মেলন যে মহান উদ্দেশ্য ও নীতি লইয়া আহূত হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ তাহা পরমাগ্রহে সমর্থন করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সম্মেলন এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের জনসাধারণকে একত্র করিয়া ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্মেলন যুদ্ধের পরে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্তেই আহ্বান করা হইয়াছে। যুদ্ধে আমাদের সকল দেশই বিশেষভাবে ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে এবং এখন এই সকল দেশই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমস্ত দেশের উন্নয়ন এবং পুনর্গঠন সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার জন্য এই সম্মেলন বিশেষ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই।

ইরাণের প্রতিনিধিগণের নেতা ডাঃ গোলাম হোসেন সাদিগি বলেন—

এশিয়াবাসী আজ মূলতঃ পাঁচটী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভ্যুদয় এবং মহিলা-আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিতে পারিবে না এবং এই দেশগুলিও সর্ব্বোচ্চ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। আজ এশিয়ার জাগরণের মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। আজ আমাদের জাতি ধর্ম্ম বর্ণ প্রভৃতি সকল বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে যাহাতে এশিয়ার প্রত্যেক নরনারী এবং শিশু, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বৈজয়ন্ত ধারণ করিয়া নিজেদের এবং উত্তরকালের বংশধরগণের অভ্যুদয় সম্পাদন করিতে পারে।

কাজাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ শাহরিফার শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর মালয় প্রতিনিধিগণের নেতা ডাঃ বরহানুদ্দীন বলেন :

এই সম্মেলন এশিয়াবাসিগণের সংঘবদ্ধ হইবার আন্তরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের আভ্যন্তরীণ জটিল সমস্যা সমূহ এতদিন এশিয়াবাসিগণকে সংঘবদ্ধ হইতে দেয় নাই। ভারতবর্ষ এশিয়াকে সম্মিলিত করিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে এই সম্মেলন এশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও একতার প্রথম ধাপ স্বরূপ।

নেপালী প্রতিনিধিগণের নেতা মেজর জেনারেল [illegible] বিজয় সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা বলেন—

আমার দেশটী ক্ষুদ্র এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য নীড়ে [illegible] দেশবাসীরা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অন্তঃকরণে বলিষ্ঠ এবং স্বাধীনতা [illegible] দৃঢ়সংকল্প। আমরা সরল ও সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা [illegible] করিয়া থাকি। তবুও আমাদের দেশে নানাবিধ সমস্যা আছে। [illegible] এই সম্মেলনে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিব তাহা যে আমাদি[illegible] ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ [illegible] নেপাল ও ভারতের মধ্যে সখ্যের বন্ধন শাশ্বতিক। ইতিহাস [illegible] সাক্ষী। এই বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। কালক্রমে এই বন্ধন আরও দৃঢ়, [illegible] ঘনিষ্ঠ হইবে। এই সভ্যতার বন্ধন এই সম্মেলনে আমাদের প্রতিবে[illegible] এবং অন্যান্য দেশবাসী-জনগণের সহিতও তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে আমাদি[illegible] সম্মিলিত করিবে এই আশা পোষণ করিয়াই আমি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছি।

প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের প্রতিনিধি অধ্যাপক স্যামুয়েল বার্গম্যান বলেন যে তিনি প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের এবং এশিয়ার এক প্রাচীনতম ভূখণ্ডের শুভেচ্ছা লইয়া আসিয়াছেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা আপন মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন— এই সম্মেলনের বিবিধ বিচিত্র সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের উপায় কৌশল অবগত হইয়া তাহা তাঁহাদের নিজ দেশে লইয়া যাইবার জন্য।

ইউরোপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে। ইহুদীগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এবং সর্ব্বত্রই নির্য্যাতিত। বিগত যুদ্ধে তাহাদের বহুলক্ষ নরনারীকে গ্যাস চেম্বার প্রভৃতি পাশবিক উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে। ইহুদীগণ তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও যৌথ কৃষিশিল্পের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক। তাহারা তাহাদের প্রাচীন হিব্রু ভাষা আধুনিক প্রয়োগপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দেশের আরও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় সভাপতি স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহাকে সেই সমস্ত বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন, কারণ তাহা এই সম্মেলনের বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর উপসংহারে অধ্যাপক বার্গম্যান সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

এই সময়ে ম্যাদাম করিমা এল্ সইয়দ (মিশরীয় প্রতিনিধি) সভাপতির অনুমতি লইয়া ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের ঘরোয়া বিতর্ক-মূলক কথা সম্মেলনে উপস্থিত করার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, প্যালেষ্টাইনের ইহুদীগণের সহিত আরব-বাসীদের কোন বিরোধ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সম্প্রদায়ের সহিত প্যালেষ্টাইনে বন্ধুভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহারা চাহেন না যে ইউরোপীয় ইহুদীগণ বৃটিশের বাহুবলে জোর করিয়া আসিয়া প্যালেষ্টাইনে বসবাস করেন। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান তাহার প্রত্যুক্তি করিতে চাহিলে সভাপতি তাঁহাকে অনুমতি দিতে অক্ষম হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাহা হইলে তর্কের জটিলতা বাড়িয়া যাইবে এবং সভার মূল উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে অধ্যাপক বার্গম্যান মঞ্চ হইতে অবরোহণ করিয়া সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার দুই মিনিটকাল পরেই, স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁহার অনুসরণ করিয়া ও তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া সহাস্যমুখে পুনরায় সভামণ্ডপে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তখন আরব এবং ইহুদী প্রতিনিধিগণ হর্ষভরে পরস্পরের পাণিপীড়ন করিলে সভার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল জয়ধ্বনিতে আলোড়িত হইয়া উঠে। প্রত্যেক দ্রষ্টার মনের মধ্যে তখন এই কথাই বিশেষভাবে প্রতীত হয় যে স্যার শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের সুমীমাংসা করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন তাহা না হইলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত এবং প্রথম সম্মেলনের ইতিহাসে একটা দুঃখের এবং ক্ষোভের গভীর রেখা থাকিয়া যাইত। এই তুমুল হর্ষধ্বনি স্যার ভাটনগরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

প্যালেষ্টাইনের ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করায় পণ্ডিত নেহরু দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনা এড়াইয়া চলাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। সকলেই জানেন যে ভারতের জনসাধারণ গত বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপের এবং অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের দুঃখদুর্দ্দশায় সহানুভূতি জানাইয়া আসিয়াছে। যখনই ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভারতবাসীগণ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছে এবং তাহাদের দুঃখের অবসান কামনা করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিতর্কের মনোভাব বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে নানা কারণে ভারতের জনসাধারণ সর্ব্বদাই মনে করে যে প্যালেষ্টাইন মূলতঃ আরব দেশ এবং আরববাসীদের সম্মতি না লইয়া কোনও সিদ্ধান্তই

করা চলিতে পারে না। আমরা বরাবর আশা করিয়াছি এবং এখনও আশা করিতেছি যে প্যালেষ্টাইন হইতে তৃতীয় পক্ষ যদি চলিয়া যায় অথবা অপসারিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করা সহজসাধ্য হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন

সম্মেলনের উপসংহার—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অনুরোধে ২রা এপ্রিল আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে উঠিলে বিংশ সহস্রাধিক দর্শক, প্রতিনিধি ও পর্য্যবেক্ষকগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি বলেন:

পশ্চিমে যাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রাচ্যের বাণী প্রেমের বাণী সত্যের বাণী। আণবিক বোমা সৃষ্টি করিয়া পশ্চিম আজ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। উহার ফলে শুধু পশ্চিম নহে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হইতে পারে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে শীঘ্রই মহাপ্লাবন হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাহা না হয়।

বক্তৃতার সময় হর্ষধ্বনি করা তিনি সমর্থন করেন না, তাহাতে বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করা হয়। অখণ্ড বিশ্ব গড়িয়া তোলার তিনি পক্ষপাতী, সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া তাহা সম্ভব করিতে হইবে।

২রা এপ্রিল, প্রাতে সম্মেলনের অধিবেশনে একটি স্থায়ী আন্তঃএশিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার গঠন প্রস্তাব এই যে প্রতি দেশে একটী করিয়া জাতীয় ইউনিট থাকিবে। ঐ সকল ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটী পরিষদ থাকিবে। প্রতি সদস্য-দেশের প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদটী গঠিত হইবে।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে হইবে স্থির হয়।

পরিচালনা-কমিটির পক্ষ হইত ডাঃ ওয়েন উয়ান মিং প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। পণ্ডিত নেহরু ও রাণী রাজওয়াদী উল্লিখিত অস্থায়ী পরিষদে ভারতীয় সদস্যরূপে থাকিবেন।

অপরাহ্নে আন্তঃ এশিয়া প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের যে সভা হয় তাহাতে পণ্ডিত নেহেরু সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। সম্মেলনে যোগদানকারী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিসহ মোট ৮৫জন সদস্য লইয়া এই অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হয়।

ভারতের প্রতিনিধি মিঃ বি, শিবরাও এবং চীনদেশের প্রতিনিধি মিঃ হ্যাম লিউ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। যে-পর্য্যন্ত না একটী নিয়মতন্ত্র রচিত হয় সে পর্য্যন্ত সাময়িক ভাবে পরিষদের কার্য্যালয় পরিচালনের নির্দ্দেশ-নামার খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটী সব-কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি, দুইজন সম্পাদক, এইচ, ই আলি আসগার হেকমৎ (ইরাণ) মিঃ বন্দর নায়েক (সিংহল) বিচারপতি মিঃ কাইয়ো মিন্‌্থ (ব্রহ্ম) এবং ডাঃ আবু হানিফা (ইন্দোনেশিয়া) কে লইয়া এই সব-কমিটি গঠিত হয়।

কোরিয়া হইতে আগত মহিলা প্রতিনিধি, কোরিয়াবাসী স্ত্রীলোক ও বালিকাদের পক্ষ হইতে উপহারস্বরূপ প্রেরিত দুইটী পুতুল পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীযুক্তা নাইডুর হাতে অর্পণ করিলে সমবেত জনমণ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনি করেন।

ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের সভাপতি ডাঃ হো চি মিনের বাণী তথাকার প্রতিনিধি পাঠ করেন, সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে না পারায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন,—"সম্মেলনের অধিবেশনকালে আমার মন ও চিন্তাধারা আপনাদের সহিতই যুক্ত থাকিবে। সম্মেলনের সাফল্যে আমাদেরই জয় সূচিত হইবে। কারণ উহা এশিয়াবাসী নরনারীর জয় ঘোষণা করিবে।"

উপসংহারে পণ্ডিত নেহরু বলেন:

মানবতার নিকট এশিয়ার শাশ্বত শান্তির বাণী মহা মূল্যবান। পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল শক্তি করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এই কল্যাণপূর্ণ শান্তির অভাব রহিয়াছে। তাই উক্ত সভ্যতাই আমাদিগকে পশুর স্তরে অবনমিত করিয়াছে। এশিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা ও প্রজ্ঞা সে অভাব পূরণ করিতে পারে।

ডাঃ শারীয়ার (ইন্দোনেশিয়া) ঘনঘন হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন :—

এশিয়াবাসীদের পুণর্গঠন করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আমাদের সকলকে সমদর্শিতা ও আদর্শবাদের পথে চলিতে হইবে। ইহার ফলে অখণ্ড এশিয়ার সৃষ্টি হইবে এবং পরিণামে অখণ্ড জগৎও সৃষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্তা নাইডু উপসংহার বক্তৃতায় বলেন :

বিভিন্ন প্রতিনিধির মুখে একই দাবী ধ্বনিত হইয়াছে—ইহার প্রেরণা হইতেই স্বাধীন ও সম্মিলিত এশিয়া গঠিত হইবে। আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্থাপনা করিলাম। এই ভ্রাতৃত্বের ফলে কাহারও শক্তি প্রভুত্বপরায়ণ হইবে না।

মহা সম্মেলন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য

এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির মাতৃভূমি স্বরূপ। এই মহাদেশেই জগতের সকল মহাধর্ম্ম জন্মলাভ করিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, তাও, কনফ্যুশীয়, জরথুস্ত্র, খ্রীশ্চান ও ইসলাম এই মহাদেশেই আলোকলাভ করিয়া জগতের ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকবিস্তার করিয়াছে।

প্রথম দুই দিনের সাধারণ-সভার এবং পরবর্ত্তী সব কমিটির কার্য্য বিবরণী হইতে ও তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি হইতে আমাদের মনে হয় যে এশিয়াবাসী সকলেই আজ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করে। এশিয়াবাসীগণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় গোলার্দ্ধের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী ও শান্তি স্থাপিত হয় তাহার জন্য ব্যগ্র এবং সচেষ্ট। জগতের মানব সাধারণের স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে স্বাধীন মানবজাতির মধ্যে যে সহযোগিতার যুগ সমাসন্ন,—এশিয়ার এই আন্তর্জ্জাতিক মহাসম্মেলনকে আমরা তাহারই সূচনা বলিয়া মনে করি।

এশিয়া আজ নিরপেক্ষভাবে সকল নাগরিককে সমান চক্ষে দেখিতে চায়। সকল ধর্ম্মের জন্য তত্তদ্ ধর্ম্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। জাতি হিসাবে কেহ কাহাকেও গরিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলিয়া কোনও ভেদবাদের সমর্থন করেন না।

এই মহাদেশের ভারতবর্ষই যেন স্বতঃসিদ্ধ মিলনক্ষেত্র। এশিয়ার পূর্ব্ব দিকে বৌদ্ধ জগৎ,—পশ্চিম দিকে মুসলিম জগৎ,—অধোদিকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও মালয় হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের মিলনক্ষেত্র, উর্দ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া—মানব সাধারণের সমান সামাজিক অধিকারের গৌরবময় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এশিয়ার আদর্শ—মিলনের আদর্শ, একত্রীকরণের আদর্শ—প্রতিদ্বন্দ্বিতার আদর্শ নহে। ইহার বাণী শান্তির বাণী—বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই মৈত্রী ও শান্তির বাণী বহন করিয়া চলিয়াছেন। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রীযুক্তা নাইডু কার্য্যে পরিণত করিলেন।

এই সম্মেলন জগতের সমগ্র জাতির মিলনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিবে—সকল জাতির সহিত—সমান অধিকারে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সহযোগিতায় আবদ্ধ হইবে। কাহাকেও শোষণ করিবে না, কাহাকেও শোষণ করিতেও দিবে না। জগতের মানব সাধারণের জীবন যাপনের অর্থনৈতিক স্তরকে উন্নত পর্য্যায়ে সংস্থাপিত করিবে। বৈজ্ঞানিক কৃষি ও শিল্প সমবায়ের সাহায্য তাহারা গ্রহণ করিবে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির পরিসমাপ্তি করিয়া তাহারা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে। শিক্ষা প্রসারণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এই দুইটী সমস্যাই প্রধান সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এশিয়ার জাতির মধ্যে যাহারা আজিও পরাধীন তাহাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য এশিয়ার সকল জাতিই ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করিবে। মহিলা প্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে জগতের বর্ত্তমান স্তরে উন্নীত করিতে হইবে।

এখন এশিয়ার স্বাধীনতা—শৈশবের দন্তোদ্গমের বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র—আর একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের চরম অবসান ঘটিবে।

এশিয়ায় সামাজিক আদর্শ হইবে 'Casteless and Classless'. সর্ব্বপ্রকার ভেদ ও অসাম্য দূর করিয়া সে খৃষ্ট, বুদ্ধ মহাবীর, মহম্মদ, কনফ্যুসিয়াস ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শকে জগতে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা দ্বেষ, হিংসা, গৃধ্নুতা, পরস্বাপহারিতাকে বিদূরিত করিয়া জগতের মানব সমাজে মনুষ্য সভ্যতার চরম এবং পরম আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এশিয়ায় এই নব জাগরণ নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিবে। উহা পাশ্চাত্য দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পাশ্চাত্য জগৎ আজ গৃহ কলহে নিমজ্জিত। আণবিক বোমা দ্বারা জগৎকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। পাশ্চাত্যের আজ একান্ত প্রয়োজন প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা। এই মৈত্রী-সম্মেলন শুধু যে বিশ্বশান্তির অনুকূল তাহা নহে পরন্তু ইহা অখণ্ড বিশ্বশান্তির ভারবাহী স্তম্ভ-স্বরূপ। বিভেদ-জর্জ্জরিত পৃথিবী যখন আজ উন্মত্তবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতেছে, তখন যে সম্মেলনে পৃথিবীর অর্দ্ধাধিক লোক একত্র হইয়া শান্তি ও কল্যাণের হিতবাদ প্রচার করিতেছে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে অতি বিপুল তাহা প্রশ্নের অতীত। পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধ ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্মেলন এশিয়ার জাতিসমূহের সম্মুখে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। বিশ্বমানবের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীনতালাভ না করা সত্ত্বেও এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহ ভারতের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরবকেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি:

> পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
> শান্তিরোষধাঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ
> শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

করোটির কূটকাম

বিশু মুখোপাধ্যায়

[শ্যামদেশীয় কোন গল্প বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত অনূদিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, সম্ভবত হয়নি। এ শুধু আমাদের দেশ বলেই নয় বিদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাশ্চাত্যেও বহুকাল শ্যামদেশীয় গল্প সাহিত্যের কোন সন্ধান প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে শ্যাম-রাজতন্ত্রের পরামর্শদাতা রিজিন্যাল্ড লি মে নামের [illegible] এর সহযোগিতায় একটি গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে; এই গল্পটি সেই গ্রন্থ থেকেই অনূদিত। সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র লৌকিক কবিতা ছাড়া শ্যামবাসীদের আজও নিজস্ব উপন্যাস বা আধুনিক সাহিত্য বলে বিশেষ কিছুই গড়ে ওঠেনি। তবে বর্তমান সময়ে কানান ডয়েল, রাইডার হ্যাগার্ড জাতীয় বিদেশীয় লেখকদের কিছু কিছু অনূদিত গ্রন্থের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। গল্প, উপন্যাসের কথা বাদ দিলে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাদের আবেক্ষণ কেবলমাত্র ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ বলা যায়। এবং সে দিক থেকে উচ্চাঙ্গের প্রৌঢ় রসিক [illegible] নেই। এমন কি থাই ভাষার বিখ্যাত 'শাম কোক' (Sam Kok) গ্রন্থখানিও চৈনিক ইতিহাসের অনুবাদ। কিন্তু তবুও শ্যামবাসীদের নিজস্ব গল্প আছে এবং সেগুলি আধুনিক আঙ্গিক ও কৌশলের দিক থেকে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও, তার মধ্যে রস বৈচিত্র্য ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। অবশ্য মধ্যযুগের চলতি প্রভাব, অলৌকিক ও অতিন্দ্রীয় বিশ্বাস, নিসর্গ নিষ্ঠা ও ধর্মাদর্শ পরায়ণতা তারা যে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তা গল্পগুলির উপর চোখ বুলোলেই বোঝা যায়। নাগরিক শিক্ষিত জীবনের [illegible] ও সংস্কার থেকে গ্রাম্য জীবনের পারিপার্শ্বিকেই বেশীর ভাগ থাই-গল্প গড়ে উঠেছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে জীবনের সত্যগুলি এইসকল গল্পের মধ্যে স্থান বিশেষ এমন অদ্ভুতভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে মানুষের মনকে তা নাড়া না দিয়ে পারে না। এই গল্পের মধ্যেও পাঠক তার কিছু কিছু পরিচয় পাবেন।—অনুবাদক।]

মহাভূপ মহীপালের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় যুবকের পরীক্ষা হয়ে গেল। ভোজনবিদ্যা-পরায়ণ প্রথম যুবক নিদ্রাবিদ্যা-পারদর্শী দ্বিতীয় যুবক প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু প্রেমবিদ্যা-পারঙ্গম তৃতীয় যুবক নাই চাও চো-র পরীক্ষা নিয়েই দেখা দিল সঙ্কট। কারণ, প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, তার জন্য সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনও সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু মহাভূপ মহীপালের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় অবশেষে তৃতীয় যুবক নাই চাও চো-র পরীক্ষারও উপযুক্ত ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না।

১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যাম রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী আয়ুথ্যার প্রান্তদেশে স্বামী-সোহাগিনী এক বিধবা তরুণীর কথা মহারাজের স্মৃতিপথে উদিত হ'ল। স্বামীর মৃত্যুর পর অসামান্য চারিত্রিক নিষ্ঠায় ও নিষ্কলঙ্ক জীবন-যাপনের অহেতুক সচেতনতায় নিজেকে প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যা করে রেখেছিল সেই নারী। তাদের দাম্পত্যজীবনের গভীরতা এমনই ঐকান্তিক ছিল যে স্বামীর দেহত্যাগের পরও যুবতীর বিশ্বাস ছিল যে, তার স্বামীর অশরীরী আত্মা সেই বাড়িতেই অবস্থান করছে—তাদের উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান ঘটেনি। এছাড়া স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরেও তার যেমন কোন ভাবান্তর দেখা দেয়নি, তেমনি লালায়িত যৌবনশ্রীও আছে অক্ষুণ্ণ—দেহে-মনে বৈধব্যের কোন ছাপই পড়েনি। বহু উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষ ও অর্থশালী প্রেমিকগণের কাতর আবেদন-নিবেদনও ব্যর্থ হয়েছে তার কাছে—সকলকেই

বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে তার দ্বারদেশ থেকে। মনাভ্যন্তরে আসন গ্রহণ ত' দূরের কথা, তার গৃহাভ্যন্তরেও কোন পুরুষ কোনদিন পদার্পণ করতে পারেনি—ঘুণাক্ষরেও পারেনি তার মনোরঞ্জন করতে। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে সে এরূপ ভাবও দেখিয়েছে যে, সে এখুনিই তার স্বামীর কাছে অভিযোগ করে এই দুষ্প্রবৃত্তির উপযুক্ত শাস্তি দেবে। ক্রমে এই অসাধারণ তরুণীর অদ্ভুত পাতিব্রত্যের কথা আযুদ্ধোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

কামগ্রপতের রাজকন্যা-বিলাসী প্রেমবিদ্যাবিশারদ যুবকের পরীক্ষার জন্য মহাপ্রাণ মহীপাল উক্ত নারীর হৃদয়রাজ্য জয়ের দ্বারা তার পাণিগ্রহণ করাই চাও চো-র উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে স্থির করলেন।

নারী চরিত্র দুজ্ঞেয় কিন্তু পুরুষের প্রখর প্রতিভার কাছে তা প্রকট হতে সময় লাগে অল্পই। চাও চো রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল এবং প্রথমেই এই নারী সম্পর্কে কতকগুলি গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করল। তার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়, স্বামীর জীবদ্দশা ও বৈধব্যকালের বিভিন্ন অভ্যাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়ে, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পর্য্যায়ে হাত দিল সে। একটি নারীর করোটি ও সেই সঙ্গে বিবাহিত মহিলার পরিচ্ছদ, একজোড়া পুরাতন পাদুকা ও পাইপ জোগাড় করল সে। তারপর মহারাজ প্রদত্ত আশিটি টিকেলের (মুদ্রা) সাহায্যে একটি সেকেলে এক-দাঁড়ের সাম্পান ও তার নিজের প্রয়োজনীয় রান্নাবান্নার সামান্য আসবাবপত্র ও তরিতরকারি সংগ্রহ করে একদিন নদীপথে সেই পতিপ্রাণা বিধবা তরুণীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

নদীর পাড়েই সুন্দর প্রাচীন ধরণের একখানি বাড়ি। বাইরের ঢাকা বারান্দাটি নদীর উপর অনেকখানি প্রসারিত; তারই তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী। বারান্দার উপর দাঁড়ালে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা চক্ষুকে সার্থক করে।

শান্ত এই নদীর উপর দিয়েই একাকী দাঁড় বেয়ে চলেছিল চাও চো। অনেকটা পথই সে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঝড়ের প্রবল বেগ দেখা দিল—মুষলধারে বৃষ্টি নাবল। তাড়াতাড়ি আশ্রয়লাভের আশায় দ্রুত দাঁড় টেনে চাও চো তার সাম্পান এনে বাঁধল ঐ তীর-সংলগ্ন বাড়িটির বারান্দার গায়ে। পরণে তার জীর্ণ মলিন বসন, বেশ-বিন্যাস অবিন্যস্ত। এখন তার দিকে তাকালে যে কোন লোকেরই করুণার উদ্রেক হয়—তার মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই হয় না।

বারান্দায় যে অংশটুকু নদীর উপর বিস্তৃত হয়েছিল, তারই একটি থামের গায়ে ডিঙিটি বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই, সেই মুহূর্ত্তেই, বারান্দার উপর থেকে একটি নারীকণ্ঠ চাও চো-কে প্রশ্ন করলে, 'কে হে তুমি, কি করা হচ্ছে এখানে?'

নিচের ডিঙি থেকে কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে চাও চো মহিলাটির কথার উত্তর দিল, 'এই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়াটুকুর জন্য আমাকে একটু আশ্রয় দিন—ঝড়জল থেমে গেলেই আমি আমার গন্তব্যস্থানে চলে যাব।'

চাও চো-র আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে আভিজাত্যের কোন লক্ষণ ছিল না। সাধারণ একজন দাঁড়বাহীর এই দুরবস্থা দেখে মহিলাটির মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল এবং প্রসন্ন মনে তিনি চাও চো-কে ঝড়বৃষ্টি থেমে না যাওয়া পর্য্যন্ত বারান্দার তলদেশে নৌকা বেঁধে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এলো, কিন্তু ঝড়বৃষ্টি থামার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। চাও চো নৌকার উপর আলো জ্বেলে, তার সান্ধ্য-আহারের আয়োজন করতে লাগল। উপরে কাঠের বারান্দা, নিচে নৌকায় চাও চো। বারান্দার উপর থেকে, কাঠের ফাঁক দিয়ে নিচের সব নজরে পড়ে—লোক চলাচলের শব্দ সহজেই বোঝা যায়। চাও চো সতর্ক হয়েই ছিল। সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে

মেয়েরাই কৌতূহলী হয় বেশি। ইতোমধ্যে মহিলাটি আবার ভিতর থেকে বারান্দার উপর ফিরে এলেন। হয়ত এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নৈশ-দৃশ্য দেখতে এলেন, কিম্বা নিজেকে স্নিগ্ধ করার জন্য উপভোগ করতে এলেন জলভারাক্রান্ত এই শীতল বাতাস।

নৌকার উন্মুক্ত পাটাতনে বসে ভাত তরকারি রাঁধতে রাঁধতে চাও চো একবার উপরে বারান্দার ফাটলের দিকে দেখে নিল।—হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে, যা সে ভেবেছিল তাই হয়েছে। মহিলাটি কৌতূহলী হয়ে তাকেই দেখছিলেন কাঠের ফাঁক দিয়ে। পুরুষের রান্নাবান্নায় দেখবার আছে বই কি! যার যা কাজ, তাকে তার বিপরীত করতে দেখলে স্বভাবতই ঔৎসুক্য জাগে। কিন্তু মহিলাটির উৎসাহ হঠাৎ দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে, যখন তিনি লোকটিকে দু'জনের খাবার দুটি পাত্রে ঢালতে দেখেন। লোকটিকে তিনি ত' একাকীই দেখেছেন নৌকায়, তবে সে দুটি পাত্রে সমানভাবে খাদ্য সাজাল কেন! লোকটির এই অদ্ভুত ব্যাপার তাঁকে আশ্চর্য্যান্বিত করে তোলে। তারপর লোকটি যেন আপনমনে বিড়বিড় করে কি বলতে থাকে। আরো নিবিষ্টভাবে কাঠের কাছে কান নিয়ে যেতেই, কয়েকটি কথা তিনি স্পষ্ট শুনতে পান। লোকটি বলছে, 'প্রিয়তমা জীবনসখী, তুমি আমি অবিচ্ছিন্ন—এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওনি। সেই অতীত দিনেও আমরা পরস্পরে পাশাপাশি বসে যেমন আহার করেছি, এখনও, যখনি আমি আহারে বসি, তোমার কথা সেইভাবে তখনি আমি মনে করি'....

তরুণী মহিলা মে পিয়ান একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। কাকে সম্বোধন করছে এই লোকটি, আর কেউই ত' নেই ওর নৌকায়! আরো ঘনিষ্ঠভাবে তিনি দেখতে থাকেন চাও চো-র কীর্ত্তিকলাপ। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে এক অভাবনীয় দৃশ্য: লোকটি একটি কাঠের বাক্সের ভিতর থেকে একটি করোটি বার করে, অত্যন্ত যত্ন সহকারে খাবারের অপর পাত্রটির নিকট রাখে। তারপর অত্যন্ত মধুর সম্ভাষণে আবার যেন কাকে আবাহন করতে থাকে,—'এসো, এসো প্রিয়তমে, এসো আমরা সেই পুরাতন দিনের মত আবার এক সঙ্গে বসে আহার করি—দু'জনকে দু'জনে খাইয়ে দিই এই অন্ন'....। এতক্ষণে মে পিয়ানের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা যেন বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সমস্ত অন্তরটা যেন তার গুমরে ওঠে এক অব্যক্ত বেদনায়—চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। এই করোটি যে নিশ্চয় তার স্বর্গত স্ত্রীর তা বুঝতে আর একটুও দেরি হয় না মে পিয়ানের।

এই মে পিয়ানই সেই স্বামীবিয়োগ-বিধুরা তরুণী যার কাছে মহাভূপ মহীপালের আদেশে চাও চো প্রেরিত হয়েছিল। নিজের জীবনের বেদনাময় স্মৃতি আবার যেন নূতন করে রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর কাছে। নিজে নিজেই তিনি চিন্তা করতে থাকেন এই পত্নীপ্রাণ দরিদ্র লোকটির কথা। অভিভূত হন স্ত্রীর প্রতি তার এই অসাধারণ অনুরাগের নিদর্শনে। সত্যিকার একমুখী প্রেমের অভিব্যক্তি ত' এই-ই—একেই ত' বলে সত্যিকার স্বামী! নিজের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি তাকে—এমন স্বামীও তা'হলে আছে পৃথিবীতে! ঠিক আমার স্বামীর নর-কপালের মত স্ত্রীর করোটি সে সঙ্গের সাথী করেছে—জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে সমানভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাকে। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে আসে তাঁর মন।

আহারাদির পর সেই পুরাতন পোষাকগুলি, যা সে সংগ্রহ করেছিল, তার মধ্যে জড়িয়ে তুলে রাখে মাথার খুলিটি। শেষ একটি তাম্বুলপত্র পর্য্যন্ত দিতে ভোলে না তার উদ্দেশে। তারপর বিশ্রামের অভিপ্রায়ে সে ঐ নর-কপালটির পাশেই শুয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চাও চো-র মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা দেখা দেয়। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মহিলাটি ঘরের মধ্যেই আছেন এই ভাব দেখিয়ে চাও চো তাঁর দর্শন ভিক্ষা করে এবং নিজের যন্ত্রণার কথা জানিয়ে, এই রাতটুকুর জন্য ওখানেই তাকে থাকতে দেবার অনুরোধ জানায়।

বিধবা গৃহেশ্বরী তরুণীটি তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় খানিকটা দয়াপরবশ হয়েই তাকে অনুমতি দিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

ভোর হয়। প্রভাতের অরুণাভা নদীবক্ষে, পথে প্রান্তরে বিস্তৃতিলাভ করে; চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়। কিন্তু চাও চো শয্যাত্যাগ করে না। অসুস্থতার ভাণ করে শুয়ে থাকে। বেলা বাড়ে, দুপুর হয়, রাত্রি আসে। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়; অসুস্থতার জন্য চাও চো-র আর যাওয়া হয় না। প্রত্যহই আহারের সময় কৌতূহলী তরুণী মা পিয়ান নগ্নপদে নিঃশব্দে বারান্দায় পাটাতনের ফাঁক দিয়ে একইভাবে দেখতে থাকেন—স্ত্রীর প্রতি চাও চোর অদ্ভুত অনুরাগের নিদর্শন। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও, নিজে না খেয়েও, চাও চো তার স্ত্রীর জন্য আহার প্রস্তুত করে; করোটিকে সম্মুখে রেখে নিত্যই দেখায় তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর জানায় তার ভালোবাসার অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা।

কয়েকদিন এইভাবে কাটবার পর, একদিন নিজেই মহিলাটি চাও চো-কে বারান্দার উপর থেকে জানান যে, 'যদি সে এখনও অসুস্থ বোধ করে, এবং যদি এখনও নৌকার দাঁড় টেনে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না হয়, তা'হলে উপরে বারান্দার গায়ের ছোট ঘরটিতে এসে সে থাকতে পারে। কারণ, নৌকায় থাকার চেয়ে এখানে অপেক্ষাকৃত আরামের মধ্যে শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

চাও চো তার আংশিক কৃতকার্য্যতায় অপেক্ষাকৃত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মহিলাটিকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে, নিজের পোঁটলা পুঁটলি সমেত সেই ঘরটিতে উঠে আসে। করোটি সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই চলে সে এবং ব্যবহারের মাধুর্য্যে ও অসুস্থতার অভিনয়ে মা পিয়ান ঘুণাক্ষরেও তার শারীরিক অসুস্থতা যে দুরভিসন্ধির ছলনামাত্র তা বিশ্বাস করতেই পারেন না।

ক্রমশঃ দিনের পর দিন যায়, নারী-হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে পত্নীপ্রাণ চাও চো রেখাপাত করে। স্ত্রীর করোটির প্রতি মিথ্যা গোপনীয়তার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিম অভিনয় করে চলে। মা পিয়ান অবশ্য তার সমস্ত ছলনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং একদিন নিজেই তার শারীরিক অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে ক্রমে বাড়ির পরিচারিকাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়, সকলেই তার কাছে আসে যায়, কথা বলে। গৃহকর্ত্রীর সম্মান ও শ্রদ্ধা যে অর্জ্জন করেছে, তার পক্ষে পরিচারিকাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন আর বেশি কথা কি! ক্রমান্বয়ে পতিহীনা তরুণী গৃহকর্ত্রী মা পিয়ানকেও গভীর সম্মান ও সৌজন্যের সুষমায় মুগ্ধ করে দেয় চাও চো। মা পিয়ানের মধ্যে মধ্যে বিহ্বল ভাবান্তর ঘটতে থাকে। তিনি চিন্তা করতে থাকেন: পৃথিবীতে একমাত্র তাঁর নিজের স্বামীরই ভালোবাসা ছিল এই দরিদ্র লোকটির অনুরূপ।—কি ভাগ্যবতী সেই স্ত্রী যার প্রাণবল্লভ মৃত্যুর পরও তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, এমনি করেই তাকে হৃদয়েশ্বরী করে রেখেছে—জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, চিন্তনে মননে মিশে রয়েছে তার সঙ্গে! কেমন একটা বিগলিত ভাব জাগে চাও চো-র প্রতি তাঁর। নিজের প্রধান পরিচারিকাকে তিনি তার কাছে পাঠিয়ে দেন পরিচর্য্যার জন্য। চাও চো-র আন্তরিক ও অমায়িক ব্যবহারে দাসীটিও তার অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যেই। চাও চো-র কাছে সে প্রাণখুলে কথাবার্ত্তা বলে—চাও চো-ও তার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে। এবং একদিন এই ষড়যন্ত্রে সাহায্যকারিণী হিসেবেই সেই পরিচারিকা এই মোহিনী পুরুষের যাদুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে—চাও চো-র মন্ত্রগুপ্তির ফল ফলে।

সেদিন প্রত্যুষেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চাও চো-র ঘুম ভাঙে। আজ তার মন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল, পূর্ব্বের তুলনায় শরীরও সুস্থ। এ-সংবাদে গৃহকর্ত্রী অতিশয় আনন্দিত হন। এতদিন পরে তাঁর আশ্রয়ে থেকে তবু যে এই মৃতপত্নীক যুবক, সামলে উঠেছে

পেরেছে, এতে তাঁর পক্ষে স্বস্তি অনুভব করাই স্বাভাবিক তিনি আজ সকালে নিজেই চাও চোর আহারের সমস্ত উপকরণ গুছিয়ে দেন। অনেক তরিতরকারি খাবার দাবার আনিয়ে দেন পণ্যস্থান থেকে। তারপর যেমন প্রত্যহ দু'বেলা সেই শুভ মুহূর্ত্তটির জন্য অপেক্ষা করেন, গোপনভাবে তাদের সপত্নীক (পত্নী অর্থাৎ এখানে সেই করোটির কথা বলা হচ্ছে) আহারের দৃশ্য দেখবার জন্য,—আজও তেমনি সেই দৃশ্যটি দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। আজ তাঁর মনে হতে থাকে, ক'দিন যেন চাও চো তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, আদর করেনি, স্নেহালিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আনেনি—শারীরিক অসুস্থতার জন্য। আজ সে সুস্থ, মন তার প্রফুল্ল, কাজেই আজ তাদের অনেক কিছুই দেখতে পাবেন তিনি। আড়িপাতার আনন্দ আজকাল যেন পেয়ে বসেছিল তাঁকে—এর মোহ যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল বিধবা মা পিয়ানকে।

রন্ধনাদি শেষ হয়ে গেছে আহারের সময় উপস্থিত। দারুণ আগ্রহাতিশয্যে দুটি পাত্রে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে বসে চাও চো। রুদ্ধ অর্গলের ভেতর থেকে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চনিনাদে, প্রচ্ছন্ন-শ্রাবীর (eavesdropper) বোধগম্যের সুবিধার জন্য তার স্ত্রীকে আহ্বান করতে থাকে: 'ওগো, আমার সুন্দরী, ওগো রাণী প্রাণপ্রিয়া,—লৌকিক নিয়মে আজ তুমি লোকান্তরিত হলেও, লজ্জাবতী লতার মত তুমি যেমন আমায় জড়িয়ে আছ, আমিও তেমনি আমার সমস্ত সত্তা নিয়ে আমারই মধ্যে তোমাকে রেখেছি সারাক্ষণ—তোমাকে ভালোবাসাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত—চিরদিন এই বিপুল ভালোবাসার বিশ্বাস নিয়েই যেন আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।....এসো এসো প্রিয়তমে, গত দিনের মতই আবার আমরা দুটিতে বসি পরস্পরের কোল ঘেঁষে—এ ওর মুখে তুলে দিই—দুঃখের অন্ন খাই সুখ করে।'....এই ধরণের আত্মক কথা যে-কোন রসিকার মনকেই উদ্বেল করে তোলে—বিরহ বেদনাতুর মনের রসোপভোগশক্তিকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়।

গবাক্ষের সূক্ষ্ম খণ্ডিত-অংশের ভিতর দিয়ে, অলক্ষ্যে, প্রাত্যহিকের অভ্যাস মত আজও এই দৃশ্য দেখছিলেন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু আজ যেন চাও চো-র কথার বিমোহন শক্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নবোঢ়া তরুণীর মত উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ তাঁর যেন কেমন অবশ হয়ে আসে। এই পুরুষের পত্নীপ্রেমের অপূর্ব্ব ধ্বনির মধ্যে মা পিয়ানের সমস্ত তেজ, নিজেকে ধরে রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা যেন দুর্বার হয়ে ধ্বসে পড়ে।

'...এসো, চলে এসো তোমার তৃষালু দৃষ্টি নিয়ে,—তৃপ্ত কর আমাকে'...আবার বলতে বলতে চাও চো নিকটের বাক্স থেকে তার স্ত্রীর নর-কপালটি তোলবার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু বাক্সটির মধ্যে হাত দিয়েই চমকে চীৎকার করে ওঠে সে—'এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার....এ তুমি শেষে কি করলে!....বাক্সটার উপর ঝুঁকে পড়ে একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গী করে চাও চো আবার বলতে থাকে—'কাল রাত্রেই শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিছল, তোমরা গড়াগড়ি খাচ্ছিলে....কী জঘন্য, কী লজ্জাকর, কুৎসিত কেলেঙ্কারী কাণ্ড! আর শেষ পর্য্যন্ত তুমিই কিনা —যার জন্যে আজ দীর্ঘ চার বছর আমি নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করেও, একদিনের জন্য পরস্ত্রীর মুখাপেক্ষী হইনি....এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিনি! কোন দিনও আমি মনে করিনি আমি তোমায় হারিয়েছি....আর তুমিই কিনা আজ এতো দিনের বিশ্বাস, এতোদিনের এতো ভালোবাসা সমস্তই জলাঞ্জলি দিলে!'

কথাগুলো বলতে বলতে চাও চো-র গলার স্বর ক্রমশঃই ভারী হয়ে আসে ভাঙা হয়ে আসে, ভেজা ভেজা আর চোখে দেখা দেয় সজলতা। গলার স্বর প্রথম দিকে স্বরগ্রামের যে উচ্চশিখরে উঠেছিল, তা নিখাদে নেবে আসে। বাক্স থেকে দুটি করোটিকেই বাইরে নাবিয়ে রাখে চাও চো।

গৃহকর্ত্রী মা পিয়ান তখনও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম

করতে পারেন নি। হঠাৎ বাক্স থেকে দুটি করোটি তুলতে দেখেই তিনি যেন বজ্রাহত হয়ে যান। অপর করোটিটি যে তাঁরই হৃদয়বল্লভ পতি-দেবতার।

চাও চো ভারী গলায় চোখ মুছতে মুছতে তখনও বলে চলে,—'শেষ পর্যান্ত তুমিই আমার আশ্রয়দাত্রী এই ভদ্র মহিলার স্বামীকে পাপাসক্ত, কুপথগামী করলে। এ যে অসহ্য। এ কি করে ক্ষমা করবে মানুষ। না, আর না, এখানেই আমাদের শেষ—এ নিয়ে আর এক তিলও এগুনো চলে না—তুমি তোমার নিজের পথ দেখ!' চাও চো-র গলা এবার ক্রমশই রুক্ষ হতে থাকে, সে চেঁচিয়ে ওঠে—'দূর হও, দূর হও তোমার প্রণয়ীকে নিয়ে যেখানে খুশি। আমার যা হবার হয়ে গেছে—তবে তোমার মত স্বৈরিণী ব্যাভিচারিণীর আর স্থান নেই এখানে....আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর আমার স্ত্রীর পরিচয় নয়'....এই সব রূঢ় হৃদয়-বিদারক দুঃখের কথা বলতে বলতে চাও চো তার বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রী ও তার প্রেমিকের দুটি করোটি সামনে রেখে, ভগবানের কাছে শপথ করে যে, এর পর যদিও কোন স্ত্রীলোককেই জীবনে তার বিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও, যদি এমন সতীলক্ষ্মী কেউ থাকে, (যা সত্যিই পৃথিবীতে বিরল) যে সারা জীবন তার বিশ্বাসের, একমুখী প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করবে, তা'হলে তারই পাণিগ্রহণ করবে সে—এ অবস্থায় তার আর গত্যন্তর নেই।' বলেই সে তার রন্ধনপাত্রের ভেতর থেকে একটি অস্ত্র বার করে, দুটি করোটিকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে নদীর জলে ফেলে দেয়।

তরুণী মা পিয়ান এতক্ষণ তাঁর হৃদয়ের তলদেশে একটা নিদারুণ দাহ অনুভব কচ্ছিলেন। এ দাহ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার দাহ। বুকের ভেতরটা তাঁর জ্বলে যাচ্ছিল স্বামীর এই কল্পনাতীত ব্যবহারে। তবু একবার নিঃশব্দে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে স্বামীর করোটির আধারটি দেখে নিলেন; তারপর রাগে দুঃখে অধীর হয়ে দূর করে সেটিকে ফেলে দিলেন নদীর জলে। শুধু সেটিকে নয়, জামা কাপড়, শয্যাদ্রব্য, চিত্রলিপি প্রভৃতি যা কিছু তাঁর স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এতদিন তিনি পূত পবিত্র মনে করে আসছিলেন, সে সমস্তই। এতদিন যাকে তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে এসেছেন, যার জন্য এক মুহূর্ত্তও কোন পুরুষের দিকে তাকানো তিনি অপরাধ মনে করে এসেছেন, সেই কিনা এই কয়েকদিনের মধ্যেই একজন সামান্য অতিথির স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। এর জন্য এই মজাদার লোকটিরই বা হ'ল কি শোচনীয় অবস্থা। এতো আর স্ত্রীলোকের দোষ নয়—এ দোষ সম্পূর্ণ তাঁর স্বামীরই। পুরুষরাই ত' এ সব ব্যাপারে সর্ব্বদা অগ্রণী। তাঁর স্বামীই এই দম্পতির সর্ব্বনাশ করলে।

মনে মনে এই সব ভাবতে ভাবতে ক্রোধে তাঁর চোখও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সমস্ত অন্তর দিয়েই তিনি সমর্থন করলেন চাও চো-র এই ব্যবস্থাকে—যাক তারা চলোয় যাক—মিথ্যে জন্যকে স্বামী-স্ত্রী হয়ে—আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। যা ভাব কোনদিনই আমার কাছে ধরা পড়ত না, চাও চো সেই মিথ্যার মুখোসটা খুলে দিয়েছে আমার কাছে। আমি এখন মুক্ত স্বাধীন—ইচ্ছে করলে এখন আমি আবার মনের মত লোকের সঙ্গে নতুন করে জীবনের সম্বন্ধ পাততে পারব—এই পাপাচারী পুরুষের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেই গেছি আমি।—কিন্তু কোথায় সেই সত্যিকার মনের মত পুরুষ। কোথায় পাবে সে তার উপযুক্ত সহধর্ম্মী, সম মনোভাবের একনিষ্ঠ মানুষ!

নিজের সম্বন্ধে এমনি সব বহু কথার আবর্ত্তের মধ্যে তার লম্পট, ব্যাভিচারী স্বামী ও পাশের ঘরের নিষ্কলুষ সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকটির তুলনা জাগতে থাকে মা পিয়ার মনে। মনে হতে থাকে অবস্থাপন্ন লোকেদের কথা। সাধারণত অবস্থাপন্ন লোকেদের স্বভাবেই এই দোষ দেখা যায় না কি? অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যই তাদের এই পথে টেনে নিয়ে যায়—মনকে ক'রে তোলে বহু পত্নীমুখী—এক থাকতেও বহুর দিকে তারা আকৃষ্ট হয়, এবং সেই কারণেই পৃথিবীতে তারা অসুখী। অনেকে মনে করে শারীরিক

ও মানসিক স্বাধীনতাতেই সত্যিকার সুখ; আবার অনেকের ধারণা অর্থই সকল সুখের কারণ। কিন্তু তারও তো ধনৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য কম ছিল না, কিন্তু তবুও ত' সে সুখী নয়,—পারল না সুখী হতে। সত্যিকার ঐশ্বর্য্য ত' সে কোনোদিন চায়নি—সে চেয়েছিল, হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয়, আত্মসমর্পণের বিনিময়ে বিশ্বাস আর এমনি মানুষ যার প্রেমে সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। ধনী লোকের মধ্যে সত্যিই এ ধরণের প্রেমিক পাওয়া শক্ত।

সারারাত্রির দুঃসহ চিন্তাধারার বিবর্ত্তি ঘটল প্রত্যুষে। শেষ রাত্রেই সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে মা পিযান। এই দরিদ্র পাশের ঘরের যুবকই তার পতিত্বের যোগ্য ব্যক্তি। সব দিক থেকে এর চেয়ে অনুকূল আবহাওয়া আর সে পাবে কোথায়—এখন শুধু একটি নৌকা নিয়ে স্রোতের মুখে ভেসে পড়া।

চাও চো প্রস্তুত হয়েই ছিল। কূটচক্রের জালে এই নারী-হৃদয়কে যে সে কি ভাবে আবিষ্ট করেছে, তার মনে যে কী দুর্দ্দমনীয় আবেগ জাগিয়ে তুলেছে, সে সম্বন্ধে তার সচেতনতা কম ছিল না। এতদিন ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের মধ্যে যে ব্যবধান ও দূরত্ব বজায় ছিল, কয়েক দিনেই তা ঘুচে গিয়ে উভয়ের মধ্যে হৃদয়-বিনিময়ের গভীরতা সূচিত হ'ল—চুম্বকের প্রতি ইস্পাতের আকর্ষণের মত পরস্পরের প্রতি পরস্পরে তারা আকৃষ্ট হ'ল। তারপর একদিন শুভক্ষণে, পূর্ণিমা-নিশীথে নদীবক্ষে নৌকার উপরে উপযুক্ত অবসরে চাও তার সকাম বাসনা নিবেদন করল মা পিযানকে এবং মা পিয়ানও সমস্ত দ্বিধা সংকোচ দূর করে চাও চো-কে তার মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হ'ল না। পতি-পত্নীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল তারা উভয়ে।

মহাভূপ মহীপালের আদেশে চাও চো পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল কিনা তা আর জানা যায়নি এবং সেটা এই গল্পের বিষয়বস্তুও নয়।*

---

* পায়ে মাসুত বাহম এর সংগৃহীত শ্যাম দেশীয় গল্প হইতে অনূদিত।

ভারতের পল্লী-পরিকল্পনা

ভূপতি চৌধুরী

মানুষের আদিম বসতি হল গ্রামে। কয়েকঘর চাষী কিংবা কয়েকঘর জেলে, ক্ষেতের ধারে বা নদীর পাড়ে বাধল তাদের বাসা। আঁকা বাঁকা আলের উপর দিয়ে সরু পায়ে-চলার পথে তাদের আনাগোনা। অতি সামান্য তাদের প্রয়োজনের দাবী, অতি সহজ সরল তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী কালের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হতে লাগল পরিবার, উদ্ভব হল নব নব বৃত্তির, পরিবর্দ্ধিত হতে লাগল গ্রামের সীমারেখা।

লোকসংখ্যার সমৃদ্ধি ও নানা বৃত্তিজীবীর সমাবেশে সহজ সরল সামান্য গ্রাম অবস্থান ভেদে, মানুষের চেষ্টায় সহরে পরিণত হল।

পশ্চিম জগতে গ্রামের চেয়ে সহরের সংখ্যাধিক্য হলেও ভারতে এখনও গ্রামের তুলনায় সহরের সংখ্যা নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪১ সালের হিসাব মতে ভারতে সহরের সংখ্যা ৩,২০৯ ও গ্রামের সংখ্যা ৪,৬১,১১১। সহরে বাস করে প্রায় ৫ কোটি লোক আর গ্রামে থাকে বাকী ৩৪ কোটি।

সুতরাং ভারতের সত্যকারের পরিকল্পনায় সহরের চেয়ে গ্রামেরই প্রাধান্য দান করতে হবে; তাহ'লেই সম্ভব হবে ভারতের জনসাধারণের প্রকৃতি উন্নতি।

পল্লীগ্রাম পরিকল্পনার প্রথম সোপান হল ভারতের গ্রামগুলির প্রকৃতি ও অবস্থান নির্ণয়। নীচের তালিকা থেকে এ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে :—

লোকসংখ্যা

প্রদেশ	পাঁচশর কম	৫০০-১০০০	০০০ ২০০০	২০০০-৫০০০
যুক্ত প্রদেশ	৬৮,৮১০	২৩,৪৪৯	৮,১০	১,১২১
বাংলা	৫১,৫০৭	১৮,০৯২	৯,৬৯৬	৪ ৫৫১
বিহার	৪৭ ৯৩৬	১২,৮৩৭	৫,৮১৪	২,০৮১
মধ্য প্রদেশ	৩০,০৯৬	৬,৪৫৩	১,৯৬৯	৪৫৮
আসাম	২৭,৯৬৭	৪,০৯৮	,৭৪	২৫৯
উড়িষ্যা	২০,৬৮৫	৩,৫৯৭	১,০৭৫	১৯১
পাঞ্জাব	১৯ ১৬১	৯,০৬৯	৫,১৬৭	১,৭৫১
মাদ্রাজ	১২,৪৬৫	৯,২২৮	৮,২০৩	৪,৯২৯
বোম্বাই	১১,৪৮১	৫,৫৬২	৩,০৯৩	১,২১৭
সিন্ধু	৫,৮৮৫	১,৪৯৩	১৩২	৭০
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১,৪৯৮	৬১৮	৪৪৫	২৩৬
	২,৯৮,৪৯১	৯৪,৪৯৬	৪৫,৫৩৬	১৭৮৬১

উপরের তালিকার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের গ্রামগুলি একেবারে আদিম স্তরের বসতি; এতে বাস করে তারা, যাদের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে সারা ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন। এই সকল কৃষিজীবীর গ্রামগুলি সংখ্যায় বিপুল হলেও এদের সমস্যা খুব জটিল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা আমাদের বিশেষ

মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তার কারণ কৃষিশিল্পীরা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন, তাদের শিক্ষা ও অর্থ-সঙ্গতির অভাবে। সরকারী ভাবে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করা হয়নি—কারণ কাগজে কলমে চমক লাগানো পরিকল্পনা গ্রামের উপর প্রয়োগ করা চলে না। অথচ যে খাদ্যশস্যের উপর আমাদের প্রাণ নির্ভর করে তার উৎপাদন এদের উন্নতির সঙ্গে জড়িত। জগৎব্যাপী যুদ্ধের জন্য খাদ্য অনটনের ফলে, এতদিনে সরকারীভাবে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। কিন্তু সে দৃষ্টিপাত পড়েছে তির্য্যকভাবে—কৃষিশিল্পীকে বাদ দিয়ে আমাদের পরিকল্পনা গড়ে উঠছে—সেচ ও শক্তিউৎপাদন ব্যবস্থার চমক লাগানো বিজ্ঞাপনে। দামোদর, কোশী হীরাকুণ্ড প্রভৃতির বাঁধ কত লক্ষ একর জমিতে চাষের জল যোগাবে, কত কোটি অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে এই সকল কথাই শোনা যাচ্ছে—কিন্তু যারা জমিতে সোনা ফলাবে তাদের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা এ পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শোনা বা জানা যাচ্ছে না। অথচ একথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে আমাদের দেশের কৃষিজীবীর অবস্থান্তর ও উন্নতি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটী প্রধান সোপান।

এখন সরাসরিভাবে কৃষিজীবীর বর্তমান অবস্থা ও তার উন্নতির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। যে গ্রামে পাঁচশ লোকের বাস—তার আয়তন অতিক্ষুদ্র, পরিবার পিছু ৫ জন হিসাবে গ্রামের পরিবার সংখ্যা মাত্র একশ। এমন একটী ছোট বসতিতে সকল রকম সুখ সুবিধা ত দূরের কথা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও একান্ত অভাব। কুঁড়ে ঘরগুলি মাটীর, খড়ের বা গোল পাতার চাল; ঘরে আলো হাওয়া যাবার জন্য জানালার অস্তিত্ব নজরে পড়ে না। এ গৃহগুলি রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় মাত্র; তার বেশী কিছু নয়। এই সকল গ্রামে হয়ত কোনটীতে এক আধটা দোকান আছে আবার কোনটীতে তাও নেই। গ্রামের অবস্থান ক্ষেতের ধারে বা জলা জমির ওপর। একটী গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ—সরু পায়ে চলার পথ। বর্ষার ফলে বছরে ছমাস জলমগ্ন থাকে। এই সব নিজ্জীব ও অস্বাস্থ্যকর গ্রামগুলির উন্নতি করতে হ'লে নতুন করে সেগুলিকে গড়ে তুলতে হবে, কৃষিজীবীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। কথাটা শুনতে হয়ত একান্ত অপ্রিয়, কিন্তু এ কথা সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামগুলির অবস্থান বাসগৃহের পক্ষে অনুপযোগী এবং বাসগৃহগুলি বর্তমান মাপকাঠির তুলনায় একেবারে নিম্নশ্রেণীর। এ দুয়েরই আমূল পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। অর্থাৎ নতুন উঁচু জমিতে নতুন যুগের উপযোগী করে গ্রামগুলির পত্তন করতে হবে। পুরাতনের সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল এবং আপোষ জোড়া-তালির কাজের ফল বিশেষ সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির চেয়ে মানসিক আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে। কাজেই সে চেষ্টা না করে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নতুন গ্রামের মূলসূত্রগুলি এক এক করে বিবৃত করাই বোধ হয় প্রশস্ত।

বাসভূমি হওয়া উচিত উঁচু জমিতে যেখানে বর্ষায় জল জমে না। গ্রামে যাবার পথ জলে ডুববে না। গ্রামের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়া সমীচীন নয়। একশ পরিবারের গ্রাম এতক্ষুদ্র যে সেখানে সকল প্রকারের ব্যবস্থা থাকা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র গ্রামের আয়তন অন্ততঃ পাঁচশ পরিবারের মত হওয়া চাই—তবেই তাতে স্কুল, প্রাথমিক চিকিৎসালয়, প্রসূতি-সদন, পাঠাগার দোকান ও বাজারের ব্যবস্থা হতে পারে।

পল্লীগ্রামটীর অবস্থান জেলার প্রধান পাকা রাস্তার ঠিক ওপরে না হয়ে কাছাকাছি হবে এমনভাবে যাতে কৃষিজীবী তার দৈনিক চলা ফেরার জন্য অনর্থক হায়রাণ না হয়। একটী কল্পিত ছকে পল্লীর বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধের একটা খসড়া এখানে দেওয়া হল।

সদর রাস্তা থেকে সিকি বা আধমাইল দূরে গ্রামের অবস্থান—গ্রামের সুরুতে কয়েকটা দোকান, ডাকঘর, পুলিশের ফাড়ি একটা ছোট বাজার। গ্রামের ভিতরে প্রাথমিক শিক্ষালয়—ছেলেদের খেলবার মাঠ, যুবকদের আলাদা খেলবার মাঠ—বেড়াবার বাগান, পাঠাগার ও পৌর সভাগৃহ। শুশ্রূষাগার ও প্রসূতি-সদন। এগুলি এ যুগের গ্রামের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। গ্রামের পথ সহরের মত পাথর বাঁধানো দরকার নেই, কিন্তু তার প্রশস্ততা অন্তত চল্লিশ ফুট করা উচিত। এই চল্লিশ ফুটের মাত্র দশফুট খোয়া বাঁধানো হলেই কাজ চলবে। গ্রামের
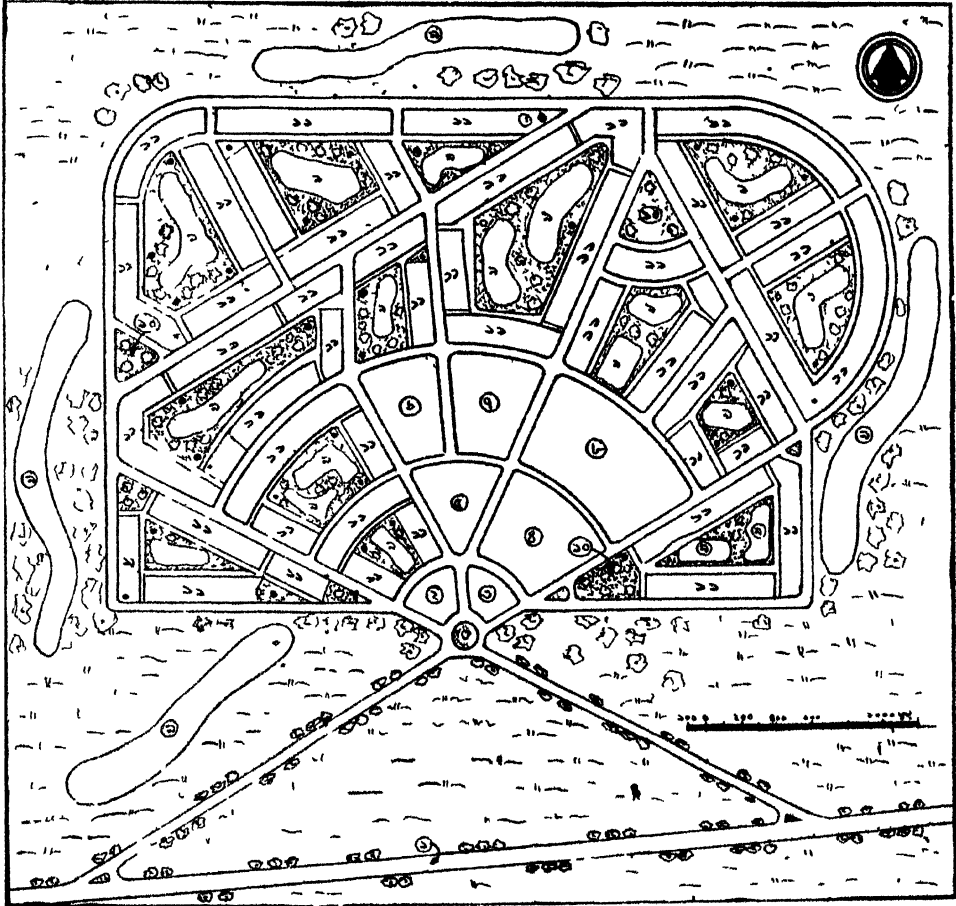
একটী নতুন পরিকল্পিত গ্রাম—প্রায় পাঁচশত পরিবার এতে বসতি করতে পারে। সদরে যাবার প্রধান রাস্তা (১), ডাকঘর (২), পুলিসের ফাঁড়ী (৩), দোকান ও বাজার (৪), পৌর সভা গৃহ ও পাঠাগার (৫), প্রসূতি সদন ও চিকিৎসা কেন্দ্র (৬), বিদ্যালয় (৭), ক্রীড়া ভূমি (৮), গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী (৯), সাধারণ কাজে এবং মেয়েদের স্নানের জন্য ব্যবহার করা চলবে। গভীর কূপে (১০), এগুলি বাসগৃহগুলির (১১), কাছেই অবস্থিত। শিশুদের জন্য প্রতি পাড়ায় ছোট ছোট উদ্যানের (১২), ব্যবস্থা আছে। পুষ্করিণীর ধারের পথগুলি শুধু পায়ে চলার জন্য। এখানে যানবাহন চলাচল নিষেধ।

রাস্তা চল্লিশ ফুট চওড়া শুনে মনে হবে যে পল্লীগ্রামগুলিকে সহরের ছাঁচে গ'ড়ে তোলাই বোধ হয় আমার আদর্শ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে একথা ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে—যে বর্তমান যুগ দ্রুত যানবাহন চলাচলের যুগ। পথগুলির প্রশস্ততা এমন হওয়া উচিত যাতে দুটী গাড়ী পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে এবং গাড়ীর জন্য জায়গা ছেড়ে পাদচারী পথিক নির্বিঘ্নে চলা ফেরা করতে পারে। দুটী চলমান গাড়ীর জন্য প্রয়োজন বিশ ফুট—এক একদিকে বাকী দশ ফুটে পাদচারীর চলাফেরা—পয়ঃপ্রণালী ও বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা। বাসগৃহগুলি পথ হতে বিশ ফুট দূরে নির্ম্মিত হবে।

সংরক্ষিত পুষ্করিণী পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রকৃষ্ট। দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হ'লে সংরক্ষিত পুষ্করিণী থেকে নলের সাহায্যে প্রতিগৃহে জলের ব্যবস্থা করা বিশেষ শক্ত নয়।

বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালী বানানোর ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন। রাস্তার বাঁধের মধ্যে মধ্যে জলনিকাশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খিলান নালীর ব্যবস্থা থাকবে।

মোটামুটীভাবে গ্রামের ব্যবস্থার মূলসূত্রগুলি নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে আসে গ্রামের বাসীন্দাদের প্রয়োজনের কথা।
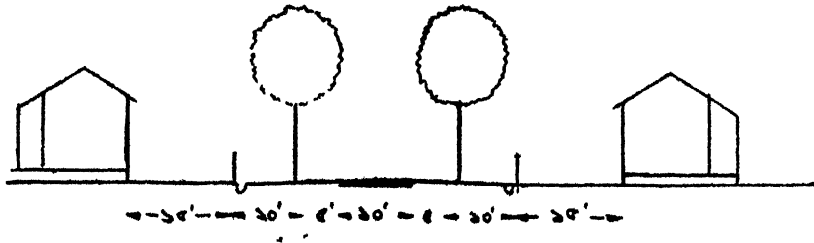
২নং—পল্লীর প্রধান পথের নমুনা। মধ্যের মোটা কালো অংশ পাকা। রাস্তার দুধারে গাছ। জমির সীমানার জলের নালী। বাড়ীগুলি সীমানা থেকে পনের ফুট ভিতরে। এর ফলে রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত মনে হবে এবং বাড়ীগুলিতে রোদ বা হাওয়া চলাচলের কোনো বাধা থাকবে না।

৺

আমাদের দেশের গ্রামের আর একটী বিশেষ অভাব পানীয় জলের। অনেকের ধারণা নলকূপের সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হতে পারে; কিন্তু এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। পানীয় জলের জন্য শুধু নলকূপের ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। পাম্পের সাহায্য ছাড়া নলকূপের জল তোলা যায় না। সেই পাম্প একবার অচল হলে অল্প সময়ে তার মেরামত ব্যবস্থা নিতান্ত দুরূহ। আমার মনে হয় গভীর পাকা ইন্দারা ও

একটী গ্রামে সকলেই একশ্রেণী বা এক বৃত্তির লোক নয়। কয়েক ঘর কৃষিজীবী, কয়েকঘর ধীবর, কয়েকঘর তন্তুবায়, কয়েকঘর ব্যবসায়ী প্রভৃতির সমন্বয়ে একটী গ্রাম গঠিত। সভ্যতার আদিম অবস্থায় বসতি গড়ে উঠেছিল শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে। প্রাথমিক স্তরের পল্লীতে থাকত শুধু এক শ্রেণীর লোক। কালক্রমে উদ্ভব হল মাধ্যমিক স্তরের পল্লী যেখানে হল একাধিক জীবিকার অধিবাসীর সংমিশ্রণ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানের ব্যবস্থা।

তারপর তৃতীয় বা যৌগিক স্তরের পল্লী—সেখানে আছে নানা বৃত্তিজীবীর সমাবেশ, ব্যবসা, শিল্পালয়, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা ও শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা, আমাদের আলোচ্য পল্লী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝামাঝি। এদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। সুতরাং তাদের কথাই প্রথম আলোচ্য। বর্ত্তমানে গৃহনির্ম্মানের ব্যয়বাহুল্যের ফলে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সাধারণ কৃষিজীবীর পক্ষে নিজ সঙ্গতিতে গৃহ নির্ম্মান করা সম্ভব নয় যদি না সরকারী ভাবে তাকে সাহায্য করা হয়। সরকারী সাহায্য বলতে আমি শুধু অর্থদানই বুঝিনা; অভিজ্ঞ স্থপতি, পূর্ত্তবিদ ও শিক্ষিত শ্রমিকের ব্যবস্থাও সরকারী সাহায্যের অন্তর্গত।

এতকাল সরকারী ব্যবস্থায় এক বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্যীভূত
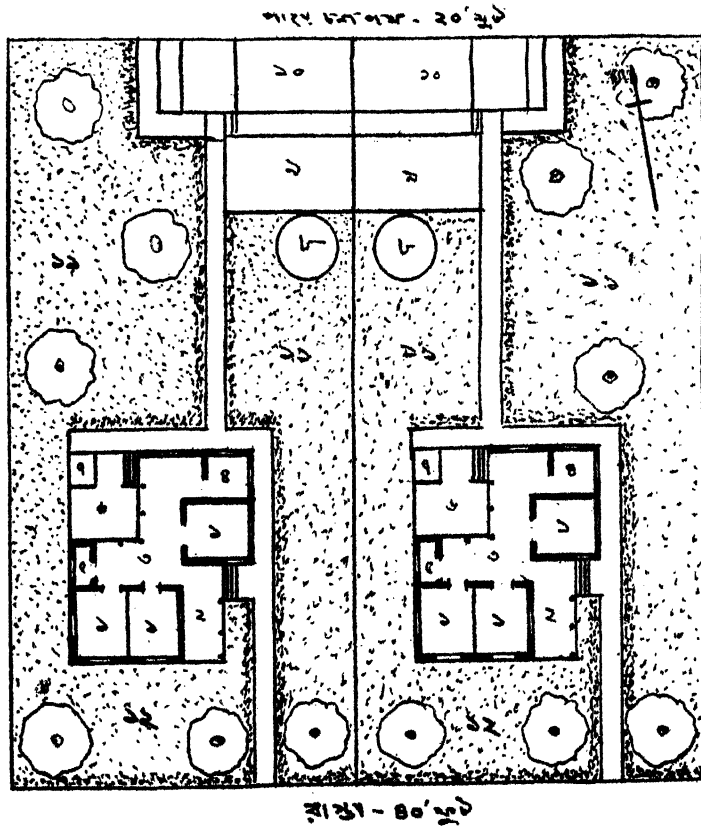
৩নং ছবি—পল্লী গৃহের নমুনা—তিনটী শোবার ঘর (১), বাইরের বারান্দা (২), খাবার ও মেয়েদের কাজ করবার জন্য ভিতরের বারান্দা (৩), রান্না ও ভাঁড়ার ঘর (৪), বাক্স ও পেঁটরা রাখবার ঘর স্নানের ঘর (৫), ভিতরের উঠান (৬), পায়খানা (৭), ধানের গোলা (৮), পাকা আঙিনা ধান বা চাল শুকাবার জন্য (৯), গরু, ছাগল রাখবার জন্য এবং কর্ম্মশালার জন্য চালা ঘর (১০), পিছনে শাক সবজির বাগান (১১), সামনে ফুলের বাগান (১২), বাড়ীগুলির সামনে পাকা ৪০ ফুট চওড়া—পিছনে পায়ে চলা পথ ২০ ফুট চওড়া।

ছিল—একটী বিশিষ্ট ছাঁচের প্রতি নিষ্ঠা। এর কারণ আর কিছু নয়—শ্রেণী ভেদে প্রয়োজনের বিভিন্নতা এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সহানুভূতির অভাব। এর উপর এদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিদেশীয় তথাকথিত বিশেষজ্ঞের অহেতুক ব্যয়বহুল পরিকল্পনার বহর।

এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ করা বোধহয় এব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হচ্ছে বলে শুনেছি, কিন্তু সে চেষ্টা কি রূপ পরিগ্রহ করেছে সে সম্বন্ধে আমার কোনো সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই। তবে আমার আশা আছে যে আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে শিক্ষা-সাহায্যে একটা ঐক্য আনতে পারলে এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জ্জন করা খুব দুরূহ হবেনা। কিন্তু সে অনেক সময় সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে আমাদের কৃষিজীবীদের প্রয়োজনের দাবী কতটা তা
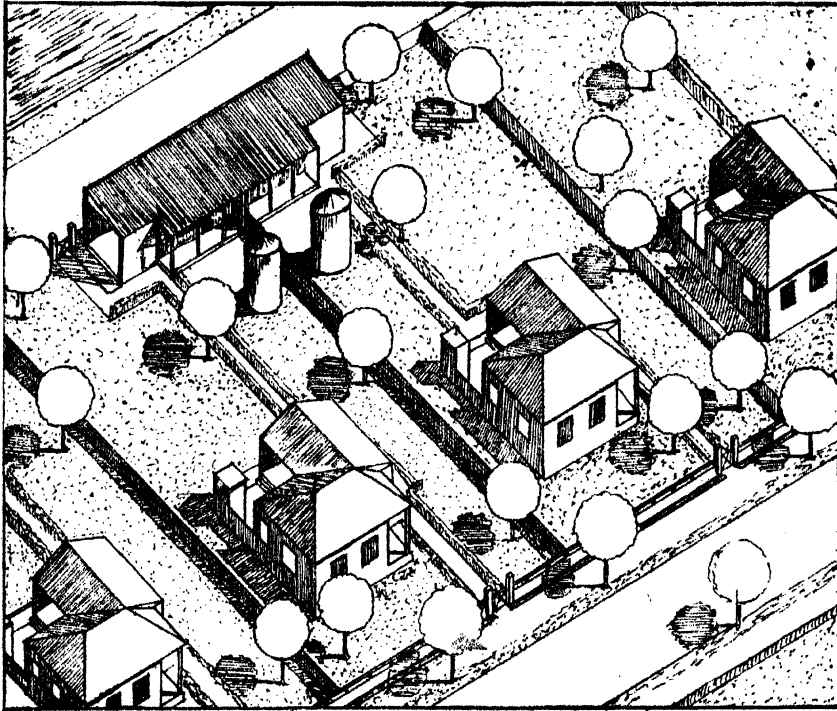
৩নং ছবি পাশ থেকে এইরকম দেখাবে।

প্রাসঙ্গিক হবেনা। গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় লাঘবের জন্য কারখানার তৈরী গৃহাংশ ব্যবহার করার একটা চেষ্টা আমেরিকা ও ইংলণ্ডে করা হয়েছে এই প্রচেষ্টা খুব সাফল্য লাভ করেছে বলে এখনও জানা যায়নি। এদেশেও নির্দ্ধারণ করে সচরাচর ব্যবহার্য্য মাল মসলার সাহায্যে কি ধরণের গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত সে আলোচনাই প্রশস্ত।

আমাদের দেশে এসম্বন্ধে বিশদবিবরণ এখনও পর্য্যন্ত

বেশ সঠিকভাবে সংগৃহীত হয়নি। ভারতের প্রদেশ হিসাবে এবং পরিবারের জন সংখ্যার উপর এই পরিকল্পনা নির্ভরশীল। তবে মোটামুটীভাবে বাংলাদেশের কৃষি-পরিবারের জন্য অন্ততঃ তিনটী ঘর একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া রান্না ও ভাঁড়ারের জন্য একটী ঘর বসবার জন্য বাইরে এবং খাবার জন্য ভিতরে একটী দাওয়া বা বারান্দা একান্ত প্রয়োজন।

একটী কৃষি পরিবারের জনসংখ্যা অনেকটা এই ধরণের :—

পিতা ও মাতা —২
প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও পুত্রবধূ
অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও কন্যা —৪
পোষ্য (একটা বা দুইটি) —
১০ জন

এই দশ জনের জন্য তিনটী ঘর মোটেই বেশী নয়। এখন ঘর ও বারান্দার একটা মোটামুটী বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথম দুটী শোবার ঘর ১২০ বর্গফুট হওয়া উচিত, অর্থাৎ ১২´ ফুট লম্বা ও ১০´ ফুট চওড়া ঘর। তৃতীয় ঘরটী কিছু ছোট হলেও চলে—সেটীর মাপ ১০০ থেকে ১১০ বর্গফুট হলে চলতে পারে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মাপ হবে ৮০ বর্গফুট। বাইরের ও ভিতরের বারান্দার মাপও এর থেকে কম হলে চলবে না।

স্নান ও পায়খানার ব্যবস্থাও বর্তমান কালের উপযোগী ভাবে করতে হবে। দুটী বাড়ীর পায়খানা একত্র করে সেপটিক্ ট্যাঙ্কের প্রবর্তন করাই সমীচীন। সেপটিক্ ট্যাঙ্কের নির্গত জল ক্ষেত ও সবজীর বাগানের কাজে বিশেষ উপযোগী।

গৃহের পোতা চার পাশের জমি থেকে অন্ততঃ দুই ফুট উঁচু হবে। দেয়ালের জন্য এক ইটের গাঁথুনি এখনও পর্য্যন্ত একার্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রত্যেক ঘরে আলো ও হাওয়া চলাচলের জন্য দরজা ও জানালা মিলে অন্তত তিনটী থাকা উচিত। ছাদের আচ্ছাদন পাকা হলেই ভাল। অবস্থা বিশেষে ঢেউ খেলান এস্‌বেসটস সিমেণ্ট, দস্তার বা ভাল লোহার চাদর ব্যবহার করা চলবে। ঘরের মেঝে সিমেণ্টের হওয়া চাই। এই বিবরণ খুব উঁচু ধরণের নয়, কিন্তু এর চেয়ে নীচু মাপকাঠি কোনো ক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না।
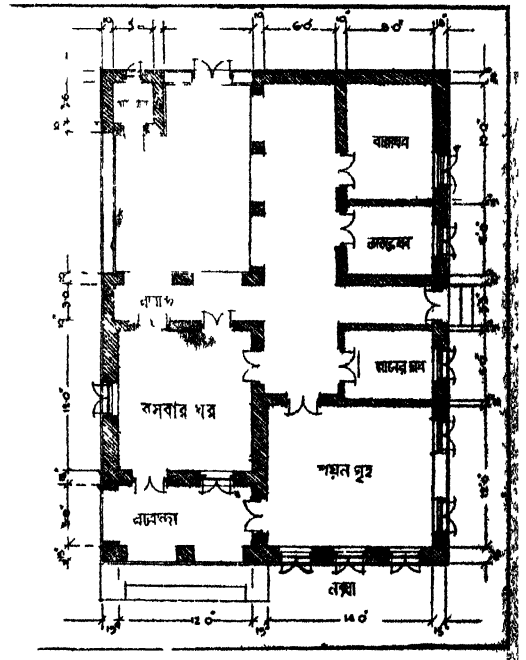
বাসগৃহের নক্সা—শ্রীযুক্ত প্রিয় গুহ অঙ্কিত

কৃষিজীবীর পরিজনের ভিতর গৃহপালিত গবাদি পশুরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুর্গী এবং চাষের যন্ত্রপাতি যথা লাঙ্গল, কোদাল, প্রভৃতি রাখবার জন্য একটা চালা ঘর বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্য

চাল ঝাড়বার জন্য একটী পরিষ্কার আঙ্গিনা ও রাখবার জন্য একটী গোলারও স্থান চাই। ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্য যখন কৃষিশিল্পের পরিণত হবে তখন হয়ত আলাদা গোলা ও আঙ্গিনার ততটা প্রয়োজন হবেনা। এর ব্যবস্থা সমবায় বা যৌথপ্রথায় সম্পন্ন হবে। তবে সংসারের প্রাত্যহিক শাকসবজী ফলাবার জন্য কিছুটা জমি বিশেষ প্রয়োজন। এই হিসাবের ভিত্তিতে প্রত্যেকটী কৃষি পরিবারের জন্য অন্ততঃ দশ থেকে বারো কাঠা জমি প্রয়োজন

কৃষিপরিবার-প্রধান পল্লীর অপর বৃত্তিধারী যথা তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতির কর্ম্মশালার জন্য আরও একটী ঘর দরকার। পিছনের চালা ঘর অবশ্য কর্ম্মশালা হিসাবে ব্যবহার করা চলে।
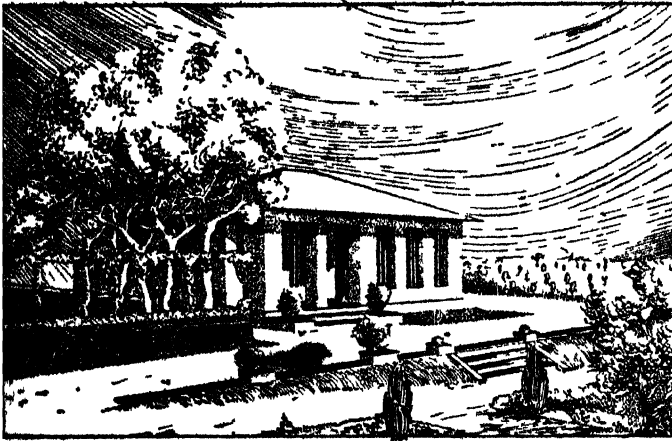
পল্লীগৃহের দৃশ্য যত্ন ও চেষ্টা করলে ও বাগানের সাহায্যে গৃহগুলি রমণীয় করে রাখা যায়

এই মোটামুটী বিবরণটী একটী খসড়া মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে কি ভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি তারই কিছুটা আভাস এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবতারণা করা গেল। অবস্থান ও প্রয়োজন ভেদের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের নব জাগরণের দিনে—তার প্রধানতম অংশটীর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কৃষিকার্য্যে যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি পেলে কৃষিপ্রধান পল্লীর প্রকৃতির কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটবে। সুলভমূল্যে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হ'লে পল্লীগ্রামেও কুটীর শিল্প ও কারখানার বিস্তার লাভ করবে। ফলে গ্রাম পরিকল্পনার সমস্যায় কিছুটা জটিলতার আবির্ভাব ঘটবে বটে কিন্তু সেজন্য মূলসূত্রের কোনো পরিবর্ত্তন হবে না। গ্রামে নানা বৃত্তিজীবীর আবির্ভাবের ফলে এক বা দুই শ্রেণীর বাসগৃহের পরিবর্ত্তে নানা শ্রেণীর বাসগৃহের প্রয়োজন ঘটবে।

বর্ত্তমানে গ্রাম ও সহরের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আছে কালক্রমে সেই ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস পাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত যাঁরা গ্রামের বাসভবন শৃঙ্খলিত করে সহরে কোন ক্রমে দিনপাত করেন নবোদ্ভূত পল্লীতে তাদের স্থান ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এধরণের পরিকল্পনা সময়সাপেক্ষ ও জটিল সন্দেহ নেই কিন্তু আমার আশা আছে যে আমাদের দেশ-নেতা ও জনসাধারণ এখন এবিষয়ে অনেকটা আগ্রহশীল হওয়ায় আমাদের দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য,অর্থনৈতিক উন্নতি, যোগাযোগ খাদ্য পরিবেশন, খনিজ শিল্প রক্ষণ, শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়সংযুক্ত একটী সর্ব্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়ত সম্ভব হবে। পরিকল্পনা করা ও পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। তবে আমার বিশ্বাস এবিষয়ে আমাদের সত্যকারের ইচ্ছা থাকলে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া মোটেই দুরূহ নয়।

বাংলার মাছ

শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে মাছ খাদ্যের প্রধান অঙ্গ। মাছ বাঙালীর এত প্রিয় যে এর জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে তাকে কটূক্তি শুনতে হয়। যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের দুধ, ঘি, গম, জোয়ার ও জলহাওয়ার মধ্যে যে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে, বাঙলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মাছ খেয়ে তার কতকটা পূরণ করা যায়। কিন্তু আজ বাঙলার অন্নসমস্যার মত মাছের সমস্যাও তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

মাছ বাংলার সম্পদ। বঙ্গোপসাগরের মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্র পৃথিবীর মধ্যে লোভনীয় ও অর্থকরী। Barent Sea পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মাছ উৎপাদন কেন্দ্র এবং তার পরেই স্থান পায় বঙ্গোপসাগর। তারপর নদীজলায় পূর্ণ বাঙলায় যে মাছের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু তবুও যে আজ বাঙলায় মাছের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার কারণ ভেবে দেখা উচিত।

যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ে মাছের উৎপাদন বা সরবরাহের প্রতি যে নজর দেওয়া উচিত তা সরকার বা জনসাধারণ কোন পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়নি। যেখানে বেশী মাছ পাওয়া সম্ভব সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ ধরা হ'ত না। আবার কোন জায়গায় এত বেশী মাছ ধরা হ'ত যে ক্রমশ সেখান থেকে পরে মাছ পাওয়ার সম্ভাবনাই নষ্ট হ'য়ে যেত। কিম্বা চারা পোনা শুদ্ধ এমন ভাবে মাছ ধ'রে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হ'ত যে মাছের উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি করা হ'ত। তারপর সরবরাহের ব্যবস্থায় এত ত্রুটি থাকত যে অনিচ্ছায় নিরামিষ খাওয়ার কৃচ্ছ্রতা কোন কোন অংশের লোককে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হ'ত। মৎস্যজীবিদের হাতেই এর সম্পূর্ণ ব্যাপক ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া ছিল তাদের সংগঠনও কিছুই ছিল না, আবার সরবরাহ ব্যাপারে সর্ব্বগ্রাসী দাদন ব্যবস্থা, মহাজনী সুদ আর জলের মালিক বা জমিদারের চাপ এদের ঘাড়ে এমন জোয়াল চাপিয়ে রাখে যে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া কোন সংগঠিত দৃঢ় সঙ্ঘশক্তির পক্ষেও খুব আশাপ্রদ মনে হয় না। অথচ মাছের বেসাতি বাঙালার চার লক্ষ জনগণের জীবিকার উপায়।

মৎস্যজীবীদের দুর্দ্দশা চরমে উঠল যুদ্ধের মধ্যে, ১৯৪২ সাল থেকে। দুর্দ্ধর্ষ জাপানের বাংলা অভিযান সফল বলে ধ'রে নিয়েই বাংলায় 'বঞ্চনা নীতির' পুরোপুরি তাণ্ডব সুরু ক'রে দেওয়া হল পাছে নৌকাগুলি জাপানীদের কাজে লাগে তাই সেগুলি সরকারী হেফাজতে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হ'ল মৎস্যজীবিদের জীবিকার উপায় শেষ হ'য়ে গেল, জালের সূত্র তাদের কাছে দুর্লভ হ'য়ে উঠ্‌ল আর ভূমিহীন এই সম্প্রদায়ের মাথা গুঁজে থাকার ব্যবস্থাও বানচাল হ'য়ে গেল, সরবরাহের ব্যবস্থা ত' গণ্ডগোল হ'য়েই ছিল। অসংগঠিত মৎস্যজীবীদের মেরুদণ্ডে এই আঘাতের ক্ষত আজও পূরণ হ'য়ে ওঠে নি।

অথচ এই মাছের চাষের সম্ভাবনা হিসাব ক'রে দেখলে আমরা অবাক্ হ'য়ে যাবো। সারা ভারতে প্রতিবছরে এক কোটি বাহান্ন লক্ষ সত্তর হাজার মণ মাছ ধরা হয়। সমুদ্রের অনেক মাছ শুঁটে নেওয়া হয়, আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরে কাজে লাগাবার জন্য তুলে রাখা হয়। বাষট্টি লক্ষ ষাট হাজার মণ মাছ বাজারে টাট্‌কা বিক্রি করা হয়। কলিকাতার বাজারে গড়ে বছরে ছয় লক্ষ পনের হাজার চারশ' পঁচিশ মণ

মাছ এসেছিল। কমবেশী চল্লিশ লক্ষ লোক এখন কলিকাতার অধিবাসী। এদের পক্ষে যে মাছের সরবরাহ যথেষ্ট হয়নি তা বেশ স্পষ্ট। সুতরাং মাছের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির চাহিদা খুব বেশী আছে। টাট্কা মাছের চাহিদা ত' খুব বেশীই, তাছাড়া মাছের তেল নানাভাবে দরকারী। মাছ থেকে জমির খুব ভালো সার তৈরী করা যায়। আমাদের দেশে বিদেশ থেকে শুকনো বা সংরক্ষিত মাছ, মাছের তেল বা মাছ থেকে তৈরী সার যা প্রতি বছরে আমদানী করা হয় তার দাম ষোল লক্ষ টাকা। সব দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে মনে হয়, মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ফেলতে পারলে দেশের উপকার করাই হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেশে রয়েছে।

ব্যাপকভাবে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দিনেমার জাতির বিরাট গাঁতি জাল আনিয়ে এই ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করা যায়। তবে এর জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন। তারপর মাছ সরবরাহ করার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের ব্যবস্থাও ক'রতে হবে রেফ্রিজারেটারের ব্যবস্থাসমেত ষ্টীম লঞ্চ এর জন্য খুব দরকার। নদীতে মাছ ধরার ব্যবস্থাও উন্নত করা দরকার। আর সুন্দরবনে আবাদ অঞ্চলের ধান ক্ষেতের মধ্যে যে ভাসা বাদা মাছ অজস্র পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ও বিভিন্নকেন্দ্রে চালান দেওয়ার ব্যবস্থাও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। তারপর পুকুরে খালে বিলে যে সব মাছের ভাণ্ডার আছে তার সংস্কার, সেই সব জায়গায় সংগ্রহ ও চালানির নতুন ব্যবস্থা চালু করা কর্ত্তব্য। মাছ উৎপাদনের এই সব ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ হবে যদি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রয়োজনমত উন্নত করা না যায়।

যে সব অঞ্চল থেকে চালান দেওয়া সময়সাপেক্ষ সেখানকার মাছ শুকনো ক'রে বা সংরক্ষিত ক'রে রাখতে হবে। কলিকাতা, দার্জ্জিলিং, ঢাকা ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে বিক্রয়ের বড় বড় ঘাঁটির সৃষ্টি ক'রতে হবে। এই সব জায়গায় সব সময় মাছ সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে, আর কোন সময়েই যাতে দামের অসামঞ্জস্য না ঘটে তার জন্য সমবায় ব্যবস্থা চালু ক'রতে হবে। পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের মধ্যে তবেই সমতা রক্ষা করা যাবে। সমবায় ব্যবস্থার মারফতেই মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা যেতে পারে। যুদ্ধের মধ্যে তারা অনেক জায়গা থেকে উৎখাত হ'যে পড়েছে। তাদের পুনঃ সংস্থাপনের ভার নিতে হবে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকেই। মহাজনী-ঋণ ও দাদনদার ক্রেতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। জালের সুতা আর আলকাৎরার অভাব মেটাতে হবে। সেজন্য শুধু ধর্ম্মঘটকে দায়ী করা চলবে না, সুতার চোরাকারবার বন্ধ ক'রতে হবে। নিয়ন্ত্রিত মূল্য কাগজে বের ক'রেই দায়িত্ব এড়ালে চলবে না। গলদ কোথায় তা খুঁজে বের ক'রতে হবে। মৎস্যজীবীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলির প্রতি তাদের শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলতে হবে। মাছ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কেমনভাবে মাছের চাষ ক'রলে বেশী ফল লাভ করা যায় তার জন্য চর্চার দরকার। মাছের তেল বা মাছ থেকে সার তৈরির বিষয়ে এই গবেষণার কেন্দ্রগুলির বেশী নজর দেওয়া উচিত

কলিকাতায় এগারটি মাছের পাইকারী বাজার আছে। তা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে। লণ্ডনের বিলিংসগেটের মত হয়তো রেফ্রিজারেশন ব্যবস্থা-সম্পন্ন ব্যাপার আশু সম্ভব না হ'লেও, সেই ধরণের কিছু সুরু করা একেবারে অসম্ভব নয়।

এরকম ব্যাপক ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেই করা সম্ভব। এ সম্বন্ধে বাংলা সরকার যথেষ্ট অবহিত হ'য়েছেন ব'লে মনে হয় না। অবশ্য তাঁরা এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা খরচে এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত করার সুপারিশ ক'রছেন। ভাল কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু, বর্ত্তমান সরকার দলগত পরিপুষ্টির জন্য যে রকম উঠে প'ড়ে লেগেছেন তাতে জনগণের কল্যাণকর ব্যবস্থায় হাত দেবার অবসর তাঁদের কোথায়? সুদৃঢ় জনমত এর অনুকূলে এলে জনগণের পক্ষ থেকেই এই সংগঠনের প্রচেষ্টা আজকের হানাহানির মধ্যেও আমরা সম্ভব ব'লে মনে করি।

প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সম্প্রতি কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেল। মূল সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে একটা নতুন কথা পেয়েছি—এ নতুন কথা একটা নতুন শক্তি। এতদিন আমরা জানতুম যে আমরা প্রবাসী বাঙালীরা বাংলাদেশের বাইরে সহরে সহরে ছড়িয়ে আছি, কিন্তু তার সংখ্যা যে সত্তর লক্ষ এবং এই সত্তর লক্ষ লোক ইচ্ছে করলে যে কিছু একটা ক'রে তুলতে পারে, এ তথ্যটি এইবার জোর ক'রে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সত্যিই ত, আমরা সত্তর লক্ষ লোক যদি একযোগে কিছু চাই ত আমাদের ইচ্ছাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কে? আমাদের শক্তি সম্বন্ধেই আমরা এতদিন সজ্ঞান ছিলুম না—এইবার যখন সেটা জেনেছি তখন সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর শিক্ষা আমাদের লাভ করতে হবে।

এই সত্তর লক্ষ লোকের অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হ'ল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। তার বয়স হ'ল চব্বিশ বছর। এতদিন এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে কেবলমাত্র বড় ক'রে একটা সাহিত্য সম্মেলন ক'রেই ক্ষান্ত থাকতো। এইবার তার কাজ করবার পালা এসেচে এবং তার জন্যে কার্যসূচী এবং প্রোগ্রামও নির্দিষ্ট হয়েচে। ভারতের রাজধানী দিল্লী সহরে সম্মেলনের একটি স্থায়ী বাসভবন নির্মিত হবে স্থির হয়েচে। আশা করা যায় এই কেন্দ্রস্থল থেকে বাংলা দেশের বাইরে থাকার ফলে প্রবাসী বাঙালীর যে সমস্ত বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হয়েচে এবং ভবিষ্যতে হবে তার নিরসন করার চেষ্টা হবে। জওহরলাল যেমন আন্ত এশিয়া সম্মেলনে সমস্ত এসিয়ার মিলনের স্বপ্ন দেখেচেন, সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি নগেন্দ্রনাথ বক্ষিত মহাশয়ও সেই রকম এই সম্মেলনের মধ্যস্থতায় সমস্ত প্রবাসী বাঙালীর মিলনের স্বপ্ন দেখেচেন। মনে মনে মিলন ত চিরদিনই ছিল, এখনো আছে—বাকি কেবল কর্মের মধ্যে দিয়ে মিলন। এখন আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেকার মিলনকে সক্রিয় (active) ক'রে তুলতে হবে—যা আমাদের কল্যাণের তাকে জোর ক'রে চাইতে হবে এবং এই চাওয়ার মধ্যে সত্তর লক্ষ লোকের কণ্ঠ মেলাতে হবে। আমাদের চাওয়ার পেছনে যদি সত্তর লক্ষ লোকের সম্মিলিত নৈতিক জোর (moral force) থাকে তবে সেই দাবিকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

এই দাবি দাওয়ার কথা এখন আর কেবলমাত্র একটা মুখের কথা কিংবা মাসিক পত্রে লেখা প্রবন্ধের কথা মাত্র নেই। কারণ বাংলা দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েচে। আগে আমরা ভেবেচি যে বাংলা দেশের বাইরে চাকরি করতে এসেচি, চাকরি শেষ হ'লে পেন্সান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব এবং বাকি জীবন শান্তিতে বাংলা মায়ের বুকে কাটাতে পারবো। এখন কিন্তু সে কথা অত সহজে মনে করতে পারিনে। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত হওয়ায় এখন আমাদের পাঁচবার ভাবতে হচ্চে যে বাংলা দেশে ফিরে যাওয়া সমীচীন

হবে কি না। অবশ্য এখনো অতটা নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়িনি - কেন না এখনো আশা আছে যে হিন্দু মুসলমানের একটা বোঝাপড়া হবে এবং আমরা আবার পূর্বের মত মিলে মিশে থাকতে পারবো। কিন্তু আমি দেখেছি ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক বন্ধু বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটাকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে যাঁদের বাড়ি নোয়াখালি জেলায় এবং ঢাকা জেলায়। তাঁদেরও দোষ দিতে পারিনে। কেন না ইচ্ছে ক'রে কে আর ছেলে পুলে নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? বাংলা দেশের অনেক জেলার অবস্থা ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মত হ'য়ে আছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। অপর পক্ষে যেখানে আমরা বাস করি অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশে, বিহারে, উড়িষ্যায় বা বোম্বাই প্রদেশে (এই সব প্রদেশেই বাঙালীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি), সেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব। সুতরাং এ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রলোভনও কম নয়। বিশেষ ক'রে স্বাস্থ্যকর জলহাওয়া এবং সস্তা জিনিষপত্র পাওয়ার সুবিধা ত আছেই কিন্তু তবু আমরা বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটাকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারিনে। কারণ আমরা বিভূতি বাঁড়ুজ্যের 'পথের পাঁচালী' পড়েছি—বাংলা দেশের অস্বাস্থ্যকর বন জঙ্গল ঝোপ ঝাড়কেও আমরা ভালবাসি। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'England, with all thy faults, I love thee still' পড়েছি। বাংলা দেশে আমরা জন্মেছি, তার অন্নজলে ঐতিহ্যে সংস্কৃতিতে আমরা পরিপুষ্ট হয়েছি—আমাদের পিতৃপুরুষের অস্থি মেদ মজ্জা ঐ বাংলা দেশের ধূলিতে মিশে আছে—তার গ্রামের পথে-ঘাটে, পাল-পার্বণে, চেনা লোকের মুখে আমাদের সহস্র স্মৃতি—তাকে কি 'যাও' বললে বুক থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া যায়? প্রবাসে আসা আমাদের জীবিকা সমস্যা সমাধানের একটা উপায় মাত্র ছিল—তার দ্বারা আমরা বাংলার এবং বাঙালীর সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হই নি। ছুটি পেলেই বাংলা দেশে গিয়েছি এবং এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলা দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাকিস্তানের দুঃস্বপ্ন দেখার ফলে আমাদের প্রশ্নটাকে আবার নূতন ক'রে ভেবে দেখতে হচ্ছে। প্রবাসী বাঙালীর মনে বর্তমানে এই নিয়ে এক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে—এই দ্বন্দ্বের একটার background হচ্ছে sentiment, আর একটার self-preservation. এই দোটানা অবস্থার মধ্যে প্রবাসী বাঙালী এখন অবস্থিত। কোনটার জয় হয় দেখা যাক্। দুই দিকেই যুক্তি প্রচুর। বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার যুক্তিটার বনেদ হচ্ছে sentiment—বাঙালী আজ বিপন্ন, বাংলার শিক্ষা, সুরুচি, সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। এই হচ্ছে এবারকার সাহিত্য সম্মেলনের বাণী। তাই এবারকার সাহিত্য সম্মেলনের সুর হ'ল রাজনৈতিক, সাহিত্যিক নয়। এই দিক দিয়েও মনে হয় যে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ বিপন্ন, তার শিক্ষা দীক্ষার উপর পাকিস্তানের খড়্গ উদ্যত—তাই ব'লে কি আমরা বিপন্ন মাকে ছেড়ে নিজেরা নিরাপদ স্থান খুঁজে নেব? সেটা কি আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় হবে? বাংলা মায়ের যদি কোন দিন সাহায্যের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে তবে সে আজ। আজ কি তাঁর প্রবাসী ছেলেরা বিপদের সম্ভাবনা দেখে বিমুখ হ'য়ে থাকবে? মায়ের সাহায্যের জন্য ছুটে না গিয়ে নিজেদের বৃদ্ধ অকর্মণ্য হাড়পাঁজরাগুলো প্রবাসের নিরুপদ্রব ভাড়াটে বাড়িতে জিইয়ে রেখে দেবে?

অপর পক্ষে আত্ম-সংরক্ষণের (Self-preservation) নিয়মগুলোও কম কাজ করে না। বাংলা দেশের বাইরে থাকার ফলেও আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত হয়েছে। বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজে কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা ছেলেপুলেদের ভর্তি করতে পারি নে- চাকরি পাওয়া ত অসম্ভব। আবার প্রবাসেও অনেক ক্ষেত্রে reservation আছে—যেমন বিহারে বিহারীদের জন্য,

যুক্তপ্রদেশে হিন্দুস্থানীদের জন্য, এই রকম। এই সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে আমাদের এই সম্মেলনকে।

সম্মেলনে এবার যে অনেকগুলি কার্য্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হয়েচে তার মধ্যে একটি এই :

"যেহেতু মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় কয়েকটি প্রদেশে ইংরাজির পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সেইজন্য প্রবাসী বাঙালীরা দাবি করেন যে তাঁহাদিগের মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত প্রদেশে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য অচিরে ভারত ও প্রাদেশিক সরকারকে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন।"

—আনন্দবাজার।

যদিও উপরের প্রস্তাবটি involved sentenceএর একটি উদাহরণ ব'লে গণ্য করা যেতে পারে, তবু মানেটা বোঝা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে প্রবাসী বাঙালীরা যে যে প্রদেশে বাস করেচেন সেখানে তাঁদের ছেলে পুলেদের বাংলা ভাষায় পড়ানোর এবং পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বাংলা ভাষায় ছেলে মেয়েদের পড়ানো যে কতটা দরকারী আমি তার কিছু উদাহরণ দেব। কেন না আমি দেখেছি যে আমার অনেক বন্ধু মনে করেন যে বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বললেই বাংলা ভাষার চর্চা থাকবে—আলাদা ক'রে বাংলা বই বা সাহিত্য না পড়ালেও চলে। আমি মনে করি যে আমাদের যে সন্তান সন্ততিরা তাদের বাল্যকালে এবং যৌবনে বাংলা দেশে থাকতে পায় নি তারা তাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অনেক জিনিষ হারিয়েচে—বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য যে শালীনতা এবং সুকুমারত্ব তা বাংলা দেশের বাইরেকার আবহাওয়ায় পুষ্ট হ'তে পারে না। তার উপর তারা যদি আবার বাংলা ভাষাটাও ভোলে তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য ব'লেই গণ্য করতে হবে। আর শুধু বাড়িতে বাংলা কথা বললেই যে বাংলা ভাষা অধিগত হয় এ ধারণাও ভুল।

আমি স্বভাবতই আমার ছেলেমেয়ের বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলা সম্বন্ধে কান পেতে রাখি। কিন্তু তবু আমার কানকে অতিক্রম ক'রে কি ক'রে যে হিন্দি ভাষার [illegible] সেখানে এসে অনধিকার প্রবেশ লাভ করে তার কারণ খুঁজে পাইনে। বোধ হয় হিন্দুস্থানী দেশের আকাশে বাতাসে তাদের ভাষা ছড়িয়ে আছে। যেমন [illegible] পেন্‌সিল দিয়ে কিছু লিখে তারা বলে, বাবা, [illegible] লেখাটা মিটিয়ে দিই? বলা বাহুল্য, বাংলা দেশে [illegible] বলতুম, পুঁছে ফেলি? আবার কাছে এসে কেউ [illegible] বলে—এই, হ'টে বোস্। অর্থাৎ কিনা স'রে বোস্। [illegible] কেউ ধাক্কা দেয় তবে কেঁদে মায়ের কাছে [illegible] নালিশ জানায়, মা, আমাকে ধেকূলে [illegible] এগুলি যে হিন্দি শব্দেরই আক্রমণ এবং বাংলা [illegible] পরাজয়, এ কথা ব'লে বোঝানোর আশা করি প্র[illegible] নেই।

তাই আমার ধারণা বাংলা ভাষাকে এবং তার [illegible] বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হ'লে সক্রিয় চেষ্টা দরকার। কেবল সহানুভূতি নিয়ে ব'সে থাকলে হবে না। [illegible] সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন।

পঞ্চগ্রাম

[বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম। নব্বই হাজার গ্রামের সঙ্গতির উপর সারা প্রদেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। শতকরা নব্বই জনের উপর বাঙালীই গ্রামের অধিবাসী। অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রামগুলির সংগঠন ও সংস্থাপন সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় এসেছে। গ্রামের সুখ দুঃখ এবং স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগতভাবে তার সংস্কার ও সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে এই স্তম্ভে সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করার জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই সম্পর্কে যে সব রচনা প্রকাশিত হবে তার মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন্। —সম্পাদক।]

মুড়াই

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত [illegible] শহরের উত্তর-সংলগ্ন মুড়াই গ্রাম পূর্ব্বে অতিশয় সমৃদ্ধি-শালী ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে মুড়াই প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকের বাড়ীর অসংখ্য ভিটার চিহ্ন দেখিলে প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয়। তবে ভগবানের কৃপায় এখন আবার গৃহস্থ লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানবের মন হরণ করে। রাশি রাশি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ শির উত্তোলন করিয়া গ্রামের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামের পূর্ব্ব এবং উত্তরেই ধানের ক্ষেত; মাত্র এক মাইল উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী এবং ইহার কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে দুমকার পর্ব্বতশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কথিত আছে যে এই গ্রামের সদ্গোপ এবং বাগ্দী জাতি ডাকাতি করিত, লোক খুন করিত; অথচ তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে কেহ সাহায্য করিত না। একবার এক [illegible] এই সমস্ত ডাকাতদিগকে ধরাইয়া দেয়। মনে হয় এই পাপের জন্যই গ্রামের অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হয়। গ্রামের একটি বহু প্রাচীন বংশের গৃহে শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা হয়। ইহাদের একটী শিব ঠাকুর ও তদীয় মন্দির আছে। শিবের নিত্য পূজা হয়। এখন ইহাদের অবস্থা নিরতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের বিরাট বাড়ী ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হওয়ায় ইহারা নিকটস্থ মৃন্ময় কুটীরে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন।

গ্রামের দক্ষিণে প্রবেশ-পথের বামপার্শ্বে কেবট (কেওট) দের মা মনসাদেবীর মৃন্ময় কুটীর।

ইহার সামান্য উত্তরেই রাস্তার ডান দিকে কালাচাঁদ ঠাকুরের মন্দির। এই স্থানটি অতিশয় মনোরম, ঠিক যেন একটী কুঞ্জবন। নানা-বৃক্ষ পরিশোভিত এই সুদৃশ্য স্থান সর্ব্বদা বিবিধ পক্ষীর কূজনে মুখরিত হইয়া আছে। দিন-মানে শিবাগণের অবাধ গতিবিধি এবং তাহাদের উল্লাস দর্শকের মনে আনন্দ প্রদান করে। স্বর্গত রাধাবল্লভ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বহু বৈষ্ণব পদ আছে। কালা-চাঁদ বা কেলেচাঁদের সুবৃহৎ দারুমূর্ত্তি অতি সুন্দর। সিউড়ী শহরের ছয় মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী কুনুড়ি গ্রামে ইনি ফাল্গুন মাসের ৯ই হইতে কার্ত্তিকের ১৫ই পর্য্যন্ত, মুড়াইএ ১৬ই কার্ত্তিক হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত এবং বাকী সময় সিউড়ীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমবর্ত্তী রাউতাড়া গ্রামে থাকেন।

কুনুড়িতে ইহার দোল, রথ ও জন্মাষ্টমী,—মুড়াইএ নবান্ন, পঞ্চমদোস, বনভোজন ও রাজভোগ এবং রাউতাড়ায়

রাস উৎসব হয়। মুড়াইএ ইহার পঞ্চম রাস দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়,মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। এ সময় এখানে নাতিবৃহৎ মেলা বসে এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

কালাচাঁদ এখানকার ঠাকুর ছিলেন না। ইনি বৃন্দাবন-ধামের আমলীতলা মদনানন্দদা কুঞ্জে বাস করিতেন। ইঁহার তথায় ১/০ একমণ দুধের ভোগ হইত বলিয়া ইনি দুধকোঁড়া নামে পরিচিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

বন রাউতাড়া গ্রামের দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী সিংহনারায়ণপুর গ্রামের কাশীপুরবংশীয় গোস্বামী বংশের দামোদর শিলা বর্ত্তমানে মুড়াইএ ছয় মাস এবং রাউতাড়ায় ছয় মাস থাকিয়া পূজিত হইতেছেন।

নবা বড়ালের গোবিন্দ জীউ ঠাকুরের ঠাকুরাণী—রাধারাণী বৃন্দাবনধামস্থিত আমলীতলার 'দুধ কোঁড়া' ঠাকুরের নিকট থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আউল গোস্বামীকে স্বপ্ন দেন।

আউল গোস্বামী সেবাইতকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে সেবাইত তাঁহাকে চোর বলিয়া অপমানিত ও অপদস্থ করেন। তিনি প্রাণভয়ে মথুরায় পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এদিকে দুধকোঁড়া ঠাকুর মনোভিলাষ সেবাইতকে স্বপ্নে আদেশ করিলে, সেবাইত বিতাড়িত গোস্বামীকে খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে দুধকোঁড়া ঠাকুর অর্পণ করিলেন। আউল গোস্বামী ঠাকুরকে পাইয়া ধন্য হইলেন এবং মস্তকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। সিংহনারায়ণপুরে তিনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৃন্দাবনের রীতি অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের মঙ্গল আরতি হইয়া আসিতেছে। একদিন মঙ্গল আরতির অব্যবহিত পূর্ব্বে নবা বড়ার ঠাকরুণকে ঠাকুরের বামপার্শ্বে শায়িত দেখা গিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ আউল গোস্বামী এই দৃশ্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাউলকে ডাকিয়া দেখান এবং বলেন যে এই ঠাকরুণের কৃপায় তিনি কালিয়া চাঁদকে পাইয়াছেন। তদবধি বৃন্দাবনের এই দুধকোঁড়া ঠাকুর কালিয়া চাঁদ বা কালাচাঁদ বা কেলেচাঁদ ঠাকুরের নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু নবা বড়াই ঠাকুরের সেবাইতরা শেষে আউলকে চুরির অপবাদ দিয়া তাঁহারা ঠাকরুণ লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে ঠাকরুণ অদৃশ্যে নামিয়া আখবাড়ীতে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। আউল গোস্বামী পুনরায় ঠাকুরকে গৃহে লইয়া যান।

সিংহনারায়ণপুর কালে ধ্বংস হইলে গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয় নিকটস্থ রাউতাড়া গ্রামে উঠিয়া আসেন। পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা মানসে এবং আউল গোস্বামীর নির্দ্দেশমতে কালা চাঁদ বা কেলেচাঁদকে এখানে কিছুদিনের জন্য আনিয়া পূজা করা হইত। পরে অসুবিধা দূরীকরণার্থ বাউলের বংশধরগণের কয়েকজন কুমুড়ি হইতে রাউতাড়ায় উঠিয়া আসেন। রাউতাড়ায় এক শাখা আবার মুড়াই গ্রামে চলিয়া আসেন।

রাউতাড়ায় বর্ত্তমানে মাত্র দুইঘর গোস্বামী আছেন। কালাচাঁদ ঠাকুরের বর্ত্তমান সেবা পূজার অধিকারী দৌহিত্রসূত্রে সেবাইত হন। ইঁহাদের ভুরকুণ্ডার রাধা বিনোদের পূর্ব্বসেবাও বর্ত্তমান আছে। ভুরকুণ্ডার ঠাকুরের রাধাবিনোদ নাম হইলেও ঠাকুরের কিন্তু রাধা নাই। এ সম্বন্ধে লোকে উপহাস করিয়া বলে—

মুলুকের অপরাজিতা
মঙ্গল ডিহির রাস
ভুরকুণ্ডার ডেঙ্গো ঠাকুর
দেখে উপহাস।

ঠাকুরবাড়ীতে কোন সময়ে অতিথি বিমুখ হয় না। শিষ্য বাড়ীর প্রণামী ব্যতীত কালাচাঁদের নিজস্ব কোন আয় নাই।

মুড়াইতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৈষ্ণব, বারুই, কলু, মাল, বাগ্দী, সদ্গোপ, ধাঙ্গড় প্রভৃতি শতাধিক লোকের বাস। গ্রামের লোক দিন মজুরী খাটিয়া ও চাষ করিয়া জীবন ধারণ করে। গ্রামবাসী সকলেই সিউড়ী শহরের সুবিধা পায়।

—শ্রীগৌরীহর মিত্র বি, এল (সিউড়ী)

পত্রলেখা

[এই বিভাগে আমরা সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন দিক্ ও সমস্যা সম্বন্ধে চিঠিপত্র আহ্বান করেছি। চিঠিপত্র সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দরকার হ'লে সম্পাদক যে কোন চিঠি ছোট করতে পারবেন। চিঠিতে লেখক লেখিকারা তাঁদের নাম ঠিকানা দিয়ে দেবেন। চিঠির প্রকাশকালে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও চিঠির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী ন'ন।]

মেয়েদের চাকুরী করা কি ভালো?

'বর্ত্তমান' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, একটী পুরোণো প্রশ্ন তুলতে যাচ্ছি। এই প্রগতিশীলতার যুগে সেটা কারও মনে হ'বে অবান্তর, কারও মনে হবে হাস্যকর। কিন্তু তবু তা না তুলে কি করি বলুন? চারিদিকের অবস্থা দেখে বার বার এ প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জেগেছে। কথাটা হ'চ্ছে, মেয়েদের চাকুরী করতে যাওয়াটা খারাপ না হ'তে পারে, অনেক ক্ষেত্রে তা জরুরী দরকারও হ'তে পারে, কিন্তু চাকুরীতে বেরিয়ে মেয়েরা যদি 'মেয়েত্ব' হারিয়ে ফেলে হারিয়ে ফেলে সমাজে নারীরূপে তাদের বিশেষ মূর্ত্তিটা, বিশেষ ব্যক্তিত্বটা, তা হ'লে কি করা উচিত? পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য কোন মেয়ে হয়তো চাকুরীতে বেরোলেন। সংসারের আয় তাতে বাড়লো, কিন্তু উপার্জ্জনশীল মেয়ে হয়ে উঠলেন দাম্ভিক, রূক্ষ, তিরিক্ষেমেজাজ। ফলে সংসারকে গড়ে তুলবার, শ্রী ও আনন্দমণ্ডিত করবার জন্য নারীরূপে তার কাছে সকলের যা আশা ছিল, যা পাওনা ছিল, তা অপূর্ণ রইল। শুধু আরো কিছু। শুধু নেতিবাচক নয়, এরকম ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ইতিবাচকভাবে অনিষ্ট ও যথেষ্ট হয়ে থাকে। সারাটা পরিবারের জীবনকে সংহত ও সুখী করবার মূল কেন্দ্রই বিকৃত হয়ে যাওয়াতে সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের নিজেদের পরিবারে এবং জানাশোনা একাধিক পরিবারে এ ব্যাপারটা ঘটতে দেখেছি, আরও একাধিক ক্ষেত্রের কথা শুনেছি। ওসব ক্ষেত্রে অবস্থা শোধরানোর চেষ্টা ক'রে প্রায় এক জায়গায়ও ভালো ফল হ'তে দেখিনি। কি করা যায় বলুন তো?

কলিকাতা ইতি—
[illegible]ই বৈশাখ, ১৩৫৪ প্রতিভা মিত্র

শিক্ষক হওয়া কি অপরাধ?

"বর্তমান" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, সরকারী কর্মচারিদের বেতনাদি বাড়ানোর জন্য পে-কমিশন বসেছে কিন্তু বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতার দিক দিযে উঁচু হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক এবং অধ্যাপকেরা অনুরূপ মানের সরকারী কর্মচারিদের চাইতে অনেক কম মাইনে পাচ্ছেন এবং তাতে দেশীয় নেতাদেরও আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। বোম্বাইতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্ম্মঘটপ্রসঙ্গে সর্দ্দার প্যাটেল সম্প্রতি বলেছেন, বেতন বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের শ্রমিকদের মত ধর্ম্মঘট করা উচিত নয়, কারণ তাদের চাকুরীর একটা উঁচু আদর্শবাদী লক্ষ্য থাকা উচিত। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পর অনেকের জন্য অনেক সুখের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন কেবলি এই দোহাই দিয়ে লাভ কি। ঐ তারিখ আসবার আগেই সরকারের অনেক কিছুর পেছনেই যখন মোটা টাকা খরচ করা সম্ভব হচ্ছে, তখন সারা ভারতের শিক্ষকসম্প্রদায়ের অত্যন্ত ন্যায্য দাবী পূরণের জন্য কি কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করা যায় না? তা করতে গিয়ে দরকার হ'লে বাজেটে কিছুটা ঘাটতিই হো'ক না কেন? কত বাজে খাতে টাকা খরচের জন্যও তো বাজেট ঘাটতি হয়ে থাকে ....বলুন তো একজন প্রাথমিক শিক্ষক আফিসের বেয়ারা পিয়নের চাইতে কম বেতন কেন পাবেন? হাই স্কুলের শিক্ষক গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীর চাইতে কম বেতন কেন পাবেন? হাইস্কুলের হেড মাষ্টার একজন সাবডেপুটীর চাইতে কম বেতন কেন পাবেন? একজন কলেজের অধ্যাপক একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাইতে কম বেতন কেন পাবেন? গড়াপড়তাভাবে বলতে গেলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও যোগ্যতা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের চাইতে কম? এ অবস্থার প্রতিকার কি? শিক্ষকদের এই অবস্থার জন্য বিভিন্ন স্কুলকলেজের বেসরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরাও যথেষ্ট দায়ী। তাঁদের শোষণ-প্রবৃত্তি সংযত করবার উপায়ই বা কি? ইতি—

কলিকাতা, ১২ই বৈশাখ, ১৩৫৪ তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

আমাদের নিবেদন :

চার দিকে দাঙ্গার যে তাণ্ডব চলছে, তাতে নতুন কাগজ বের করার সময় এ নয়। মানুষের জীবনযাত্রা আজ বিপর্যস্ত। জীবন অনিশ্চিত। জীবিকা-সংস্থানের হয়রাণিতে উদয়াস্ত বিব্রত নাগরিকের জন্যে ঘাতকের ছুরিকা যে কোথায় লুকিয়ে আছে, কেউ জানে না। কি ঘরে, কি বাইরে, কোথাও আজ আর কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছে না। অন্নাভাব এবং বস্ত্রাভাবের উপর দাঙ্গার আনুষঙ্গিক ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন, পুলিশ, মিলিটারী অনেক উপদ্রবই এসে মানুষের মনের শান্তি হরণ ক'রে নিয়েছে। এর উপর আছে কাগজের কলের ধর্মঘট, ডক-ধর্মঘট ; ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ না হ'লেও স্তব্ধ ; ডাকের বিভ্রাটে চিঠি-পত্র নির্দিষ্ট সময়ে পৌছুচ্ছে না। সুতরাং নতুন কাগজ বের করার সময় এ নয়।

তবু নিকট ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ সময় আসবে এও আমরা কল্পনা করতে পারছি না। এবং এই রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কালবৈশাখীর মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে 'স্বাধীন ভারত'। চারিদিকের সহস্রবিধ বিপদ থেকে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখাই আজ একমাত্র সমস্যা নয়। আসন্ন স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করার প্রয়োজন তারও চেয়ে বেশি। এই একান্ত প্রয়োজনের কথাটা ভেবেই এই দুর্যোগের মধ্যেও এবং নানা অসুবিধা সত্বেও 'বর্তমান' প্রকাশিত হ'ল।

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জাতি গঠনের জন্যে পুনর্গঠন ব্যবস্থা,—সমস্ত কিছু আসন্ন স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ক'রে এবং বিশেষ ক'রে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। এ কাজ সাময়িক পত্রেরই। দেশের এই সমস্ত একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়-সাধনই 'বর্তমানের' প্রধান উদ্দেশ্য। তার জন্যে আমরা একদিকে চিন্তাশীল লেখক সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে উৎসাহী পাঠক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি। লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হলেই 'বর্তমানের' উদ্দেশ্য সফল হবে।

২৫শে বৈশাখ

পঞ্জিকায় এক একটি তারিখ আসে যা চব্বিশ ঘণ্টার সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে বহু দূর ভাবীকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। ২৫শে বৈশাখ এমনি একটা তারিখ। এই দিন রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তার মানে একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে। মানব-জীবনের আয়ুরেখায় একে আবদ্ধ করা যায় না।

২৫শে বৈশাখের প্রভাত-রবি যাঁর ললাট স্পর্শ করলো, তাঁরও দীপ্তি রবির মতোই ভাস্কর। তিনি দিলেন আমাদের নতুন দৃষ্টি, নতুন চিন্তা, সংকীর্ণ সংস্কার এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধি থেকে মুক্তির মন্ত্র। তাঁর বৃহৎ আদর্শ এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের মহাবাণী হয়তো সম্যক উপলব্ধি করার শক্তি আমাদের হয়নি। নিজেদের মূঢ়তায় হয়তো তাঁর শান্তির প্রয়াসকে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়েছি, এবং এখনও সেই মূঢ়তার জন্যে লজ্জাবোধ করার অবকাশও আসেনি। আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে সেই কথাটাই যদি সর্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি, নিজেদের আচরণে যদি আজ লজ্জা আসে, তবেই তাঁর স্মৃতি-পূজা সার্থক হবে। তিনি কবি, তাঁর মৃত্যু নেই। জীবনের পরিপূর্ণ অমৃত পাত্র তিনি আমাদেরই জন্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন। সেই অমৃতের আস্বাদ নেবার সামর্থ্য যদি আমাদের না হয়, তাহ'লে শুধু লজ্জারই নয়, দুর্গতিরও অবধি থাকবে না।

আজ এই হানাহানির পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিগুরুকে স্মরণ করি, হে ঋষি, যে সত্য দীর্ঘজীবনের সাধনায় তুমি উপলব্ধি করেছিলে সেই সত্য তোমার দুর্গত স্বদেশবাসীর জীবনেও প্রতিভাত হোক,—তোমার আশীর্বাদে আমাদের চিত্ত নির্মল, দৃষ্টি উদার এবং মন ভয়শূন্য হোক। তোমার জীবনে জীবন লাভ করে সমস্ত দেশ জেগে উঠুক।

এই দাঙ্গা :

মাসখানেকের উর্ধ্বকাল হ'ল কলিকাতায় দাঙ্গার এই যে তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে—এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। ১৬ই আগষ্ট এর সূত্রপাত। সেই ভয়াবহ নরমেধ শেষ হয়ে গেলে অনেকেই আশা ক'রেছিলেন, এর বোধহয় আর পুনরাবৃত্তি হবে না। নরহত্যা, নারীহরণ, লুঠ, গৃহদাহ যে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না সে শিক্ষা জাতির হয়ে গেল। এবারে শান্তভাবেই এরা বোধহয় নিজেদের মধ্যে আপোষে সত্যকার ও কল্পিত সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নেবে। কিন্তু সে-আশা মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো দাঙ্গা এখন থেকে-থেকে, কেঁপে-কেঁপে দেশের উপর জেঁকে বসলো। শুধু তাই নয়। যা আরম্ভ হয়েছিল কলিকাতা ও বোম্বাইতে, তা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, কলিকাতা থেকে নোয়াখালি এবং সেখান থেকে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে. ভারতের পূর্ব প্রান্তবর্তী নোয়াখালি থেকে পশ্চিম প্রান্তবর্তী পেশোয়ার পর্যন্ত দাঙ্গার প্রক্রিয়া হুবহু একই রকমের : নরহত্যা, নারীহরণ, লুঠ, গৃহদাহ, ছোরা, বোমা, এসিড এবং বন্দুক। এর থেকে এই অনুমান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, একটি কেন্দ্রীয় শক্তি কোথাও থেকে গৃহযুদ্ধ (civil war) নামধেয় এই পৈশাচিক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত করছে।

অনুমানের কারণ :

অনুমানের আরও একটা কারণ আছে। সিভিল ওয়ারের হুমকি আজকের নয়। পাকিস্তানের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে এ হুমকিও অনেক দিন থেকেই দেওয়া হচ্ছিল। তখন হুমকিটাকে কেউ বড় একটা আমল দেয় নি,—রাজনৈতিক আতসবাজি ব'লেই গ্রহণ করেছিল। ইতি-মধ্যে মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস ঘোষণা করলে। কর্মপরিষদ (Council of Action) গঠিত হ'ল। ঘোষিত হ'ল, এ সংগ্রাম দেশবাসীর বিরুদ্ধে নয়, বৃটিশ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে। বলা হ'ল, লীগ কংগ্রেসের মতো অহিংস থাকবে না. মুসলিম জনসাধারণকে এই দিন কি করতে হবে তা তারা জানে। লীগের ছোট-বড়-মাঝারি সমস্ত নেতাই এই একই সুরে হুমকি দিতে লাগলেন। অন্য জায়গার কথা জানি নে কিন্তু কলিকাতা শহরের মুসলমান পল্লীতে-পল্লীতে লীগ-বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ এবং সংগ্রামের আয়োজন চলতে লাগলো। কিন্তু এত বড় কাণ্ডেও বৃটিশ সিংহকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। কংগ্রেসের অহিংস আগষ্ট-প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই নেতৃবৃন্দকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু লীগের একটি চুনো পুঁটিকেও এজন্য গ্রেপ্তার করা হ'ল না। ১৯৪২ সালে আগষ্ট-প্রস্তাব গ্রহণের আগেই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ক'রেছিলেন। ১৯৪৬ সালে আগষ্ট-সংগ্রাম ঘোষণার আগে কোনো প্রদেশের লীগ মন্ত্রীমণ্ডলই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন না। গদীতে আসীন থেকে সংগ্রাম চালালে ফল আরও ভয়াবহ হ'তে পারে এমন অনুমান করা বৃটিশের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁরা নির্বিকারই রইলেন! বরং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট থেকে বৃটিশ বণিক এবং বৃটিশ সংবাদপত্র পর্যন্ত ১৬ই আগষ্টের ধর্মঘটে পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে অফিস বন্ধ রাখলেন! কার্যকালে দেখা গেল, তাঁরা ভুল করেন নি। এত বড় সংগ্রামের উন্মত্ততা বৃটিশ-সিংহের একগাছি কেশরও স্থানভ্রষ্ট করলে

না। উন্মত্ততার সমগ্র প্রচণ্ডতা গিয়ে পড়লো প্রতিবেশী হিন্দুর উপর। 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' প্রশ্ন করলেন, লীগ বাহিনীর হাতে এত এক-মাপের ছোরা এল কোথা থেকে? নিরপেক্ষ ইংরেজ মহিলা মিস মুরিয়েল, লিষ্টনার নোয়াখালির অবস্থা স্বচক্ষে দেখে প্রশ্ন করলেন, এই সুদূর দুর্গম স্থানে গ্যালন-গ্যালন পেট্রল এবং ষ্টিরাপ পাম্প এলো কি ক'রে? এ প্রশ্নের আজও উত্তর মেলে নি।

শান্তির আবেদন:

এই দাঙ্গার সূচনা থেকেই কংগ্রেস জনসাধারণের কাছে শান্তির আবেদন জানিয়ে আসছে। ফল হয় নি। কংগ্রেসের আবেদনে লীগপন্থীয়দের সাড়া দেবার অবশ্য কথাও নয়। মহাত্মাজি নিজে নোয়াখালি গেলেন। বহু কংগ্রেসকর্মী প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লেন। জরাজীর্ণ দেহে নগ্নপদে গান্ধীজি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। ফল হয় নি ফল শুধু হ'ল বিহারে। সীমান্ত-গান্ধী বাদশা খাঁ এবং তারপরে স্বয়ং গান্ধীজি বিহার পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। তার ফল পাওয়া গেল। বিহার ঠাণ্ডা হ'ল। কিন্তু পূবের আগুন ছড়িয়ে পড়লো পশ্চিমে। জ্বলে উঠলো পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল ভেঙে গেল। গভর্ণরের চাপে প'ড়ে স্যার খিজির হায়াৎ খাঁ পদত্যাগ করলেন। অত্যন্ত ভয়াবহ রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু লীগের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হোল না। স্যার ইভান জেংকিন্স অনেক কাণ্ড করলেন, কিন্তু লীগের হাতে মন্ত্রিত্ব তুলে দিতে তাঁরও বিবেকে বাধলো। পাঞ্জাবে ৯৩ ধারা জারি হ'ল। এর পরেই পাঞ্জাব এবং বাংলা বিভাগের দাবী উঠলো। লর্ড ওয়েভেল পদচ্যুত হয়ে মনের দুঃখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। তাঁরই উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নার স্বাক্ষরিত শান্তির যুক্ত-আবেদন প্রচারিত হ'ল। পাঞ্জাব, বাংলা এবং সীমান্তে সেই আবেদনের লক্ষ লক্ষ কপি সাধারণ্যে বিতরিত হ'ল। কিন্তু তাতেও আশানুরূপ ফল হ'ল না।

কেন?

কেন হ'ল না সে একটা ভাববার কথা। এই দাঙ্গায় অন্তত লাখখানেক নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ হতাহত হয়েছে। বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যারা প্রাণে বেঁচেছে তারাও অকথ্য দুঃখ ভোগ ক'রেছে এবং এখনও করছে। কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি আগুনের মুখে ছাই হয়ে গেছে, নয় তো লুঠ হয়েছে। ১৬ই আগষ্ট দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং হতেও চললো এক বৎসর। দাঙ্গাকারীদের ক্লান্তি আসা উচিত ছিল। অথচ আসছে না। দাঙ্গাও থামছে না। গান্ধী-জিন্না যুক্ত-আবেদনের পরেও না। কেন? সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব বলেছেন: 'সীমান্তে মিঃ জিন্নার কোনো প্রভাব নেই'। এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সর্দার আব্দার রব নিশ্‌তার বলেছেন:

> 'ডাঃ খান সাহেব যেদিন ওই কথা বলেছিলেন, সেই দিনের ঘটনা থেকেও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সীমান্তে কায়েদে আজমের প্রভাব যথেষ্টরূপেই রয়েছে। ২৮শে এপ্রিল যে বিপুল জনতা সমবেত হয়েছিল, শুধু কায়েদে আজম শান্ত থাকতে বলেছিলেন বলেই তারা শান্ত ছিল।'

নইলে তারা অশান্তির সৃষ্টি করত, মিঃ জিন্নাকে সমর্থন করার আগ্রহে সর্দার নিশ্‌তার নিজের অজ্ঞাতসারেই তা স্বীকার ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু এটা একটা যুক্তি নয় কুযুক্তি। অশান্তি সৃষ্টির ত্রুটি করছে না তারা। দুর্ভিক্ষের সময় বাংলায় যখন ৫০ লক্ষ লোক সাবাড় হয়ে গেল, তখন তদানীন্তন লীগ মন্ত্রীমণ্ডল যুক্তি দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বলেই অল্পের উপর দিয়ে গেছে, নইলে আরো বেশি লোক মরতো। এও তেমনি যুক্তি! সীমান্তে অশান্তি যে থামেনি এ তো সবাই জানে। ৩০শে এপ্রিল

তারিখেও ডেরা ইসমাইল খানে নরহত্যা, লুঠ ও অগ্নি-সংযোগের খবর পাওয়া যায়।

গান্ধীজীর মন্তব্য :

দিল্লীর প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজি বিভিন্ন স্থানের দাঙ্গার প্রসঙ্গে গান্ধী-জিন্না আবেদনের উল্লেখ ক'রে বলেন :

'আবেদনের উদ্দেশ্য কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। জিন্না সাহেব এ কথা বলতে পারেন না যে তাঁর অনুগামীগণ তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। জিন্নাসাহেব মুসলিম লীগের অবিসংবাদী সভাপতি। এখন তিনি যদি ও কথা বলেন তাহ'লে তাঁর দাবী আদৌ টিকতে পারে না।"

অর্থাৎ জিন্না সাহেবকে এর পরে হয় বলতে হবে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের প্রতিনিধি নয়, নয় তো স্বীকার করতে হবে তিনি অন্তরের মধ্যে শান্তি কামনা করেন না। এর পর মহাত্মাজি প্রশ্ন তুলেছেন :

"বৃটিশ সরকার কি যুক্তি তর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্রবলের নিকট নতি স্বীকার করবেন?"

সীমান্ত মন্ত্রিসভা

গান্ধীজির এই প্রশ্নের সঙ্গতি ইতিমধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লীতে গুজব, বড়লাট নাকি সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার সঙ্কল্প করেছেন। মুসলিম লীগ সীমান্তে নূতন নির্বাচন দাবী করেছে। সেই নির্বাচন যাতে স্বাধীনভাবে হতে পারে, সেই জন্যই কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ। এই গুজব কতখানি সত্য জানি না। কিন্তু এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লীগ প্রীতিও সুবিদিত। সুতরাং গুজব সত্য হওয়া বিচিত্র নয়। লীগ দাবী করেছে, 'স্বাধীনভাবে' নির্বাচন পরিচালনার জন্য সীমান্ত মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ। অথচ সিন্ধুপ্রদেশে ভোটের জোরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণ যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন 'স্বাধীনভাবে' নির্বাচন পরিচালনার চিন্তামাত্র না ক'রেও সিন্ধুর গবর্ণর ওই মন্ত্রীমণ্ডলকেই 'কেয়ারটেকার' হিসাবে মন্ত্রীর গদীতে বহাল রাখলেন। সিন্ধু প্রদেশের কথা মুসলিম লীগ কি এত শীঘ্রই ভুলে গেল যে, সীমান্তে দল-গরিষ্ঠতায় ন্যায়ের বলে সমাসীন কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের অপসারণের আবদার জানাতেও লজ্জাবোধ করলে না? গান্ধীজি প্রশ্ন ক'রেছেন : 'বৃটিশ সরকার কি যুক্তিতর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্রবলের নিকট নতিস্বীকার করবেন?" এ গুজব সত্য হ'লে বলব, অস্ত্রবলের নিকট নয়, লীগকে তোষাজ করবার জন্যে লীগের আবদারের নিকট তাঁরা নতিস্বীকার করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ লর্ড ওয়েভেল যা করেছেন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও তাই করতে যাচ্ছেন।

বাদশা খানের আবেদন

দেখা যাচ্ছে, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফর খানও এই গুজব একেবারে উড়িয়ে দেননি। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করবার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্যে বড়লাটকে পাঠানো হয়েছে। ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যে নামা তাঁর সঙ্গত হবে না। দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকাই তাঁর কর্তব্য। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবার জন্যে এখানকার সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কারণ মাত্র এক বৎসর আগে পাকিস্তানের প্রশ্নের উপর ভিত্তি ক'রেই নির্বাচন হয়ে গেছে।'

"সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেই কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যতদিন না লীগদল জয়লাভ করছেন ততদিন প্রতি বৎসর একবার ক'রে নতুন নির্বাচন করতে হবে, এ আবদার ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উত্তর দিয়েছেন সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর খান সাহেব। তিনি বলেছেন :

"নির্বাচকমণ্ডলী যদি না চান তাহলে শাসনতন্ত্রবিরোধী পন্থায়

অথবা গায়ের জোরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলকে সরাতে পারে, এমন শক্তি কারও নেই।'

কিন্তু সব চেয়ে বড় উত্তর দিয়েছেন বাদশা খানের সুযোগ্য পুত্র খান আব্দুল গণি খান এম, এল, এ, (কেন্দ্রীয়)। তিনি মুখে কিছুই বলেন নি। শুধু 'জালমে পাখতুন' নামে একটি সশস্ত্র তরুণ পাঠান-বাহিনী গঠন করেছেন। এদের পোশাকও তাঁর পিতার 'লাল কোর্তা' বাহিনীরই অনুরূপ কেবল এরা পরিপূর্ণ অহিংসার দায় থেকে মুক্ত। এদের প্রত্যেককে পিস্তল এবং আত্মরক্ষার জন্যে তা ব্যবহার করবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। সংযোগী 'ইত্তেহাদ' একে জল্লাদ-বাহিনী নামে অভিহিত ক'রেছেন। কে জানে কি ! তবে খুনে, ডাকাত এবং নারীহরণকারীর সংখ্যা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দেশসেবা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্যে জল্লাদের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করতে পারে ?

বঙ্গ বিভাগের দাবী

কলিকাতা, নোয়াখালি এবং ঢাকার নারকীয় ঘটনাবলী বাংলার হিন্দুসম্প্রদায়কে এমনই বিচলিত করেছে যে, যে-বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্যে একদিন তারা ফাঁসীকাঠে ঝুলতেও দ্বিধা করেনি, আজ সেই বাংলাই বিভাগ করবার জন্যে তারা দাবী জানাচ্ছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের একাংশ এবং কমিউনিষ্ট দল ছাড়া আর সবাই এই দাবী সমর্থন করেছে। বঙ্গবিভাগের বিরোধীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। কিন্তু বঙ্গবিভাগের পক্ষে জনমত এমনই প্রবল এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে, বাংলার জনসাধারণের উপর শরৎবাবুর অসামান্য প্রভাবও যেন ম্লান হয়ে পড়েছে। বঙ্গ-বিভাগ রোধ করবার সাধ্য আজ আর কারও নেই।

বঙ্গ-বিভাগের প্রয়োজন আজ প্রধানতঃ দুটো কারণে একান্ত হয়ে উঠেছে : প্রথমতঃ, বাংলা ভারত-বিভাগ চায় না। সে জানে, ভারতকে ভাগ করার অর্থ তাকে দুর্বল করা। গত আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনে দেখা গেছে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ভারতের নেতৃত্ব এশিয়ায় একপ্রকার স্বীকৃত হয়েছে। এই বিরাট দেশ স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসরের মধ্যেই শক্তিতে, সমৃদ্ধিতে এবং মর্যাদায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সমকক্ষ হয়ে উঠবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে যদি এই ভারত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়, তাহ'লে সে প্রভাব তার অনিবার্যরূপে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হবেই। পৃথিবীর বৃহত্তর পটভূমিকায় ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চেয়ে বাংলা ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই থাকতে চায়। পাকিস্তান যদি অনিবার্যই হয়, তাহ'লে যে-অংশে হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ সেই পশ্চিম-বঙ্গ উত্তর-বঙ্গের কয়েকটি জেলার কিছু অংশ নিয়ে যদি ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, সেটাও কম লাভ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩৭ থেকে লীগ শাসনের যে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ ক'রে এই সুরাবর্দী গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে পাকিস্তানের যে আস্বাদ পাওয়া গেল, তারপরে পাকিস্তানে থাকতে সম্মত হবে এমন হিন্দু কোথাও নেই। অতি বড় নির্লজ্জ স্তোকবাক্যেও কেউ আজ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। সে প্রত্যাশা করাও অন্যায়।

স্বদেশে ও বিদেশে

যাঁরা মনে করেন, মিঃ জিন্না সর্বত্রই মুসলমানদের তৎদেশীয় জনসাধারণের থেকে স্বতন্ত্র 'নেশন' মনে করেন, তাঁরা বর্মা সরকারের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা মিঃ [illegible] চ্যান টুনের কাছে লেখা তাঁর চিঠি প'ড়ে বিস্ময় বোধ করবেন। তাতে মিঃ জিন্না বর্মার মুসলমানদের 'সর্ব স্বদেশবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে' স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করার পরামর্শ দিয়েছেন, এবং বলেছেন, মুসলমানদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহ'লে তারা যেন নিজেদের মধ্যে তার মীমাংসা ক'রে নেন। কেননা, বর্মা তাঁদের স্বদেশ ব'লে এইভাবে তাঁদের প্রত্যেকটি বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ও শান্তিতে বসবাস করবার একমাত্র পন্থা।

মধ্যে মতের পার্থক্য যদি বেড়ে যায়, আর সেই পার্থক্য দূর করবার কোন উপায় না বের ক'রতে পারা যায়, তবে সারা বিশ্বে আবার আগুন জ্ব'লে উঠবে। এই পরিণতির কথা ভাবতেও ভয় হয়। তাই সবরকম অসম্মতি সত্ত্বেও যখন মিঃ মার্শাল বলেন যে, আমরা আমাদের মতের বিভিন্নতার স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি এবং এর পর এই পার্থক্য দূর করা অসম্ভব নয়, তখন বিশ্বাস না হ'লেও মন যেন সায় দিতে চায়। কিন্তু ব্যর্থতার দায়িত্ব কার? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া শক্ত। দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা যে নীতি গ্রহণ ক'রেছে তা স্পষ্টতঃ ইউরোপে নিজেদের তীক্ষ্ণ স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আমেরিকা যে কোন উপায়েই হোক তার সাম্রাজ্যের প্রসার ক'রতে চায়। তার জন্য আণবিক বোমার ভয় দেখাতেও সে কুণ্ঠিত নয়। বৃটেন এই নীতিতে সমর্থন না জানিয়ে পারে না তাই আমেরিকান তল্পীবাহকের ভূমিকায় বৃটিশসিংহকে আজ কেশর অবনমিত করতে হয়েছে। নিজে থেকে, নিজের দায়িত্বে কিছু করবার ক্ষমতা বৃটেন হারিয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে বিজয়লাভের গর্ব তার দম্ভের খোরাক জোগাতে পারে কিন্তু বিরাট দেনার দায় এবং সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তার শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ করেছে। আর রাশিয়া, যুদ্ধের বিরাট তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও নিজের ঘর সামলাবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দেশ নিজেদের অনুকূল রাখার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে প'ড়েছে। রাশিয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সবাই সচেতন।

তাই ব্যর্থতার দায়িত্ব কোন একক রাষ্ট্রশক্তির নয়, দুই শক্তির আদর্শগত প্রতিকূলতার এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা যদি আলোচনা না ক'রে সম্ভব না হয় তবে বিশ্বধ্বংসী সর্বনাশা যুদ্ধের কথা ভেবে সুস্থ মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে পারে না।

কাপড়ের কন্ট্রোল

চোরা বাজারীদের তৎপরতায় কাপড় যখন প্রকাশ্য-বাজার থেকে অন্তর্হিত হ'ল এবং বহু হীনতা স্বীকার ক'রে এবং কৃচ্ছ্রসাধনার পরে চার পাঁচ গুণ দরে চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে লজ্জা নিবারণের আর উপায় রইলো না, তখন 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্' পরম করুণাময় লীগ গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা করলেন। দুষ্কৃত বিনষ্ট হ'ল কি না ভগবান জানেন, কিন্তু সাধুরা যে পরিত্রাণ পাননি তা চোখেই দেখা যাচ্ছে। কণ্ট্রোলের দোকানে কাপড় প্রায়ই পাওয়া যায় না, ক্বচিৎ-কখনও কোনো ভাগ্যবান যদি একান্ত পেয়ে যায় তো সে কাপড় নিতান্ত বিপাকে না পড়লে পরা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা কি? মিল কি কাপড় তৈরি করা বন্ধ রেখেছে, না মিলের কাপড় বাংলা দেশে আসছে না?

সহযোগী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এ সম্বন্ধে একটি খবর দিয়েছেন:

"আমরা খবর পাচ্ছি গাঁট গাঁট কাপড় বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের গুদাম থেকে নির্বাচিত পাইকারী ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। তারা সেসব চোরা বাজারেও বিক্রি করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে প্রকাশ্য বাজারেও বিক্রি করতে পারে। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে: কোন রহস্যময় প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থায় বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের গুদামে সূক্ষ্ম এবং অতি-সূক্ষ্ম কাপড়, এমন কি গাঁট না খুলেই 'রদ্দি' ব'লে ঘোষিত হয়। যে বা যারা এর জন্যে দায়ী তাদের আমরা চিনি না। কিন্তু শুনেছি এ রকম ঘোষণা করবার জন্য তিন শো টাকার মতো 'ফি' নেওয়া হয়। সে টাকা একাধিক লোকের পকেটে যায়। সম্পূর্ণ ভালো মাল কেন 'রদ্দি' ব'লে ঘোষণা করা হয়? তা'র কারণ 'রদ্দি' ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা 'রেশন-বহির্ভূত' পণ্যে পরিণত হয় এবং অনুগৃহীত পাইকারী বিক্রেতারা তা' চোরা বাজারে অথবা প্রকাশ্য ভাবেই যেমন খুশি বিক্রি করতে পারে।"

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর কতকাল এই চোরাবাজারী যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? তেল এবং নিউজ প্রিণ্টের উপর কণ্ট্রোল উঠেছে, কাপড় এবং হোয়াইট প্রিণ্টের উপর থেকে কণ্ট্রোল উঠবে কবে? দুর্নীতির ভারে জাতির মেরুদণ্ড যে ভেঙ্গে যাচ্ছে!

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা

গত ১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসরুল্লা জানান :

নোয়াখালিতে ৮৮১টি গৃহ ভস্মীভূত ও ২২৬৬টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়; হাঙ্গামায় ১৭৮ জন এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে ৪২ জন নিহত হয়।

ত্রিপুরা জেলায় ১,৭১৮ টি গৃহ ও ৬৫২৬ টি কুটির ভস্মীভূত ও ২১৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়; হাঙ্গামায় ৪০ জন এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ২৫ জন নিহত হয়।

বলপূর্বক কত লোককে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তার উত্তরে মিঃ নসরুল্লা জানান ত্রিপুরায় এইরূপ ধর্মান্তরিতের সংখ্যা ৯,৮৯৫; নোয়াখালির হিসাব জানা যায় নি, তবে হাজার হাজার হবে। এই সম্পর্কে মিঃ সিম্পসন ও মিঃ আর, গুপ্ত কি রিপোর্ট দিয়েছেন বিরোধীপক্ষ তা জানতে চান। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তা জানাতে অস্বীকার করেন। মিঃ নসরুল্লা আরও জানিয়েছেন, নোয়াখালিতে এই সম্পর্কে ১,০৬১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে ৯০৯ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; আর ত্রিপুরায় ১,১৩৬ জনের মধ্যে ৯১২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদের কতক জামিনে ছাড়া পেয়েছে, কতক একেবারেই। কংগ্রেস-সদস্য হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জানান, বেসরকারীসূত্রে পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মিঃ নসরুল্লার হিসাব মেলে না।

হেনরী ওয়ালেস

হেনরী ওয়ালেস পদত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়েছেন। মার্কিনী নীতির ফলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করাই তাঁর অপরাধ। পদত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আমেরিকার বাণিজ্য-সচিব ছিলেন। স্বর্গত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের তিনি নিকটতম সহকর্মী ছিলেন। তাঁর পদত্যাগ ও আশঙ্কাপ্রকাশের গুরুত্ব আছে। আণবিক বোমা ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক মর্যাদা আমেরিকাকে মদমত্ত ক'রে তুলেছে। তাই রাশিয়ার নূতন ভাবধারার সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৃথিবীকে আবার সর্বনাশা যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। শক্তির দম্ভেই রাশিয়াকে বাগ মানাবার চেষ্টা আমেরিকা'র নীতিতে দেখা দিয়েছে। তাই রণসম্ভার বৃদ্ধি তার পক্ষে জরুরী। এরই ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। নিঃসহায় বৃটেন আমেরিকার নির্দেশ মাথায় ক'রে এই বিরোধের আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এই নীতির বিরুদ্ধে ওয়ালেস প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বের কল্যাণে এই দুই শক্তির মধ্যে মীমাংসা তিনি একান্ত প্রয়োজন ব'লে মনে করেন। এই মত প্রকাশের জন্য নিজের দেশে তাঁকে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছে, সব দেশেই তিনি বাধা পেয়েছেন, কিন্তু দমেন নি। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ প্রচারের ফলে একটি কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। জবরদস্ত মার্কিনী নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বকল্যাণমুখী জনমতও আছে। এই জনমত ক্রমশ যে বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে তার আভাসও পাওয়া গেছে। মীমাংসার সূত্র তিনি যা প্রস্তাব করেছেন ষ্ট্যালিনও তা সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন এক সাংবাদিকের কাছে।

গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সাহায্য

গত মার্চ্চ মাসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেছেন, গ্রীস ও তুরস্ককে আমেরিকা সবরকমে সাহায্য ক'রবে। 'সাম্যবাদের অত্যাচার (?)' দমনের নামেই এই সাহায্যের প্রস্তাব। মার্কিন নৌবহর ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে তাই ট্রুম্যানের আবেগ ফুটে উঠেছে, 'মানুষের মনের উপর সবরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরদিন শত্রুতা করার শপথ আমি নিয়েছি।'

দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবার মনোভাব আর আমেরিকার নেই। রণসম্ভার বৃদ্ধির জন্য তার বিরাট অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য পৃথিবীর বাজারে তার অবাধ কর্তৃত্ব থাকা চাই। এই

তাগিদেই শুধু ইউরোপ কেন, সারা দুনিয়ায় তাকে প্রভাব বাড়াতে হবে। তাই, গ্রীস ও তুরস্কের মত দুর্বল রাষ্ট্রকে নিজের স্বার্থের অনুকূল ক'রে নিতে হবে। গ্রীসের অবস্থা এখন ভয়ঙ্কর। বৃটেন তাকে সাহায্য ক'রেও এতদিন তার 'গোরিলা' বাহিনীকে কায়দা ক'রতে পারে নি। এবার আমেরিকা লেগেছে, আর উঠে প'ড়েই লেগেছে। সৈন্য, নৌবহর আর অর্থ– সবরকম ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী কায়দা এর জন্য সে নিয়োগ ক'রেছে।

এই সাহায্যের (?) ফলাফল ভাবতেও ভয় হয়। বলশেভিকবাদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা হিটলারের মহান ব্রত হ'য়ে উঠেছিল। সম্মিলিতভাবে হিটলারকে ধ্বংস করার সাধনায় রুজভেল্টের আমেরিকা সমগ্রভাবে আত্মনিয়োগ ক'রেছিল। তার পরিণতি স্বরূপে ট্রুম্যানের আমেরিকাকে আমরা কি হিটলারী নীতির অনুধারকরূপে দেখতে পাবো?

চীনের 'কুওমিণ্ট্যাং'

'কুওমিণ্ট্যাং'এর নূতন সংস্কার প্রস্তাবে লোকে আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিল। সর্ব্বদলীয় শাসনপরিষদ গঠনে (অবশ্য কমিউনিষ্ট বাদে) সঙ্কটাপন্ন চীনের নূতন প্রচেষ্টা ব'লে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন জেনারেল চ্যাং চুন। এঁর জাপ-প্রীতি বিশ্ববিদিত। অত্যাচার ও প্রতিক্রিয়ার মনোভাবে এঁকে নিজের দেশের লোকের কাছেই হেয় প্রতিপন্ন হ'তে হয়েছিল। তা ছাড়া আর্থিক সঙ্কট ও চোরাবাজারের দাপট চীনাদের বেশ বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। ইয়েনান দখল ক'রেই কমিউনিষ্টদের জয় করা যায় নি। তারা শেনসী অঞ্চলে কুওমিণ্ট্যাং বাহিনীকে বেশ কাহিল করেছে। এই অবস্থায় সংস্কারের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশেষ, আমেরিকার 'সাহায্য' কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লাগাবার একটি নূতন উপায় বের করার জন্য চিয়াং কাইশেক যখন বেশ মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তাই 'কুওমিণ্ট্যাং'এর পক্ষপাতহীনতা প্রচার করার প্রয়োজন আছে। সেইজন্যই কি এই নূতন সংস্কার?

ফ্রান্সে দলগত বিরোধ

জেনারেল দ্য গল কর্ম্মচঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচনের পর তিনি রাজনীতি থেকে স'রে ছিলেন। সঙ্কট এখন এত তীব্র যে তিনি নতুন দল গ'ড়ে দেশকে রক্ষা করার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছেন।

ফরাসী পার্লামেণ্টে চারটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কমিউনিষ্ট দলের সদস্যসংখ্যা সব চেয়ে বেশী। সোশ্যালিষ্ট, র‍্যাডিকাল ও বামপন্থীদের কেন্দ্রীয় দল (Left-centre Party) এতদিন কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন। ক্রমশ ফ্রান্সের অধীন উপনিবেশ ইন্দোচীন, মাদাগাস্কার প্রভৃতি যায়গায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণ নিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতবিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। তারপর এই মতবিরোধ ভাঙ্গনের আকার ধারণ করে সোশ্যালিষ্ট দলের প্রস্তাবিত শ্রমিকের বেতন ও জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে। ফরাসী জাতীয় পরিষদে গত ৪ঠা মে তারিখে এই নীতি সম্পর্কে রামাদিয়র গবর্ণমেণ্ট এক আস্থা প্রস্তাব তোলেন। কমিউনিস্টরা সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের পরে এই প্রথম কমিউনিষ্টদের বাদ দিয়ে শাসন কার্য চালানো হ'চ্ছে।

এই পরিস্থিতির পরিণাম কি তা ভাববার কথা। সোশ্যালিষ্ট দল অনেক বাদ-বিতর্কের পর এরকম ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন। ভয় আছে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড-ইউনিয়নগুলি দেশে ব্যাপক ধর্ম্মঘট চালাতে পারে। মার্কিন জননায়কেরা এই পরিণতি উৎফুল্ল হ'য়ে লক্ষ্য ক'রছেন তা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কমিউনিস্ট-বিরোধিতার নামে দ্য গলের বা রামাদিয়রের মারফতে মার্কিন 'সাহায্য'ও (?) এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

ক্রটি স্বীকার

২৫শে বৈশাখ 'বর্তমান' বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাগজের অভাব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সান্ধ্য আইন প্রভৃতি অনিবার্য কারণে 'বর্তমান' প্রকাশে বিলম্ব হ'ল। এই বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক।

৩৩/এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রেস থেকে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিভ্রমণের
পরিপাটী রূপটী
ফুটিয়ে তুলবে

হিমানী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বরযাত্রী (৪ সং) ২॥০ বসন্তে (২সং) ৩৲
বর্ষায় (৩সং) ৩৲ শারদীয়া (২সং) ৫৲
হৈমন্তী ৩৲ চৈতালী ৩৲ দৈনন্দিন ২॥০
নীলাঙ্গুরীয় (৪সং) ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲
বিশেষ রজনী ৲ স্বপ্ন-অন্তঃপুরিকা ২৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রতি খণ্ড ৪৲

শ্রীমতী বাণী রায়ের

প্রেম ৩৲ পুনরাবৃত্তি ২৲

নং গোপাল দাস, আই সি-এস্-এর

নিঃসহ যৌবন ৩৲ তারা দুজন ২॥০
অনবগুণ্ঠিতা (২ সং) ৩৲
নাগর দোলায় ঢেউ ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

মহানগরী ৪৲ দুঃস্বপ্ন ২৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

সমাজ ও যৌনসমস্যা ২৲
পায়ে চলার পথ ৩৲
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

ভাস্করের রচনা

মজলিস ১॥০ শুভশ্রী ১॥০
কথিকা ১॥০ লেখা ৩৲

অমলেন্দু দাসগুপ্তের

ডেটিনিউ ২৲

কমল দাসগুপ্তের

পরিচিতা ৩৲

*** সদ্য প্রকাশিত ***

মোহিতলাল মজুমদারের

জয়তু নেতাজী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲
কোপবতী (- সং) ৩৲

ডাঃ সুশীলকুমার দের

ক্ষণ-দীপিকা ২৲

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের

আমাদের ইংরেজী শেখা ১॥০

কাজী আবদুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে ১ম খণ্ড ৫৲
২য় খণ্ড ৪৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায়ের

ব্যক্তিগত ২৲

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

অবধূত প্রণীত
ঈশোপনিষৎ ২৲

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষের

গীতা ও হিন্দুধর্ম্ম ৪৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲
ক্ষুধা ২॥০ শৃঙ্খল (৩ সং) ২॥০ মনের গহনে
(২সং) ২৲ বসন্ত রজনী (২ সং) ১॥০,
ঘরের ঠিকানা (২ সং) ২॥০ শতাব্দীর
অভিশাপ (৩ সং) ২॥০ হালদার সাহেব ২

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

পরিমল গোস্বামীর

মহামন্বন্তর ৩৲ ঘুঘু (২ সং) ২৲
দুষ্মন্তের বিচার (২ সং) ১।০
ট্রামের সেই লোকটি (২ সং) ২৲
ব্ল্যাক মার্কেট ২৲

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ২৲ সঞ্চারী ১৲

আমিনুল হকের

টাইগার হিল ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহের

সমী ও দীপ্তি ১৲ সমর্পণ ১॥০
ভুলের ফসল ২৲ অন্তর্যামী ১॥০

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

মরীচিকা ১৲ মরুশিখা ১।০
কাব্য পরিমিতি ১৲

প্রমথনাথ বিশীর

গালি ও গল্প ১॥০ গল্পের মতো ১॥০
মৌচাকে ঢিল (২ সং) ২॥০

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)

জীবন সাহারা ১।০

রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের

বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩ সং) ৫৲
বিস্মরণী (৩ সং) ৪৲ স্মর-গরল ৪৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲

সু বী র শি শু গ্র ন্থ মা লা

মোহিতলাল মজুমদারের

রূপকথা (২ সং) ১৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিবাজী মহারাজ ১৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

বসন্তের রাণী ॥০

জে না রে ল প্রি ণ্টা স য়্যা ণ্ড পা ব লি শা র্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পত্র লেখবার সময় দয়া ক'রে 'বর্ত্তমানের' নামোল্লেখ করবেন।

'বর্তমানের' নিয়মাবলী

গ্রাহক:

(১) 'বর্ত্তমানের' বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক সডাক ৬৲ টাকা, ভি-পি খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। টাকাকড়ি—ম্যানেজার, 'বর্ত্তমান', ৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(২) বৈশাখ থেকে 'বর্ত্তমানের' বৎসর আরম্ভ। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক লওয়া যায়।

(৩) গ্রাহকের চাঁদা নিঃশেষ হ'লে গ্রাহকের নিকট থেকে নিষেধাজ্ঞা না পেলে পরবর্তী সংখ্যা যথাসময়ে ভি-পি করা হয়। মণি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই সুবিধা, খরচ কম।

(৪) নতুন গ্রাহক হবার সময় মণি-অর্ডার কুপনে অথবা পত্রে 'নতুন' কথাটা দয়া করে লিখবেন। পুরাণো গ্রাহকগণ টাকা অথবা চিঠিপত্র পাঠানোর সময় গ্রাহক সংখ্যাটী উল্লেখ করবেন।

রচনা:

(৫) রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। উত্তরের জন্যে ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

(৬) নকল রেখে রচনা পাঠানোই ভালো। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ, **'বর্ত্তমান'**,

৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬,

বর্তমানের সূচী

(প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা)

—১৩৫৪

রক্সোর এক শিশি 'ক্যাষ্টর অয়েল' ব্যবহারেই আপনার কেশপাশ অভিনব লালিত্য, চিক্কন-কৃষ্ণ কোমলতা'ও রহস্যঘন গভীরতায় অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। চিত্তস্পর্শী সুরভিযুক্ত এই কেশ তৈল এই কারণেই নারীসমাজে আজ এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।
রক্সোর
সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
ভিটামিন 'এক' সংযুক্ত
আকরস্ এণ্ড কোং লিঃ :: কলিকাতা
A.A.S.

লেখ-সূচী

প্রত্যেকটী ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল বই

হেমেন রায়

যক্ষপতির রত্নপুরী

গুপ্তধনের সন্ধানে যে সকল "এ্যাডভেঞ্চারের' বই বাজারে আছে, এটাই সবচেয়ে সেরা বই। মূল্য—১॥০

সতীকুমার নাগ: **কামালের গড়া দেশ** ৸৶০

তুর্কীবীর কামালের জীবনচরিত সরল ভাষায় লেখা

হেম চট্টোপাধ্যায়: **ভণ্ডুলরামের দিগ্বিজয়** ১৲

একখানি প্রকৃত এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী

শীঘ্র বেরুবে — শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু অনূদিত

চায়নার সেরা কাহিনী

কো-অপারেটিফ বুক ডিপো

৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২য় খণ্ড (বাহির হইল) দাম—৫৲

বাংলা সাহিত্যে জাতীয়-আন্দোলনের প্রামাণিক তথ্যপূর্ণ এই প্রথম বই। সকল পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত।

Dr. Hemendranath Dasgupta

INDIAN NATIONAL CONGRESS

Price Rs. 6/-

সাহিত্যের কথা

বাইশটি সুচিন্তিত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। দাম ৪৲

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

চক্রধারী (সুবৃহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস) ৪৲

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

ইতালীর সেরা গল্প (উচ্চপ্রশংসিত) ২॥০

পরিমল মুখোপাধ্যায়

দিল ডাক (উপন্যাস) ৩৲

শৈলবিহারী ঘোষ

জার্মাণীর সেরা গল্প ৩৲

বুক ষ্ট্যাণ্ড

১।১এ, বংকিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর দুইখানি জনপ্রিয় উপন্যাস—অভিনব রূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে

ডাঃ সেন ২৲

ডাঃ সেন একজন স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ। এই শ্রেণীর জীবন্ত চিত্র চলমান জগতে অভিনব। সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিজড়িত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এ সংসারে চোখে পড়ে বলেই এত চিত্তাকর্ষক।

জীবন-মৃত্যু ১।০

জীবন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মানব জীবনের নানা ঘটনার অভিনব আলেখ্য। দামোদরের তীরে চন্দনা গ্রামের বহু বিচিত্র নরনারীর অপরূপ কাহিনী নানা পরিবেশের মধ্য দিয়া।

অভিভাষণ—॥০ (বিভিন্ন সভাসমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ সঙ্কলন—গভীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি) **অতুলচন্দ্র**—॥০

সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী পরিকল্পিত ও দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত উপন্যাস—

শনি-রবি-সোম ১৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

কর্জ্জনার মাঠ ২৲

কর্জ্জনার মাঠ অজয়ের বান বড়ডাঙ্গার মেলা হিজলের বিল নয়া পলাশী, কল্যাণপুরের শ্মশান, পাঁচুন্দির হাট রিলিফ-সেণ্টার প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন।

সহর উপকণ্ঠে ৩৲

মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর কলিকাতা ও সহরতলীর বুকের উপর দিয়ে কি ভাবে চলেছে তারই না হল। বিরাট পটভূমিকায় অভিনব আলেখ্য।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

শ্মশান ঘাট ২৲

জনপ্রিয় কথাশিল্পী

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মজুমদারের

মহামানব সঙ্ঘ ২৲

কংসনদীর তীরে ১॥০

আমাদের উপন্যাস

কুয়াসার মায়া — শিল্পী— কিশোরী রায়

বর্তমান

১ম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ● ১৩৫৪

সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু

মৃত্যুহীন প্রাণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং 'মরণে' তা-ই আবার বাংলার মাটিকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার জনসাধারণকে—দেশবন্ধু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু'টি লাইনে উচ্চারিত এই পরম সত্যটা বাঙালীর জীবনে ফলবান্ হয়েছে কি, এই লোকোত্তর জননায়কের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ প্রশ্নটাই বারবার করে মনে জাগছে। দেশবন্ধুর মত মানুষকে সারা বছর ধরেই স্মরণ করার কথা। তাহ'লেও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে আমরা ঘটা করে স্মরণ করি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী দিনে। বিরাট ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় নেতাদের অন্যতম হিসাবে তাঁকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। যে স্বাধীনতা পাওয়ার পথে আজ

আমরা অনেকদূর এগিয়েছি, তার পেছনে রয়েছে যে দীর্ঘ সংগ্রাম-বন্ধুর পথ, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনা-নায়ক হিসাবে তাঁকে আমরা স্মরণ করি। ভারতীয় রাজনীতিতে বৈপ্লবিক বাঙালী প্রতিভার বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অবদান-প্রসঙ্গে তাঁর কীর্তিকথা স্মরণ করি। সাহিত্য সৃষ্টিতে, জীবন-দর্শনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন, মানবপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন ও 'মানুষ' চিত্তরঞ্জনের যে অপূর্ব পরিচয় বাংলাদেশের মানুষকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল, সে কথা আর একবার স্মরণ করি। স্মরণ তো করি, তাঁর জীবনকে নিয়ে বক্তৃতায় এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাগ্‌বিভূতিও বিস্তার করে থাকি আমরা যথেষ্ট, কিন্তু তাঁর জীবনের ও চরিত্রের মূল দিকগুলো আমরা ইতিমধ্যে কতটা অনুসরণ করেছি, তাও মধ্যে মধ্যে খতিয়ে দেখা দরকার নয় কি? তাই তো গভীর বেদনার সঙ্গে ভাবি, অজস্র উদার প্রাণ-প্রাচুর্যের যে শিক্ষা দেশবন্ধু জীবিতকালে দিয়ে গেছলেন, মৃত্যুতে বাংলার ধূলিকণার মধ্যে যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণকে নিঃশেষে ছড়িয়ে রেখে গেলেন, তার প্রেরণায় ভ্রষ্ট-আদর্শ, কর্মহীন, অজস্র-উপদল-পঙ্কিল বাংলার রাজনীতিতে, বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধনে নবতর রেনেসাঁসের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠল না কেন। শুধু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ করেই কি আমরা আমাদের সব দোষ ক্ষালনের প্রয়াস পাব? বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধুর মন্ত্র-শিষ্য সুভাষচন্দ্র তো সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতির সব চেয়ে তীব্র-বিপ্লবাত্মক পরিচ্ছেদের স্রষ্টা। কিন্তু বাংলার রাজনীতি তথা সাধারণভাবে বাংলার সমগ্র জাতীয় জীবনে আজ যে ক্লৈব্য, স্বার্থপরতা, অলসতা ও মোহের আবর্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, শুধু নেতাজীর নাম কীর্তন করেই তো তা ঢাকা আর সম্ভব নয়। বঙ্গ-বিভাগ হয়ে গেল, এবার নতুন বাংলার রাষ্ট্র গড়বার সময় আসছে। দেশবন্ধু ও নেতাজীর ঋজু জীবনাদর্শ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভা আসন্ন কঠিন দিনগুলিতে আমাদের বহুবিচিত্র কাজের আয়োজনে শক্তির সঞ্চার করুক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

জাতিকে যিনি অনেক কিছু দিয়েছেন, জাতি তাঁকে কি করে ভুলবে। একটা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহিমা তো প্রধানতঃ এই শ্রেণীর মানুষদের ঘিরেই গড়ে ওঠে ;—এঁদের আদর্শই তো জাতিকে নবতর বৃহত্তর কর্মপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও তাই বাঙালীর পক্ষে কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়। বছর ঘুরে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী আবার ফিরে এসেছে। প্রাচীন ভারতের আচার্যদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার সমন্বয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যাঁর চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, সেই আচার্যদেবের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যাঁর মধ্যে শিক্ষকতার আদর্শ একটি অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল, যাঁর হাতে-গড়া অসংখ্য ছাত্র আজ বাংলা তথা ভারতের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করেছে, তাঁকে স্মরণ করি। নব্য ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, ক্ষুরধার মনীষী, আদর্শবাদী সমাজসংস্কারক, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মশালবাহী, ব্যবসায়-বিমুখ চাকুরীপ্রিয় বাঙালী যুবককে ব্যবসায়মুখী করবার জন্য সারাজীবন অক্লান্ত প্রচারক ও কর্মী,—কতো বিচিত্র পরিচয় আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, দুর্গতত্রাণে প্রফুল্লচন্দ্রের বরাভয় মূর্তি আমরা দেখেছি,—সে সব ক্ষণে এক মুহূর্তে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরি ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে'র নামে লীগ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারের খড়্গ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পড়তে উদ্যত হ'ল, তার বিরুদ্ধে আচার্যদেবের কণ্ঠকে আমরা গর্জে উঠতে শুনেছি। বাংলায় জীবনের বহু ক্ষেত্রেই সহজ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি, বিপুল জ্ঞান ও বিপুল কর্মের সুসমন্বয় করেছিলেন নিজ জীবনে। বাংলার যুবশক্তি বাংলার সাম্প্রতিক-অতীত ইতিহাসের এই সব বিরাট মহীরূহ থেকে কি জীবনী আহরণ করবে না ?

কবি প্যারিমোহন

কবি প্যারিমোহন গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ট্রাম থেকে নামতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার ফলে মারা যান। তাঁর কন্যার মৃত্যুর শোকে কিছুদিন আগেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে তিনি বহুদিন সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার বহন করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'মেঘদূতের' সরল বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য সমাজে আদর লাভ ক'রেছিল।

'বঙ্গবাসী' কলেজে অধ্যাপনাতেও তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল।

তাঁর প্রতিষ্ঠাপূর্ণ জীবনের অন্তরালে নিরলস, সদা-হাস্যমুখ মানুষটিকে ভাল না বেসে পারা যেত না।

আমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

২০শে জুন

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ২০শে জুন তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্রে সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তি-পত্তন হয়, কৌশলী মিঃ জিন্না তারই উপর পাকিস্তানের ইমারৎ তৈরি করলেন। মিথ্যা-বিভেদের বালুচরে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তের মশলায়, বৃটিশ স্বার্থের ইঁটে তৈরি এই ইমারতের আয়ু যে দীর্ঘ হ'তে পারে না,—হওয়া উচিত নয়,—সে কথা দুর্দান্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ-নায়কেরাও

এখন বুঝতে আরম্ভ করেছেন। বলা যেতে পারে, ২০শে জুন থেকেই এই উপলব্ধির সূত্রপাত।

২০শে জুন ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগ হয়ে গেল।

বাংলার লীগপন্থীদের মনে মনে ধারণা হয়েছিল, ইংরেজ ভ'ক্তের রক্ষার যে স্বার্থে ভাবতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রোপন ক'রেছিল, সেই স্বার্থেই যাবার বেলায় মসলিম লীগকে শক্তিশালী ক'রে দিয়ে যাবে। লীগের দাবী ছিল আসাম, বাংলা এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত ও সিন্ধু তাব চাই। আসাম হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। মিথ্যা অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তান কিল্লা গ'ড়ে ঝুটা সমরায়োজনের হুমকিতে আসামকে কুক্ষিগত কবাব একটা ব্যর্থ আয়োজনও হয়েছিল। কিন্তু বরদলুই গবর্ণমেণ্টের শক্তির পরিচয় পেয়ে লীগ আসামের লোভ ছেড়ে দিলে। তবু তাব মনে ভরসা ছিল, সমগ্র বাংলা এবং সমগ্র পাঞ্জাব লীগের হাতে আসবেই। কিন্তু বড়লাট যখন ফতোয়া দিলেন, পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব পাঞ্জাব ইচ্ছা করলে পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে, এবং মিঃ জিন্না তা মেনে নিলেন, বাংলার লীগপন্থীরা তখন থেকেই প্রমাদ গণতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সুর গেল বদলে।

নির্লজ্জের ভাঁড়ামি

যাঁদের নীতি হোল হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক জাতি, আচারে, ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে তারা সম্পূর্ণ পৃথক, এবং সেই নীতিতেই ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার দাবী—তাঁরাই রাতারাতি ভোল বদলে বলতে লাগলেন, এ কি একটা কথা হ'ল। বাংলা কখনও ভাগ হয? হিন্দু মুসলমান যে দুই ভাই,—এক বৃন্তে দুটি ফুল। হিন্দুরা প্রশ্ন করলে, তাই যদি হয়, তাহ'লে আর ভারত-বিভাগ কেন? ভারতীয় ইউনিয়নেই আমরা একবৃন্তে দুটি ফুলের মতো মলয় হাওয়ায় দুলতে থাকি। লীগের তাতে মত নেই। ভারত-বিভাগ হবে। পাকিস্তান চাই-ই। সেই পাকিস্তানের কাটা-ডালে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে একবৃন্তে দুটি ফুলের মতো দুলতে হবে। লীগ বললে, তোমরা করছ কি? বিড়লা-ডালমিয়ার গোলামী করবার জন্যে হিন্দুস্থানে যোগ দেবে? পাকিস্তানে যোগ দেওয়াই যে হিন্দুদের স্বার্থের অনুকূল এত বড় দাঙ্গার পরে এবং লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের গত দশ বৎসরের সুশাসনেও কি বুঝতে পারছ না? চেয়ে দেখ, সিন্ধু প্রদেশের দিকে। কি রকম ন্যায় এবং সুবিচারেব সঙ্গে মিঃ গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা সেখানে 'শরিয়তের শাসন' চালু করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হিন্দুরা বহিষ্কৃত। ভূমিসত্ব আইনে তাদের জমি কি সুকৌশলে মুসলমানের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনিতেই সেখানে হিন্দুদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে,—আগে বিহারের আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান, তারপরে সিন্ধী মুসলমান, তারপরেও যদি বাড়ী থাকে তাহ'লে তা সিন্ধুর হিন্দুরা পেতে পারে,—এর উপর আবার জনাব জিন্নার পাকিস্তানী বাহিনীর স্থান সংকলানের জন্যে করাচী শহরের হিন্দু-অঞ্চল বন্দর রোড ও আর্টিলারী ময়দানে যে ক'খানা বাড়ী হিন্দুদের আছে, তাও বুঝি যায়। সবদিকে মার খাবার এই আনন্দ ছেড়ে বাংলার হিন্দুরা যে হিন্দুস্থানে যোগ দিতে চলেছে, তার জন্যে বাংলার লীগপন্থী কাগজগুলিতে প্রত্যহ চোখে সাঁতার-পানি বইছে। নির্লজ্জের এই ভাঁড়ামি যে হিন্দুরা খুবই উপভোগ করছে তা বলাই বাহুল্য।

ব্যবচ্ছেদের খতিয়ান

বলা অনাবশ্যক, ভারত অথবা প্রদেশ ব্যবচ্ছেদে কোনো হিন্দুই খুসি হতে পারেনি। গত শতাব্দীকাল ধরে সে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছে। এরই জন্যে সে জেলে গেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। এরই জন্যে কত হিন্দু-গৃহে সুখের নীড় ভেঙ্গে গেছে, কত পরিবার ছন্নছাড়া, সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার বিনিময়ে কী পেলে তারা। আর লীগ,—দেশসেবার প্রেরণা যারা কোনোদিন অনুভব করলেনা, পাকিস্তানের আহ্বানের

যাদের গৃহের আরাম, প্রিয়জনের সঙ্গসুখ, অর্থোপার্জন এবং ভোগবিলাসের মোহ, কিছুই ত্যাগ ক'রে আসতে হয়নি,—বরং যারা পেয়েছে, পাকিস্তান যাদের কাছে এসেছে রজত-ঝন্‌ঝনায়, এনেছে কণ্ট্রাক্ট, কণ্ট্রোল, চাকরী, ব্ল্যাকমার্কেট, এজেন্সি, প্রোকিওরমেণ্ট, কত কি,—নিশ্চিন্তে, নিরাপদে দুঃখের আঁচ পর্যন্ত গায়ে না লাগিয়ে যারা একই সঙ্গে ইসলাম এবং স্বর্গের সেবার সুযোগ পেয়েছে.—তারাই বা কি পেলে? নোয়াখালির নরক আর কলিকাতার রক্তনদীর বিনিময়ে তারাই বা পেলে কি? 'কীটদষ্ট, অঙ্গহীন পাকিস্তান'? তারাও আজ পস্তাচ্ছে। কিন্তু এই পস্তানির কোনো মানে নেই। মিঃ জিন্না শেষ পর্যন্তও অখণ্ড ভাবতে রাজি হতে পারেননি। পারলে আজ উভয় পক্ষের আপশোষের অবকাশ ঘটতো না। মর্যাদায়, ঐশ্বর্যে এবং শক্তিতে ভারত দীপ্যমান হয়ে উঠতো তাহ'লে। কিন্তু নিজের জেদ ও দম্ভে আজ ভারতকে সর্বনাশের যে শিখরে তিনি ঠেলে নিয়ে গিয়েছেন, সেখান থেকে ফেরবার পথ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর অনুগামীরা একবার বিদ্রোহের ভঙ্গীতে মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁরা এতই দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যে মিঃ জিন্নার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কিছুই ক'রে উঠতে পারেননি।

এই ব্যবচ্ছেদের যদি সত্যকার হিসাব-নিকাশ করতে হয়, তাহ'লে বলতেই হবে, এর ফলে হিন্দুও জেতেনি, মুসলমানও জেতেনি, জিতলো ইংরেজ। হিন্দু-শিখ-পার্শী-খৃষ্টানের মিলিত স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, মুসলীম লীগের লোভের সামান্য ভগ্নাংশমাত্র পরিতৃপ্ত হয়েছে, আর ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিয়েই নিষ্কৃতি পেলে!

শান্তির সম্ভাবনা

যাঁরা বলছেন, ভারত বিভাগের ফলে শান্তি আসবে, তাঁদের সঙ্গে একমত হবার কোনো সুযোগই আমরা বাস্তব ঘটনার দিকে চেয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে আগুন আজ জ্বলে উঠেছে তা নেভবার আশা করতে পারতাম যদি ভারতকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সাম্প্রদায়িক অঞ্চলে ভাগ করা সম্ভব হত। হিন্দু এবং মুসলমান গ্রামে গ্রামে পাশাপাশি ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং যে হিন্দুস্থান হ'ল তাকে যেমন সম্পূর্ণ হিন্দু ভারত বলা যায় না। যে পাকিস্থান হ'ল তাকেও তেমনি সম্পূর্ণ মুসলিম-ভারত বলা যায় না। হিন্দুস্থানে প্রায় ৪১২৪১৬৮৬ মুসলমান (অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি) এবং পাকিস্থানে প্রায় তিন কোটি হিন্দু রয়ে গেল। নবগঠিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে এরা যদি শান্তিতেই থাকবে তাহ'লে অখণ্ড ভারত কি দোষ করেছিল? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আশা ক'রেছেন এবং মিঃ জিন্না ভরসা দিয়েছেন, পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর সুবিচার করা হবে এবং তারা খুব আরামে থাকবে। কিন্তু একদিকে শরিয়তের শাসনের ধুয়া, অন্যদিকে সিন্ধুতে তারই ভয়ঙ্কর নমুনা দেখে কে সেই ভরসার উপর নিশ্চিন্তে আশা ক'রে থাকতে পারে? সাজানো বাগান শুকিয়ে যবার পর মিঃ সুরাবর্দি যে বক্তৃতা দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি পশ্চিমে বাংলার মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন:

> "Their rights and interests will not be jeopardised. The Muslim world is not so far away that their voice will not reach it or it will not be able to come to their assistance."

অর্থাৎ—

> 'তাদের (পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের) অধিকার ও স্বার্থ বিপন্ন হবে না। মুসলিম জগৎ এতদূরে নয় যে তাদের কণ্ঠস্বর তার কাছে পৌঁছুবে না, বা সে তাদের সাহায্যে আসতে পারবে না।"

কথাগুলি ঠিক শান্তির বাণী মনে হচ্ছে কি?

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই হোল মুসলিম লীগের দান। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা পাশাপাশি বাস ক'রে এসেছে,—যাদের এক রক্ত, এক দেশ এবং এক ভাষা—হঠাৎ লীগের তাড়ায় তারা পৃথক নেশন হয়ে আর কিছুতেই

একসঙ্গে বাস করতে পারছে না। মাতৃভূমি ভাগ হয়ে গেল হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে। তবু তাদের পাশাপাশি বাস করতেই হবে,—কিন্তু আগের মতো শান্তিতে বোধ হয় আর নয়, নবার্জিত তিক্ততার সঙ্গেই হয় তো।

অথ বিভাগ পর্ব

তিক্ততার এই তো সূত্রপাত। এর পরে আসছে সীমানা কমিশন। সাম্প্রদায়িক সংখ্যার অনুপাত হিসাবে তাঁরা পশ্চিম ও পূর্ব বাংলাকে ভাগ ক'রে দেবেন। বঙ্গ বিভাগ কাউন্সিলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় আর মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দি ও খাজা নাজিমুদ্দিন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণায় আপাততঃ কলিকাতা, সমগ্র বর্ধমান বিভাগ (অর্থাৎ বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী), প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলা এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে, অবশিষ্টাংশ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের বাইরে পড়েছে। এটি সম্ভবতঃ আসামের মধ্যে যাবে। কিন্তু বলাই হয়েছে, এই বিভাগ চূড়ান্ত নয়। বাংলা বিভাগের সময় সীমানা কমিশন শুধু সংখ্যানুপাতই বিবেচনা করবেন না, 'অন্যান্য বিষয়ও' বিবেচনা করবেন। সেই 'অন্যান্য বিষয়' যে ঠিক কি কি, তা এখন বলা শক্ত। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে বড়লাট স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছেন, "এই অস্থায়ী বিভাগের সঙ্গে চূড়ান্ত বিভাগ হুবহু এক হবে না।" আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জন্যে তিনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার এবং বাংলার দিনাজপুর জেলার উল্লেখ করেছেন। গুরুদাসপুরে মুসলিম জনসংখ্যাহার শতকরা ৫০.৪, আর অমুসলমানের শতকরা ৪৯.৬। অস্থায়ী বিভাগে গুরুদাসপুরকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ধরা হলেও চূড়ান্ত বিভাগে নিশ্চয়ই তার সমগ্র অংশ মুসলিম-পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বাংলার অবস্থা

সাময়িক বিভাগে বাংলার কয়েকটি জেলাকেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন মুর্শিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর, মালদহ, ফরিদপুর, ও রাজশাহী। এই সমস্ত জেলার কোনোটিই সমগ্রভাবে পাকিস্তান-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। এই সমস্ত জেলার কতক অংশ হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দুবঙ্গেরই সংলগ্ন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা হিন্দুপ্রধান। অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, নবগ্রাম, ও সাগরদীঘি থানাও হিন্দুপ্রধান। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরও একান্তভাবে হিন্দুপ্রধান। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমা এবং যশোহর জেলার অভয়নগর, সালিখা, নড়াইল ও কালিয়া থানা হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দুবঙ্গের সংলগ্ন। দিনাজপুর জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের শতকরা হার সমান-সমান। এবং এর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের সামান্য অংশ বাদ দিলে সমস্তটাই হিন্দু-প্রধান। মালদহের ও দিনাজপুরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে পদ্মার ধার পর্যন্ত সমস্ত মধ্যাংশই হিন্দু প্রধান। এরই সঙ্গে রাজশাহীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের হিন্দুপ্রধান অংশ সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

এ তো গেল জনসংখ্যার দিক দিয়ে। কিন্তু জনসংখ্যাই বঙ্গবিভাগের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন 'অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের' উল্লেখ করেছেন। তার অর্থ যাই হোক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচনা করবার বিষয় তাতে আর সন্দেহ নেই। হিন্দু বঙ্গের প্রাক্‌বৃটিশ যুগের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ

ও কৃষ্ণনগর এবং প্রতাপাদিত্যের যশোহর। ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক দিক দিয়েও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর প্রায় দুই শতাব্দীকাল প্রেসিডেন্সি বিভাগের সঙ্গে সম্বদ্ধ। জনসংখ্যার উপর ভিত্তি ক'রে ওই জেলা-গুলির কিয়দংশকেও বিচ্ছিন্ন ক'রে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হ'তে পারে না।

কিন্তু এ সবের চেয়েও গুরুতর বিবেচনার বিষয় আছে। সীমানা কমিশনকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, কি অবস্থায় এই বিভাগ হচ্ছে। ভারত এক এবং অবিভাজ্য, এই ছিল চিরন্তন ধারণা। এই ভারতে শতকাল ধ'রে হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পার্শী, বৌদ্ধ জৈন ও খৃষ্টান একসঙ্গে এক জাতি হিসাবে পাশাপাশি শান্তিতে বাস ক'রে এসেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্বার্থের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ মিশিয়ে মিঃ জিন্না দুই নেশনের থিওরী প্রচার করলেন। এবং এরা যে একসঙ্গে বাস করতে পারে না, তা প্রমাণ করবার জন্যে এমন এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাধানো হ'ল ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না। দাঙ্গা বাধানো কঠিন কিছুই নয়। দুটি কয়েক গুণ্ডা ভাড়া করে যদি খুন-খারাপি আরম্ভ করা যায়, অনতিবিলম্বেই তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে বাধ্য। এর পিছনে যদি একটা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভার প্রশ্রয় থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই।

বাস্তবিক দিক

ভারত তথা প্রদেশ-বিভাগের এই পটভূমিকা সীমানা কমিশন কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বেষ-বিধ্বস্ত দেশে শান্তির প্রস্রবণ ঝর ঝর নেমে আসবে, এ ব'লে যারা মনকে প্রবোধ দিতে চায় তারা দিক। কিন্তু বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা রাজ-নীতিকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। পশ্চিম বাংলা স্বাধীন হিন্দুস্থানের পূর্বসীমানা। সীমানা কমিশনকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্দেশ করার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ বিভাগ এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন দুটি প্রদেশ বিভাগ নয়। গোপন ক'রে লাভ নেই, এই দুইটি রাষ্ট্র পরস্পর বন্ধুভাবাপন্নও নয়। যদি হত, তাহ'লেও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব কখন ছিঁড়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে সীমানা এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যাতে উভয়ের মধ্যে বিরোধের অবকাশ অল্প থাকে।

সেই বিভাগ জনসংখ্যার অনুপাতেও সর্বক্ষেত্রে হবে না, —জেলা অথবা থানা হিসাবে ভাগ ক'রেও না। তার জন্যে শরণ নিতে হবে সুপ্রশস্ত পদ্মা নদীর। নোয়াখালির পশ্চিম প্রান্ত থেকে রাজশাহী পর্যন্ত পদ্মানদীর এবং রাজসাহী থেকে দিনাজপুরের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত আত্রাই নদীর উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এই সীমানা নির্দিষ্ট হ'লে দুটি রাষ্ট্র নিশ্চিন্তে নিরাপদে এবং শান্তিতে নিজের নিজের সংস্কৃতির চর্চায় ও জনকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অন্যথা ভারতে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন ভরসা করবার আমরা সাহস খুঁজে পাচ্ছি না। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যদি ভারত বিভাগের প্রয়োজন হয়ে থাকে; তাহ'লে সেই শান্তিকে নিরঙ্কুশ এবং সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যেই বাঙ্গলাকে পদ্মা বরাবর বিভাগ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হবে।

বঙ্গ বিভাগের প্রবর্তক

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবিভাগের প্রবর্তক হিসাবে 'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। একদা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করবার জন্যে যিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গের বাণী প্রথম তাঁরই রসসিক্ত কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ ১৬ই আগষ্টের আগে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, মুসলমানেরা যখন কিছুতেই হিন্দুদের সঙ্গে অখণ্ড ভারতে থাকতে রাজি নয়, তখন তাদের

পৃথক ক'রে দেওয়াই ভালো। সেই সংগে বাংলাকেও পৃথক দুটি ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া হোক। এই বিষয়ে উপীনদার সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন মতামত 'বর্তমানের' বৈশাখ সংখ্যার একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণ হচ্ছে, প্রথম যখন তিনি 'বসুমতী'তে বঙ্গভঙ্গের দাবী তোলেন, তখন আমরা বিস্মিত এবং ব্যথিতই হয়েছিলাম। হবারই কথা। বাংলাকে দু ভাগে ভাগ করবার কল্পনা তখন আমাদের চিন্তারও বাইরে। কিন্তু মুসলীম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের কুশাসন, অযোগ্যতা ও সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি,—সর্বোপরি লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হিন্দু জনসাধারণের মনকে এমন বিষিয়ে দিলে যে, বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় হিন্দু-বাংলা অতি আশ্চর্যজনক অল্প সময়ের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। এবং তার দাবী এমনি প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মতো অসামান্য প্রভাবশালী নেতাও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছুই করতে পারলেন না। বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু জনসাধারণের একাংশও যদি লীগের অপশাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে থাকে, তাহ'লে সেজন্যে তাদের প্রথম কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত উপেন্দ্রনাথের কাছে।

তত: কিম

কিন্তু বঙ্গবিভাগ তো হোলো! তারপরে কি?

৩রা জুন মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণার পরেই সুরাবর্দি মন্ত্রীমণ্ডলের অবসান ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়েও হ'ল না। সুরাবর্দি মন্ত্রীমণ্ডল গেলেন বটে, কিন্তু 'তত্ত্বাবধায়ক গবর্ণমেণ্ট' হিসাবে তাঁরাই ফের রয়ে গেলেন। পরিষদ সদস্যগণের ভোটে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এক মুহূর্তও কোনো ভাবেই মিঃ সুরাবর্দির হাতে শাসনভার রাখা উচিত নয়। যা হয়ে গেছে তারপরে হিন্দুজনসাধারণ তাঁকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তাঁর গবর্ণমেণ্ট এখনও বলবৎ থাকায় নানা কারণে অনেকের মনে অনেক সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্তও করা হয়েছে। এখনই আঞ্চলিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় নাকি আইনগত বাধা আছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে উভয় সম্প্রদায়ের সমসংখ্যক পরামর্শদাতা নিয়ে গবর্ণর বারোজ ৯৩ ধারার শাসনের প্রবর্তন করতে দেরী করছেন কেন? শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই সেই ব্যবস্থা হবে। কিন্তু গবর্ণর বারোজের উপর হিন্দু-জনসাধারণ গত দাঙ্গায় যে আস্থা হারিয়েছে, আজও তা ফিরে আসার কোনো কারণ ঘটেনি। সুতরাং যত দেরী হবে, জনসাধারণের মনেও ততই নানা আশঙ্কা ও সন্দেহের উদ্রেক হবে।

আঞ্চলিক মন্ত্রীমণ্ডল

এই অস্থিতপঞ্চক অবস্থায় নানা বিষয়ে নানা কথাই রটছে। তার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা আংশিক সত্য এবং কোন্‌টা একেবারেই মিথ্যে আজ তা বলা কঠিন। প্রকাশ, ১৫ই আগস্টের পর লাট-বদল এবং আঞ্চলিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে। ডক্টর বি, আর, আম্বেদকর নাকি বাংলার গবর্ণর হবেন। খবরটা খুশির সন্দেহ নেই। এবং খোসখবরের ঝুটাও ভাল।

ভাগাভাগির তাড়ায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ দল শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্ব হারিয়েছে। কিরণবাবু পূর্ববঙ্গের বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্ব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হোল, পূর্ববঙ্গ সেই পরিমানেই লাভবান হবে এইটেই সান্ত্বনা।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলের তিনিই যে প্রধান মন্ত্রী হবেন তা অনুমান করা যায়। ডক্টর ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কারো সন্দেহের কোনো হেতু নেই। কিন্তু বাংলার এই একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত হচ্ছে না। বঙ্গবিভাগ

সম্বন্ধে তাঁর মতামত যাই হোক, বঙ্গ বিভাগ যখন হয়েই গেল, তখন সেই মতামতের জের টানা এখন নিরর্থক। তাঁর দেশপ্রীতি সম্বন্ধে যেমন কোনো প্রশ্ন নেই, তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধেও তেমনি কোনো প্রশ্ন নেই। পশ্চিম বাংলায় আজ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণধী নেতৃবর্গকে নিয়ে একটি বলিষ্ঠ মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে হবে। শরৎবাবু এবং কিরণবাবুকে বাদ দিয়ে তেমনি একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে কি? আমাদের সন্দেহ আছে।

বঙ্গ-বিভাগের পূর্বে

বিভাগের পূর্বে বাংলাকে আবার একবার পরিপূর্ণ ক'রে সমগ্রভাবে দেখে নিই। মাথায় তার ঝলমল করছে হিমালয়ের তুষার-কিরীট, পদতল ঘিরে ছল ছল করছে সমুদ্র। তার পায়ের আঙুলগুলি চুম্বন করবার জন্যে ভেঙে ভেঙে পড়ে ঢেউ। শাড়ীর পাড়ের মতো গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা তাকে গভীর অনুরাগে বেষ্টন ক'রে আছে। বাংলার এই এক এবং অনন্য রূপই রইলো আমাদের কল্পনায়। জাতির একান্ত দুর্গতির দিনে লোভ, দুর্বুদ্ধি এবং মূঢ়তাই আজ প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই [illegible]দের হাতে বাংলাকে একেবারে হারাবার ভয়ে যারা [illegible]ভেদ যেচে নিলে, তাদেরও মনে আজ সুখ নেই, আনন্দ নেই, শান্তি নেই। থাকবেও না। যতদিন বাংলাকে তার পরিপূর্ণ, সুন্দর, সমগ্ররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারে ততদিন মেদিনীপুর থেকে দুর্জয়লিঙ্গ এবং চট্টগ্রাম থেকে রংপুর পর্যন্ত তার সন্তানদের মনে শান্তি আসবে না।

পাঞ্জাব-বিভাগ

বাংলার মতো পাঞ্জাবেও যেই পৈশাচিক দাঙ্গা বেধে উঠলো, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখেরাও স্থির করলে পাঞ্জাব ভাগ ক'রে নেওয়াই ভালো। তারাও দাবী জানালে পাঞ্জাব ভাগ ক'রে নেবার। পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পূর্ব পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সদস্যেরা মিলে পাঞ্জাব বিভাগের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং পাঞ্জাবও ভাগ হয়ে গেল। পশ্চিম পাঞ্জাবে পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পূর্ব পাঞ্জাব হিন্দুস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। বাংলার মতো সেখানেও বসবে সীমানা কমিশন। সেই কমিশন চূড়ান্তভাবে স্থির ক'রে দেবেন, কোন জেলা কোন ভাগে পড়বে।

সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান

সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। সেখানে প্রদেশ বিভাগের সমস্যা নেই। উভয় প্রদেশই প্রবলভাবে মুসলিম প্রধান। সেখানে বিরোধটা কংগ্রেস-পন্থী ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সঙ্গে লীগপন্থী মুসলিমদের। মুসলিম লীগের চেষ্টায় এবং উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আজ সর্বত্রই সংক্রমিত হয়েছে। সীমান্তে হিন্দুরা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। অথচ সেখানেও সেই নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক অসহায় হিন্দুদের উপরও অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। অথচ তারা কোনো অপরাধ করেনি। সীমান্তের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের উপর মুসলিম লীগের যে আক্রোশ, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল মুষ্টিমেয় হিন্দুদের।

সীমান্ত এবং বেলুচিস্থানের কংগ্রেসী মুসলমানেরা পাকিস্তানে যোগদানে অনিচ্ছুক। সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফুর খান পুনঃ পুনঃ বলেছেন, পাকিস্তান উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে ইংরেজ তার ঘাটি রাখবার জন্যেই ভারত বিভাগ চাচ্ছে। তিনি বলেছেন, পাঠানেরা চায় স্বাধীন পাঠানীস্থান। আগামী কয়েক বৎসরে পাকিস্তান কি পরিণতি লাভ করে তারা তা দেখতে চায়। তারপরে তারা স্থির করতে চায় কোন্ স্থানে তারা যোগ দেবে,—হিন্দুস্থানে, না পাকিস্তানে।

বড়লাট ঘোষণা করেছেন, এখনই সেটা স্থির করবার

জন্যে সীমান্তে গণভোট গ্রহণ করা হবে। গণভোটে বেলুচিস্থান লীগ-গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সীমান্তের গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর উপর কংগ্রেসী পাঠানদের আস্থা না থাকায় বড়লাট নিরপেক্ষ গণভোট পরিচালনার জন্যে ব্রিগেডিয়ার বুথকে নিযুক্ত করেছেন। মনের দুঃখে স্যার ওলাফ দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন। কিন্তু সেটা নিতান্তই মুখরক্ষার জন্যে। সীমান্তে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করবার জন্যে যা কিছু করার দরকার তার কিছুই তিনি বাকি রাখেননি।

বাদশাখানের আপত্তি

এই গণভোটে খান আব্দুল গফুর খানের প্রবল আপত্তি। তিনি জানেন, এই গণভোটের অর্থ সীমান্তে পাঠানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং উভয় পক্ষেরই পাঠানের রক্তে সীমান্ত প্লাবিত হবে। মুসলমানের জীবন-মৃত্যু নিয়ে মিঃ জিন্না খেলা করতে পারেন, কিন্তু সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান তা পারেন না। তিনি বলেন, হিন্দুস্থান নয়, পাকিস্তানও নয়, পাঠানের স্বপ্ন স্বাধীন পাঠানীস্থানের প্রশ্নে যদি গণভোট হয় তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু যদি হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের প্রশ্নে গণভোট নেওয়া হয়, তাহ'লে তিনি তা বর্জন করবেন। সেই সিদ্ধান্তই তিনি বড়লাটকে জানিয়েছেন।

বড়লাট তাতে রাজি হননি। অর্থাৎ সীমান্তে গণভোট হবেই। এবং বাদশা খান ও তাঁর অনুগামী সহস্র সহস্র লাল-কোর্তা ও অন্যান্য কংগ্রেসপন্থী তাতে অংশ গ্রহণ করবেন না। এর ফল যে ভালো হবে না, তা বলাই বাহুল্য। বাদশা খান সীমান্তের মুকুটহীন রাজা। পাঠানদের উপর অসামান্য তাঁর প্রভাব। তাঁকে বাদ দিয়ে ফাঁকির referendumএ জিতে সীমান্তকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিলে সীমান্ত পাকিস্তানের দেহে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে, যতক্ষণ না সে পাকিস্তানের কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে বের ক'রে আনতে পারবে। সীমান্তের উপজাতি অঞ্চল নিয়ে দুর্ধর্ষ ইংরেজরাজ দুই শতাব্দী ভুগেছেন, পাকিস্তানকেও ভুগতে হবে,—তবে অবশ্য অল্প কালের জন্যে।

দেশীয় রাজ্য

এর পরের সমস্যা দেশীয় রাজ্য নিয়ে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই হিন্দুস্থানে যোগ দিয়েছে। শুধু হায়দারাবাদ আর ত্রিবাঙ্কুর স্থির করেছে, ১৯৪৮ সালের জুনে ভারত বিভাগ ক'রে ইংরাজ দু'টি ডোমিনিয়নের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ ক'রে যখন চ'লে যাবে, তখন তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব হবে, এই আনন্দে লীগ তাতে সম্মতি দিয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে লীগ দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও ক'রে এসেছেন। কংগ্রেস যে এ ব্যবস্থা মেনে নেবে না তা সুনিশ্চিত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আগেই ব'লেছেন, দেশীয় নৃপতিদের সামনে দু'টি মাত্র রাস্তা খোলা আছে,—হয় বর্তমান গণপরিষদে যোগদান, নয় পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদান। এ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পন্থা নেই। তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁদের 'বিদ্রোহী' ব'লে গণ্য করা হবে, এবং অন্য কোনো বৈদেশিক শক্তি যাতে তাঁদের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে না নেন তারও ব্যবস্থা করা হবে।

এই উক্তিতে স্বাধীনতাকামী দেশীয় রাজন্যদের উষ্মা হয়েছে। তাঁরা নির্বিকার চিত্তে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চোখ-রাঙানী সহ্য করতে পারেন, কিন্তু দেশীয় গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ-উপরোধও নয়!

তাঁদের যুক্তি

দেশীয় রাজন্যদের যুক্তি হচ্ছে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ইংরেজ চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সার্বভৌমত্ব

(Sovereignty) তাঁদের কাছেই ফিরে আসবে। এর পরে তাঁরা ইচ্ছা করলে কোনো একটি গণপরিষদে যোগ দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন,—নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।

এর উত্তর হচ্ছে, ইংরেজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে এঁরা কেউই স্বাধীন ছিলেন না, মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন। অনেকের সে সময় অস্তিত্বও ছিল না। তাঁরা ইংরেজ-রাজের সৃষ্টি। এবং দিল্লী কেন্দ্র থেকে বড়লাট ইংলণ্ড-রাজের প্রতিনিধিরূপে তাঁদের সকলকেই শাসন ও পরিচালন ক'রে এসেছেন। আজ ইংলণ্ড-রাজের শাসন-শক্তি ভারতের দুটি ডোমিনিয়নের কাছে হস্তান্তরিত হতে চলেছে। সুতরাং যে সার্বভৌমত্ব তাঁদের কোনোকালে ছিল না, তা তাঁদের কাছে ফিরে আসার প্রশ্ন উঠতে পারে না। দুটি ডোমিনিয়নের একটির নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পন্থাও তাঁদের থাকতে পারে না।

তাঁদের আরও একটা যুক্তি হচ্ছে, কংগ্রেস যখন সীমান্তের পাঠানদের স্বাধীনতালাভের অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন দেশীয় রাজন্যদের স্বাধীনতাই বা মেনে নেবেন না কেন? এর উত্তর স্বয়ং মহাত্মাজি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> "ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীর সঙ্গে সীমান্তে পাঠানীস্থান গঠনের আন্দোলনের কোনো তুলনা হয় না। আব্দুল গফুর খান পাঠানীস্থান দাবী করেছেন কারণ পাঠানদের তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চান না। তাঁদের শাসনতন্ত্র তাঁরাই তৈরি করবেন এবং পরে নিজেদের ইচ্ছামত ভারতীয় ইউনিয়ন অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবেন। তৃতীয় আর একটি রাষ্ট্রগঠনের অভিপ্রায় তাঁদের নেই। ভিন্ন প্রদেশবাসীর হস্তক্ষেপ সহ্য করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। আব্দুল গফুর খান যদি এর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু দাবী ক'রে থাকেন, তাহ'লে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। রামস্বামী চান পাকিস্তান অথবা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কহীন তৃতীয় আর একটি রাজ্য গঠন করতে।"

প্রজাদের দাবী

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে দেশীয় প্রজাদের দাবী কি? তারা কি চায়? হায়দারাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরের প্রজামণ্ডল সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, তারা ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতী নয়। তাদের দাবীই থাকবে। মিঃ জিন্না তাঁর নিজের স্বার্থে (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব করার স্বার্থে) এই সমস্ত ক্ষুদে 'জার'দের (Czar) স্বীকার করে নিলেও, গণতন্ত্র কখনই স্বীকার করবে না, সার্বভৌমত্ব প্রজাদের হাতে নয়, রাজার হাতে। লক্ষ লক্ষ প্রজার দাবীকে উপেক্ষা ক'রে কোনো স্বৈর শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। তার বিপদও আছে। চতুর্দিকে ভারতীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বেষ্টিত এই সমস্ত রাষ্ট্র কতক্ষণ প্রবল প্রজা আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে? এখন যদি এঁরা সেকথা উপলব্ধি করতে না পারেন, তাহ'লে পরে যে মূল্যে তা উপলব্ধি করতে হবে তা প্রীতিকর হবে না।

ইংরাজের কর্তব্য

এই ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও কর্তব্য আছে। তাঁরা সে কর্তব্য পালন করবেন কি না জানি না। ইতিমধ্যে অনেকের মনেই সন্দেহ উঠেছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত বুঝিবা মিঃ চার্চিলের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করতে চলেছেন। লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেনের ৩রা জুনের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও এতে কেউই খুশি হননি,—না কংগ্রেস, না জাতীয়তাবাদী মুসলমান ; না শিখ, না লীগ।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'গৃহযুদ্ধের' গালভরা নামে যা চলছে, আসলে তা গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন সংবাদপত্রগুলি একে Gangsterism বলেই অভিহিত করেছেন। যে কোনো গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই এ দমন করতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবার কথা নয়। আসামে এ গুণ্ডামি দমিত হয়েছে। স্যার ওলাফ ক্যারোর চক্রান্ত সত্ত্বেও

ডক্টর খান সাহেব এ গুণ্ডামি দমন করেছেন। পারেন নি শুধু বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্ট আর পাঞ্জাবের জেঙ্কিন্সের গবর্ণমেণ্ট। তাঁরা নিজেরাও পারেন নি, বিবিধ আইনের চক্রান্তে স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকেও হাত দিতে দেননি। বরং এই অতি তুচ্ছ গুণ্ডামিকেই উপলক্ষ্য ক'রে মিঃ জিন্নার ভারত বিভাগের দাবীকেই শক্তিশালী করেছেন। জনসাধারণের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং তা মিঃ জিন্নাকে মানতে বাধ্য ক'রেছেন, ভারতবিভাগ সম্বন্ধে সেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করলে আজ ভারত হিন্দুস্থান পাকিস্তানে বিভক্ত হত না।

বড়লাট জানিয়েছেন, বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো ভারতকে টুকরা টুকরা করার অভিপ্রায় তাঁদের নেই। কি যে তাঁদের অভিপ্রায় তাঁরাই জানেন। কিন্তু যেদিকে তাঁরা ভারতকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা 'বলকানাইজেশনেরই' পথ। তার ফলে ভারত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে নামেমাত্র স্বাধীন থাকলেও কাজে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদেরই কুক্ষিগত হয়ে থাকবে এবং তার দুর্দশার আর অন্ত থাকবে না। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ঘোষণায় বৃটেন যদি প্রশ্রয় দেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে ভারতকে বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো দুর্ব্বল করাই তার গোপন অভিপ্রায়।

মুসলিম মনোভাব

প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লীগ অথবা জাতীয়তাবাদী কোনো মুসলমানই যে অন্তরে অন্তরে খুশি হতে পারেন নি তার প্রমাণ প্রত্যহই পাওয়া যায়। লীগ পন্থীদের আশা ছিল, তাঁরা সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা পেয়ে যাবেন। তাঁরা তা পাননি। মিঃ জিন্না কিছুতেই পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ মেনে নেবেন না আশ্বাস দিলেও বড়লাটের ধমকে শেষ পর্যন্ত তা শিরোধার্য করতে সম্মত হয়েছেন। এর ফলে পাকিস্তানের নামে ভারতের পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে যে দুটি দীর্ঘব্যবহিত ভূখণ্ড তাঁরা পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে বাংলার লীগ মন্ত্রিসভার শিক্ষা-সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন মন্তব্য করেছেন :

> "বাংলার মুসলমানদের অতি অল্প সম্পদশালী এমন একটি অঞ্চল দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলমানগণ কোনো কালেই উন্নত হতে পারবে না।...মুসলমানেরা পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র চেয়েছিল ব'লেই তাদের যেন সাজা দেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু এই সাজা মিঃ জিন্না মেনে নিলেন কেন? তাঁর অভ্রভেদী দম্ভ এবং অতি তিক্ত কংগ্রেস বিদ্বেষই কি এর জন্যে দায়ী নয়? এর ফলে হ'ল কি? 'ইত্তেহাদ' বলছেন :

> "মুসলিম জাতির পার্লামেণ্ট আজ পূর্ব পাকিস্তানের চার কোটী মুসলমানকে কোরবাণী করিয়াছে। এটা বিরাট কোরবাণী। যাদের আজ কোরবাণী করা হইয়াছে, সেই জনগণের বিক্ষোভে আজ পূর্ব পাকিস্তানের আসমান জমিন কম্পিত।"

কম্পটা অবশ্য ভিতরে ভিতরেই চুকে গেছে; কারণ মিঃ জিন্নার মুখের উপর 'আসমান-জমিন' কাঁপাবার এত বড় বুকের পাটা কোনো বাঙ্গালী মুসলমানের নাই। 'বুকে পাথর বাঁধিয়া তাদের নাড়ী ছেঁড়া এ ত্যাগ'—এই 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' তাদের নিঃশব্দেই মেনে নিতে হ'ল।

এর উত্তরে 'নবযুগ' বলছেন :

> "কিসের কোরবাণী রে? একবার তোদের কায়দে আজম মোট ৯ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ৩ কোটি ২৯ লক্ষ জনকে কোরবাণীর কবুলতিতে স্বাক্ষর করিয়া পাকিস্তানী ধূয়া ধরিয়াছিলেন, তারপর দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ১ কোটি ২৫ লক্ষ জনকে সেই কোরবাণীর পালের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, অবশিষ্টগুলিনের ভাগে কোরবাণী আছে, না বলির সম্মুখীন হইয়া তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে, তাহার কোনো দিশা পাওয়া যাইতেছে না।"

এর প্রতিকার কি? জমিয়ৎ-উল-উলেমার বুন্দেলখণ্ড অধিবেশনের সভাপতি মওলানা শহীদ ফকরী বলেছেন :

'আমরা মুসলীম লীগের বহু গুণ্ডামি সহ্য করেছি এবং সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌছেছি। এখন তাদের জানা দরকার আমরাও কড়ায় গণ্ডায় গুণ্ডামীর প্রতিশোধ নিতে পারি। লীগপন্থীরা মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় খুশি হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা খুশি হইনি।"

শ্রীহট্টে গণভোট

আগামী ৫ই ও ৬ই জুলাই শ্রীহট্টের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানে সংযুক্ত হবে কি না, এই সম্পর্কে শ্রীহট্টবাসীদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

শ্রীহট্ট বাঙালীপ্রধান। আগে বাঙলার অন্তর্গতই ছিল। ১৮৭৪ সালে আসামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আসামের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়। বাংলার শ্রীহট্ট বাংলায় ফিরে আসবে, এ সম্ভাবনা দেখা দিলে বাঙালীর আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু সে বাংলা আর নেই। খণ্ডিত বাংলার অন্য অংশ আর বাংলা দেশ নয়, পূর্ব পাকিস্তান। এই ইস্‌লামীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রশ্নে বাঙালীমাত্রেই আজ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীহট্টের অধিবাসীর সংখ্যা ৩১ লক্ষ। শতকরা ৫৬ জন মুসলমান। এক এক বর্গমাইলে ৫৭২ জন লোকের বাস। মুসলমানের সংখ্যা বেশী হওয়ায় গণভোটের ফলাফল সম্বন্ধে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা যায়।

চুন, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প শ্রীহট্টে বেশ উন্নত হয়েছে। শ্রীহট্টের এই শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। তার জন্য শ্রীহট্টের পক্ষে যখন পশ্চিমবঙ্গে চ'লে আসা সম্ভব নয়, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত থাকতেই হবে। আসামের চা, জঙ্গল প্রভৃতি শিল্প-সম্ভাবনার মধ্যে চায়ের উৎপাদনকেন্দ্র শ্রীহট্টের বিকাশলাভের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আর আসাম হবে প্রগতিশীল ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ। কাজেই সারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রীহট্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হ'তে পারে। কিন্তু শতকরা ৪৪ জন হিন্দু আসামের সঙ্গে সংযোগে একমত হবে। আর তাছাড়া জাতীয়তাবাদী মুসলমান অনেকেই আসামে আছেন। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি তায়েবুল্লা সাহেবের প্রভাব মুসলমানদের উপরে কম নয়। পূর্বপাকিস্তান কিল্লার সমরায়োজনের ক্ষান্তকর পরিণামের কারণ খুঁজলে তায়েবুল্লা সাহেবের মত বিশিষ্ট মুসলমানদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি, হিন্দু মুসলমানের শ্রীহট্ট জাতীয় সদ্ভাব ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকেই মত দেবে, ভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকার জন্য আসামের সঙ্গেই যোগ দেবে।

ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ প্রভৃতি

জুন মাসের প্রথমে লেঃ কর্ণেল ডিয়ানের নেতৃত্বে একটি মার্কিন সামরিক মিশন ওলন্দাজ সামরিকবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং ইন্দোনেশিয়ার অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করেন। গত মে মাসে ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শাসনকর্তা ডক্টর ভ্যান মুক ওলন্দাজদের পক্ষ থেকে ঋণ পাবার আশায় আমেরিকা গিয়েছিলেন। বর্তমানে ইন্দোনেশিয় গণতন্ত্র ও ওলন্দাজদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলছে, তাতে এই দুই সংবাদের বেশ তাৎপর্য আছে। ওলন্দাজদের শেষ আপোষ প্রস্তাবে মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য, আইন ও শৃঙ্খলা, আমদানি রপ্তানি ও কাঁচা মাল সংগ্রহে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওলন্দাজদের যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় সম্মত হ'তে হবে বলা হয়েছে। আগেকার সমস্ত চুক্তির কথা যেন ভুলেই যাওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক এক চুক্তি অনুসারে সমস্ত ওলন্দাজ সৈন্য অপসারণ করার পরিবর্তে সেখানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ওলন্দাজ সৈন্য আছে এবং আরও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ ওলন্দাজদের এরকম উদ্ধত আচরণের কারণ কি? ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্বল হল্যাণ্ড সেখানে তার সাম্রাজ্যিক অধিকার বজায় রাখতে পারে না, এমন কি প্রচ্ছন্ন বৃটিশ সাহায্যও তাদের অনুকূলে কিছু করতে পারেনি। বরং

ডক্টর সুকর্ণো ও সুলতান শাহরীরের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য ইন্দোনেশিয়দের দুর্ধর্ষ সংগ্রাম ভারত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল। বিপন্ন ভ্যান মুক অসহায়ের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করেও শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের গবর্ণমেণ্টকে ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সন্ধি ও আপোষের কথা চালাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। অথচ আজ এই কয়েকমাসের ব্যবধানে কোথা থেকে ওলন্দাজেরা এত শক্তি সঞ্চয় ক'রল যে, তারা নূতন ভাবে ইন্দোনেশিয়াকে শৃঙ্খলিত রাখার ব্যবস্থা পাকা করতে চায়? ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্র বহু কষ্টার্জিত রাষ্ট্রীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলে সাম্প্রতিক আপোষ প্রস্তাবে তার পক্ষে সম্মত হওয়া চলে না। প্রস্তাবটিতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার সর্তে ইন্দোনেশীয়রা রাজী হ'তে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার দাবী

পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় সরকার ইন্দোনেশীয়দের দাবী। ওলন্দাজদের নূতন প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজন সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। আজও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টা তারা ছাড়েনি। নিজেদের অনুগত পশ্চিম বোর্ণিও, পূর্ব ইন্দোনেশিয়া আর সুণ্ডা ষ্টেট্ প্রতিষ্ঠা ক'রে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ তারা গ্রহণ ক'রতে উৎসুক। এ সত্ত্বেও কিন্তু ইন্দোনেশিয়দের দীর্ঘস্থায়ী দৃঢ় প্রতিরোধ দমন করার মত ক্ষমতা একা ওলন্দাজদের নেই। বৃটেনের কাছে সে আশানুরূপ সাহায্য পায়নি, পেতে পারেও না। এখন আমেরিকা কি তাদের সাহায্য ক'রবে না? নিশ্চয়ই, মার্কিন ধনতন্ত্র যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাহায্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রেই রেখেছে। ইউরোপকেই শুধু রক্ষা করার ব্রত তাদের নয়, সারা পৃথিবীকেই যে তাদের রক্ষা করতে হবে। গ্রীসে বৃটেন অপারগ হ'ল, আমেরিকা এগিয়ে গিয়েছে। তুর্কীতে ঈগলের দৃষ্টি পড়ার সুযোগ পাওয়া গেছে, প্রচ্ছন্নভাবে জোগানকারী টাকা দিয়ে ফ্যাসিষ্ট স্পেনকে সাহায্য করার প্রস্তাবও বাদ যায়নি। আর এশিয়ার জাপানে জবরদস্ত ম্যাক্ আর্থার বামপন্থীদের ভোটে হারিয়ে নিরঙ্কুশ 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। চীনে মার্কিন স্বার্থ ও দম্ভ আমেরিকার প্রকাশ্য নীতির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। ভারতবর্ষে নূতন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পর কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হ'তে পারে সে চেষ্টায় যে আমেরিকা নিরত থাকতে দ্বিধা ক'রবেনা তার প্রমাণ রয়েছে, নেপালের সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তিব্যবস্থায় আর পাকিস্থান রাষ্ট্রের সঙ্গে এরই মধ্যে সংযোগ স্থাপনের অতি উৎসাহের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে বন্দর গঠিত হওয়ার যত অসুবিধাই চট্টগ্রামের থাক সেখানে নূতন বন্দর গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করার প্রস্তাব হয়তো ঝুটো খবর নাও হ'তে পারে। এমন অবস্থায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ দ্বীপগুলিতে শক্তি-মদমত্ত মার্কিনী প্রচেষ্টার সুযোগ এলে আমেরিকা তা গ্রহণ ক'রবে না, এ আশা করা অসঙ্গত। তাই মার্কিন সামরিক মিশন যে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ সেনাবাহিনী পরিদর্শন করলে, এই দুই সংবাদের তাৎপর্যেরও কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

মার্শাল প্ল্যান

যুদ্ধপীড়িত ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা দৃঢ়পণ। যুদ্ধের মধ্যে সারা ইউরোপে যে ধ্বংসলীলা চলেছে তা পূরণ ক'রে তুলতে বিরাট সম্পদ কাজে না লাগালে সর্বজননীন প্রচেষ্টাও কার্যকরী হওয়া শক্ত। সুতরাং ডলার-সম্রাট আমেরিকা পররাষ্ট্র-সচিব মার্শাল সাহেবের পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হ'ন। দুর্বল বৃটেন উল্লাস প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই কর না। তবে নিজেদের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে দারুণভাবে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে গবেষণা সুরু ক'রল। এমনভাবে প্রচার সুরু হ'ল যা থেকে সাধারণ মানুষ এই কথাই ভাববে যে, ইউরোপে রক্ষা ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় একমাত্র বাধা

সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানে তিনি বলতে পারেন যে, তিনি মীমাংসার জন্ম উন্মুখ, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যেই ঐক্য নেই। তারা নিজেদের ঝগড়া মিটিয়ে সম্মিলিত হ'লেই তিনি মীমাংসা করতে পারেন। বৃদ্ধ স্মাট্‌সের ঝুনো নীতিকে সতেজ সবুজ ও কার্যকরী রাখার আগ্রহ ও উদ্যম আজও কমেনি, কমেনি পৃথিবীর সর্বহারাদের জাগ্রত গণসমাবেশের স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখেও, আর ভারতবর্ষের লুপ্ত শক্তির নবোন্মেষের সূচনা দেখেও।

ছায়া মন্ত্রীমণ্ডল

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলের নাম দিয়েছেন। এতে আছেন, (১) ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, (২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (৩) ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা, (৫) শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, (৬) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, (৭) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, (৮) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, (৯) শ্রীরাধানাথ দাস, (১০) শ্রীমোহিনীমোহন বর্মন।

ছায়া মন্ত্রীমণ্ডলই বটে। বিধানচন্দ্র ছাড়া কাযা দেখছি না। তা বিধানবাবুও এখানে নেই। আমরা নবীন মন্ত্রী-মণ্ডলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জ্ঞানাঙ্কুর দে

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে নিজের বাড়ীতে গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন। প্রকাশ, গত ২২ শে জ্যৈষ্ঠ সকালে তাঁকে নিহত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর নিজের রিভলভার থেকেই গুলিটি ছোঁড়া হয়েছিল। অথচ ঘটনা পরম্পরায় বেশ বুঝা যায় কোন হত্যাকারীই তাকে নিহত করেছেন। পুলিশ তাঁর ছেলে জয়ন্তকুমার দে, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য নামে একজন কন্ট্রাক্টর এবং রেখা বিশ্বাস নামে একজন মহিলাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছে। ব্যাপারটি বিচারাধীন।

শ্রীযুক্ত দে ১৯১৭ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কাজে যোগ দেন। তিনি ল্যাণ্ডএকুয়িজিশন কালেক্টর হয়েছিলেন। অপক্ষপাত যোগ্য কর্মী ব'লে সরকার ও দেশের লোক উভয় পক্ষের কাছেই তাঁর সুনাম ছিল।

আমরা তাঁর পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

গবর্ণরের বেতার বক্তৃতা—

১লা জুলাই বাংলার গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বেতার-বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অংশের জন্যে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। বলা হয়েছে, শাসনব্যাপারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুরাবর্দি মন্ত্রীমণ্ডলই চালাবেন। কিন্তু তাঁরা কোনো শাসন-নীতি অবলম্বন করতে চাইলে তা পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলের সম্মতি ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গে প্রযোজ্য হবে না। আরও বলা হয়েছে, পশ্চিম বঙ্গ সম্বন্ধে নতুন মন্ত্রীমণ্ডল কোনো নীতি গ্রহণ করলে গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী কাজ করবেন।

গবর্ণর বারোজের বক্তৃতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে। বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আঞ্চলিকমন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে পারতেন। কিন্তু 'এক পক্ষের' (অর্থাৎ লীগ পক্ষের) আপত্তিতে তা পেরে ওঠেন নি। এতে গবর্ণর হিসাবে তিনি শোচনীয় দুর্বলতাই দেখিয়েছেন। তাঁর মতো একজন দুর্বল গবর্ণর অবশ্য ৯৩ ধারায় স্বহস্তে শাসনভার না নিয়ে ভালোই করেছেন। সে হিসাবে বর্তমান ব্যবস্থাকে মন্দের ভালো বলা যেতে পারে।

আমাদের আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনা। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। আমরা জানতে চাই, কলিকাতার এই অশান্তি দমনের জন্যে নতুন গবর্ণমেণ্ট বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে পারবেন কি না।

পদাবলীর গোড়ার কথা

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের বাংলাদেশে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল, কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িল। সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকই বঙ্গদেশে শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক, গোবর্ধনাচার্যের আর্যা সপ্তশতী ও ধোয়ী সেনের পবনদূতই শেষ রসকাব্য এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতই শেষ ঐতিহাসিক কাব্য। সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হইল। সঙ্গীতের আমন্ত্রণে ও প্রয়োজনে এই নূতন কাব্যধারার সৃষ্টি ও পুষ্টি। সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ আর বাংলাভাষাকে অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদে এই ধারার সূত্রপাত হইল। এই ধারা একাধারে সঙ্গীত, ধর্ম ও কাব্যসাহিত্যকে পুষ্টিদান করিয়াছে।

জয়দেব যে ধারার প্রবর্তন করিলেন তাহাই পদাবলীর ধারা। জয়দেবের এই 'ললিতকান্ত কোমল পদাবলী' রাধাকৃষ্ণের মধুর রসের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত ও রাগতালসংযোগে গেয়। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের অনুসরণে যে পদগুলি রচনা করেন সেইগুলিই বাংলা ভাষার প্রথম পদাবলী। পদকর্তাদের গুরু জয়দেব। জয়দেবের পদাবলীর ছন্দ, বিষয়বস্তু, গঠনভঙ্গী, পদবিন্যাস, আলঙ্কারিকতা, ভাবভঙ্গী সমস্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন বাংলার পদকর্তারা। কেবল তাহার সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের কথা মাঝে মাঝে আছে, বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন পদকর্তা তাহার অনুসরণ করেন নাই।

পদকর্তারা জয়দেবের পদবিন্যাস অনেক পদে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন—জয়দেবের কোন কোন শ্লোককেও পদের আকার দান করিয়াছেন। জয়দেবের আলঙ্কারিক চাতুর্যের সবটুকুই পদকর্তাদের রচনায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। জয়দেবের পদগুলি বাংলা ও ব্রজবুলির পদগুলির তুলনায় দীর্ঘ। গীতগোবিন্দে রাধার পূর্বরাগ, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি নাই। এইগুলির সূত্রপাত হইয়াছে বিদ্যাপতি হইতে। গীতগোবিন্দে রাধা খণ্ডিতা মানিনীরূপে প্রধানতঃ চিত্রিতা হইয়াছেন। ভণিতায় জয়দেব হরিস্মরণে যাহাদের মনঃ সরস এবং বিলাসকলায় যাহাদের কুতূহল আছে তাহাদের হর্ষবৃদ্ধি ও ভক্তিসঞ্চারের কামনা করিয়াছেন—পদকর্তারা নিজেদের শ্রীমতীর সখীস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করিয়া শ্রীমতীকে আশ্বাস, উপদেশ, সমবেদনা ইত্যাদি জানাইয়াছেন কখনও কখনও তিরস্কারও করিয়াছেন। এই প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। সেজন্য চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত যে সকল পদে এই সখীস্থানীয়তা আছে—সে সকল পদকে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কোন চণ্ডীদাসের এবং যেগুলিতে তাহা নাই সেগুলিকে চৈতন্যের পূর্ববর্তী অন্য চণ্ডীদাসের রচনা মনে করা হয়।

জয়দেবের আগে প্রাকৃত ভাষায় পদ রচনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত পিঙ্গলের ছন্দের গ্রন্থে দুচারটির নিদর্শন পাওয়া যায়। জয়দেব যে সকল ছন্দে পদগুলি রচনা করিয়াছেন সে সকল ছন্দ প্রাকৃত ভাষারই ছন্দ। এইগুলির নাম—মরহট্টা, রত্ননরেন্দ্র, চৌউইআ, দোহা, চচরী ইত্যাদি। প্রাকৃতভাষা ক্রমে কথিত ভাষা হইয়া চলিত না—দেশের বিদ্বৎসংঘও প্রাকৃতভাষার রচনার বিশেষ আদর করেন

নাই। তাহার ফলে প্রাকৃত ভাষার পদগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। জয়দেব প্রাকৃত ভাষায় না লিখিয়া সংস্কারিত প্রাকৃতে অর্থাৎ তরলায়িত সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন বলিয়া সমাদর পাইয়াছেন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় আর্যাবর্ত্তের সর্বত্রই তাহার প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। বাংলার মত অন্য কোন প্রদেশে ইহা গীতিসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গীতগোবিন্দের অনুকরণে গীতিকবিতা হিন্দী ভাষায় কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ইহা গীতিরসের বন্যার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। ইহার কয়েকটি কারণ আছে, প্রথমতঃ—বাঙ্গালী প্রেমিক জাতি, প্রেমের কবিতাই সে ভালবাসে। গীতগোবিন্দে বাঙ্গালী প্রেমকবিতার একটা চূড়ান্ত আদর্শ পাইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার। তাহার ফলে গীতগোবিন্দ—বৈষ্ণব জগতে গীতা বা বেদের মর্যাদা লাভ করিল। শ্রীচৈতন্য গীত-গোবিন্দে লোকাতীত ব্যঞ্জনা সমারোপ করিলেন। ফলে শ্রীচৈতন্যোত্তর গীতিসাহিত্যে গীতগোবিন্দ অসাধারণ প্রেরণা দান করিল। তৃতীয়তঃ—বাঙ্গালীর নিজস্ব কীর্ত্তন-সঙ্গীতের অভাবনীয় উন্নতি। এই উন্নতির ফলে কীর্ত্তন-সঙ্গীতের অংশীভূত হইয়া গীতগোবিন্দের সমাদর যেমন বাড়িল—তদনুকরণে রচিত পদাবলীরও তেমনি মর্যাদা বাড়িল। শ্রীচৈতন্যোত্তর কীর্ত্তন-সঙ্গীতে গীতগোবিন্দের পদাবলী কেবল অভিনব সার্থকতা (Interpretation) নয়—অভিনব সুরতালও লাভ করিল।

প্রাকৃত ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন—বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। এইগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়। মনে হয় এইরূপ পদ দেশে অসংখ্য ছিল।

ক্রমে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি এবং ভাষার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে চর্যাপদগুলিও অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই গুলির মধ্যে কয়েকটিকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, বাংলায় নয়, নেপালে আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে অপ্রচলিত হইলেও সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে এইগুলি অপরিচিত ছিল না। এইগুলির গঠনগত সাম্য ছাড়া পদাবলীর সঙ্গে ইহাদের কোন মিল নাই। চর্যাপদগুলি সাধারণতঃ পজ্ঝটিকা ও চৌপইয়া ছন্দে এবং ভনিতান্ত হ্রস্বাকারে লিখিত। এইগুলিতে প্রধানতঃ দুই চরণের পর ধ্রুবপদও আছে। পদাবলীর অধিকাংশ পদও পজ্ঝটিকা ও চৌপইয়া ছন্দে, হ্রস্বাকারে ও ভণিতান্তরূপে রচিত। ধ্রুবপদও দুই বা চারি চরণের পর সংস্থিত। বৈষ্ণব পদের গঠনভঙ্গী বাংলাভাষাতেই প্রচলিত ছিল—কেবল এইকথাটাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। চর্যাপদের সঙ্গে পদাবলীর বিষয়গত কোন সাম্য নাই।

বৈষ্ণবপদকর্তারা সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাকৃত পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রের সহিতও যে তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল—তাহার প্রমাণ জগদানন্দ রচিত একটি গৌর-গীতিকায় পাওয়া যায়। ভাগবত ত তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থই ছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্র, রসমঞ্জরী, অমরুশতক, আর্যাসপ্তশতী, গাথাসপ্তশতী, শৃঙ্গারতিলক ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ হইতে তাঁহারা অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাগবতের অনেক অংশকে ইহারা চৈতন্যপ্রবর্তিত লীলা-তত্ত্বের অনুগত করিয়া লইয়া তদবলম্বনে পদ রচনা করিয়া-ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের ভাব, তৎকাল-প্রচলিত ধামালী সঙ্গীতের সহিত মিলাইয়া তদবলম্বনে তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন। মালাধর বসু পদকর্ত্তাদের আগেই ভাগবতের একটা মোটামুটি অনুবাদ করিয়া-ছিলেন। এই অনুবাদ রাগরাগিণী সংযুক্ত হইলেও পদের আকারে নয়। ইহা কৃত্তিবাসের মত পয়ার ছন্দে লিখিত। দীনচণ্ডীদাস ভাগবতের অনুসরণে এবং অনেকস্থানে ভাগবতের অনুবাদ করিয়া পদের আকারে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য (?) রচনা করেন। প্রাচীন সঙ্কলনপুস্তকে দীনচণ্ডীদাসের বহু পদ স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভ্রমরদূতসম্বন্ধীয় পদগুলি ভাগবতের শ্লোক অবলম্বনেই রচিত। জ্ঞানদাসই ইহার প্রধান কবি।

বঙ্গীয় পদকর্তাদের গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বিবিধ স্তরের এবং বিবিধ অঙ্গের পদ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য রূপ গোস্বামী ও কবিকর্ণপুর তাঁহাদের রস শাস্ত্রের গ্রন্থে লীলা-বিলাসের এমন বহু নবনব অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল। তবু বলিতে হয় পদকর্তারা বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর পদকর্তারা প্রায় সকলেই বিদ্যাপতির অনুকারক। বিদ্যাপতির প্রধানশিষ্য গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস নিজেই বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে।
হরিহরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।

সেযুগে মিথিলার সঙ্গে বাংলার বিদ্যাজ্ঞানের আদানপ্রদানের পথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতি কবিতা রচনার জন্য মৈথিলীর একটা অপভ্রষ্ট রূপ অবহঠ্ঠা নামে একটি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পদগুলি এই ভাষাতেই রচিত। এই অবহঠ্ঠাই বাংলায় বাংলাশব্দের প্রচুর মিশ্রণে ব্রজবুলির নাম রূপ ধারণ করে। ইহাই কোন কোন মনীষীর মত। অন্য মত আছে—কেহ কেহ বলেন—ইহার জন্ম কোথায় তাহা বলা যায় না। আসামের শঙ্করদেবের পদ, উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের পদ, নেপালের কোন কোন সঙ্গীত, প্রায় একই সময়ে ব্রজবুলিতে রচিত হয়। অতএব বঙ্গদেশে ইহার জন্ম না-ও হইতে পারে।

বাংলায় ব্রজবুলির প্রথম পদ যশোরাজখাঁর, তার পর উড়িষ্যার রামানন্দ রায়ের বিখ্যাত পদ "পহিল হি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল"। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাংলায় ব্রজবুলিতে পদরচনার পদ্ধতি বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোধানের অনেক পরে ব্রজবুলির পদরচনার ধুম পড়িয়া যায়। খেতুরীর উৎসবের সময়ে ব্রজবুলির পদ—লীলা-কীর্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজবুলিতে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই, ব্রজবুলি কখনো কথিত ভাষাও ছিল না, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই ভাষায় পদ রচনার সার্থকতা কি ?

১। প্রথম সার্থকতা মনে হয়—এই ভাষা লালিত্য-পূর্ণ, প্রেমগীতিরচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী—এবং এমন উদার, যে ইহার মধ্যে যে কোন ভাষার শব্দ সহজে সামঞ্জস্য লাভ করে।

২। দ্বিতীয়তঃ ব্রজবুলির সঙ্গে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ সুললিত ছন্দ পাইয়া গিয়াছেন। এই ছন্দগুলি দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিল্লোলিত। সেকালেই বাংলা ভাষায় দীর্ঘ স্বর তাহার গুরুত্ব ও দীর্ঘতা হারাইয়াছিল—বাংলায় যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—অন্যত্র দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে গেলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রজবুলিতে তাহা হইত না। ছন্দোহিল্লোল পাওয়ার সুযোগের জন্য কবিরা ব্রজবুলিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

৩। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্যাবর্তে বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্যের প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্যাবর্তের বহু ভক্ত বৈষ্ণব এই সাহিত্য উপভোগের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। সেজন্য কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় লইলেন যাহা আর্যাবর্তের সকল লোকেরই অল্প আয়াসেই বোধগম্য হইতে পারে।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরস সাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা প্রচলিত থাকে সম্ভবতঃ কবিদের ইহা অভিপ্রেত ছিল।—এই স্বাতন্ত্র্য-গৌরব বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজেরও উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

৫। পূর্বেই বলিয়াছি প্রেমলীলা বর্ণনার পক্ষে এই ভাষা সম্পূর্ণ উপযোগী। বিশেষতঃ এই ভাষায় বিদ্যাপতির প্রেমকবিতা রচনার অসাধারণ সাফল্য কবিগণের মনে এ

ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছিল। পরে এই ভাষায় অন্য রসের কবিতারচনার চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু সে কবিতা সমাদর লাভ করে নাই, তুলসীপত্র দিয়া যেন শক্তিপূজা বলিয়া মনে হইয়াছে। যাহাই হউক এই ব্রজবুলির জন্য পদকর্ত্তারা বিদ্যাপতির কাছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ঋণী।

চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তারা সব চেয়ে বেশি অনুপ্রাণনা পাইয়াছিলেন—রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, কবিকর্ণপূর, রায় রামানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্যগণের রচনা হইতে। ইঁহারা সংস্কৃতে কাব্য, নাট্য ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ। কেবল লীলাতত্ত্বের জন্য নয়, এই সকল রচনার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের জন্যও ইঁহাদের কাছে পদকর্ত্তারা বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবাচার্যগণের রচনাসমূহ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই, অথবা সকল গ্রন্থ তখনও রচিত হয় নাই। সেজন্য এইগুলির প্রভাব সমসাময়িক পদকর্তাদের রচনায় বিশেষরূপ দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসর পরে এইগুলি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হয়। তাহার ফলে ঐ সকল বৈষ্ণব-গুরুদের রচনার ভাবসম্পুট চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর পুষ্টি সাধন করিয়াছে। বহু পদ তাঁহাদের রচিত শ্লোকের মর্মানুবাদ অথবা বিস্তৃত ব্যাখ্যান মাত্র।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তৎপরবর্তী কালে অপরিচিত ছিল না। এই পুস্তকের দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড ইত্যাদির পদগুলি অমার্জিত ও রসাভাসদুষ্ট হইলেও পদকর্তাদের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী যোগাইয়াছিল। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-বিরহেই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় পদরচনার সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ আর পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের গোবিন্দ গোঁয়ারগোবিন্দ, পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধমাধব—রসিক চূড়ামণি। তবে রাধার সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাই যেন রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীর রাধারূপ ধরিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের Realistic রাধা, পদাবলীতে Idealised হইয়াছে। বিরহের অনলে রাধার বাস্তবতা যেন গলিয়া 'কালিনী নইজলে' মিশিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনখণ্ড হইতেই রাধার রূপান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহার্তা রাধার মুখের বচনগুলি, ব্রজবুলিতে না হউক খাঁটি বাংলা ভাষার পদগুলিতে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দূতী জরতী বড়ায়ি (বড়+আয়ী); কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাস্তব পটভূমিকায় বড়ায়ি অসমঞ্জস নয়। পদাবলীর সৌন্দর্যঘন রসলোকের পটভূমিকায় বড়ায়ি অচল হইয়াছে—তাহার স্থলে আসিয়াছে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা ইত্যাদি তরুণী সখীগণ।

বিদ্যাপতি কবি ছিলেন, সাধক ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান লেখেন নাই, তিনি অনেক বিষয়ে কাব্য ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গানও তিনি লিখিয়াছিলেন অনেক, সেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই, এমন কি বৃন্দাবনের পটভূমিকাও নাই। সেগুলিকেও আধুনিক সংগ্রাহকগণ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বাংলার পদকর্ত্তারা সকলেই সাধক কবি—তাঁহারা জানিতেন—দুর্লভ কবিশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাহাকেও নিবেদন, বা ব্রজলীলা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করা স্বধর্ম-চ্যুতি। তাই তাঁহাদের কানু বিনা গীত নাই।

গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম।

ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দুর্লভ কবিশক্তিকে বিষয়ান্তরে বিনিয়োগ করেন নাই। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের কাব্যের বিষয়বৈচিত্র্যের দিক হইতে হয়ত ক্ষতি হইয়াছে—কিন্তু পদাবলীসাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে।

গোবিন্দদাস ছিলেন একজন মহাকবি। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, তাই তিনি হরগৌরীর স্তবও লিখিয়াছিলেন, তিনি যদি বৈষ্ণব না হইতেন তাহা হইলে হয়ত নানা বিষয়ের কবিতাই আমরা তাঁহার লেখনী

হইতে পাইতে পারিতাম। কিন্তু তিনি পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হওয়ার পর আর বিষয়ান্তরে কবিতা রচনা করেন নাই।

পদাবলী মন দিয়া পড়িলে মনে হয়, অনেকেই গোবিন্দদাসের মত স্বভাবকবি ছিলেন না। বৈষ্ণব সাধনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত হইয়া, বৈষ্ণব রসতত্ত্বে দীক্ষা লাভ করিয়া এবং কীর্তন-সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য দুইচারিটি পদ রচনা করিয়াছেন। সে পদগুলির ভাব ও ভাষায় চমৎকারিতা নাই, কলাকৌশলও নাই, শ্রেষ্ঠ কবিদের ভাব ও ভাষারই রূপান্তর মাত্র তাঁহাদের রচনা,—কেবল ধারার অনুবর্তন মাত্র। তবু তাঁহারা আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে ছন্দের অঞ্জলি দান করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ কবিতাসংকলনে সেগুলির স্থান না হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির বেদীতে সেগুলিরও স্থান আছে। তাঁহাদের রচিত সকল পদ হয়ত পাওয়াও যায় নাই। কবির কথায় মাটির প্রদীপের মত উৎসবান্তে হয়ত সেগুলি বিসর্জিত হইয়াছে—যে কয়টি তৈজস প্রদীপের মর্যাদা লাভ করিয়াছে,—সেইগুলিই সংগৃহীত হইয়া আছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীতে প্রেমদাস বলিয়াছেন—"কীর্তন সঙ্গীতে মুগ্ধ রাজা প্রতাপরুদ্রকে গোপীনাথ আচার্য বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবই কীর্তনের স্রষ্টা।" একথা সকলে স্বীকার করেন না, বিশেষজ্ঞেরা বলেন—'কীর্তন-সঙ্গীত লক্ষ্মণ সেনের সময়েও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কীর্তনের স্রষ্টা না হন, তিনি যে ইহার মহিমা-প্রচার করেন এবং ইহাকে নবভাব-কলেবর দান করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে কীর্তনসঙ্গীতের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন —"প্রভুর তিরোভাবের ৫০ বৎসরের মধ্যে নরোত্তমদাস ঠাকুর গরাণহাটি কীর্তনের সৃষ্টি করিলেন। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস মনোহরসাহী কীর্তনের প্রবর্তন করিলেন।" গোবিন্দদাস ও তাঁহার আত্মীয় বলরামদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাসই চৈতন্যোত্তর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠপদকর্তা। ইঁহাদের সময়ই অর্থাৎ খেতুরীর মহোৎসবের সময়ই পদাবলী-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ইহা হইতে অনুমিত হয়—কীর্তন-সঙ্গীতের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সঙ্গেই পদাবলী-সাহিত্যের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষের গভীর সংযোগ আছে। সঙ্গীতের চাহিদায় ও প্রেরণায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। ব্রজলীলার সকল অঙ্গেরই অজস্র পদাবলী এই যুগে সৃষ্ট হইয়া কীর্তনসঙ্গীতকে পুষ্ট করিয়াছিল।

পদাবলী ও কীর্তনসঙ্গীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে অনুস্যূত। দুইএরই যুগপৎ শ্রীবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের ফলে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময়ে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"শাক্তধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে, শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিল। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের

প্রবলতা সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কার শাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়? ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনি গান ধরিল।

প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত রাগরাগিণী সংগীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সংগীত-প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সংগীতের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনসঙ্গীতকেই বাঙ্গালীজাতির আত্ম-প্রকাশের আবেগময় পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন:—

"এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ আছে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।"

(যাত্রীসাথীর পত্র)

একরসের পদাবলী লইয়া কীর্তনের এক একটি পালা রচিত হইয়াছিল। ব্রজলীলাকে বৈষ্ণবাচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে ভাগ করিয়াছিলেন। এই প্রকরণ-বিভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনা করিতেন। এক একজন কবি এক এক প্রকরণে বিশেষভাবে কৃতী ছিলেন। কেহ কেহ নানা প্রকরণের উপযুক্ত পদ রচনা করিয়াছেন, যেমন গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস। প্রেমলীলার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের দিক হইতে এই প্রকরণ-বিভাগে কিছুই বাদ পড়ে নাই। তাই বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রেমলীলাবিলাসের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণ কেবল ব্রজলীলা নয়, গৌরলীলারও পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলিকে প্রধানতঃ গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। গৌরচন্দ্রিকার পদ দুই শ্রেণীর। একশ্রেণীর পদে গৌরাঙ্গদেবের রূপগুণ ও মাহাত্ম্যের কীর্তন। এই পদগুলিতে গৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণের যুগনদ্ধ অবতার, পূর্বে যে দেহভেদ ছিল, যে দ্বৈতভাব ছিল—তাহা তাঁহার মধ্যে যে অদ্বয়ত্ব লাভ করিয়াছে—অদ্বৈতের আহ্বানে অদ্বৈত ব্রহ্মই যে গৌরাঙ্গরূপে কলি-কল্মষ মোচন করিতে—পতিতোদ্ধার করিতে অবতীর্ণ, 'শ্যাম ভেল গৌর আকার' এই সকল কথা আছে। গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রাধামোহনদাস, গোবিন্দঘোষ, কৃষ্ণদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি, নরোত্তমদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিগণ এই শ্রেণীর গৌর-চন্দ্রিকা রচনা করিয়াছেন।

আর একশ্রেণীর গৌরচন্দ্রিকায় রাধাভাবে বিভাবিত লীলাবৈচিত্র্যকে রূপদান করা হইয়াছে। রাধার ভাবজীবনে যে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ ইত্যাদি লীলাবিলাসের কথা কবিরা বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকটি গৌরাঙ্গের প্রেমজীবনেও দেখানো হইয়াছে। কৃষ্ণরাধার যে লীলাটি লইয়া রসকীর্তনের পালা অনুগীত হইত, তাহারই উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ হিসাবে উপগীত হইত।—আজিও সেই প্রথাই প্রচলিত আছে। বিবিধ পদসংগ্রহের পুস্তকেও যে লীলাবিলাসের পদাবলী একত্র গুম্ফিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভে তদুপযোগী গৌরচন্দ্রিকা সংযোজিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গৌর-চন্দ্রিকা যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, নয়নানন্দ, পরমানন্দ, নরহরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাসের নামে কোন গৌরচন্দ্রিকা নাই—ইহা হইতে চণ্ডীদাসের গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তিতা সূচিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর গৌরচন্দ্রিকা-পদাবলীর রসের স্থায়ী ভাব দেবাদিরতি বা ভাব। এই ভাবই পাকাৎ পাকান্তরে ইক্ষুরস হইতে সিতোপলের ন্যায় ঘনীভূত মধুর রসে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীরাধিকার মহাভাবে পরিণত। এই সত্যটি মধুর রসের কীর্তন গানের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা সংযোজনের সার্থকতা সম্পাদন করে।

সর্পশিশু

আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম ইতিহাসটা অজ্ঞাত।

সদ্যোজাত একটা শিশু ডোবার ধারে না বাঁশবাগানের কানাচে পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে পৃথিবীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছিল; হয়তো—এক সময় নিস্তব্ধ হইয়া যাইত সেই নিষ্ফল প্রতিবাদের ক্ষীণস্বর, গ্রামের বিরিঞ্চি পাগলা তাকে কুড়াইয়া আনিয়া একেবারে বামুনবাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গারদে দিবার মত উন্মাদ পাগল নয় বিরিঞ্চি, আগে মজুরী খাটিয়া খাইত, যা' কিছু গোলমাল ছিল কেবল পয়সার হিসাব লইয়া। জগতের লোক যে শুধু ঠকাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া আছে এই রহস্যটা যেন বড় বেশী ফাঁস হইয়া গিয়াছিল বিরিঞ্চির কাছে। তাই একবাড়ীর মজুরির পয়সা লইয়া গ্রামসুদ্ধ সকলের কাছে হিসাব বুঝিতে যাইত।

এখন আর সে বালাই নাই। পাঁচবাড়ী চাহিয়া চিন্তিয়া—পেটের ব্যবস্থাটা বজায় রাখে, আর একমুখ দাড়ি গোঁফ লইয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করা একটা পুরণো চটের থলি হাতে সারাটা দিন ছেঁড়া ন্যাকড়া, পচা কাগজ, ভাঙ্গা কাঁচ, আর টিনের টুকরা কুড়াইয়া বেড়ায়। পৃথিবীর কোনো জিনিষ নাকি অপচয় হইতে দিতে রাজী নয় সে।

আঁস্তাকুড় মানেনা, ময়লার বিচার করেনা, অব্যাহত গতিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তা' নয় তো ভদ্রলোকে বা সুস্থ কোনো লোকে কোন্ কাজে সারাগ্রামের 'ওঁচলা' জঞ্জালফেলা এই অখন্তে জায়গাটায় উঁকি দিতে আসিত?

মেয়েটাকে যে ফেলিয়া গিয়াছিল—সে বোধকরি মনুষ্যত্বের শেষ অবশিষ্টটুকুর প্রমাণ দিতে নিতান্ত নিরাবরণ ভাবে না ফেলিয়া দিয়া অনেকগুলি কাপড়ে চোপ্‌ড়ে মুড়িয়া যত্নের ভান করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ার লোভে আকৃষ্ট বিরিঞ্চি ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাজ্জব বনিয়া গেল।

পরবর্তী কর্তব্য স্থির করিতে অবশ্য এক সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই বিরিঞ্চির, লাগিবেই বা কেন? আস্ত একটা এতবড় বস্তুকে তো অপচয় হইতে দিতে পারে না সে? পাগল বলিয়াই হয়তো আদর্শচ্যুত হয় না, অথবা আদর্শচ্যুত হইতে পারেনা বলিয়াই পাগল।

কিন্তু বামুনগিন্নী তো পাগল নয়?

বিরিঞ্চির মুখে ভাতের বদলে দুধের আবদার শুনিয়া 'মার মার' করিয়া উঠিলেন—দুগ্‌গা দুগ্‌গা সকাল বেলা একি পাপ! বেরো হতচ্ছাড়া আমার বাড়ী থেকে। কোন্ চুলো থেকে পেলি ওকে? কি আপদ!

বিরিঞ্চি মুখের ভাব যথাসাধ্য করুণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে—ডোবার ধারে পড়ে কাঁদতেছিল বড়োমা। তা—একটুকুন দুধ তো ওরে দিতে হয়, কেষ্টর জীবটা অনাহারে হত্যে হ'তে পারেনা তো?

—মরে যাইরে—ওই কেষ্টর জীবটাকে দুধ খাইয়ে জীইয়ে তুলে কোন সগ্‌গে বাতি দেবে রে আমার? বলি গাঁয়ে কি আর বাড়ী খুঁজে পেলিনে মুখপোড়া, তাই আমার হাড় জ্বালাতে এলি?

—তোমার ঘরে যে দুধের সাঁতার পাথার বড়োমা, গোয়াল ভর্তি গরু। কেঁড়ে ধোয়া জল এক ছিটে দিলেও ছুঁড়ির জীবনটা রক্ষে হয়।

বামুনগিন্নী ঈষৎ নরম হইয়া বলেন—তা' যেন রক্ষে হ'ল, কিন্তু রক্ষে হয়ে কি হবে শুনি? কার উপকারে লাগবে?

বিরিঞ্চি দার্শনিক উদারতায় গম্ভীরভাবে বলে—উপগারের কথা ছেড়ে দাও বাপু, বিরিঞ্চি পাগলা কার উপগারে লাগছে? মুখের গোড়ায় ভাত পাথরটা দিচ্ছ তো ধরে নিত্যি, না কি দিচ্ছনা? ন্যাও এখন তক্কাতক্কি রেখে একখুরি দুধ বের করো দিকিন।

বামুনগিন্নী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—দুধ যেন দিলাম, খাওয়াতে পারবি?

বিরিঞ্চি একগাল হাসিয়া বলে—মদ্দমানুষ তাই কি পারে? তোমার তো এখনো 'ছ্যান' হয়নি—ঘাটে যাবার আগে—

বামুনগিন্নী ক্ষণপূর্বের কৌতুক বিস্মৃত হইয়া এবার যথার্থই প্রবল রোষে চীৎকার করিয়া ওঠেন—বেরো লক্ষ্মীছাড়া, বেরো আমার উঠোন থেকে। ওই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসবো আমি?

কিন্তু গালাগালি দিয়া ভূত ভাগানো বরং সম্ভব কিন্তু পাগল ভাগানো সহজ নয়। বিরিঞ্চি ন্যাকড়া-কানি-সমেত সেই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালটাকে প্রায় বামুনগিন্নীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বেশ একটু বাহাদুরীর হাসি হাসিয়া বলে—বেশ, এই রইল হেথায় পড়ে, ন্যাও এখন কি করবে করো। বিচেরে হয় এক ফোঁটা দুধ দিয়ে বাঁচাবে—না হয় গলাটা টিপে শেষ করে দেবে। ব্যস এই সোজা কথা।

বামুনগিন্নী বিপদ গণিয়া ডাক দেন—বৌমা, বৌমা, এই দেখ এসে তোমার আদরের খোকার কাণ্ড। নিত্যি ভাত দিয়ে দিয়ে আস্কারা বাড়িয়ে দিয়েছ, এখন পাগলের উপদ্রব পোহাও!

কথাটা মিথ্যা নয়, বৌমার প্রশ্রয়েই মাসের মধ্যে দশদিনের ভাত বিরিঞ্চির এই একটা বাড়ীতেই জোটে। বামুনগিন্নী রাগঝাল করেন বটে, তবে অতবড় বৌয়ের ইচ্ছাটাকে একেবারে ফেল্না করিতেও পারেন না।... কিন্তু ফেলাছড়ার সংসারে দুটি ভাত দেওয়া এক, আর এহেন অভিনব উপদ্রব সহ্য করা আলাদা।

ডাক শুনিয়া বৌমা আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অবাক হইল না—দোতলার জানালা হইতে দেখিতেছিল সবই, শুধু শাশুড়ীর ভয়ে এতক্ষণ নীচে নামে নাই।

নীচে নামিয়া আসিয়া ভালোমানুষের মতো অবাক ভঙ্গীতে বলে—এ আবার কি?

—ওই দেখ গেরো! নাও এখন এই পাগলকে সামলাও। এ কি পাপ বাড়ীর ভেতর এনে ঢোকানো!

—বড়োমার এক কথা! বলে 'শিশু নারায়ণ', ওইটুকু অবোধ শিশুর আবার পাপপুণ্যি কি?...তোমার শাশুড়ীর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ছোট মা, যাক গে—ঝট্ করে দুধ এক ফোঁটা খাইয়ে দাও দিকিন ওটাকে। বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল বাবা! বেরালে কুকুরে কত সামিগ্রী খাচ্ছে আর এতো মনিষ্যির সন্তান।

নীহার একবার শঙ্কিতভাবে শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া বিরক্তির ভাণে বলে—পাগল বলে কি তুই একেবারে পাগল বিরিঞ্চি? আমি কখনো ওকে ছুঁতে পারি? স্নান করে নারায়ণের ভোগ রাঁধতে যাচ্ছি যে—তুই বরং পলতে করে খাইয়ে দে।

বিরিঞ্চি ঈষৎ শান্তসুরে বলে—তবে তাই আনো তোমার পলতে-মলতে, আর কলকৌশলটাও অমনি শিখিয়ে দিয়ে যাও। নারায়ণ তো তোমার গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছেনা—ভোগের ভাত বরং দু'দণ্ড পরে রাঁধলে চলবে।

গোড়ার ইতিহাসটা এই।

অতঃপর কেমন করিয়া যে সেই 'মনিষ্যির সন্তানটা' মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল সেই এক রহস্য! বোধকরি—পথের কুকুর বিড়ালগুলা যেমন বাঁচিয়া থাকে, যথানিয়মে বাড়িয়াও ওঠে—তেমনি ভাবে বাড়িতে লাগিল 'ফেলি'।

তা' 'ফেলি' ছাড়া আর কি ভালো নাম জুটিবে তার— জন্মদাত্রী মা যাহাকে জন্মমাত্র ফেলিয়া গিয়াছে ?.. বামুন-গিন্নীই এই উপযুক্ত নামটা দিয়াছেন তাকে।

নীহার নাকি কবে যেন বলিয়াছিল—'করুণা' বলিয়া ডাকিলে হয় মেয়েটাকে, পৃথিবীর করুণা কুড়াইয়াই তো টিঁকিয়া থাকিতে হইবে বেচারাকে—হাসির খোরাক হিসাবে এখনো মাঝে মাঝে ওঠে কথাটা ফেলির বিষয়ে বিরক্তিকর কোনো কথা উঠিলেই বামুনগিন্নী ব্যঙ্গহাস্যে বলেন—বেশী বলবোনা বাবা, উটী আবার বৌমার পুষ্যি কন্যে কিনা। কি যেন নাম রেখেছিলে বৌমা—ললিতলবঙ্গলতা নাকি ?....

প্রতিবেশিনীরা এমন হাসিয়া ওঠেন যে, নীহার মুখ লুকাইবার পথ পায় না।

বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিরিঞ্চি ছিল হয়ত নিতান্ত মেয়েটার পরমায়ুর জোর ছিল বলিয়াই পাগলার এতো ঝোঁক চাপিয়াছিল তার উপর। অনভ্যস্ত হাতে পলিতা ধরিয়া আর শামুকের খোলার ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো হইতে সুরু করিয়া নিজের পাতের মাখাভাতের ভাগ দিয়া দিয়া পাঁচবছরেরটী করিয়া তুলিয়াছিল বিরিঞ্চি, কিন্তু আর টিঁকিল না।

গ্রামের মধ্যে নিজের জায়গায় ফেলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া বিরিঞ্চি একদিন চৈত্রের ঝড়ে গাছ চাপা পড়িয়া মারা গেল।

বিরিঞ্চির মতই ফেলিও হইল বারোয়ারী।

বিরিঞ্চির মত সারাদিন যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় আর হঠাৎ পেটের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিলে যে কোনো একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া উঠানের ধারে বসিয়া কাঁদিতে থাকে।

ফেলির কান্নার কারণটা কাহারও অজানা নয়, তবু বিনাবাক্যব্যয়ে দু'মুঠা ভাত ফেলিয়া দিবার উদারতা বড় কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না—আ মরণ, এ ছুঁড়ি আবার মরতে এখানে এলো কেন ? এই লক্ষীছাড়ি, শুধু শুধু কেঁদে মরছিস যে ? ইত্যাদি সভ্য প্রশ্নের উত্তরে ফেলি যখন কান্নার মাত্রা আরো বাড়াইয়া বলে— খিদে পেয়েছে—পেটের মধ্যে ব্যথা করতেছে—' তখন নিতান্ত অবহেলায় পাতকুড়ানো এঁটোকাঁটা দুই মুঠা ভাত দিয়া দয়াবতীরা দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

একমাত্র নীহারের কাছেই এর কিছুটা ব্যতিক্রম হয় বটে—কিন্তু সেটা বামুনগিন্নীর অনুপস্থিতির মাহেন্দ্রযোগ না ঘটিলে নয়।

ভাত খাইয়া পাতা ফেলিতে হয়, গোবর ঘসিয়া ঘসিয়া এঁটো পাড়িতে হয়, বিরিঞ্চি মরিয়া এইসব অসুবিধাগুলা বাড়িয়াছে ফেলির।

বিরিঞ্চির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে।

অবশ্য তার অনেকটাই স্বার্থপ্রসূত। চড়া রোদ উঠিলে যে বিরিঞ্চি মাটিতে পা ফেলিতে দিত না ফেলিকে, কাঁধে করিয়া ঘুরিত, ঝড়বৃষ্টির সময় আশ্রয় খুঁজিয়া আগলাইয়া রাখিত, ক্ষুধার সময় ভাতের আবেদনের ভারটা লইত, এসব একটু আধটু আজকাল বুঝিতে পারে সে। কষ্ট হইলেই তাই বিরিঞ্চিকে মনে পড়ে তার।

তবে তার বেশী নয়।

ভালোবাসা উদ্রেক করিবার মতো মানুষ বিরিঞ্চি নয়।

হ্যাঁ ভালোবাসিতে হয় তো বামুনকর্তার ছেলে ছোট বাবুকে। যেমন টকটকে সুন্দর রং, তেমনি পোষাকের পারিপাট্য, যেন গল্পের রাজামশাই। নীহারের মেয়ে লীলার উপর অদ্ভুত একটা ঈর্ষা হয়, লীলার মতো যদি 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইত ছোটবাবুকে, তবে বোধ করি ধন্য হইয়া যাইত ফেলি।

কিন্তু ডাকা সহজ নয়।

একদিন ইচ্ছাকৃত অসাবধানে ডাকিয়া ফেলার অপরাধে বামুনগিন্নী শুধু গর্দ্দান লইতে বাকী রাখিয়াছিলেন তার। একেই তো নীহারের প্রশ্রয়ে পাড়ার সকলের চাইতে তার

বাড়ীতেই ফেলির দাবীদাওয়াটা জোরালো—তার উপর আবার এমন আদিখ্যেতার ডাক ভাবিলে বলিবে কি লোকে?

তা বামুনগিন্নীরই বা অন্যায়টা কোথায়?

ফেলিরও তো স্পর্দ্ধা কম নয়।

ভিক্ষার ভাত খাইয়াও গায়ে 'গত্তি'টী তো মন্দ লাগে নাই, সাত বছর বয়সেই বছর দশেকের মতো দেখিতে লাগে, অনায়াসেই এখন লোকের গোয়ালটা পরিষ্কার করা বা বাসন দু'খানা মাজিয়া আনার কাজ করিয়া দিতে পারে ফেলি। কাঁহাতক আর ব্যাগারের ভাত খরচ করিবে লোকে? তা' নয়—লীলার মতো বই শ্লেট লইয়া ইস্কুলে যাইবেন তিনি!

শোনো আব্দার! দেখো স্পর্দ্ধা!

কথাটা শুনিয়া আসিলেন বামুনগিন্নী, পাড়ায়।

লীলা নাকি স্কুলে বলিয়াছে—ফেলিও পড়িতে আসিবে। পাড়ার ভদ্রমহিলারা তাই একজোট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমন অনাচার ঘটিলে নিজেদের মেয়ে তাঁহারা ছাড়াইয়া লইবেন। মুখ্যু থাকে সেও ভালো; তাই বলিয়া ফেলির সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিয়া পড়া? গলায় দিতে দড়ি জুটিবেনা তাদের?

বামুনগিন্নী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে বাড়ী ফিরিয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করেন—বোমা, অ বৌমা! বলি তুমি বা কি ঠাউরেছ বাছা?

নীহার শঙ্কিতভাবে চাহিয়া থাকে।

—হাঁ করে চেয়ে আছো যে? বলি ফেলি হারামজাদীকে ইস্কুলে পড়তে দেবার কথা কে তুলেছে?

নীহার মৃদুস্বরে বলে—তোলাতুলি আর কি—মেয়েটাই ঘ্যানঘ্যান করছিল "দিদিমণির সঙ্গে ইস্কুলে যাবো যাবো" ব'লে—তাই বলেছিলাম, আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে যদি ফ্রী করে দেওয়া যায়।

—তবে আর তোলার বাকীটাই বা কি রেখেছ? আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি তোমায় বৌমা, অতি কিছু ভালো নয়, ওকে অত আস্কারা দিও না।

নীহার ঈষৎ অনুনয়ের স্বরে বলে—একটু লেখাপড়া শিখলে তো কোনো ক্ষতি নেই মা, ছেলেমানুষ—অত সাধ হয়েছে—

—হাড়জ্বালানে কথাগুলো বোলো না বৌমা, 'সাধ হয়েছে'—আবো বতো শুনবো! বলি পাড়ার আর সব ভদ্দরলোকের মেয়েরা ইস্কুল ছাড়ুক এই তবে তুমি চাও?

কথাটা এই যে—স্কুলের সেক্রেটারী বামুনগিন্নীর নিজের ছেলে হইলেও নীহারেরও বর, কাজেই নীহার আবদার ধরিলে কি হয় বলা যায় না।

নীহার সাশ্চর্য্যে বলে—তারা ইস্কুল ছাড়বে কেন মা? ও যদি পড়েই—মাটিতে একপাশে বসে থাকবে বৈ তো নয়? ফটিক বাগ্দীর মেয়েটাও তো সেবার—

—তুমি থামো বাছা, হাড়িই হোক বাগ্দীই হোক তবু সে মা-বাপের ছেলে তো বটে। তার সঙ্গে ওই আঁস্তাকুড়ের তুলনা?... খবরদার বলে রাখছি ও সব অনাচার চলবে না। তবু গোয়ালটা-গোবরটা করতে শিখছিল—তা' নয়,—ইস্কুল যাবেন! ইস্কুলের ভাতটা বোধহয় তুমিই রাঁধবে?

একটুখানি বিষ হাসি হাসিয়া বামুনগিন্নী তখনকার মতো কথাটার ইতি করেন।

বলা বাহুল্য স্কুল সেক্রেটারীর গৃহিণীত্বের মর্য্যাদা সত্বেও আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে স্কুলের উঠানেও ঠাঁই দেওয়াইতে পারিল না নীহার। গোয়াল পরিষ্কার ও ঘুঁটে দেওয়ার কাজটাই কায়েম হইল ফেলির, নিয়মিত ভাতের বদলে।

ফেলিও তা'তে খুব অখুসি নয়—পাঁচবাড়ী চাহিয়া খাইতে তারও আর ভালো লাগে না। শুধু এক আবদার যদি লীলার মতো বই খাতা লইয়া বসিতে পাইত।

স্কুলের আশায় হতাশ ফেলি যখন-তখন তাই নীহারকেই খোসামোদ করে—হেই ছোট মা, পায়ে ধরি তোমার, একখান পেরথম ভাগই নয় দাও আমায়, দিদিমণির পড়া শুনে শুনে শিখবো।

নীহার হাসিয়া বলে—পড়া শিখেই বা তোর কি হবে রে?

ফেলি ম্লানমুখে বলে—কি আবার হবে? সকল মেয়ে শেখে কেন তবে? এ্যাঁ? ফেলি যেন মানুষ নয়।

কিন্তু ফেলি আবার মানুষ হইল কখন? বিরিঞ্চি পাগল ছিল, তাই 'মনিষ্যির সন্তান' বলিয়া গণ্য করিয়াছিল ফেলিকে। সুস্থ মানুষে তো তা' পারে না। 'ফেলি' ফেলিই, তার বেশি কিছু নয়।

আচ্ছা ফেলিরই বা নিজের অবস্থায় সন্তোষ নাই কেন?

বামুনবাড়ীর মেয়েদের মতো সভ্যভব্য হইবার দুরন্ত সখ কেন তাহার? লেখাপড়া শিখিতে পাইল না বলিয়া গোয়ালঘরে বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিবে এই বা কি কথা?

নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিবার ইচ্ছা কেন?

ভদ্রজীবনের উপর অমন লুব্ধদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে কেন?

বালিকা লীলাও টের পায় যেন, পাকা পাকা সুরে বলে—দেখছো ঠাকুমা দেখছো, রাক্সী কি রকম হাঁ করে চেয়ে আছে আমার দিকে—যেন গিলে ফেলবে।...খবরদার ফেলি, আমার পড়ার সামনে এসে বসবি না। আমি কষ্ট করে পড়বো আর উনি মুখস্থ করে নেবেন, আবদার! .. ফেলি ঘরে ঢুকছিস যে বড়ো? বলে দেব ঠাকুমাকে?

ফেলির সীমানা উঠানের উপরে নয়। ফেলি আবার ঘরে ঢুকিবে কি?

ধীরে ধীরে ঝি-গিরিতে প্রমোশন পাইতে থাকে ফেলি।

বারো বছর বয়স না হইতেই সারা সংসারের বাসনমাজা, কাপড়কাচা, উঠান ঝাঁটানো, আর গরুর কাজের ভার লইতে হইয়াছে তাহাকে। বামুনগিন্নী আর একটু বুড়ো হইয়াছেন, তাই আরো বেশী খিটখিটে হইয়াছেন, চক্ষুশূল মেয়েটা যতো খাটে, তাঁর গাত্রদাহটা ততো প্রবল হয়। গালাগালের মাত্রাটা বাড়ে।

ময়লা ছেঁড়া আট হাত একখানা ধুতি পরণে, এক মাথা রুক্ষ চুল, হাঁটু অবধি ধুলা, ভাঙা ঝুড়ি কাঁখে করিয়া ফেলি যখন গোবর কুড়াইয়া বেড়ায়, কে বলিবে ফেলি স্বপ্ন দেখিতেছে সভ্য সুন্দর ভদ্র জীবনের। ঝি গিরিটা তার কাছে যেন অবাস্তব, যেন সাময়িক ছদ্মবেশ মাত্র, এই শ্রীহীন জীবনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনো যোগ নাই ফেলির।

'ফেলি' নামটা কী কুৎসিত। অনেকদিন একথা ভাবিয়াছে সে—দয়া করিয়া যাহারা পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিবার রসদ জোগাইয়াছিল, তুচ্ছ একটা নামের বেলায় এতো কার্পণ্য কেন তাদের? ফেলি না বলিয়া 'স্বর্ণি' বলিতেই বা লোকসানটা কি ছিল? পয়সা খরচ তো নাই?

লেখাপড়ার কথা আর তোলে না ফেলি, নূতন এক অনাসৃষ্টি বায়না ধরিয়াছে আবার। পাগলের হাতে মানুষ হইয়াছিল বলিয়াই কি ফেলি এমন বাস্তববুদ্ধিহীন?

আলাদা একখানা ঘর চাই তার। নিজের বলিতে একখানা ঘর।

নীহার অবাক হইয়া বলে—ঘর তুই কি করবি ফেলি? এমন কথাও তো শুনিনি!

ফেলি মুখভার করিয়া বলে—তা' শুনবে কেন—নিজেদের পঞ্চাশখানা নেই যেন? আমি বুঝি চিরকাল ঢেঁকিঘরে পড়ে থাকবো?

—পড়ে আর তুই থাকিস কখন রে?...নীহার সকৌতুকে বলে—সুধু রাতটুকুন শোয়া বইতো নয়। চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে মরছিস, ঘর নিয়ে করবি কি?

—আমি ঠাকুর পিতিষ্ঠে করবো।

মরিয়া হইয়া অনেকদিনের গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া ফেলে ফেলি।

ঠাকুর প্রতিষ্ঠা? সে আবার কি?

—দেখোনা তখন—সোৎসাহে উত্তর করে ফেলি—তোমার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ওই গোপাল ঠাকুরের পটটুকুনি শুধু দাও আমায়, আর একটুকু জায়গা—দেখ কেমন সাজাই। রাত্তির চারটের সময় উঠবো, বুঝলে ছোট মা, ফুল আনবো—'পেতে' ভর্তি করে এই এ্যাতো ফুল এনে গোপাল ঠাকুরকে সাজাবো। মালাও গাঁথতে পারি আমি, তোমরা তো গাঁথতে দাও না আমার মালা, নইলে এইসান বড় বড় মালা গেঁথে দিতাম তোমার লক্ষ্মী-নারাণকে। দাওনা ছোট মা পটখানা, তুমি ফুল-লতা দে পুজো করো, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

তুচ্ছ একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবি, খুলিয়া লইলে ঘরের শোভার এমন কিছু হস্তারক হইবার কথা নয়; দু' চারদিন চোখেও পড়ে নাই কারুর, হঠাৎ ধরা পড়িল লীলার কাছে।

এবং সেই তুচ্ছ ছবিখানা উপলক্ষ্য করিয়া বাড়ীতে যা গোলমাল সুরু হইল, স্বয়ং গোপালঠাকুর উপস্থিত থাকিলে বোধকরি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন।

ছোটবাবু পর্যন্ত হাল ধরিয়াছেন এবার—স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলেন—তুমিই মাথা খেলে মেয়েটার, উচ্ছন্ন গেছে একেবারে। যা খুশী তাই বায়না! চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে হবে? ঠাকুরের ছবিখানা কি বলে দিলে ওকে?

—ভারী তো একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবি, এমন করছো তোমরা—নীহার শ্রান্তস্বরে বললে।

—'ভারী-তো হালকা-তো'র কথা হচ্ছেনা, দেবে কেন? ওরই বা চাইতে সাহস হয় কেন? এতো প্রশ্রয় কিসের? বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এই ঢের, আবার—

—ঠাঁই দেবার দাম তো উশুল করে নিচ্ছ - বলিয়া নীহার উঠিয়া যায়।

ছোটবাবুও কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া যান; কিন্তু কর্তাবাবু তো আছেন? আছে লীলা।

—কি বললি? ফেলি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করছে?

বুড়ো কর্তা সোজা হইয়া দাঁড়ান।—চল দিকিন দেখি তার আস্পর্দ্ধা! বামুনগিন্নী নাতনীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন—আসপর্দ্ধা আর হবে না কেন? আসকারা পায়! ফেলি চাইলে তোমার বৌ শালগ্রামটুকুও দিতে পারে। যতই হোক পটতো? কথায় বলে ঘট আর পট, ভগবানের আবির্ভাবের ঠাঁই, সেই পট তোমার বৌমা ওকে দিলেন খেলা করতে? ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয়ও কি নেই ছাই?

নীহারের না থাক, তার অভিভাবকবর্গের আছে বই কি।

চুপড়িসুদ্ধ ফুল নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া ছবি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলার মতো পবিত্র ধর্ম্মজ্ঞান যদি মুখুয্যে মশাইয়ের না থাকিবে—বৃথাই তবে জীবনভোর 'লক্ষ্মী-নারায়ণের' সেবা করিয়া আসিলেন তিনি।

গোপালঠাকুরের ছবির টুকরাগুলি সারা উঠানে উড়িয়া বেড়ায়—আর ধবধবে ফুলগুলা নর্দ্দমার ঘোলা জলে কুৎসিত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে।

ফেলি কাঁদে না—কেমন বোকার মতো চাহিয়া থাকে। কাঠ ঘুঁটের ঘরটা পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের সিংহাসন পাতিতে যে প্রাণপাত পরিশ্রম হইয়াছে তার, সে কথা মনে করিয়াও কাঁদে না।

কাঁদিবেই বা কখন? সারা সংসারের কাজ পড়িয়া আছে, ত্রুটি পাইলে কি রক্ষা রাখিবেন বামুনগিন্নী?.... কাঁদেও না, হাসেও না, গম্ভীরভাবে শুধু কাজ করিয়া চলে।....

নীহার মাঝে মাঝে আবেদন করে—আর একটা লোক নইলে আর চলে না বাপু, বাতাসীর মাকে অন্ততঃ গরুর কাজটার জন্যেও রাখলে হ'ত, যতই হোক ওটা ছেলেমানুষ।

শাশুড়ী বিজ্ঞ আর বহুদর্শী লোক, তাই বিজ্ঞ পরামর্শই দেন—"ছেলেমানুষ" নামে আর অরুচি ধরিও না বৌমা, 'সোমত্ত মাগী'। বোঝোনা তুমি, এ বয়সে হাত পায়ের ছুটি হলেই কুচিন্তা আসবে মনে।

কুচিন্তা আসিবার ভয়ে হাত পায়ের আর বিশ্রাম দিতে দেন না পরহিতব্রতী বামনগিন্নী। পরহিতব্রতী বৈ কি, নয় তো তাঁর নিজের নাতনী লীলা চব্বিশঘন্টা হাত পা কোলে করিয়া নাটক নভেল পড়িতেছে—তাকাইয়া দেখিবার ফুরসুৎ হয় না তাঁর, অথচ ফেলির জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিধাতার বিচারটাও যে ন্যায্য নয়, তা' নয়তো এতো যত্ন করিয়াও বিয়ের যুগ্যি মেয়ে লীলার হাড়ের উপর মাস গজায় না, আর সারা সংসারের খাটুনি খাটিয়াও দুইবেলা দু' কাঁসির ভাতের জোরে ফেলি দিন দিন সত্যই সোমত্ত মাগী হইয়া উঠিতেছে।

দেখিলে গা জ্বলিয়া যায় কি আর সাধে?

গায়ে মাস না গজাক, 'পুয়ে পাওয়া' হোক, বয়সের মেয়ের বিয়েটা তো দেওয়া চাই। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ এই একটা উপলক্ষ্যে আশা মিটাইয়া উৎসব করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছেন মুখুয্যে দম্পতি।

লীলার বিয়ে।

কতো সাধ আহ্লাদের ব্যাপার। কতো কাপড়, কতো অলঙ্কার কতো ফুল কতো আলো ভোজের আয়োজনে কী রাজসূয় কাণ্ড। দেখিতে দেখিতে দিশেহারা হইয়া যায় ফেলি।

ফেলি যদি লীলা হইত।

হয়তো এমনি আগুনরঙা শাড়ী আর কনেচন্দনে সাজাইয়া আলপনা-আঁকা পীড়িতে বসাইয়া রাখা হইত ফেলিকে। গোড়ে মালা পরা বর আসিত ফেলির জন্য। ফেলিকে ঘিরিয়া সমারোহের আর শেষ থাকিত না।

বিবাহ উপলক্ষ্যে একখানা নুতন শাড়ী পাইয়াছে ফেলি।

কোরা লালপাড় কন্ট্রোলের শাড়ী। তা হোক তবু নুতন তো বটে, জীবনের প্রথম নববস্ত্র।

তা' সে শাড়ীও এখনো পরিবার অবসর হয় নাই তার। ফেলি নতুন কাপড় পরিয়া বাহার দিয়া বেড়াইলে রাজ্যের এঁটো পাতা ফেলিবে কে?

অনেক রাত্রে সকল কাজের জের মিটাইয়া কোরা শাড়ীখানা জড়াইয়া ফেলি ধীরে ধীরে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়...অতি পরিশ্রমের ফলে পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, দুই পা বিশ মণ ভারী....ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। তবু এই স্বর্গলোকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না ফেলি।

আর ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রবলে সমস্ত শ্রান্তি উপিয়া যায়। গানের আর হাসির হল্লা উঠিয়াছে...বর নাকি বলিয়াছে ঠানদির দল বাজনা বাজাইলে সে গাহিতে রাজী আছে। সদাবিরক্ত বামুনগিন্নী একগাল হাসি লইয়া কোমরে গোট আর পায়ে পাঁয়জোর পরিয়া নাত জামাইয়ের সামনে আসিয়া বসিয়াছেন....বাজনা কেন—ঠানদি'রা কি নাচিতেই পিছ পা? এমন নাচ দেখাইয়া দিবেন—তোমাদের উদয়শঙ্কর কোথায় লাগে!

আত্মবিস্মৃত ফেলি যে সভামঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবে নাই।....

হঠাৎ অনেকগুলা কণ্ঠের হাসি থামিয়া গিয়া উঠিল তীব্র ঝড়।

—'এটা কে? ফেলি না?'...'আ মরণ এ আপদ আবার এখানে কেন?'....'অযাত্রা কোথাকার...বেরো বেরো এখান থেকে'.... 'ওমা সব ছিষ্টি ছুঁয়ে জয় জয়কার করলে গো'। 'যত রাজ্যের নোংরা জঞ্জাল ঘেঁটে এলো—না চান না কিছু'.... 'আহা চান করে এলেই ফেলি একেবারে গোঁসাইকন্যে হয়ে আসরে বসবার যুগ্যি হবে যে!'.. 'আসপদ্দা দেখো একবার, দোরের বাইরে থেকে উঁকি দে—তা' নয় একেবারে বাসরের বিছানা ছোঁওয়া!'...

ঝড়ের তাড়ায় ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে ফেলি।

—হেথায় বসে শুধু গান শুনবো ঠাকুমা—করুণ মিনতি করে ফেলি।

কিন্তু বামুনগিন্নী আদিখ্যেতা দেওয়ার মধ্যে নাই। ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন—আর কি। তুমি গান শোনো আর আমি যাই এঁটো পাত ফেলতে। বলি—কাল সকালের জন্যে বাসন-কোসন চারটি মেজে রাখলেও তো হ'ত? সকালে তো একটা কাজ নয়—পঞ্চাশটা কাজ পড়বে। চায়ের বাসন ধুয়ে রেখেছিস্?

ফেলিকে আর দেখা যায় না।

কিন্তু সকালের বাসন আবার মাজিল কখন সে? যেমন তেমনি পড়িয়া আছে না?....পঞ্চাশটা কাজের একটা কাজেও যে পাওয়া গেল না তাকে!

নীচে, উপরে, গোয়ালে আর ঢেঁকিঘরে···সারা পাড়ায় ফেলি নাই! যাক্ ফেলি হারাইয়া গেছে আপদ গেছে, কিন্তু লীলার নূতন ফ্যাসানের কঙ্কণজোড়া আর রূপালি জরিদার ঢাকাইখানা বেমালুম হারাইয়া যাইবে?

যাইবে বই কি। দুধকলা দিয়া কালসাপ পুষিলে তার ফলভোগ করিতে হইবে না?

অধর্মের চারা বাড়িয়া বিষ ফল দিবে না তো কি অমৃত ফল দিবে?··

ফেলি যে শুধু চোরই নয় চরিত্রহীনাও—সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ থাকে না।···চালচলন দেখিলে গা জ্বলিয়া যাইত লোকের। কেমন যেন 'ঢলানি' ভাব। গোয়ালের পিছনে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায়ই কার সঙ্গে যেন চুপি চুপি কথা কহিতে দেখা যাইত ফেলিকে····অনেকেই নাকি দেখিয়াছে····এই তো কাল রাত্রেও বরযাত্রীদের মধ্যে একটা ইয়ার গোছের ছোঁড়া ফেলিকে মিঠা পানের খিলি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে····আর ফেলি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল তার সামনে। এমনি অনেক প্রমাণ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই।

অবিশ্বাসের আছেই বা কি? জাত-সাপের বাচ্ছা তো বটে?

হয়তো সত্যই তাই। এতগুলা পাকাপোক্ত সংসারী মানুষের অনুমানে ভুল নাই।

জন্মলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে—একদিন হয়তো সর্পিণীর মতোই ক্রুর হইয়া উঠিবে ফেলি····বিষের থলি পুঁজি করিয়া—গৃহস্থের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া সভ্যতা আর সৌন্দর্য্য আর ভদ্রজীবনের গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে।

এশিয়ার সংহতি ও সম্মেলন

শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ধারা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক মহামিলনক্ষেত্র লাভ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বিশ্বসভ্যতার পরমবাণী চরম মাধুর্যে উৎসারিত হয়েছে। এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ পরিব্রজনের পর রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার মূলগত একত্বের ধারা ও অন্তর্নিহিত বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন। নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এশিয়ার সাংস্কৃতিক একত্বের সুর রবীন্দ্রনাথের মনে এক অপরূপ অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বকবি তাঁর অনন্য ভাষায় নিজ অনুভূতিকে রূপায়িত করে গেছেন জাপানযাত্রীর পত্রে ও চীন, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে লিখিত পত্রাবলীর পৃষ্ঠায়।

যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লব অতিক্রম করে এশিয়াখণ্ডে যুগে যুগে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, যে বাণীর প্রভাবে কোটি কোটি নরনারীর জীবন সুখে দুঃখে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তা হচ্ছে ধর্মের বাণী। এশিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফিউসিয়ান, খৃষ্টীয় ও ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান। ধর্মই হ'চ্ছে এশিয়ার সভ্যতার প্রাণবস্তু। ধর্মের ভিতর দিয়েই এশিয়ার অন্তরের নিগূঢ় সত্যানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—আধ্যাত্মিকতা। যান্ত্রিক বিপ্লব, ধনিকতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি এশিয়ার জনগণকে নিষ্পেষিত করেছে; দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংসলীলা, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে; পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে এশিয়াবাসী আজ ঘটনাবহুল বর্তমানের সম্মুখীন। তথাপি এশিয়াবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের প্রেরণা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। আদিকাল থেকে সাহিত্য, স্থাপত্য, চারুকলা ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে এশিয়ার আধ্যাত্মিক মর্মকথা প্রকাশলাভ করেছে। কিন্তু ইউরোপের কথা স্বতন্ত্র। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত, ইউরোপ ধর্মকে মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রিক ও ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেবল মধ্যযুগেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল। তাই বোধহয় ইউরোপের মধ্যযুগ ইউরোপীয় ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বলে পরিচিত। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইউরোপের বাস্তব সাংসারিক চিন্তাকে ধর্ম ব্যাহত করতে পারেনি, যেমন পেরেছে এশিয়ার জীবনধারাকে। তাই ঐহিক ক্ষেত্রে এশিয়া পুনঃ পুনঃ ইউরোপের হস্তে ক্ষুণ্ণ ও পর্যুদস্ত হয়েছে।

শুধু যে ধর্মের দিক দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে তা নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিতর একটা বিভেদ দেখা যায়। ইউরোপে মানুষের জীবন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, এশিয়ার জীবনধারা সমাজকেন্দ্রিক। সামাজিক অনুশাসন এশিয়াতে প্রাধান্য লাভ করেছে। সমাজপতি, ধর্মনেতা ও পুরোহিত সম্প্রদায় এশিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালন করেছেন। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্র সামাজিক অনুশাসন খর্ব ক'রে জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'য়েছে। তাই ইউরোপে রাষ্ট্র জনগণকে সমাজের শাসন থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষিত ইউরোপ স্ত্রী-স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এশিয়াতে নারী-প্রগতির ইতিহাস প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এশিয়ার সমাজধর্মী গোষ্ঠী-গঠনের প্রতিকূল। এশিয়ার বিশেষত্ব প্রকাশ হয়েছে

পিতৃপুরুষের পূজায়, যৌথ পরিবারে, মানুষ ও মনুষ্যেতর সমগ্র জীবজগতের একত্ববোধে। প্রেম, ক্ষমা, তিতিক্ষা, অহিংসা ও মৈত্রী এশিয়ার ধর্মের মূলতত্ত্ব। ইউরোপের সভ্যতা জড়বাদী গ্রীস ও রোমক সভ্যতার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। ইউরোপের জড়বাদকে খৃষ্টধর্মের পারত্রিকতা স্পর্শ করেছে মাত্র, কিন্তু প্রভাবিত করতে পারেনি বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ধর্মসংস্কারমুক্ত ইউরোপ তাই জাগতিক জীবনে জয়ের পন্থা অধিকার করতে অগ্রসর হয়েছে। মধ্যযুগের অবসানের পর ইউরোপ বিজ্ঞানের সাহায্যে এশিয়াকে বহু পশ্চাতে ফেলে যান্ত্রিক সভ্যতার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। অন্যদিকে এশিয়া আধ্যাত্মিকতা ও মানবধর্মে এক চিরন্তন আদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছে। ক্রমে এশিয়ার ধর্মপ্রাণতা—ধর্মান্ধতা, পুরোহিতবাদ ও কুসংস্কারে পর্যবসিত হলো এবং এশিয়া জীবনযুদ্ধে পশ্চাৎপদ ও পরাজিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'লো।

কিন্তু একদিন ছিল যখন এশিয়া সভ্যতার আলোক-বর্তিকা হস্তে সমগ্র পৃথিবীতে অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করেছিল। শুধু ধর্ম ও দর্শনে, কলা ও সাহিত্যে নয়, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জ্ঞান প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে এশিয়া ছিল পথপ্রদর্শক। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রেও এশিয়ার অনেক জাতি ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর আদর্শ স্থল। চীন, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ-সমূহ, পারস্য, আরব ও তুর্কীতে রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালন যে উন্নতি লাভ করেছিল প্রাক্-আধুনিক যুগে গ্রীসে ও রোমেই কেবল তার তুলনা পাওয়া যায়। এশিয়ার দেশে দেশে সমর-বিজ্ঞানও এককালে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পুরাকালে পারসিক ও পরবর্তী যুগে মঙ্গোলীয় আরব ও তুর্কীর বিজয় পতাকা ইউরোপে এশিয়াবাসীর শৌর্য ও রণকৌশল ঘোষণা করেছে।

জিজ্ঞাসা অমিত বেগে অগ্রসর হ'তে থাকে। প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও ভৌগলিক আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে ইউরোপীয়েরা এক নূতন জীবনের সন্ধান পায়। এই রেনেসান্সের যুগে যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সূচনা হ'লো, তারই একদিকের পরিণতি লক্ষ্য করা যায় অষ্টাদশ-শতাব্দীর যান্ত্রিক বিপ্লবে। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক শক্তিতে বলীয়ান ইউরোপ যখন পৃথিবী-বিজয়ে অগ্রসর হ'লো তখন পুরাতনপন্থী এশিয়া ঘোর নিদ্রামগ্ন: তার চেতনা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই ধীরে ধীরে প্রাচ্যের দীপশিখাগুলি নির্বাপিত হতে বিলম্ব হয়নি। ইউরোপ এলো তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে এশিয়া-খণ্ডের দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে ; এবং বণিকের মানদণ্ড অনতিকালে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হ'লো। কিন্তু ইউরোপ যে শুধু বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে প্রাচ্যে হানা দিয়েছিল তা নয় ; তার সঙ্গে ইউরোপ এনেছিল তার জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও দীক্ষা, সাহিত্য ও কলা, রাষ্ট্র ও সমাজনীতি ও সর্বোপরি ইউরোপের সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ, স্বাধীন চিন্তাধারা। বণিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পেষণে এশিয়াবাসী নিষ্পিষ্ট হ'লো বটে কিন্তু ইউরোপের নব্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন আলোকস্পর্শে প্রাচ্যের মোহনিদ্রা ভাঙতে দেরি হ'লো না। যুগান্তকারী ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে প্রাচ্যের অগ্রগতি সুরু হ'লো। প্রাচ্যের জাগরণের ইতিহাসে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও গবেষকগণ প্রাচ্যের গৌরবময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করতে আরম্ভ করেন। এরই ফলে প্রাচ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। যে সকল যুগন্ধর উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের জাগরণের আগমনী গান ক'রে তাকে আত্মসচেতন করে তুলেছেন তার ভিতর ভারতবর্ষের রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্থান

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ... সম্ভবতঃ সর্বোচ্চে। চীন ও জাপানেও তৎকালে এই

শ্রেণীর মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে কিনা সন্দেহ। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম এশিয়ার মর্মবাণী উদাত্তকণ্ঠে ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘোষণা করে বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা ও মানবত্বের বাণী প্রতীচ্য সমাদরে গ্রহণ করে। জাতীয় সংস্কৃতিতে আত্মপ্রত্যয়শীল, প্রবুদ্ধ প্রাচীতে তখন পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষুদ্র জাপানের হাতে রাশিয়ার ন্যায় একটি প্রবল ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বাধিকারপ্রেমী প্রাচ্যের দেশে দেশে এই যুগান্তকারী ঘটনার যে চেতনার সঞ্চার হয় তারই ফলে সেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করে। এই মুক্তি আন্দোলনে যারা অগ্রণী হয়েছেন তাদের মধ্যে চীনের সুন্ ইয়াট সেন, মিশরের জঘলুল পাশা, তুর্কীর কামাল আতাতুর্ক ও ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর নাম এশিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও ধর্মের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু এশিয়াক্ষেত্রে বিজয়ী ইউরোপের আবির্ভাবের পর এই প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এশিয়া ইউরোপীয় শক্তির নজরবন্দী হয়ে পড়ে, এবং সর্ববিষয়ে ইউরোপের মুখাপেক্ষী হ'য়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন, জাপান, ইন্দোচীন, শ্যাম, জাভা, বালি, মালয়, ব্রহ্ম, ইরাণ প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ ক'রে ঐ সব দেশের সভ্যতার মূল তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও মিলন সংঘটনের প্রয়াসী হন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যবিদ্যা সংগ্রহ ও অনুশীলনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেদিন দিল্লীতে এশিয়ার দেশসমূহের মিলনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো, এশিয়াবাসীর কর্তব্য আজ রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা; কারণ এশিয়ার মিলনমন্ত্রের তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন এশিয়ার সাংস্কৃতিক মিলনের ঋষি, তেমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন এশিয়ার রাজনৈতিক মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু বলেছিলেন:

"The question of all questions in India today is the attainment of Swaraj.....Even more important than this is participation of India in the great Asian Federation, which I see in the course of formation, It is the union of the oppressed nationalities of Asia. I admit that our freedom must be won by ourselves but such a bond of friendship and love, of sympathy and co-operation, between India and the rest of Asia, nay, between India and all the liberty-loving peoples of the world is destined to bring about world peace. World peace to my mind means the freedom of every nationality, and I go further and say that no nation in the face of the earth can be really free when other nations are in bondage."

দেশবন্ধু এশিয়া ফেডারেশন্ এবং পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতির মিলনের উদারবাণী নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করে-ছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন: যে পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্বাধীনতা লাভ না করে সে পর্যন্ত বিশ্ব-শান্তি নিষ্ফল স্বপ্নেই পর্যবসিত হবে। পঁচিশ বৎসর গত হয়েছে, আজ যুক্ত-জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হ'য়েছে। কিন্তু দেশবন্ধুর মতবাদের সত্যতা আজ এশিয়ার সকল স্বাধীনতাকামী জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

তাই এশিয়ার জাতিপুঞ্জের মিলনের দিনে পরিস্ফুট চিত্তরঞ্জনের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। জওহরলালের আন্তর্জাতিকতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ধারা অনুসরণ করেছে। জওহরলাল ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে পুব ও পশ্চিম এশিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলনকে উৎসাহিত ও সম্বর্ধিত করেছেন। তাই তিনিই এশিয়ার জাতিপুঞ্জের—সম্মেলনের যোগ্য নেতা

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপান নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা ভণ্ডবাণী প্রচার করে এশিয়াবাসীদের পাশ্চাত্যশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল। "এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' (Asia for Asiatics), "বৃহত্তর এশিয়ার সামগ্রিক উন্নতি পরিকল্পনা" (Greater Asia Co-prosperity Plan) প্রভৃতি ধাকা আওয়াজে এই বৃহৎ মহাদেশের কোন কোন স্থানে জনসাধারণ অল্পকালের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপানের এই আন্দোলন এশিয়ায় কোন স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি। কারণ রাজনৈতিক বুদ্ধিশীল জনসাধারণের মনে জাপানের নিগূঢ় কূট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভিয়েটনামের নেতৃবৃন্দ, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী সৈনিকগণ জাপানের হীন, গুপ্ত অভিসন্ধি অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করেননি। সেই কারণে জাপানের নেতৃত্বে এশিয়ার জাতি-সমূহের মিলন-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হয়েই ভারতবর্ষ আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের ন্যায় একটা বৃহৎ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। ভারতের পক্ষে সম্মেলনের এই অসামান্য সাফল্য খুবই গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। প্রথম আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন যে ভারতবর্ষে আহূত হয়েছে তার একটা সার্থকতা আছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ থেকে সভ্যতার ধারা পূবে চীন, জাপান ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয়, জাভা ও বালিদ্বীপে এবং পশ্চিমে সুদূর মধ্য এশিয়া ও আরব দেশসমূহে বিস্তীর্ণ হয়ে এশিয়ার সভ্যতাকে একটা মূলগত ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার জাগরণের প্রারম্ভেও ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্রিক পরাধীনতা সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের কাজ করেছে। আজ এশিয়ার নবযুগের সূচনায় আধুনিক ভারত পুনরায় এশিয়ার প্রবুদ্ধ দেশসমূহকে নূতন যাত্রা-পথে আহ্বান করে নিয়েছে। ভারতবর্ষের এই নেতৃত্বের একটা ঐতিহাসিক সার্থকতা আছে স্বীকার করতেই হবে।

এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করে সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। এশিয়াবাসীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি ছিল সম্মেলনের আলোচ্যবিষয়। রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রশ্ন প্রকাশ্যভাবে সম্মেলনে আলোচিত হয়নি, কারণ সম্মেলনের নিয়মানুযায়ী এ দুইটি সমস্যা আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল না। তথাপি স্বীকার করতেই হবে সম্মেলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশি। এশিয়ার ইতিহাসে এইটিই হ'চ্ছে এশিয়ার জাতিসমূহের প্রথম সম্মেলন। পরোক্ষভাবে এই সম্মেলন ইউরোপ কর্তৃক এশিয়ার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শোষণের বিরুদ্ধে একটা মিলিত, নীরব প্রতিবাদের দ্যোতক। এই দিক দিয়েই এশিয়া সম্মেলন সার্থক হয়ে উঠেছে। নতুবা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মেলন যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার মূল্য খুব বেশি নয়। সেগুলি অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি কার্যে পরিণত করবার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। দুটো উদাহরণ দিলেই জিনিষটি স্পষ্ট হবে :

জাতি হিসাবে (Racial Discrimination) নীতি সম্পর্কে পূর্ণ অধিবেশনে আলোচনার সময় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রস্তাব করেছিলেন, সম্মেলন থেকে

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক যে সম্মেলন এশিয়ার বিভিন্ন সরকারকে অনুরোধ করছেন, তারা যেন জাতিগত সর্ব-প্রকার প্রভেদাত্মক আইন পরিত্যাগ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন—যদি এশিয়া সম্মেলন এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে তবে কোন মুখে এশিয়াবাসী যুক্ত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে জাতিগত সাম্য দাবি করবে? সোভিয়েট এশিয়ার নেতৃবর্গ এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কিন্তু এই ন্যায্য প্রস্তাবটিও বাতিল করে দেওয়া হ'লো। সিংহলের প্রতিনিধিবর্গ আপত্তি করলেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে সম্মেলনের নিয়ম ও কার্যক্রমের গণ্ডী অতিক্রম করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় স্বাধীনতার আলোচনা সমিতিতে যেরূপ ব্যাপার ঘটলো তাও খুব প্রশংসনীয় নয়। মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃদ্বয় প্রারম্ভিক অধিবেশনে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ সমূলে বিতাড়িত করে সর্বদেশে জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপন এশিয়াবাসীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। সম্মেলনের জাতীয় স্বাধীনতা শাখায় আলোচনা হচ্ছিল যে এশিয়ার যে সব জাতি স্বাধীনতালাভের জন্য এখনও সংগ্রামে লিপ্ত তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে এশিয়ার অন্যান্য দেশ কিভাবে সাহায্য করতে পারে। একজন ভারতীয় প্রতিনিধি বললেন যে এইরূপ সাহায্য দান করলে যুদ্ধ ক্রমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে। স্পষ্টভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া সাহায্যের অন্য পন্থা আবিষ্কার করা সুকঠিন। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করা হ'লো না। সম্মেলনের এইসব ধারা লক্ষ্য করে একজন ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি কি কলেজী বক্তৃতা শোনবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে নূতন দিল্লীতে উপনীত হয়েছেন?

এই সব অভিযোগের উত্তরে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষীয়দের তরফ থেকে বলা যেতে পারে যে এশিয়ার জাতিসমূহের এই প্রথম সম্মেলন; এই বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতার পথনির্দেশ নেই। তাই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ভিতর মোটামুটিভাবে একটা সর্বাঙ্গীন ঐক্য থাকলেও তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ এক নয়। তাই সম্মেলনের একতা রক্ষার জন্য মতদ্বৈধমূলক প্রস্তাব ও আলোচনা বর্জন করাই ভাল। তৃতীয়তঃ সম্মেলনের কোন প্রকার নিয়মাবলী বা আইন কানুন ছিল না, সেজন্যও বাদানুবাদমূলক সিদ্ধান্ত পরিহার করা সমীচীন হয়েছে।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে দুটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, একটি স্থায়ী আন্তঃ-এশিয়া সঙ্ঘ গঠন। এই সঙ্ঘের সভাপতি হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এশিয়া সম্মেলনের আদর্শ কার্যে পরিণত করা ও ১৯৪৯ সনে চীন দেশে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করা আন্তঃএশিয়া সংঘের কার্যক্রমের অন্তর্গত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে এশিয়া পাঠচক্র গঠন সম্পর্কীয়। এটি একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান; এর উদ্দেশ্য হবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্র আবশ্যকীয়। সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে না।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলন ভারতবর্ষে যে অভূতপূর্ব চেতনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে অন্ধ হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে এশিয়ার একতা নিরঙ্কুশ, অবিচ্ছিন্ন সত্য নয়। মোটামুটিভাবে মূলগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনেকস্থলে বিভিন্ন আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থের উদ্ভব হয়েছে। এই বিভেদটুকু স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় স্বার্থের সংঘাতে এশিয়া সম্মেলনের অকালমৃত্যু ঘটতে পারে। দিল্লী অধিবেশনে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সহযোগিতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্য অনেকেই অনুভব করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়া সম্মেলন ইউরোপ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান নয়। প্রগতিশীল ইউরোপের সঙ্গে সাম্যমূলক, স্বাধীন

সহযোগিতা ও সাহচর্যের ভিতর দিয়েই আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের নিজ আদর্শে সোপান সম্ভব হবে। যদি এশিয়া সম্মেলন ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ধারা পরিত্যাগ করে জীর্ণ পুরাতন পন্থায় অগ্রসর হন, এশিয়া যদি ইউরোপের ন্যায় স্বাধীন বলিষ্ঠ ভাবধারাকে প্রাণবান ও গতিশীল না রাখতে পারে তাহলে এশিয়ার চিন্তন জ্ঞান ব্যর্থতায় পরিণত হবে। তৃতীয়তঃ যুক্ত জাতিসঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী এবং তারই অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এশিয়া সম্মেলনকে নিজ উদ্দেশ্য লাভ করতে হবে। ভবিষ্যতে সম্মেলনের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। আদর্শ যেরূপই হোক না কেন ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বমৈত্রীর পথেই প্রগতির সন্ধান মিলবে, অসহযোগিতা এনে দেবে বদ্ধজলার পঙ্কিলতা ও সুনিশ্চিত মৃত্যু। এশিয়ার শুভজাগরণের দিনে এশিয়াবাসীর এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

"সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশঃ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত শাসন যন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তাহলে কখনই ভারত-ইতিহাসের এতবড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। এই বিদেশীয় সভ্যতা, একে যদি সভ্যতা বল, আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি। সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের উপর শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।" —রবীন্দ্রনাথ

সীমা

লিঅন ফএখ্‌ট্‌ভানগার   অনুবাদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়

[লিঅন ফএখ্‌ট্‌ভানগার প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। ১৮৮৪-এর ৭ই জুলাই মুনিকের ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম। বার্লিন ও মুনিকে দর্শন অধ্যয়নান্তর নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস "জু সুস্", "জোসেফস্"—আর "আগলী ডাচেস্" বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৩৩-এ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে জার্মান অধিকারের পর অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায় আমেরিকায় পালিয়ে এসেছেন।

বর্ত্তমান উপন্যাস "সীমঁ" ১৯৪৪-এ যুদ্ধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় রচিত। বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য "সীমঁ"কে "সীমা"য় রূপান্তরিত করা হয়েছে।—**অনুবাদক**]

[পূর্বানুবৃত্তি]

সীমা ও ইতেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বর্তমান; ইতেন সীমাকে ভালোবাসে ও তার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিশীল। তবু সে অল্পবয়সী বালকমাত্র, সীমা নিজেকে তার চাইতে বড় মনে করত। অথচ সীমা-ই ছিল তার চাইতে এক বছরের ছোট। মনে যত কিছু সমস্যা ও সংশয়ের ভাব উদয় হ'ত ইতেনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলাপ আলোচনা করত। এই বিভ্রান্তিকর সাময়িক ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ইতেন হয়ত কিছুই বলতে পারবে না এ কথা সে জানে। তবু তার মনে হ'ল, ইতেন থাকলে বড় ভাল হ'ত, সে হ'ল হেনরিয়েটের ভাই।

সীমার সহপাঠিনী হেনরিয়েট ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সহপাঠিনী, এক বছর আগে হেনরিয়েটের মৃত্যুর পর এখন আর এমন কেউ নেই যার কাছে ও খোলাখুলিভাবে বিশ্বাস করে মনের কথা বলতে পারে, ভাব বিনিময় করে। যে বাড়ীতে হেনরিয়েট ও ইতেন থাকত সেই বাড়িটির সামনে দিয়ে চলার সময় নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হ'ল সীমার।

এই শরণাগতদের বিষয় যদি কিছু হেনরিয়েটকে বলা যেত, তা হলে সব কিছুই বেশ সহজ ও সরল হয়ে উঠত, হয়ত উভয়ে কলহ করত, হয়ত হেনরিয়েট চটে উঠত, কিন্তু উভয়ে উভয়কে ঠিক বুঝত। হেনরিয়েট ছিল সীমার বিপরীত চরিত্র, আত্ম-সমাহিত, চটপটে আর সর্বদাই কিছু একটা অপ্রত্যাশিত কাজ করে বসত। মেয়েটি কলহপরায়ণা ছিল। লোকের মনে আঘাত দিয়ে আনন্দ পেত। সীমা আর হেনরিয়েট একবার স্কুলে পরস্পর মারামারি করেছিল, সীমার বাবার সম্পর্কে হেনরিয়েট একটা অশ্রদ্ধাকর মন্তব্য করেছিল। হেনরিয়েট অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট মেয়ে ছিল। এই শান্ত ও সুশীলা মেয়ে সীমা তখন তাকে মেরে, আঁচড়ে, তীব্রভাবে আক্রমণ করল। এরপর আশ্চর্যভাবে হেনরিয়েট মার্জনা ভিক্ষা করল, আর তদবধি উভয়ের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়ে উঠল।

ওদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করলেও, অনেকদিন হেনরিয়েটের কথা সীমার মনে হয়নি। মাঝে মাঝে এমন হ'ত, কিছুকাল, কিছু সপ্তাহ ধরে হেনরিয়েটের কথা ওর মনে হ'ত না। পরে যখন মনে পড়ত, তখন স্বীয় নিষ্ঠাহীনতার জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে

উঠত। এখন যখন সে আন্তরিকভাবে হেনরিয়েটের কথা চিন্তা করছে, তখনো কিছুতেই তার মুখাকৃতি স্মরণ করতে পারছে না। কফিনে শায়িত সেই শান্ত মোমের মত মুখখানি তার অন্তরে গাঁথা ছিল, যে কোনো সময় সেই মুখখানি সে মনে করতে পারত। কিন্তু সেই মেয়েটির জীবিত, সচল, সুস্থ মূর্তিখানি স্মরণে আনা কঠিন। সীমার স্মৃতির বোঝা এই মুখখানি নিয়তই পরিবর্তিত হত, কখনো শান্তিদায়ক, কখনো বা ঘৃণাব্যঞ্জক, তবু সে ছিল ওর কাছে সব চেয়ে বিশ্বস্ত। হেনরিয়েটের সঙ্গে শুধু যদি একবার কথা বলা যেত।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল ওর বাবাকে। যদিও দশ বছর পূর্বে পীয়ার প্লানকার্ডের মৃত্যু ঘটেছে, তবু তিনি সীমার মনে হেনরিয়েটের চাইতেও সজীব হয়ে আছেন। যেভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে গুজব কখনো বন্ধ হ'ল না। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে কঙ্গোতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। উৎপীড়িতদের প্রতি গভীর মমতা ছিল। তাঁর বন্ধুরা বলেন, নিগ্রোদের উপর কি প্রকার বর্বরভাবে শোষণ চলে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উপনিবেশস্থাপকদের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। পীয়ার প্লানকার্ডের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি আর সরকারী তদন্তে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রস্পার খুড়োর মার মতে পীয়ার মরে গেছে, চুকে গেছে, বন্ধুদের কাছে পীয়ার বীর ও শহীদ হয়ে আছেন।

বাপের স্মৃতি সীমার কাছে স্বভাবতঃই তেমন স্পষ্ট নয়, কারণ শেষ দেখার সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বছর মাত্র। তবু সব কথাই বেশ মনে আছে এই ওর ধারণা। এমন কি সীমা বলত, তাঁর গলার আওয়াজ পর্যন্ত ওর মনে আছে, বেশ গভীর ও গম্ভীর গলা। সীমার বাবা একবার তাকে নতরদামে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথাটি বিশেষ করে মনে আছে। বেশ একটি ছোটোখাটো দল। ও অবশ্য তিনশ ছিয়াত্তরটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেনি, সবাই বিদ্রূপ করেছিল, হেসে বলেছিল ওকে রেখে যেতে। তাদের বসালো প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওর বাবা সমস্ত পথ ওকে কোলে তুলে নিয়ে সব বিস্ময়কর মূর্তিগুলি দেখিয়েছিলেন। অদ্ভুতাকৃতি মূর্তি দর্শনে সীমা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলে ভয় ভেঙ্গে দিয়ে তার মনে তিনি কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ছবি, ফটো বা ম্লান সংবাদপত্রের অংশের উপর নির্ভর করেই সীমার স্মৃতি সঞ্জীবিত হয়েছিল। পীয়ারের ছিল শীর্ণ মুখ, গভীর চোখ আর ঘন চুল। সীমা শুনেছিল এই চোখের রঙ ছিল ঘোলা-নীল। সেই চোখ কখনো খুব উত্তেজিত আবার কখনো বেশ আনন্দময়। ছবিতে পীয়ার প্লানকার্ডকে একটু বয়স্ক বলে মনে হয়, কিন্তু যখনই নতরদামের ঘটনাটি সীমার মনে হ'ত, তখনই সে ভাবত তার বাবা ছিলেন হাস্যময় তরুণ, চোখের কোণের কুঞ্চিত ছোটখাটো রেখাগুলিও তাঁকে বৃদ্ধ করতে পারেনি। যখনই তাঁর কথা সীমা মনে করত, তখনই তার মনে হত তিনি যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভিলা মনরেপোর সকলে কিন্তু পীয়ার প্লানকার্ড সম্পর্কে কথা বলতে ভালোবাসতেন না। প্রস্পার খুড়ো অবশ্য তাঁর সতাত ভাই পীয়ারকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, মাদাম কিন্তু তাঁর সতাত ছেলের সম্পর্কে হিম শীতল অবহেলার ভঙ্গীতে কথা বলতেন। সীমাকে ভুলতে দিতেন না যে তার জন্য পীয়ার একটি পয়সাও রেখে যাননি। প্রস্পার খুড়ো কখনও এর প্রতিবাদ করতেন না। মাদামের এই কটূক্তিতে পিতার সম্পর্কে সীমার গর্ব আরো বেড়ে উঠত।

আজ তিনি থাকলে ভালো হ'ত তিনি বুঝতেন কেন তার বাজারের ঝুড়ি আজ এত ভারী হয়ে উঠেছে, কেন সেই শরণাগত ছেলেটিকে বাবেলকন্ চীজের টুকরোটি সে দিয়েছিল।

এতক্ষণেও প্যালেস নইবেটে পৌছুল, এই চমৎকার প্রাচীন বাড়ীটিতে মসিয়ে লে হুস্-প্রিফেকট্-এর অফিস।

ডেপুটী প্রিফেকটের অফিসে সীমা বিশেষ পরিচিত, এখানেই সে তার মালবোঝাই ঝুড়িটি রেখে দিল, কাকার অফিস পর্যন্ত আর বইতে হবে না।

বোঝাটি নামিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সীমা এ্যাভিন্যু দ্য পার্কের পথ ধরে কাকার অফিসের দিকে চলল। কিন্তু এ্যাভিন্যুতে বা সহরের নূতন অংশে পৌছবার পূর্বেই মত পরিবর্তন করে সীমা স্থির করল পেরী বাসটিডের সঙ্গে দেখা করবে। ওর মনে হ'ল কোনো বন্ধুজনের সঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভিলা মনরেপোয় এই প্রাচীন দপ্তরী পেরী বাসটিডের তেমন সুনাম নেই। তাঁর সঙ্গে বা তাঁর ছেলে ডেপুটী প্রিফেকটের সেক্রেটারী মঁশিয়ে জাভিয়েরের সঙ্গে মেলামেশা সীমার আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেন না। প্রস্পার খুড়ো ও মাদাম এদের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন, স্পষ্টই বলতেন বুড়া দপ্তরীটা নির্বোধ। পেরী বাস্‌টিড্ একটু অবশ্য ছিটগ্রস্ত ও একগুঁয়ে ছিলেন। সব বিষয়েই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, নিন্দা ও প্রশংসা কোনো বিষয়েই তার সংযম ছিল না, মাঝে মাঝে অতীত ও বর্তমান তাঁর কাছে গোলমাল হয়ে যেত। এখন যদিও অনেকের মন সংশয়াচ্ছন্ন, তবু ফ্রান্সের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা হ্রাস পায়নি। এঁর কাছে ফ্রান্স সম্পর্কে দু এক কথা শুনতে সীমার ভালো লাগত। সবচেয়ে বড় কথা উনি ছিলেন সীমার বাবার বন্ধু,—তাঁকে উনি ভালো ভাবেই জানতেন, মাঝে মাঝে তার সম্পর্কে সগর্বে ও সস্নেহে কথা বলেন। এই কারণেই সীমার সঙ্গে বৃদ্ধটির একটা সংযোগ থেকে গিয়েছিল, আর আজকের এই দুঃখকর তমসাবৃত অভিজ্ঞতার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে হয়ত ভালোই হবে।

পেরী বাস্‌টিড পেটিট্ পোর্টে থাকতেন। শহরস্থ পাহাড়ের পিছন দিকটিতে, সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁর প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। একদিক থেকে প্রাচীন শহরের বাড়িগুলির ধূসর ছাত দেখা যায়, অপর দিকে প্রশস্ত ও চক্রাকার সেরিন নদীর উপত্যকা।

প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উপরে কারখানার কাচের দরজায় মুখ চোখ রেখে সীমা ভিতরে দেখল। পেরী বাস্‌টিড্ দীর্ঘকাল পূর্বে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আত্ম-তৃপ্তির জন্য এখনও বই বাঁধাতে ও এইখানে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন, অনেক সময় এই দোকানেই বসে কাটান। বই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, আর তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটিও বেশ বড়।

এই কারখানার সকল রকমের প্রাচীন ও অদ্ভুত আসবাবপত্রের ভিতর সীমা দেখল, তিনি একটি আরাম-কেদারায় বসে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মাথার ঠিক উপরেই বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা জাঁ জাউরেসের প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো, পেরী বাস্‌টিডের তিনি অশেষ শ্রদ্ধাভাজন। বিগত যুদ্ধের সূচনায় জাউরেস উগ্র-দক্ষিণপন্থী একটি সংবাদপত্রের প্ররোচনায় এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাস্‌টিডের কাছে জাউরেস গৌরবময় অতীতের ও ফ্রান্সের প্রতীক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি বিরাট পতাকার সামনে মঞ্চোপরি দাঁড়িয়ে জনতার কাছে বক্তৃতা করছেন। লোকটিকে মল্লবীর মত দেখায়। নম্র অথচ দুর্দমনীয় প্রকৃতি।

সীমা কিছুক্ষণ কাচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছবির নীচে নিদ্রাচ্ছন্ন বৃদ্ধ বাস্‌টিডের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে। আগে তাঁকে সর্বদাই সতেজ, প্রাণবান ও আগুন-ভরা মানুষ বলে মনে হ'ত—আজ কিন্তু এই বিশাল আরামকেদারার গহ্বরে তাঁকে কুঞ্চিত, ক্ষুদ্র ও পর্বতের মত প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে দেখে সীমার মনে বড় কষ্ট হল, দুঃখে তার অন্তর আকুল হয়ে উঠল।

সীমার মনে হ'ল উনি হয়ত তার অতর্কিত আবির্ভাব পছন্দ করবেন না। তাই সে নীচে নেমে গেল, সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করল, আবার ওপরে উঠে এল যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে ও পায়ের শব্দ করে।

যেমনটি ঠিক আশা করা গিছল, পেরী বাস্‌টিড ঘুম

ভেঙে উঠেছেন, চক্‌চকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সীমাকে দেখে খুসী হয়ে বললেন—"এসো, খুকী যে!" তারপর দেরাজ থেকে ঘরে তৈরী করা এক বোতল ব্রাণ্ডি বার করে এনে সীমাকে একগ্লাস দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সীমাও নম্রভাবে এক চুমুক ব্রাণ্ডি পান করলো।

সীমা যেমনটি হবে আশা করেছিল ঠিক তেমনই হ'ল। সীমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে করতে তিনি বললেন "শোনো মা—", তারপর যে সব ঘটনা ঘটছে সেই বিষয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রোধভরে বললেন—"এইত, কোথায় আমরা নেমে এসেছি।" এই কথা বলে ছোট্ট জানলা দিয়ে সেরিন উপত্যকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। এখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে রৌদ্রতপ্ত ধূলিমলিন পথে শরণাগত দলের অন্তহীন মিছিল।

তিনি বললেন—ওদের এই পালিয়ে আসাটা নিছক পাগলামো, একটা বিপদ থেকে ওরা আর একটা বড় বিপদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এদের কোথায় আট্‌কে রাখবে, না কর্তৃপক্ষরা ওদের পালিয়ে আসার জন্যই তাড়া দিয়েছেন। এখন ওরা পথ আট্‌কে দাঁড়িয়েছে, আমাদের রিজার্ভ বাহিনী কোনো পথ দিয়েই অগ্রসর হতে পারে না। বোঝা শক্ত যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট অপটু, না এর পিছনে কোনো কু-মতলব আছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। হাত পা নেড়ে যে ভঙ্গীতে তিনি কথা বলছেন কে বলবে যে এই বৃদ্ধই অথর্বের মত সঙ্কুচিত হয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন।

পেরী বাস্‌টিড আবার সুরু করলেন: প্রধান মন্ত্রী রেডিয়োতে বলেছেন, যেখানে সৈন্যদের থাকা উচিত ছিল সেখানে তাদের পাওয়া যায় নি, ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, ষোলজন জেনারেলকে তিনি পদচ্যুত করেছেন। তিনি নিজেই একটা বিদ্রোহের কথা ইঙ্গিত করেছেন। আমার ছেলে জাভিয়ের বলে যে, ইনডাস্‌ট্রিয়াল কাউন্সিল, কমিতি দেস্ ফরজেস্, ব্যাঙ্ক দি ফ্রান্স প্রভৃতির বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোড়া থেকেই "বস্‌দের" (জার্মান) জয় হবে ধরে নিয়েছেন এবং বলেছেন সেই অবস্থা তাঁদের অসন্তোষের কারণ হবে না। আমি এ ধারণায় বিশ্বাসী নই।—নিস্ফল ক্রোধে চীৎকার করে তিনি বললেন—আমার বুড়ো মাথায় এ সব বিশ্বাসে প্রবৃত্তি হয় না। ফ্যাসিস্তরা কি পারে না পারে আমি জানি। জাউরেসকে হত্যা করার পর এই দুশ' পরিবার কি করতে পারে আমি জানি, কি তাদের ক্ষমতা বুঝি, তাদের সম্বন্ধে সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারি, তবে তারা বিজয়ী হবে এ বিশ্বাসে আমার প্রবৃত্তি নেই।

সহসা সীমার সাম্‌নে থেমে, জাউরেসের ছবির দিকে নির্দেশ করে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুর বাণী উদ্ধৃত করে বল্লেন: "ফ্রান্স একটি ঐতিহাসিক দেউল, বহু শতাব্দীর সমবেত দুঃখ, লাঞ্ছনা, ও ক্লেশের ভিতর ধীরে ধীরে এই বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে। শ্রেণী সংগ্রাম বা তীব্র সামাজিক বৈপরীত্য অবশ্য থাকতে পারে। কিন্তু তদ্বারা কি মাতৃভূমির মূল সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়?" সীমাকে পেরী সন্ত্রাসকর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি বিশ্বাস করো মা, এমন ফরাসী আছে যে ফ্রান্সের নিদারুণ সংকটকালে প্রকৃতই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে? বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্বদেশবাসীকে এইভাবে পথে বার করে দেবে?—শরণাগতের মিছিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তেজিত পেরী বাস্‌টিড বললেন, আমি এ সব বিশ্বাস করি না—

টেবিলের উপর বৃদ্ধ সজোরে একটি ঘুসী মারলেন।

আগ্রহভরা সুন্দর চোখ মেলে সীমা বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাচীন ফ্রান্সের ভগ্নাংশ এই বৃদ্ধ কিছুতেই স্বীকার করবেন না-যে, তাঁর ফ্রান্সের অবসান ঘটেছে। ক্ষুদ্র ও অসহায়, সাহসী আর কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক এই বৃদ্ধ তাঁর অতীতের মৃত ভাবধারার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

বৃদ্ধ আবার সুরু করলেন: এর জন্য দায়ী উকীলরা। রাজনীতিক আর উকীলরাই ফ্রান্সের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছেন। "বস"রা (জার্মানরা) যখন অস্ত্রে সজ্জিত

হয়েছে তখন তাঁরা চোখ মেলে দেখেছেন, কোনো কোনো মহাজন টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন। আমাদের দেশের দুশ' পরিবার যখন তাঁদের টাকাকড়ি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন, তখনো তাঁরা নীরবে সেদিকে চেয়ে রইলেন। শুধু দিনের পর দিন বিতর্ক আর আলোচনা, আলোচনা আর বিতর্ক চল্‌ল—তার ফল ত' এখন দেখতে পাচ্ছ।—বাস্‌টিড পুনরায় রাজপথের মিছিলের দিকে আঙুল দেখালেন।

অত্যন্ত খুসীমনে সীমা বাস্‌টিডের মুখে উকীলদের নিন্দা শুনতে লাগল। সীমার মৃত পিতাকে যথোচিত শ্রদ্ধার অধিকারীত্বে তাঁরাই বঞ্চিত করেছেন। কঙ্গোর জঙ্গলে তার পিতার মৃত্যুর কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত এই উকীলদল-ই মাঝপথে অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়েছিলেন আর অবশেষে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

পেরী বাস্‌টিড আরো কিছুকাল উকীলদের প্রতি কটূক্তি কর্‌লেন, তারপর একটি পদের মাঝখানেই সহসা থেমে হেসে ফেল্‌লেন। দুঃখ ও ক্রোধের ভিতর কণ্ঠকম্পিত হলেও, একটা প্রীতিপূর্ণ ভাব এনে তিনি সহসা বলে উঠলেন —কিন্তু খুকী, তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে এই সব কথা শুনতে আসনি, আমার মনের ঝাল মেটাবার জন্য তুমি তো উপযুক্ত শ্রোতা নও মা। এখনও আমার ব্রাণ্ডিটুকু তুমি শেষ করোনি দেখছি—দাঁড়াও আর কি আছে দেখি।

তাড়াতাড়ি তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। সীমা অনুমান করলো কি তিনি আনবেন। সীমা বই পড়তে ভারী ভালোবাসে, সমস্ত অবসর সময়টুকু সে বই পড়েই কাটায়—পেরী বাস্‌টিড তা জানতেন, ওকে উপদেশ দিতেন, দু চারখানি বইও পড়তে দিতেন।

এক গাদা বই নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। তারপর নিপুণ হাতে একটি প্যাকেট বেঁধে সীমাকে দিলেন। সীমা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। যতটুকু সময় সে থাকবে মনে করেছিল, তার চাইতে একটু বেশী সময় কেটে গেছে।

পেরী বাস্‌টিড আবার বাতায়নে ফিরে সুদূর রাজপথের মিছিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: কেলেঙ্কারী! কেলেঙ্কারী! তারপর একটু আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন: কি জানো মা! ফ্রান্স অনেকবার বিপদে পড়েছে কিন্তু বার বার সে বিপদ তার কেটে গেছে—সর্বদাই একটা অঘটন ঘটেছে।

তার এই আত্মবিশ্বাস সীমার অন্তর স্পর্শ কর্‌ল, কিন্তু সে ভেবে পায় না সবাই যদি অপেক্ষমান হয়ে বসে থাকে, তাহ'লে কোথা থেকে ইন্দ্রজালের অঘটন ঘটবে। ওরিয়েন্ট থেকে একটি বাণী সম্প্রতি উদ্ধৃত করা হয়েছিল....“এখন যদি না হয় ত' কবে হবে? তুমি যদি না পারো ত' কে পারবে?”

—দুই—

—গ্যারাজ—

প্রাচীন শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছবার জন্য কঠিন পথে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সীমার সমস্ত সংশয় অপহৃত হ'ল। পেরা বাস্‌টিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভালোই হয়েছে, সীমা অধিকতর আনন্দ বোধ করতে লাগল। ফ্রান্সের আবার পুনর্জন্ম হবে।

পাথরের পথ রু স্থ লা আর্কবুসে এসে থেমেছে, এই পথেই প্রাচীন শহরের শ্রেষ্ঠতম প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ির নম্বর ৯৭, প্রাচীন ধরণের কারুখচিত অক্ষরে লেখা আছে—৯৭, রু স্থ লা আর্কবুসে। স্কুলে পড়ার সময় সীমা জেনেছিল এই চমৎকার বাড়িটি একদা ত্রিমোইলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও পরে মণ্টমরেন্সিদের অধিকারে ছিল। এখন একটি উজ্জ্বল তাম্রফলকে ঘোষিত হচ্ছে যে এই প্রাসাদটি ব্যবহারজীবী চার্লস মেতর্‌-লেভাতুর-এর অফিস। এই রাজসিক প্রাসাদটি মেতর্‌-লেভাতুরদেরই, এই বাড়ির সাম্‌নে দিয়ে চলার সময় সীমার অন্তরে প্রবল ঘৃণা সঞ্চারিত হ'ল। মেতর্‌-লেভাতুর ছিলেন সীমার বাবার সমসাময়িক ও সহপাঠী, আর পীয়ার প্লানকার্ডের নামের কলঙ্ক মোচনে যারা বাধা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

নূতন ও বিষময় তথ্যাদির সাহায্যে পীয়ারের মৃত্যু সম্পর্কে কুৎসা রটনার জন্য সংবাদপত্রাদিকে সাহায্য করতেন, আর পীয়ার প্ল্যানকার্ডের স্মৃতি রক্ষার জন্য সেন্ট-মার্টিন সম্প্রদায়কে স্মৃতিফলক উৎসর্গীকরণে তিনি বাধা দিয়েছিলেন। সেই কারণেই এদের উপর সীমার অপরিসীম ঘৃণা ছিল। পেরী বাস্টিড যাদের সম্পর্কে অনুযোগ করছিলেন মেতর্-লেভাতুর তাঁদের অন্যতম। যে সব আইনজীবী কালোপোষাক আর গলায় শাদা ফ্রিল লাগিয়ে কৌশলসহকারে জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে প্রবঞ্চিত করে থাকেন, ফ্রান্সকে তার বর্তমান দুর্দশার পথে যাঁরা টেনে এনেছেন—মেতর-লেভাতুর তাঁদের অন্যতম।

সীমা এ্যাভিন্যু দ্য পার্কে পৌছেচে, এইখান থেকেই পথ গ্যারাজের দিকে বেঁকেছে। দেরী হয়ে গেছে, বাগান ও রান্নাঘরে এখানেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। এখন ওর গ্যারাজে না গিয়ে বাড়িতে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। ওর স্বপক্ষে বলবার মত যুক্তিও ছিল, মাদামের হুকুম তামিল করতে অন্যদিনের চাইতেও সময় বেশী লেগেছে। তা ছাড়া আজকের দিনে পেট্রল পাম্পের কাজ যেন অধিকতর লজ্জাকর, বিশেষতঃ লরী ড্রাইভার মরিস যে অভদ্র ভঙ্গীতে তাকায় এবং যে রকম অভদ্র কথায় তাকে অভ্যর্থনা জানায়। অশেষ বিরক্তিভরে সে কথা সীমার মনে জাগ্‌ল।

এই কারণেই এ্যাভিন্যু দ্য পার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে সীমা ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল, এই পথের একদিক চলে গেছে গ্যারাজের দিকে, অপর অংশ বাড়ির দিকে। এত বিপরীত যুক্তি থাকা সত্বেও সীমা গ্যারাজের পথ ধরল। সীমা কাপুরুষোচিত কাজ করবে না, পেট্রল পাম্পের কাজে ও যদি না যায় তাহলে ড্রাইভার মরিস মনে করবে তার বাক্যবাণের ভয়েই সে আসেনি—কিন্তু সীমার কোন ভয় নেই।

যদিচ সীমা দ্রুতগতিতে হাঁটলো, উৎরাই-এর পথ, তবু গ্যারাজে পৌছুতে প্রায় পনর মিনিট লাগ্‌ল। নূতন শহরের পশ্চিম প্রান্তে প্লানকার্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, এইখানেই ৬নং রুট্ থেকে পোর্ট মার্টিনের মূলরাস্তা শাখা বিস্তার করে বেরিয়েছে, এই রাস্তাটিই শহরের চারিপাশে একটি প্রশস্ত বৃত্ত রচনা করেছে। কোম্পানীর বাড়ি ঠিক বড় রাস্তার ওপর নয়। একটু ভিতরে, তবে ভিতরে যাবার একটা নিজস্ব রাস্তা হয়েছে।

প্রস্‌পার খুড়ো শরণাগতদের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ব্যবসাগৃহের মূলপথ চেন দিয়ে আটকানো তার উপর একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলছে "প্রাইভেট রোড, শুধু এইবাড়িতে যাওয়া যায়।" কারখানার দুজন শ্রমিককে প্রহরীর কাজে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে—প্রাঙ্গনের অবরুদ্ধ গেটে প্রকাণ্ড অক্ষরে স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে "পেট্রল নাই, মেরামতি কাজ হয়না, পার্ট্‌স নাই, পথের মানচিত্র পাওয়া যায়না।"

এখানেও সীমাকে গোপনীয় ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রবেশ করতে হ'ল। সীমা আগে অফিসঘরে গিয়ে নিজের আগমন বার্তা জানালো। পথের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার পর এই ঘরটিকে শূন্য ও শান্তিময় মনে হচ্ছে, সংকটময় বিপজ্জনক পথে প্রকাণ্ড লরী ছুটে চলেছে, ফেণোচ্ছল সমুদ্রে বিশাল জাহাজ ভেসে চলেছে, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গা বেয়ে সুন্দর সর্পিল পথ। এইসব দেয়ালগাত্রসংলগ্ন রঙীন চিত্রাবলী আজ যেন নিরর্থক।

সহসা ক্ষণিকের জন্য সীমার মনে পড়ল প্রস্‌পার খুড়োর ব্যবসার পরিধি কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যানবাহনের ব্যবসা, বিশেষতঃ সুরা ও কাঠের ব্যবসায় শুধু যে প্লানকার্ড কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার তা নয়, পূর্বদিকে পাহাড়ের কোলে ভ্রমণকারীদের জন্য এঁরা সুন্দর রাস্তা তৈরী করে যাত্রীদের নিয়ে বেশ চালু ব্যবসা সুরু করেছিলেন।

অফিসে ঢুকেই প্রস্‌পার খুড়োকে না দেখে সীমা একটু বিস্মিত হয়েছিল। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, এই কর্মঠ সত্বাধিকারীকে সব জায়গা

থেকেই দেখা বা শোনা যাবে ; আফিসে গ্যারাজে, পেট্রল পাম্পের প্রাঙ্গনে, সর্বত্রই যেন তিনি বিরাজমান, একে হুকুম করছেন বা তাঁর গম্ভীর ও সুরেলা গলায় কারো সঙ্গে গল্প করছেন। সীমা আশা করেছিল এই দুর্যোগের সময় তাঁকে হয়ত অধিকতর ব্যস্ত দেখা যাবে।

বুক-কীপার মঁসিয়ে পেরুর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, কর্তা প্রাইভেট রুমে রুদ্ধদ্বারে বসে আছেন, এখন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে এই তাঁর বাসনা। তিনি স্যাটালিন মার্ক্ইস্ ডি সেণ্ট ব্রিসনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত আছেন। মঁসিয়ে পেরু বেশ সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে মৃদু-গলায় বললেন, টেলিফোন নিষ্ক্রিয়, তাই মার্ক্ইস্ স্বয়ং মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সঙ্গে কথা বল্‌তে এসেছেন। বুক-কীপারের খরগোসের মত মুখখানি শ্রদ্ধায় নির্বোধের মত হয়ে উঠ্‌ল।

মঁসিয়ে পেরু সীমার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এবং গোপনকথা বল্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক দরদ আছে, মঁসিয়ে প্লানকার্ডের কর্মচারী হিসাবে পেরুর মনে মনে বেশ গর্ব ছিল, তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। আর মামসেল সীমা হল কর্তার আত্মীয়া। পেরু ভাবলেন যে মার্ক্ইস্ সেণ্ট ব্রিসনের মত ব্যক্তি স্বয়ং যখন মঁসিয়ে প্লানকার্ডের সাহায্যপ্রার্থী, তখন সীমাও তাতে গর্ব অনুভব করবে। অফিসের অপর কর্মচারীরা কিন্তু পরস্পর হাসাহাসি ও সীমার প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগ্‌ল। ঐ "ফ্যাসিষ্ট" মার্ক্ইসটা হয়ত সীমার খুড়োর প্রাইভেট কক্ষে বসে নতুন কোন ব্যবসার ফন্দী আঁটছে, এই কথা মনে করে তারা হয়ত বিদ্বেষপূর্ণ রসিকতা করছে।

(ক্রমশঃ)

সত্য নিজেই বেগবান, এবং কখনই জিজ্ঞাসার গতিরোধ করে না, নিবৃত্তিও ঘটায় না। যা কিছু চিন্তার পথ রোধ করে তাই মিথ্যা। সুতরাং চিন্তার প্রকৃত এবং যথার্থ প্রগতি হচ্ছে জ্ঞানান্বেষণের পথে,—যে জ্ঞান কোনো দিকেই কোনো বাধাকে স্বীকার করে না। চিরন্তন জিজ্ঞাসার মধ্যেই জীবনের তাৎপর্য্য। আর কেবল সেই জিজ্ঞাসার সাহায্যেই আমরা নূতন সত্যে উপনীত হতে পারি।— আউস্পেন্স্কি।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা

অজিত দত্ত

হঠাৎ কালবৈশাখী এলো। সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীব্যাপী তৃষ্ণার বহ্নি মুহূর্তে নিবে গেলো এক উদ্দাম ফুৎকারে। ম্রিয়মান জগতে এক দুর্দান্ত প্রাণ-শক্তির চঞ্চল খেলা যেন জীবনের আনন্দ ও জীবন-ধারণের অভিলাষকে নিমেষে মর্মের গোচর করে দিয়ে গেলো। গতানুগতিক জীবনের পর্দা সরিয়ে দিলে এই কালবৈশাখীর ঝড়,—স্মরণ করিয়ে দিলে,—'বাঁচি আমি বাঁচি'।

এইরকম করেই প্রকৃতির সহস্র প্রকাশে, রূপ থেকে রূপান্তরে, আমরা বারবার চকিতে নিজেকে দেখে নিতে পারি। এমনি করেই ভাদ্রের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় শরৎ এলো। এইরকম করেই ফাল্গুনে প্রথম উত্তাপের স্পর্শে মন সচেতন হয়ে ওঠে। এইরকম করেই ঋতুচক্রে বারবার নব নব আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের অলস মনকে সচকিত করে দেয়। বিতৃষ্ণ, বিমুখ মনকেও ফিরিয়ে আনে জীবনের সৌন্দর্যের উপভোগের দিকে, অন্ধকার হতাশা থেকে আশার উজ্জ্বল প্রভাতের অভিমুখে।

প্রকৃতির আকস্মিক অভিনব আবির্ভাবে হৃদয়ে যে সাড়া জাগে, আমার কাছে সে-আনন্দের আর কোনোই তুলনা নেই একমাত্র কাব্যপাঠের রোমাঞ্চকর আনন্দ ছাড়া। কিন্তু কাব্যচর্চা অনভিনিবিষ্ট মনকে চকিতে এমন আনন্দের সুরে ভরে দিতে পারে না। আলস্য-যাপনকে আলস্য-বিলাস করে তুলতে পারে না এমন এক মুহূর্তে। কাব্য পড়বার এবং উপভোগ করবার জন্য আমরা এক-একটি দুর্লভ ক্ষণের প্রতীক্ষা করি। কাব্য-পাঠের অভিনিবেশ আনবার জন্য মন সব সময় প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু কখনো, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে প্রকৃতি যখন হঠাৎ এক নতুন রূপ নিয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন মন তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেননা আমরাও বিশ্বপ্রকৃতিরই অঙ্গ। ওর সঙ্গে আমাদের অন্তরের যে নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন, তাকে তো ছিঁড়ে ফেলবার উপায় নেই।

সেই অপরূপ প্রকৃতির আবার নতুন ক'রে দেখা পেলাম ওই কালবৈশাখীর ঝড়ে। আজকের বীভৎস মারণ-যজ্ঞের পূতিগন্ধ মিলিয়ে যাবার আগেই, আমাদের মনের অস্থির উত্তেজনাকে শান্ত হবার অবসর না দিয়ে হঠাৎ আকাশ তার নীলাঞ্জন মোহ বিস্তার করে হৃদয় ছেয়ে দিলে। যেমন করে শবাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রেও চাঁদ ওঠে, যেমন শ্মশানপ্রান্তের শাল্মলী শাখাও একদিন জীবনের রঙে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিতভাবে এবারও যেন ওই মুহূর্তের শুভদৃষ্টিতে নিজেকে আবার ফিরে পেলাম।

এই হচ্ছে প্রকৃতির কাছে মানুষের পরাজয়। এটাই প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ ও পরম শিক্ষা। প্রকৃতি বারংবার, অক্লান্তরূপে তার দানকে সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলছে। কোনো কারণেই সে তার সৃষ্টিকে ব্যাহত হতে দেয় না। রাত্রি ও প্রভাতের জ্যোতিচ্ছায়াময় চক্রটি যেমন অবধারিত তেমনি বিস্ময়কররূপে বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রি নিজস্ব রূপ ও দানের গৌরবে স্বতন্ত্র, অগণিত মানুষেরই মতো। তাদেরকে বিশেষভাবে চিনে রাখা যায়। এক-একটি দিবা ও রাত্রির—

এমনকি এক-একটি মুহূর্তের কণ্ঠস্বর আয়ুর বৃহত্তর অংশ উত্তীর্ণ হয়ে বার্ধক্যকেও সচকিত করে' তুলতে পারে। তেমনি ভাবেই ঘোরে ঋতু-চক্র, বৎসর ও শতাব্দী। যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালান্তরে প্রকৃতি যা দেবার দিয়ে চলে। কখনো কার্পণ্য করে না, কখনো তাকিয়ে দেখে না, আমরা তার দান গ্রহণ করবার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছি কি না।

পৃথিবীর প্রতিদিনকার ইতিহাস যদি খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এই ছোট্ট গ্রহটিতে প্রতিদিন, কোথাও না কোথাও, বীভৎস, বিকৃত, কুৎসিত আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের অমানুষিকতা আত্মপ্রকাশ করছে। জীবেতিহাসের বৃহৎ পটভূমিতেও সেই একই ছবি। জীবগণ পরস্পরের রক্তমাংসের স্বাদে নির্বিচার ও লোলুপ—মানবজন্মের পূর্বেকার কাহিনীরও এইটেই ধ্রুবপদ। সভ্য মানুষের অভ্যুদয়ের পরও কতো রাক্ষস-বানর, কুরু-পাণ্ডবের হনন-যজ্ঞে প্রকৃতির দানকে আহুতি দেওয়া হোলো সর্বভুক হিংসার হুতাশনে। কতো রাজ্যলোভের সংগ্রামে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান জীবনকে বলি দেওয়া হোলো। কখনো স্বাদেশিকতা, কখনো আনুগত্যের বলপ্রয়োগ। এলো কত মহামারী, মন্বন্তর, কতো উৎপীড়ন, বঞ্চনা। অপ্রাকৃতের মোহে কতবার মানুষ প্রকৃতির থেকে মুখ ফেরালে। কিন্তু তবু প্রকৃতি বারবার নিয়ে আসে তার ঐশ্বর্য, মানুষের ঘর—এই পৃথিবীকে সে ভরিয়ে দেয় তার দানে। মানুষের প্রাণকে সে পরিপূর্ণ করে দিয়ে যেতে চায় তার সৌন্দর্যের সমৃদ্ধিতে। মানুষ দুষ্টু ছেলের মতো যতোবার সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবনের আসবাব দৌরাত্ম্যে ভেঙে ফেলতে চায়, ততোবারই প্রকৃতি নতুন করে' ঘর সাজায়। তার সন্তানের শিয়রে সে রাখে ফুলের গুচ্ছ, উপরে মেলে দেয় মণিময় চন্দ্রাতপ।

আজকে আমি যেমন করে' আমার মনের স্থৈর্য ও আত্মস্থতা ফিরে পেলাম, মানুষকে বারবার এমনি করে তার অন্তরের সম্পদ ফিরিয়ে দেয় প্রকৃতি, তাই সে এত প্রিয়। ওই জীবন্ত সচকিত বিদ্যুৎ-দীপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, জীবনের মূল্য যেন কিছুটা বোঝা গেলো। আয়নায় যেন আমার হৃদয়কে চকিতে দেখে নিলাম। সে-হৃদয় কেবল আমার একলার নয়। সে-অন্তর বিশ্বমানবের অন্তরেরই প্রতিরূপ। যে-হৃদয় দিয়ে মানুষ ভালোবাসে, ভোগ করে, আনন্দের চঞ্চল স্রোতে অবগাহন করে এ তারই ছায়া। মনে হয় প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ যদি আরও নিবিড় হোতো, তাহলে হয়তো জীবন এবং তার সমস্ত ঐশ্বর্যের যথার্থতর মূল্য দিতে আমরা শিখতে পারতাম।

প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্লোকের পরিচিতির মধ্যে বিস্ময়কর কিছুই নেই। বরং এইটেই সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। প্রকৃতিই মানুষের মনের অন্তরঙ্গতম সুহৃদ্। কেননা মানব-প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শুধু সৌহার্দ্য নয়, একটা সাদৃশ্য আছে। শুধু অন্তরঙ্গতা নয়, মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপের সাম্যও মানুষকে আবেশের অতিশয়তার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও ভাবসাম্য হারাতে দেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর্লোকের সাদৃশ্যে ও সৌহার্দ্যে যেদিন ছেদ পড়ে সেদিন মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে হয় পশু বা পাগল।

আকাশের মতোই মানুষের ঔদার্যের প্রসার, তার চিন্তা ও কল্পনার বিস্তৃতি। আমাদের মনের আকাশেও মেঘ জমে, বর্ষণ হয়। সেখানেও বন্ধুর পথ, হিমাচলের ভয়াবহ উত্তুঙ্গ নির্জনতার শিক্ষা। এই অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাই যখন মেঘালোকে সুখীর মনও অন্যথাবৃত্তি হয়, যখন অশিক্ষিত কিষাণও পশ্চিমাকাশের আরক্তিম সৌন্দর্য দেখবার জন্য একবার থমকে দাঁড়ায়।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের এই যোগ উপলব্ধি না করা সম্ভব, ভুলে থাকাও সহজ ও স্বাভাবিক। কেননা যে বহির্দৃষ্টি প্রকৃতিকে ভালো করে' দেখতে পায়, আর যে

অন্তর্দৃষ্টি মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির রূপ গ্রহণ করতে পারে, এ-দু'য়ের মিলন হলেই শুধু জীবনে প্রকৃতির প্রভাব ও প্রয়োজনের যথার্থ মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। রামধনুর সৌন্দর্য অনেকেই তাকিয়ে দেখে, কিন্তু ওই বর্ণবৈচিত্র্যে হৃদয়বাসিনীর পায়ে যে মঞ্জীর বেজে ওঠে, তার আওয়াজ তো সহজে সকলের মর্মে প্রবেশ করতে জানে না। কোনো এক রৌদ্রস্নাত সুনীল সকালের স্পর্শে যদিও বা অনেকেরই মন সচকিত হয়ে ওঠে—তবু এর নিগূঢ় বাণী যে অস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়, সে ভাষা অনেকেরই কাছে রহস্যময়। যে ভাগ্যবান সে ভাষা বোঝে সে-ই শুধু লৌকিক ভাষায় তাকে প্রকাশ করে বলতে পারে :

God's in His Heaven
All's right with the world.

প্রকৃতির যে শিক্ষা, তা চিরকালের, চিরযুগের শান্তির বাণী, সৃষ্টির বাণী, আনন্দের বাণীতে প্রোজ্জ্বল। ধর্মের রূপান্তরে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে তা বদলায় না। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিবর্তনে সে যেমন বদলায় নি, ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র বা ভবিষ্যতের অজ্ঞাত-তন্ত্রের ভ্রূকুটিতেও যে সে পরিবর্তিত হবে এরূপ আশঙ্কা করিনে। কেননা প্রকৃতি যে ধর্মপ্রচার করে তা মানবতার ধর্ম। মানুষ যতোদিন মানুষ থাকবে, ততোদিন স্নেহ-প্রেম ও বাৎসল্যকেই নিবিড়, নিকট, অপরিবর্তনীয় ধর্ম বলে' বিশ্বাস করবে, ততোদিন আনন্দই হবে তার কাম্যশান্তি ও সুখই তার জীবনের লক্ষ্য। এবং যদি দেখবার চোখ থাকে, যদি শোনবার মন থাকে তবে শরতের নীলাকাশে ও আষাঢ়ের মেঘে, যূথী ও চম্পায়, সমুদ্রে-পর্বতে ও নদীতে সেই স্নেহ ও প্রেম, শান্তি ও আনন্দেরই ইঙ্গিত। জাজ্জ্বল্যমান এই ইঙ্গিত, এই বাণীকে শস্ত্র দিয়ে ছেদ করা যায় না, জলেও একে ধুয়ে ফেলা যায় না মানুষের পৃথিবী থেকে। যিনি এই ভাষা বোঝেন তিনি জানেন যে :

রাহুর দন্ত, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে
নিমেষ পরেই উগ্‌রে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।

....

পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।

কিন্তু এ-ভাষা তো সকলের বুদ্ধির ও অনুভূতির আয়ত্তে নয়। তাই সমসাময়িক সর্বসাধারণের এবং শাশ্বত কালের মানবমনের সামনে বোধগম্য ভাষায় প্রচার করবার দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের আমরা বলি কবি, বলি স্রষ্টা। কেননা তাঁরা হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীতে সৃষ্টি করেন জীবনের নতুন তাৎপর্য। যদিও এই জীবন ভাষ্য চিরপুরাতন তবু বারংবার তা' নতুন করে' সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। এই সৃষ্টির ভার যাঁদের উপর, তাঁরাই কবি, প্রকৃতির বার্তার তাঁরাই অনুবাদক। তাই আজকের এই হিংসা-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন কবির, প্রয়োজন সেই সব স্থিরপ্রজ্ঞ মানবের, প্রকৃতির বার্তা ও শিক্ষাকে যারা চয়ন করে' আনতে পারে মানবের গোচরে। যদিও বিকৃতবুদ্ধি মানব তাঁর ভাষার সবটুকু গ্রহণ করতে অপারগ হয়, তবু মানবধর্মের প্রচারক কবির প্রয়োজন আজকের মতো এমন তীব্রভাবে আহত পৃথিবী আর কখনো বোধহয় অনুভব করে নি, কবির অভ্যুদয়ের আজকের চেয়ে শুভমুহূর্ত আর নেই।

আজ কথা উঠেছে আবেগমর্মী কবিতার নাকি দিন ফুরিয়েছে। এমনকি কাব্যেরই প্রয়োজন নাকি কমে আসছে। পণ্ডিতদের মুখে যুক্তি শুনছি। কাব্যকে যদিও বা দয়া করে সহ্য করা যায়, আবেগধর্মী কবিতাকে 'নৈব নৈব চ'। কেননা, আবেগ সেতো হৃদয়বৃত্তির স্রোত, আজ বুদ্ধিবৃত্তিই মাত্র কাম্য, আদরণীয়, এমন কি পূজনীয়। স্বভাবতই অনুমিত হতে পারে যে বুদ্ধির বাহন পদ্য নয় গদ্য, এবং কাব্য নয় নিবন্ধ। এমনও হতে পারে যে মানুষের হৃদয় ক্রমশই মরে যাচ্ছে, তার আয়ু আর বড় জোর হাজার কি দু' হাজার বছর। এমন যুক্তিও হতে পারে

হৃদয়বৃত্তি যদিও বা মুমূর্ষু না হয়, তবু দমনের যোগ্য। কেননা হৃদয়বৃত্তির থেকেই মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার উৎপত্তি বেশি। সে-কারণে কবিতা এখন বিদ্বজ্জনগণের বিরাগ ও অপ্রীতির হেতু।

কিন্তু আমরা যারা পৃথিবী ও আকাশে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, প্রভাতে ও রাত্রে নিত্যই হৃদয়ের নব অনুভূতির প্রেরণা পাই, এবং আমাদেরি মধ্যে আরো সহস্র-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, আগত ও অনাগত মানব যারা ঘর বাঁধে ও ভালোবাসে, হৃদয়ের আনন্দ ও বেদনার মধ্যেই যাদের জীবনের পরিচিতি, যারা শৃঙ্খলা মানে বলেই মানুষ নয়, বরং অনুভব করতে জানে বলেই মানুষরূপে গণ্য, তাদের জীবনে কবিতার চেয়ে বড়ো সান্ত্বনা আজ কোথায়?

তাই মনে হয়, কবিতার প্রয়োজন যেন আজ বড়ই বেশি। এবং তারো চেয়ে প্রয়োজন কবিতার দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে নেওয়ার। কেননা ওরি মধ্যে আছে সত্যধর্ম, যে ধর্ম প্রত্যেক মানুষের অন্তরে; মানুষ মাত্রই যে-ধর্ম জানে, তবু বারবার ভুলে যায়। প্রকৃতির মধ্যে কবি যে অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পায়, সে আজ তা বিশ্বমানবকে ফিরিয়ে দিক।

"সমাজবিচ্ছিন্ন যে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, সে মানুষ নিতান্তই কাল্পনিক, তার সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেদন সর্বজনীন নয়। কেননা সে নিজেকে অন্যের কাছে উদ্ভাসিত করছে না, আপনার পরিচয় সে বহন করছে নিরালম্ব অনন্যতায়; অপরের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে অপরিহার্য যে সাধারণ সামাজিক আধার, তার মূলে আছে জীবনের প্রতি এক গভীর বিশ্বাস, সমাজ-সংযুক্ত একটি সততা—সাহিত্যিক সততা।...এই সততার জোরেই বোধ হয় সোভিয়েট লেখকের কাছে বক্তব্যটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য পায়; কেমন করে চলতে হবে তার অনুশীলনটা বিশেষ করে মুখ্য হয়ে ওঠে তখন, যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে আচ্ছন্ন চরিত্রের ক্লান্তিকর বিশ্লেষণে স্বকীয়তার আশ্রয় না নিলে লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হয়।"

সুবোধের মা সরস্বতী

জগদীশ গুপ্ত

সরস্বতী বিধবা, সরস্বতী দরিদ্র, সরস্বতী ভদ্র এবং সে সুবোধের মা। জননীর এই সুবোধ একমাত্র সন্তান। কিন্তু সে কেবল সরস্বতীর গর্ভজাত সন্তান নয়—সে আরো অনেক কিছু—জীবন-মরণ ইহকাল-পরকালব্যাপী সত্তা সে—সে ইয়ত্তাহীন ভাবের আর অন্তরের বিগ্রহ আর আশ্রয়।

সরস্বতীর শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক — বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল তাঁর। তাঁর দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকিত না বটে, কিন্তু দুয়ারে লোকসমাগম ছিল, লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সম্ভ্রান্ত সজ্জন বলিয়া মান মর্যাদা ছিল; তিনি অর্থোপার্জন করিতেন প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী একদিন বিমুখ হইলেন—যে পথে টাকা আসিত, অতর্কিত দৈবদুর্ঘটনায় একদিন সেই পথেই তাঁর শেষ কপর্দকাদি পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছু টাকা খাটিত, কিছু টাকা অসময়ের সম্বল হিসাবে স্থানীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিত। ব্যাঙ্ক ফেল করিল। যাহারা আইন-পরিচালক তাঁহাদের হস্তক্ষেপে আমানতকারীরা কিছু কিছু পাইলেন বটে, কিন্তু সেটা সঞ্চিত অর্থের নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। ইহার অল্পদিন পরেই মালগাড়ীর তাঁহারই নামীয় গাড়ীখানা কোন্ লাইনে কোন্ ঠিকানায় চলিয়া গেল তাহার আর উদ্দেশই মিলিল না। উকিলের চিঠি পাইয়া রেল কোম্পানী কিছু ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিলেন বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষতির পূরণ তেমন কিছুই হইল না।

তারপর, বাজারে যাহাদের সঙ্গে তাঁর মালপত্রের লেনদেন চলিত তাহারাও ঠিক এই সময়টিতেই একদিন গদী গুটাইয়া আজমীর গেল, কি ভোল্ বদলাইয়া অন্য স্থানে সরিয়া বসিল তাহা আবিষ্কৃত হইল না। চালানী কাঁচা মালের দরুণ তাহাদের কাছে মোটা টাকা পাওনা ছিল সেটা গোটাই গেল।

এই সবের ফলে মহেন্দ্রের বিস্তৃত কারবার নষ্ট হইয়া লক্ষ্মীর পুলক চপলার দ্যুতির মতো এক নিমেষে অন্তহীন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। সেই শোকে মহেন্দ্রনাথ শয্যাগ্রহণ করিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সরস্বতীর স্বামী বিশ্বনাথ ভাঙ্গা হাট জমাইয়া তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কেবল না পারিলে তেমন দুঃখ ছিল না; কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় হইল ইহাই যে নিরুপায় হইয়া তাহাকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল; কারবারসূত্রে একদিন তাহারা যাহাদের সমকক্ষ ছিল বিশ্বনাথ তাহাদেরই একজনের অনুগ্রহ শিরোধার্য করিয়া লইল। মাধব দত্ত তাহাকে কর্ম্মচারী করিয়া রাখিলেন····

দাসত্বের জ্বালায় বিশ্বনাথের প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

বিশ্বনাথ নিঃশব্দ থাকিত—

পিতৃগৌরব সে কীর্তন করিত বটে, কিন্তু বর্তমান দুঃসহ দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া সরস্বতীর সম্মুখে সে কোনদিন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে নাই। তবু সরস্বতী বুঝিতে পারিত স্বামীর মনে অহরহ ঘুণের কাজ চলিতেছে—নিটোল সবল স-লীল মনটি লইয়া তিনি নাই—মন তাঁর শীর্ণ। অভাবের কথা উঠিতেই তাঁহার মুখে যে ছায়া দেখা দিত, সরস্বতী জানিত, তাহা বড় গুরুতর। স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার পরিচিত—রেখার

ইঙ্গিত সে কখনো ভুল বোঝে নাই। সেই পাঁচ বছর বয়স হইতে বিশ্বনাথ তার স্বামী, আর খেলার সাথী। তারপর বাইশটি বৎসর তার বিশ্বনাথকে লইয়া নিরন্তর সঙ্গ-সুখে কাটিয়াছে; স্বামীর সর্বাঙ্গ যেমন তেমন তাঁর অন্তরটিও সরস্বতীর একান্ত আপনার জিনিষ— নিজেরই হাত দুখানার মতো তার চোখের উপরকার জিনিষ।

সুবোধ কোলে আসিল।

বিশ্বনাথ বলিত,—বাবা মা বেঁচে থাকলে কত সুখী হতেন। তাঁদের রক্ত আর শরীরের আবির্ভাব তাঁরা নূতন করে অনুভব করতেন। বিশ্বনাথের বড ইচ্ছা ছিল, ছেলেকে সে মনের মতো করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। তার অতি-ইচ্ছার আবেগ যেন বাতুলতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল...

কোলের শিশুটিকেই সম্বোধন করিয়া বিশ্বনাথ বলিত,— তোকে আমি চেয়েছি কেবল ছেলে বলে নয়—তুই আমার ত্রাণকর্তা দেবতা; আমায় ছাইয়ের স্তূপ থেকে তুলে' আমার নিজের বৈকুণ্ঠে বসিয়ে দিবি তুই। পারবি ত' রে? জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বনাথ হাসিত না; চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন ভবিষ্যতের প্রাণময় আর প্রাণারাম চিত্র দেখিত।

সরস্বতী বুঝিতে পারিত, এই প্রশ্নে স্বামীর দুরাকাঙ্ক্ষা তেমন প্রকাশ পায় নাই, যেমন পাইয়াছে তার গভীরনিহিত ব্যাকুলতা: পিতা পিতামহের লুপ্ত নাম ভাগোর দেয়া সমাধির ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া সে আবার দুনিয়ার সঙ্গে সহজ নির্ভীক স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। অতল হইতে উঠিবার শেষ অবলম্বন ঐ বংশধর। ভগবান্, বংশের মর্যাদা রাখিতে ও যেন পারে।

সরস্বতী বলিত,—তুমি অমন ক'রে ভেবো না। ভগবানে বিশ্বাস রাখো; তিনিই দেখবেন।

কথাটা দৈববাণীর মতো শুনাইত—ক্ষণিকের জন্য দুঃখ ভুলিয়া একটা অহেতুকী সান্ত্বনা পাইয়া বিশ্বনাথ সোৎসুকে সরস্বতীর দিকে চোখ তুলিত—স্বামী স্ত্রীর মনে মনে অনুকম্পার নিবিড় স্পর্শ ঘটিত।

কিন্তু ছেলেটিকে অতিমানুষ নয়, কেবলই মানুষ করিয়া তুলিবার পূর্বেই বিশ্বনাথ মারা গেল।

বিশ্বনাথের অসুখটা কি, ডাক্তার তাহা চিনিতেই পারিলেন না। যেদিন সে অসুখে পড়ে সেদিন সকালবেলা দৈহিক কোনো বিকার সে অনুভব করে নাই। চা খাইয়া মাধব দত্তের আড়তে যাইয়া হাতবাক্সের সম্মুখে বসিবার সময় অতিশয় তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা যেন মস্তিষ্কের কেন্দ্র হইতে চারিপ্রান্ত শতমুখে বিদ্ধ করিয়া এক মুহূর্তের জন্য চিড়িক মারিয়া গেল—তারপর আর কিছুই নাই।

খাতালেখার কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে বিশ্বনাথ তার হাতখাতায় বারো বার শ্রীদুর্গার নামটি লিখিয়া খাতাখানা কপালে ছুঁয়াইয়া দিনের কাজ শুরু করিত। সেদিন "শ্রী" লিখিতে যাইয়াই বিশ্বনাথ দেখিল, তার চোখ আর খাতাখানার মধ্যবর্তী বায়ু যেন স্বচ্ছ নয়—পূর্বের হস্তাক্ষরগুলি ঝাপসা দেখাইতেছে। কলম আর কাগজের দিকে কিছু করিয়া চাহিয়া থাকিয়া "শ্রী"-এর প্রথম বক্র রেখাটি সে অতিশয় সাবধানে কলমটা চিত্রকরের তুলির মতো টানিয়া টানিয়া ধীরে ধীরে বড় বিলম্বে নিপুণতার সহিত শেষ করিবার পর দ্বিতীয় অক্ষরটি লিখিতে তার আলস্য বোধ হইতে লাগিল.. এবং সেইটা শেষ করিয়াই তার মনে হইল যেন বিরাট একটা কাণ্ড সে শেষ করিয়া তুলিয়াছে —ঐ দু'টি অক্ষর যেন বিস্ময়কর—পরস্পরে সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র দু'টি বৃহৎ জগৎ—সেই দু'টি জগৎ সে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে।...হাত কাঁপিয়া, তৃতীয় অক্ষরটি বেঁকিয়া বিকৃত খাপছাড়া হইয়া গেল; কলম দোয়াতের ভিতর ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বনাথ সেই অক্ষর তিনটির দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়া গেল....চোখের পাতা ভারি আর অবশ হইয়া আর উঠিতে চাহিতেছে না; প্রত্যেকটি মুহূর্ত ঘর্ষণ খাইয়া কর্কশ একটা শব্দ করিতে

করিতে দূর দূরান্তে অদৃশ্য হইতেছে, হাত যেন ঘুমাইতে চাহিতেছে; ঢুলিতে ঢুলিতে দু'বার চমকিয়া উঠিয়াই হাত আবার এলাইয়া পড়িল—কলমটি আর তুলিয়া লওয়া হইল না....

রাস্তার উপর হইতে লোকের গলার শব্দ আসিতেছে—

বিশ্বনাথের মনে হইতে লাগিল, সে শব্দ যেন মেঘলোক হইতে নির্গত হইতেছে, অস্ফুট অথচ অবিরাম, চোখের সম্মুখে কতকগুলি মর্তি নড়িতে লাগিল—তাহাদের কলরব পরস্পরকে পর্যুদস্ত করিয়া ক্রমশ: উচ্চে উঠিতেছে

বিশ্বনাথের আচ্ছন্ন এই ভ্রমটা হঠাৎ দূর হইয়া গেল সহকর্মী রামলালের ডাকে—

—এঁ্যা! বলিয়া চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে কখন দেয়ালে পিঠ দিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাও সে জানে না।

তারপর পাল্‌কিতে করিয়া বিশ্বনাথকে বাড়ীতে আনা হইল।

রামলাল আর ভৃত্য পানু ধরিয়া লইয়া যখন তাহাকে শয্যায় শুয়াইয়া দিল তখন তার চোখের রং রক্তজবার মতো। শুইয়া সে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল, কাহারো ডাকে সাড়া দিল না, কাহারো প্রশ্নের জবাব দিল না। গায়ের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল; রামলালেরই সাহায্যে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা শুরু হইল।

পাল্‌কিতে তুলিয়া বিশ্বনাথকে বাড়ীতে আনিবার সময় রামলাল শঙ্কিতচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, না জানি কান্নাকাটির আর অস্থিরতার কি তুমুল কাণ্ডটাই দেখিতে হইবে। রামলাল জানিত, বিশ্বনাথের স্ত্রী বুদ্ধিমতী; কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা তাহাকে যে এমন আত্মস্থ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে তাহা সে চোখে না দেখিলে অনুমান করিতে পারিত না। সরস্বতী অস্থির হইয়া কান্নাকাটি কিছুই করিল না, আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না—নিঃশব্দে বাহকদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর শয্যায় সে বসিল। সে বসিবামাত্রই তার বসা দেখিয়াই রামলালের মনে হইল, সে আর উঠিবে না; ঐ শয্যার বাহিরে তার আর প্রয়োজন নাই; স্বামীর রোগশয্যা ছাড়া আর সব তার কাছে শূন্য হইয়া গেছে।

নূতন ধরণের ব্যাধি দেখিয়া শিক্ষানবীশ ডাক্তার একবার ডাকিতেই তিনবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন; পানু ঔষধ আনিতে লাগিল; ডাক্তার চার ঘণ্টায় তিনবার ঔষধ পরিবর্তন করিলেন, রামলালের ছেলে দুটি রোগীর মাথায় বরফ দিয়া রাত জাগিল; কিন্তু বিশ্বনাথের চোখের লাল কাটিল না, মুখে শব্দ আসিল না; গায়ের উত্তাপ কমিল না।

সূর্যোদয়ের পর অকস্মাৎ তার জ্ঞান ফিরিল; চোখ মেলিয়াই দেখিল, সরস্বতী তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; ইচ্ছা হইল, তার মাথার উপর হাত তুলিয়া দেয়, কিন্তু হাত অতদূর উঠিল না, বলিল,—আমি চললাম সরস্বতী।

সরস্বতী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল—

বিশ্বনাথ বলিল,—মিথ্যে নয়। মনটাকে ক্ষয় করে এনেছি। যে ইচ্ছার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে সে জোর আমার নেই, আমি তা বোধ করছি। এখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি, ছেলের ঐশ্বর্য আর কৃতিত্ব দেখে যাই, কিন্তু জীবনের আকর্ষণ আমি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে লঙ্ঘন করে গেছি···

সরস্বতী বলিল,—না, তুমি বাঁচবে; আমার ইচ্ছায় তুমি বাঁচবে।

কথাটা কানে যাইয়া বিশ্বনাথের মনে হইল, সাধ্বী স্ত্রীর এই দৃঢ় প্রত্যয় বুঝি ব্যর্থ হইবার নয়, বলিল,—দেখো চেষ্টা করে। ডাক্তার এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কি বলে গেল?

—বলেনি কিছুই। ওষুধ দিচ্ছে।

—টাকা দিচ্ছ কোত্থেকে?—বলিয়াই বিশ্বনাথ স্ত্রীর

হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষয়াবশিষ্ট কবেকার সেই দুখানা স্বর্ণালঙ্কার—একদা হাতে উঠিয়াছিল ·

কিন্তু তা হাতেই আছে।

সরস্বতী বলিল,—রামলালের স্ত্রী রাত্তিরে এসেছিল। বাবা নাকি রামলালের কাছে শ'খানেক টাকা পেতেন। তাই সে দিয়ে গেছে।

শুনিয়া বিশ্বনাথের নিষ্প্রভ চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল, বলিল,—মিছে কথা, সরস্বতী, সে আমাদের দিয়েছে।

দু'জনেই নিঃশব্দ হইয়া রহিল, দুজনারই অন্তর বিগলিত হইয়া যেন সেই দয়াময়ের পায়ের উপর লুটাইতে লাগিল।

বিশ্বনাথ বলিল,—সুবোধ কই?

—ঘুমুচ্ছে।

—তুমি তাকে মানুষ করো, তোমার উপর দায়িত্ব রইল।

সরস্বতী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—আমি কাছে থাকলেই তুমি এমনি প্রলাপ বক্‌বে।

বিশ্বনাথ কাতর হইয়া বলিল,—আর বকব না, কিন্তু তোমাদের আমি ভাসিয়ে চললাম।—বলিতে বলিতে এক ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

সরস্বতী দ্রুতপদে বাহিরে যাইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া দাঁড়াইল, বিশ্বনাথের অজস্র চোখের জল উপাধানে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বনাথের শেষ কথাটি ঐ—

অশ্রুর শেষ প্রবাহ ঐ—

বুকের শেষ প্রদাহ ঐ—

পরক্ষণেই সরস্বতী যখন তার কাছে গেল তখন তার শ্বাস নাভিমূল হইতে উত্থিত হইতেছে - চোখের তারা স্থির হইয়া গেছে।

—দুই—

ছেলে বড় হইয়াছে, এখন সে সাত বছরের, কিন্তু তার সুবোধ নাম সার্থক হয় নাই।

সরস্বতী মাঝে মাঝে বসিয়া তাই ভাবে। স্বামী তাহার জীবনে যে মাধুর্য ঢালিয়া দিয়া গেছেন তাহা মন্দাকিনীর স্রোতের মতো অনন্ত। বাইশ বছরের অগাধ উদ্বেল আনন্দের অখণ্ড মূর্তি ঐ ছেলে—রক্ত, মজ্জা, মেদ, মর্ম, সম্বিৎ, আশা সব মিলিয়া যে নারী সে তাহাদেরই নিখিল-ব্যাপী সারবিন্দু ঐ ছেলে। কিন্তু বড় দুরন্ত, ঘরবাড়ী যেন দুহাতে আকাশে তুলিয়া ঘুরাইতে থাকে—সংসার ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তা যাক্, কিন্তু ছেলে নিজের অকল্যাণ ঘটাইয়া না বসে। সরস্বতীর বুক ফাটায়, তার সতর্কতা এতই যেন সে দুই পাশে অতল গহ্বর লইয়া সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছে, গা টলিলে পা টলিলে, মাথা টলিলে আর রক্ষা থাকিবে না। ভাবিয়া সরস্বতীর গা ঘামিতে থাকে।

তার নিজেরও মনে পড়ে, এবং আরো আগেকার কথা, শাশুড়ী বলিতেন, বিশ্বনাথও অমনি দুদান্ত দুর্বশ্য ছিল। সুবোধও তেমনি অশান্ত। সরস্বতী আশা করে, বাপেরই মতো বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার এই দুর্দম ঝঞ্ঝার বেগ শান্ত হইয়া আসিবে। কিন্তু এখন যে বড় নিরুপায় মনে হয়। ভয়ের যে অবধি নাই! শুধু সে মা নয়, সে অভিভাবিকা। মৃত্যুশয্যায় স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, আর, পরম অমূল্য একটি মর্যাদা দিয়া ছেলের ভার অর্পণ করিয়া গেছেন, তাঁর মুখ দিয়া লুপ্ত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধারের আশার কথা, আর, পিতৃকুলের আশীর্বাদ আর আকাঙ্ক্ষা নির্গত হইয়াছিল, তর্পণপিপাসু পরলোকগত আত্মা এই বংশধরের দিকে চাহিয়া আছেন।

সরস্বতী ছেলের কথা ভাবে—ছেলের দায়িত্ব আর কর্তব্য অশেষ।

সুবোধের চেহারা তার বাপের মতো নয়; কিন্তু সময় সময় সরস্বতী হঠাৎ চমকিয়া ওঠে—ছেলের

ঠোঁট যেন ঠিক সেইরকম করিয়া মুচড়াইয়া ওঠে, হাসিটা যেন তেমনি ভঙ্গীতে ফোটে, চোখের চাহনিটা তেমনি সতেজ মনে হয় পরক্ষণেই সে বিভ্রম লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু অতীতের স্মৃতি উদ্দীপ্ত প্রখরতর হইয়া ওঠে।

—তিন—

মাথায় টিকি—টিকিটা বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আর সব আগাগোড়া এমন অপরিষ্কার যে, সেদিকে চাহিয়াই মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইতে হয়। গোঁফ দাড়ি কবে কামানো হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদের উদ্দাম প্রাচুর্যে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের মুখখানা সশস্ত্র কেল্লার মতো প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে, পরিধানের কাপড়খানা কাঁধের উড়ুনি (ঠাকুরের নিজের ভাষায় উত্তরীয়), যার বলে এত দর্প সেই উপবীত, এমন ময়লা যে, সে পথ ধরিয়া স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা করে না। গা দিয়া ঘাম ঝরিয়াছিল, সেই ঘাম মরিয়া গায়ের ময়লা স্থানে স্থানে ধাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাত পায়ের নখগুলি বড়বড়, ঠাকুর ডানা ঝুলকাইয়াছিলেন বলিয়া হাতের নখের ভিতর কাদা ঢুকিয়াছে, আর, ডানার উপর আধ আঙুল ফাঁক ফাঁক কাটা তিনেক ময়লার আঁশ উঠিয়া আছে। পা মাটি ঘাঁটিয়া চলে—তার কথা আর নাই বলিলাম।

ইহারেই সরস্বতী প্রতিবেশিনীর গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছে। পায়ের ধুলা, ব্রহ্মবাক্য, আশীর্বাদ, এবং অজ্ঞাত যদি কোনো শক্তি থাকে তবে তাহাও প্রযোগ করিয়া ইনি শান্তি সুমতি সান্ত্বনা কল্যাণাদি ঘটাইয়া দিবেন; ছেলের হাত দেখিয়া ইনি তার ভবিষ্যৎও বলিবেন; ছেলের মানুষ হইবার অদৃষ্ট আছে কিনা, না, ছোঁড়ানচড়ের মতোই সে চিরকাল বেড়াইবে! হাতের উপর বিধাতার লিপির লেখা পাঠ করিয়া ঠাকুর সাবধান করিয়া দিবেন। আরও কত কি যে ইনি বলিতে পারেন, তুষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিলেই কত কি যে করিতে পারেন তাহা সরস্বতীর ধারণাতেই আসিল না। এই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্দৈব আর দুরদৃষ্টের স্পর্শাতীত স্থানে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো তাহার ছুটি করাইয়া দিতে পারেন।

সরস্বতী উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁর পদধূলি লইল।

ঠাকুর টুলে বসিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্বক নিজের নাক বরাবর পা তুলিয়া পায়ের জল মুছিতেছেন, এমন সময় সুবোধ দিগিজয় করিয়া ফিরিল—কপালে ঘাম ফুটিয়া তার মুখখানা তখন আরো সুশ্রী বেপরোয়া দেখাইতেছে।

সরস্বতী বলিল,—এই ছেলে, বাবা। আমার চোখের মণি।

কোমল চক্ষে ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন,—তা ত হবেই। বিধবার সন্তান! আহা! কিছু ভাবিস্‌নে, মা; ছেলের মুখে চোখে যে লক্ষণ দেখছি তা'তে তোর ছেলে অত্যন্ত ভাগ্যমান। হবেই ত'। বাপ ঠাকুরদার পৌরষ ছিল কত!—বলিতে বলিতে ঠাকুর পায়ের জল মুছিয়া শেষ করিলেন। আকাশস্থ পা আবার মাটিতে নামিল।

ঠাকুর ভূমিকায় যাহা শুনিয়াছেন তাহা হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, ইহাদের সুদিন কেবল সেদিন গেছে। সে-অনুমান না করিলেও, পূর্বপুরুষের প্রশংসাকীর্তনে গর্বে আনন্দে গদগদ আর বেসামাল না হইয়া ওঠে এমন মানুষ ত' ঠাকুরের চোখে পড়ে নাই। বড় বড় রথীকেই তিনি ঐ অস্ত্রে ঘা'ল করিয়াছেন—এ ত' স্ত্রীলোক।

—সুবোধ এদিকে আয়; ঠাকুরমশাইকে গড় কর। বলিয়া সরস্বতী সুবোধকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

ঠাকুরের টিকি ছিল পিছনে; কিন্তু টাক আর নাক ছিল সম্মুখেই। সুবোধ ঠাকুর মহাশয়কে গড় করিয়া সেই টাক আর নাকের বিপুলতার দিকে চাহিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল; ঠাকুর তার ডান হাতখানা তুলিয়া লইয়া একনজর দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—ইস্!

সরস্বতী আঁৎকাইয়া উঠিল : "কি, বাবা"? সুবোধের হাতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—বিষুব রেখা চক্রকেন্দ্র স্পর্শ করে' গেছে ; ফলম্ ধনাগমম্। তোর এ ছেলে দ্বাদশ বৎসর বয়সেই প্রচুর ধনের অধিকারী হবে, মা।

সরস্বতী ভাবিতে লাগিল—

ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন।

ভাবিয়া সরস্বতী বলিল,—বাবা, ওকে কি কেউ পুষ্যিপুত্তুর নেবে?

—না; তবে হস্তরেখায় দেখছি, নিরন্নের অন্নদাতা, আয়ুষ্কালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ; দ্বাদশ বৎসর থেকে তার পত্তন; ধীরে ধীরে উন্নতি ‥রেখার সমাপ্তি ; গুরুকুণ্ডলী চক্রং ; স্বর্গে শুভং কার্যং পাতালে ভদ্রা চ ধনাগমঃ...

বলিয়া ঠাকুর সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া পুলকিত নেত্রে হাসিতে লাগিলেন।

সরস্বতী ব্যাকুল হইয়া বলিল,—বাবা আমায় সব কথা ভাল করে' বুঝিয়ে বলো। ছেলে লেখাপড়া কেমন শিখবে; যে যা করে' সুখী হবে কিনা; বাপ ঠাকুদ্দার নাম রাখতে পারবে কি না।

অতিশয় মোলায়েম কণ্ঠে ঠাকুর বলিলেন,—পারবে; আরো উজ্জ্বল করবে। ছেলে তোর দীর্ঘজীবী হবে।

—বড় দুরন্ত যে।

—তা' হোক, এমন থাকবে না।

সরস্বতীর মনে পড়িল, স্বামীও অল্প বয়সে অতিশয় একগুঁয়ে দৌরাত্ম্যপরায়ণ ছিলেন। মিলিয়া গেছে দেখিয়া সে পুলকিত হইল।

ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বাপের ধারা পেয়েছে বোধ হয়। লেখাপড়া তেমন শিখবে না।

ঠাকুর জানেন, লেখাপড়া শিখাইবার ক্ষমতাই ছেলের মায়ের নাই। বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু যার বুদ্ধি খর সে কেটে বেরিয়ে যাবেই। তোমাকে ও সর্বপ্রকারে সুখী করবে; নাতি নাতনীতে ঘর ভরে' যাবে। দেখি, মা, তোর বাঁ হাতখানা।

সরস্বতীর প্রসারিত বাম করতলের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—মৃত্যু পঁচাশী বৎসর বয়সে, মহাতীর্থে। মা, তোর ভাগ্য ভাল। দেখতে দেখতে এ-দুর্দিন কেটে যাবে। তোর চক্রাধিপতি স্বয়ং নারায়ণ।

শুনিয়া সরস্বতী শিহরিয়া উঠিল : শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সর্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠেশ্বর, বামে লক্ষ্মী বিরাজিতা—ত্রিভুবনপূজিত সেই নারায়ণ তার আপন!

সরস্বতী গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এমন ভক্তিভরে যেন ঠাকুরের এই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়া ওঠা, আর, দীর্ঘ জীবনব্যাপী এত সৌভাগ্য ঠাকুরেরই এখনকার সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে।

সুবোধ লাফাইয়া উঠানে পড়িল—ঠাকুরের রূপ আর মজা দেখা তার শেষ হইয়াছে।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—এই উৎপাতটা একটু সয়ে থাকিস, মা। ধর্মে মতি, দেব দ্বিজে ভক্তি ওর হবে, এমনি করেই হবে।

তারপর আরো দশবিশটা বুকজুড়ানো ঠাণ্ডা কথা বলিয়া হারাধন ঠাকুর আটগণ্ডা পয়সা, একসের চা'ল, দু'টি গোল আলু গামছায় বাঁধিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সরস্বতীর সঙ্কুচিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এতেই আমি তুষ্ট হয়েছি, মা; ভক্তি করে' যা' দিয়েছ তা'ই যথেষ্ট। নারায়ণ তুলসী পেলেই খুশী। তোমার চলে কিসে?

সরস্বতী পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; বলিল—বাড়ী বাড়ী থেকে ধান দিয়ে যায়। তাই চা'ল করে' দি'। শুনিয়া ঠাকুর প্রস্থান করিলেন।

—চার—

সেইদিনই—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে; কিন্তু সুবোধের এখনো দেখা নাই। সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকার অভ্যাস তার নাই—

তার নিজেরই কিসের যেন ভয় আছে। কিন্তু আজ এখনো সে আসে নাই। সরস্বতীর উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল…

সন্ধ্যা-প্রদীপ সে জ্বালিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত আনমনায়। তুলসীমূলে প্রণাম করিবার সময় কাহাকে সে প্রণাম করিতেছে, বুকে জল ছল্‌ছল্‌ করিয়া তাহার তা মনে পড়ে নাই। দুপ্‌দাপ্‌ একটা পায়ের শব্দ থাকিয়া থাকিয়া তার কানে আসিতেছে, কিন্তু সেটা তাহারই অশান্ত মনের ভুল—দুয়ারের দিকে চোখ পাতিয়া থাকিতে থাকিতে দুঃসহ আতঙ্কে সে বারবার চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিল….

বাহিরের ঘন অন্ধকার ঘনতর হইয়া দূরের আকাশ, দূরের দৃশ্য যেন চিরদিনের মতো গলাধঃকরণ করিয়া অজগরের মতো অগ্রসর হইতে লাগিল; কলের চিম্‌নিটা, শ্বেত একটা অট্টালিকার খানিকটা, ফলশোভিত খর্জুর বৃক্ষটি, গৃহচূড়াগুলি, চিরপরিচিত যারা তারা চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকারের জঠরে নিরবশিষ্ট হইয়া একে একে নিঃশব্দে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মূকের নীরব বেদনা সরস্বতীর প্রাণে বাজিতে লাগিল।

সুবোধ এখন কোথায়, কেমন আছে, কে জানে। হঠাৎ শুকাইয়া উঠিয়া সরস্বতীর বুকের বায়ু বুকের ভিতরেই আটকাইয়া অচল হইয়া রহিল; আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সরস্বতী উঠিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—তার গলির ভিতর হইতে সদর রাস্তার হাত দুয়েক মাত্র দরজা হইতে দেখা যায়। লোকজন যাতায়াত করিতেছে—অতি অল্প সময়ের জন্য মানুষের অবয়বটা আর তার গতিটা চোখে পড়ে।

সরস্বতীর একাগ্র উন্মুখ বিহ্বল চোখের সম্মুখে আবছায়া অন্ধকারে যেন ভৌতিক ছায়াবাজি চলিতে লাগিল।

ঘরের প্রদীপ তেল ফুরাইয়া নিবিয়া গেল; চাঁদ ছিল না; আকাশে তার আভা ফুটিয়া উজ্জলতর হইয়া উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যার নক্ষত্রটি আড়ালে নামিয়া গেল; লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিল। কোথা হইতে স্যাকরার হাতুড়ির খট্‌খট্‌ শব্দ আসিতেছিল, জাগ্রত পৃথিবীর সমাচারের মতো—সেটা বন্ধ হইয়া গেল।

সরস্বতী গলির প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া তার দুয়ারে দাঁড়াইল…

কুকুরের ডাক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; চতুর্দিকে সেই নিশাচরের সতর্ক কণ্ঠ তার নিজের ভাষায় পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, যেমন উচ্চ তেমনি গভীর। দ্রুতবেগে কি একটা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সরস্বতীর হাঁটু দুটি যেন জড়াইয়া আসিতে লাগিল…

কিন্তু সুবোধের দেখা নাই।

অনেক দূরে চৌকিদার হাঁক ছাড়িল। সরস্বতী যাইয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

—পাঁচ—

বিশ্বনাথের জীবিতাবস্থার মনিব মাধব দত্ত চেয়ারে বসিয়াছিলেন, যাত্রা শুনিতেছিলেন। সরস্বতী কেমন করিয়া জানিবে যে, তার সুবোধ সঙ্গীগণসহ সেই চেয়ারের কাছাকাছিই বসিয়া গেছে, আর, বসিয়া বসিয়া যাত্রা শুনিতেছে। তা তারা শুনুক, কিন্তু মাধব দত্ত অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাত্রার সবগুলি পাত্রপাত্রীকেই তাঁর মনে হইতেছিল যেন সং। দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি জনক, পঞ্চমুখ ব্রহ্মা, মহাতপা মুনি হইতে ভগ্নদূতটি পর্যন্ত কি যে বলিতেছে আর কি যে করিতেছে—তার না হয় অর্থ, তাতে না আছে রস।

অর্থ আর রস তাদের কথায় কার্যে হয়তো ছিল। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মাধব দত্ত অতিশয় গোপনে পাত্র টানিয়া যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর রসবোধ লইয়া যাত্রা শুনিতে বসিয়াছিলেন তাহাই যেন কেমন—কাজেই রাজর্ষি মহর্ষি প্রভৃতির কথাবার্তা আর ক্রিয়াকলাপ তাঁর ভাল লাগিল না; খানিক ঢুলিয়া খানিক সজাগ হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে লণ্ঠন লইয়া পানু আসিয়াছিল—তাহাকে অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিয়া তিনি অটল পদে অগ্রগামী হইলেন।

আসরের বাতাস লোকের নিঃশ্বাসে গরম হইয়া উঠিয়াছিল—বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগিয়া মাধব দত্ত আরামবোধ করিলেন।

ব্যাটারা যেন কি! একটু আক্কেল যদি ব্যাটাদের থাকে! এ কি যাত্রা না ছাই! দল ছিল যাদব পাকড়াশীর—যাত্রা বলে যাকে! গাইত কি! চারচৌকশ ছিল তারা। এদের ডেকে বলে দিতে হবে। এমন গান না করে যেন বেগুন বেচে।

ভাবিতে ভাবিতে নিজের রসটাই ষোলআনা উপভোগ করিয়া মাধব দত্ত মনে মনে খুব হাসিতে লাগিলেন; খানিক হাসিবার পর জানিতে চাহিলেন—ওরে পান্নু, গান শুনলি?

পান্নু পিছন হইতে বলিল,—আজ্ঞে, শুনলাম।

—কেমন শুনলি?

ইতস্ততঃ করিয়া পান্নু মনের কথাটাই বলিল,—মন্দ নয়, বাবু!

—হি হি। তোর যেমন আক্কেল তেমন আদেখলে মন। যাত্রা ছিল যাদব পাকড়াশীর—গান একবার জুড়লে কার সাধ্য নড়ে; ঠায় বসিয়ে রাখবে শেষ রাত অবধি।

পান্নু বলিল,—যে আজ্ঞে।

—তাই বল্। থিয়েটার দেখেছিস্ কখনো?

—দেখেছি, বাবু; এখানকার বাবুদের।

শুনিয়া মাধব দত্ত অট্টহাস্য করিলেন,—এখানকার বাবুদের থিয়েটার! সে ত' থিয়েটারের ঠাট্টা রে। আমিও দেখেছি' এদের সব পৌরাণিক বাবু; ভীম অর্জুন সবাইকে এরা নিজেদের ঢঙে সাজায়—বুঝলি রে? এরা ভুল করে। কলকাতার থিয়েটার আমি দেখেছি। আমরা বলি থিয়েটার, তারা বলে রঙ্গালয়। রঙ্গালয় নয়, যেন নন্দন-কানন—হারে রে রে ঝম্‌ঝম্ করছে একেবারে! নিজেরা ত সাজেই যাকে যেমনটি মানায়—চ্যাপ্‌টা-নাক মেয়ে-গুলোকে এমন অপ্সরী সাজায় যে—বুঝলি, পান্নু?

পান্নু সাড়া দিল; বলিল,—আজ্ঞে শুনছি।

—শোন্ ভাই। এমন সাজায় মেয়েগুলোকে যে, দেখলে তুই বল্‌বি ওরা জাদু জানে; তুই আর আসতে চাইবিনে। দেখেছিস কখনো?

চ্যাপটানাক মেয়েরা অপ্সরা সাজিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে, সে আর আসিতে চাহিবে না, বাবুর মুখে এমন কথা শুনিয়া পান্নু টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল, বাবু কি!—বলিল,—দেখিনি, বাবু।

—দেখে আসিস একবার; গোজন্ম উদ্ধার হয়ে যাবি। সেখানকার রাবণ বিভীষণের দাদা, এখানকার লক্ষ্ণ নায়েকের ভাগনে নয়। আরে এখানে সেখানে বিস্তর—

বলিতে বলিতে মাধব দত্ত ঝপ করিয়া থামিয়া গেলেন। মাধব দত্তের চোখে পড়িল, হাত দশেক দূরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। পথ নির্জন, আর রাত দুপুর। মনিব যাহা অনুমান করিয়া লইলেন তাহা একেবারেই ভুল।

সরস্বতীও তাঁহাকে দেখিয়াছিল; মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সে একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল—

মাধব দত্ত ধীরে ধীরে তার নিকটবর্তী হইলেন; বলিলেন—ছুটো দেখছি। দরদস্তুর করতে হবে, না এক দরে বিক্রয়?—বলিয়া তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন, এমন নির্ভয়ে যেন অবধ্য দূত তিনি।

পুত্রবতী কুলবধূর সম্মুখে তখন স্বর্গত সপ্ত পুরুষ হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—প্রশ্ন করিতেছিল: যে আমাদের রক্তের ধারা আর নামের স্মৃতি বহন করিবে, আর জল দিয়া তিল দিয়া তর্পণ করিয়া আমাদের শীতল করিবে, সে কই? সুবোধ কোথায়? কেমন আছে সে?

প্রশ্নের উত্তর ছিল না—

ত্রাসে সরস্বতীর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল—

মাধবের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়ালোক সহস্রবাহু রাক্ষসের মতো তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল—কি উদ্দেশ্যে সে চারিদিকে চাহিল তাহা সে নিজেই জানে না; কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল একটা লোহার ভাঙা গরাদে; অর্ধ-চেতনা অর্ধ-অচেতনার মাঝেই সে

চক্ষের নিমেষে সেটা তুলিয়া লইয়া মাধব দত্তের গা বরাবর বসাইয়া দিল এক ঘা। ঘা কোথায় পড়িল কে জানে; মাধব দত্ত একবার পাক খাইয়া "মরিছি" বলিয়া ধরাশায়ী হইলেন—বিরাট উদর আকাশে তুলিয়া তিনি নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন....

পান্নু তফাতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল—

ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া হাত পা কাঁপিয়া তার হাতের লণ্ঠন মাটিতে পড়িয়া গেল; পরক্ষণেই সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল: খুন, খুন....

এবং দেখিতে দেখিতে সেই জনমানবহীন রাজপথের উপর জনারণ্য যেন মাটি ফুঁড়িয়া গজাইয়া উঠিল। গরমের দিনে মানুষের ঘুম তখনও আঁটে নাই; চতুর্দিকের দরজা খুলিয়া হু হু শব্দে লোক বাহির হইয়া আসিল; শতকণ্ঠে প্রশ্ন হইতে লাগিল: কে মারলে?

পান্নু বলিল,—ঐ মাগী।

সরস্বতীকে সে চিনিতে পারে নাই।

সরস্বতী তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে; সুবোধ যে তখনও ফেরে নাই এ অশেষ উৎকণ্ঠাও তার লুপ্ত হইয়া গেছে—তখন কেবল লোকের কলরব সুদূরাগত অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনধ্বনির মতো তার কানে আসিতেছে...

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে,—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল, সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ছিল, এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল,...তবে বহু শতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা সমস্তই সার্থক হইবে,—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে,—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।—রবীন্দ্রনাথ।

কপালকুণ্ডলার ভূমিকা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

দুই

'কপালকুণ্ডলা'র ভাব-বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, অতঃপর ইহার কাব্য-পরিচয় আরম্ভ করিলাম 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান-বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ।—

এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। নবকুমার নামে সপ্তগ্রামবাসী এক গৃহস্থ যুবক গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম হইতে দেশে ফিরিবার কালে ঘটনাচক্রে সমুদ্র-তীরবর্তী এক নির্জন বনভূমিতে সহযাত্রিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ওই বনে এক কাপালিক বাস করিত, সে সেই নির্জনস্থানে তাহার তান্ত্রিক সাধনার আসন করিয়াছিল। কিছুদূরে বনের অপর প্রান্তে একটি কালী-মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের অধিকারী ঐ বনের দ্বিতীয় অধিবাসী। আরও একজন ছিল—ঐ কাপালিক এক কন্যাকে শৈশব হইতে পালন করিয়াছিল, তাহার নাম কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার প্রথমে সেই কাপালিকের দর্শনলাভ করে এবং তাহারই আশ্রয়ে একরাত্রি ও একদিন যাপন করে। তাহাকে দৈবপ্রেরিত মনে করিয়া কাপালিক তাহার ইষ্টদেবীর তর্পণার্থে নবকুমারকে বলি দিতে মনস্থ করিয়াছিল, আয়োজনও করিয়াছিল, কিন্তু সেই কন্যা কপালকুণ্ডলা ইতিমধ্যে নবকুমারকে দেখিয়া এবং পরে কাপালিকের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহাকে সুকৌশলে উদ্ধার করে, এবং সেই দূরস্থ দেবীমন্দিরে তাহাকে লুকাইয়া রাখে। মন্দিরের অধিকারী সেই পূজারী ব্রাহ্মণ এই কার্যে সহায়তা করিলেও, কপালকুণ্ডলার প্রতি কাপালিকের ভীষণ রোষ ও তাহার ফল কি হইবে স্মরণ করিয়া উভয়ের বিবাহ দিয়া, নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকেও সেই স্থান হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দিল—যাহাতে কাপালিক আর তাহার সন্ধান না পায়।

পথে এক চটিতে অবস্থান কালে নবকুমারের সহিত তাহার পূর্ব-বিবাহিত ও বহুকাল-পরিত্যক্ত পত্নী পদ্মাবতীর সহিত হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, সেও ঐ পথে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে অতিশয় বিপন্ন অবস্থায় সেই একই চটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু পদ্মাবতী এখন আর বালিকা নহে; তাহার পিতা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া আগ্রার ওমরাহসমাজে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পদ্মাবতীর এখন নাম হইয়াছে, লুৎফ-উন্নিসা; এখন সে পূর্ণবয়স্কা যুবতী, তাহার বেশভূষা, কথাবার্তা ও আদব-কায়দা অতিশয় সম্ভ্রান্ত মোগল-অন্তঃপুরিকার ন্যায়। তাই এতদিন পরে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। বয়সের সহিত নবকুমারের চেহারার পরিবর্তন হইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকার এবং অস্পষ্ট দীপালোকও একটা কারণ। লুৎফউন্নিসা একটা গুরুতর রাজনৈতিক অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিল, এখন এই পথে ফিরিতেছে।

সঙ্গে লোকজন দাসদাসীও আছে। এইরূপ ভ্রমণকালে সে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া থাকে, সে নাম—মতিবিবি।

নবকুমার তাহাকে চিনিল না বটে, কিন্তু মতিবিবি তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল, এবং সেই মুহূর্তে অন্তরে একটা প্রবল বেদনা ও বাসনা অনুভব করিল। সে-ও আর বিবাহ করে নাই, আগ্রার বিলাস-ঐশ্বর্যে লালিত হইয়া সে এতদিন অতিশয় দুর্নীতিপূর্ণ ভোগসর্বস্ব জীবন যাপন করিতেছিল। আজ তাহার বিবাহিত স্বামীকে দেখিয়া সে পুনরায় দাম্পত্য সুখভোগের জন্য আকুল হইয়া উঠিল, অথবা এইবার সে সত্যই প্রথম প্রেমে পড়িল। সপত্নী কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যদিও সে তাহার রূপে ও স্বভাব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইল, তথাপি আশা ছাড়িল না, কারণ সে নিজেও অসামান্য রূপবতী। ইহার কিছুদিন পরে সে আগ্রার ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া একান্তে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল, উদ্দেশ্য—নবকুমারকে তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজের সেই কামনা চরিতার্থ করিবে।

এদিকে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্বগৃহে আনিয়া নব সুখের আশায় নূতন করিয়া সংসার পাতিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এমনই যে, সে কিছুতেই সংসার বা সমাজের শাসন, এমন কি—স্নেহপ্রেমের বন্ধনও স্বীকার করিবে না। সে নিজের সুখেও সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবলই পরের প্রতি করুণাময়ী। নবকুমার যতই তাহার প্রতি প্রেম-বিহ্বল হয় সে ততই কঠিন হইয়া উঠে—সেই ব্যাকুলতা তাহার কৃপা উদ্রেক করে মাত্র।

মতিবিবি সকল সংবাদই লইতেছিল। সে নানা ছলে নবকুমারকে নিজগৃহে আনিয়া বহুপ্রকারে তাহার প্রেমভিক্ষা করিল; নবকুমার প্রতিবার তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে একদিন এইরূপ সাক্ষাৎকালে, উত্তেজিত ও অপমানিত মতিবিবির মুখে সে যখন শুনিল যে, সে তাহারই প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী, তখন সে আরও ভীত ও চিন্তিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল, আর তথায় পদার্পণ করিল না।

মতিবিবি তাহাতেও হতাশ হইল না, বরং আরও কঠিন সংকল্প করিল। অতঃপর সে এক অভিসন্ধি করিয়া নবকুমারের গৃহসন্নিহিত নিবিড় অরণ্যে পুরুষবেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, স্বাধীনপ্রকৃতি স্বেচ্ছাবিহারিণী সরলহৃদয়া কপালকুণ্ডলাকে ঐ বনে সে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, এবং ঐ পুরুষবেশেই তাহার সহিত এমনভাবে মিশিবে, যাহাতে তাহাদের সেই বন্ধুত্ব ক্রমে নবকুমারের চিত্তে ঘোরতর সন্দেহ উদ্রেক করে। এইরূপে কপালকুণ্ডলাকে স্বামীপ্রেম-বঞ্চিত করিতে পারিলেই সে অনায়াসে নবকুমারকে জয় করিতে পারিবে—ইহাই তাহার বিশ্বাস।

হঠাৎ দুইটা সুযোগ ঘটিল। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে সেই সমুদ্রতীরবাসী কাপালিকের দেখা পাইল। কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নবকুমারের উদ্ধারসাধনের পরে সেই রাত্রেই কাপালিক তাহাদের সন্ধানে একটা বালুস্তূপের শিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল; ঐ স্তূপের তলদেশ বর্ষার জলস্রোতে একদিকে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, কাপালিক তাহা লক্ষ্য করে নাই, সেইক্ষণে সহসা স্তূপসহ ভূপতিত হইয়া তাহার দুইবাহু ভগ্ন হইয়া যায়। তথাপি সেই অবস্থাতেও বহুসন্ধানের পরে এতদিনে সে নবকুমারের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ বনের মধ্যেই সে পুনরায় তাহার আসন করিয়াছে; এবার সে কপালকুণ্ডলাকেই বলি দিবে,—এতদিন দেরী করিয়াছিল বলিয়াই দেবী তাহাকে ঐ শাস্তি দিয়াছেন, আর সে ভুল করিবে না। মতিবিবি এই কাপালিকের দ্বারা কিছু সাহায্য পাইবার আশা করিল—দুইজনে একটা ষড়যন্ত্র চলিল।

দ্বিতীয় সুযোগ এই যে, ঠিক ঐ সময়ে কপালকুণ্ডলা তাহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর দুঃখমোচনের জন্য—

স্বামীসহবাসবঞ্চিতা কুলীন-কন্যার পতি-বশীকরণ-কার্যে সহায়তা করিবার জন্য—রাত্রিকালে বন হইতে একটি লতামূল সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিল। বনে মতিবিবির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে কাপালিকের পুনরাবির্ভাব ও তাহার কারণ অবগত হইল, তাহাতে তাহার পূর্ব জীবনের সেই সংস্কার এবং কাপালিকের প্রতি তাহার সেই পূর্ব মনোভাব আবার জাগ্রত হইল। প্রথমদিন সে সবকথা শুনিবার অবসর পায় নাই, লতামূলও সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই পরদিন সে মতিবিবির পুরুষ-নামে স্বাক্ষরিত একখানি ক্ষুদ্রলিপি পাইয়া পুনরায় রাত্রিকালে বনে বাহির হইল; নবকুমার দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিল, সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিষেধ মানিল না। ইহার পর নবকুমার সেই লিপিখানিও কুড়াইয়া পাইল, লিপি পাঠ করিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল—হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। কাপালিক পূর্বরাত্রে কপালকুণ্ডলার অজ্ঞাতসারে তাহার অনুসরণ করিয়া বনপথে নবকুমারের গৃহে প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বারপথ দেখিয়া গিয়াছিল; আজ সে ঐ সময়ে গৃহের নিকটে থাকিয়া সকলই লক্ষ্য করিতেছিল। কপালকুণ্ডলার বহির্গমন, নবকুমারের সেই আকস্মিক দুরবস্থা ও তাহার কারণ, সকলই তাহার কার্যসিদ্ধির বড় অনুকূল হইল। সেই সময়ে কাপালিক সহসা নবকুমারের গৃহপ্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে যেমন বিস্মিত করিল, তেমনই, পুরুষবেশী মতিবিবির অবৈধ প্রণয় উল্লেখ করিয়া তাহার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করিল; শেষে তাহাকে নিঃসংশয় করিবার জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল, এবং কিছুদূর গিয়া একস্থানে সেই পুরুষের সহিত আলাপরতা কপালকুণ্ডলাকে দেখাইয়া দিল। ইহার পর নবকুমারের বুদ্ধিলোপ হইল। সেই অবস্থায় কাপালিক তাহাকে মদ্যপান করাইল, এবং তদ্দ্বারা নবকুমারকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, কপালকুণ্ডলাকে ধরিয়া বলি দিবার জন্য পূজার স্থানে লইয়া যাইতে তাহাকে সম্মত করিল।

তখন কপালকুণ্ডলা মতিবিবির মুখে কাপালিক সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় বিচলিতচিত্তে সেই অন্ধকার বনপথ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে অতি গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে ডাকিল, সেইস্বরে চমকিত হইয়া কপালকুণ্ডলা ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তৎক্ষণাৎ কাপালিককে চিনিতে পারিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। কাপালিক তাহাকে গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া বলির পূর্বে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য নবকুমারকে আদেশ করিল। মদিরার প্রভাবে নবকুমার তখন অপ্রকৃতিস্থ, সে তাহাকে লইয়া যে উচ্চ পাড়ের উপরে দাঁড়াইল—তাহা ভাঙ্গনের ধার, নীচে খরস্রোত বহিতেছে। সেইকালেও কপালকুণ্ডলার ধীর প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া সহসা নবকুমারের নেশা ছুটিয়া গেল, সে আকুলভাবে কপালকুণ্ডলাকে তাহার সেই হৃদয়বিদারক সন্দেহ দূর করিতে বলিল। কপালকুণ্ডলা সেই সন্দেহ দূর করিল, কিন্তু আর গৃহে ফিরিতে চাহিল না। তাহাতে নবকুমার আরও ব্যাকুল হইয়া যেমনই তাহার দিকে অগ্রসর হইল, অমনি কপালকুণ্ডলার পদতলস্থ সেই ভূমিখণ্ড ভাঙ্গিয়া তাহাকেও লইয়া, নদীগর্ভে পড়িয়া গেল; নবকুমারও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেহই আর উঠিল না।

এই আখ্যানে ঘটনার বাহুল্য নাই; ঘটনার ধারাও জটিল নয়, তাহার কারণ, ইহা যে সমাজ ও গৃহ-সংসারের কাহিনী তাহার জীবনযাত্রা অতিশয় সহজ ও সরল। অতিস্থির প্রবাহহীন জলতলে লোষ্ট্রক্ষেপের মত দুই একটা উৎপাত মাত্র আছে, তাহাতে সেই জলরাশি বিক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনার খাতে পূর্ববৎ বহিয়া চলে। লেখক এই জীবনযাত্রার পশ্চাতে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা যুক্ত করিয়াছেন বটে—কিন্তু ইহার মূল কাহিনীটি পারিবারিক, অতিশয় সাধারণ জীবনের কাহিনী। ইহার যাহা কিছু অভাবনীয়তা বা কাহিনীসুলভ চিত্ত-চমৎকার তাহার কারণ হইয়াছে দুইটি চরিত্র—একটি অসাধারণ, অপরটি অস্বাভাবিক। ইহার ঘটনাধারাও অবিচ্ছিন্ন নয়, এবং

তাহাতেও চরিত্রগুলি সাক্ষাৎভাবে সংশিষ্ট নয় ; অর্থাৎ পাত্রপাত্রী নিজ নিজ স্বভাব বা প্রবৃত্তির বশে যে কর্মজালে জড়াইয়া পড়ে, ঐ ঘটনাজাল সেইরূপ একটা বয়নবন্ধ নহে—ঘটনাগুলি দৈবের মত বাহির হইতেই ঘটে, এবং তাহার সংঘাতে চরিত্রগুলি যেন অভিভূত হইয়া তাহাদের গূঢ়তর প্রবৃত্তি-প্রকাশ করিয়া ফেলে

এইজন্য উপন্যাসহিসাবে কপালকুণ্ডলা বিশেষ নৈপুণ্য দাবী করিতে পারে না। মাত্র একটি কালানুক্রম-সূত্রে কতকগুলি ঘটনা গ্রথিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে এমন কয়েকটি সংস্থিতির (situation) সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে ঐ রোমান্টিক কাব্যকল্পনা একপ্রকার নাটকীয় রস রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটকহিসাবে দেখিলে, ইহার ঘটনাচক্র (plot বা action) যে চারিটি খণ্ডে বা অঙ্কে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেই নাটকের crisis বা নায়ক-ভাগ্যের সেই সঙ্কট মুহূর্ত দেখা দিয়াছে—যাহাকে তাহার জীবনের একটা গুরুতর সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহই সেই crisis, তাহাতে নায়ক জয়লাভ করিয়া যেন সৌভাগ্যের পথে পদার্পণ করিল, কিন্তু তাহার পরেই ভিন্নমুখে অবতরণ, এবং Catastrophe বা পূর্ণ-পতনের সূচনা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সেই catastrophe (পতন)-র বীজ দেখা দিয়াছে ও দ্রুত অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধ্যে গতি-নিবারণের একটু সম্ভাবনা জাগিয়াছিল—হয়ত নবকুমার বাঁচিয়া গেল, কারণ মতিবিবি তখনও একটা অতিশয় উচ্চাশা পোষণ করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্র তাহা ধূলিসাৎ হওয়ায়, এই ক্ষণ-রুদ্ধ পতন-বেগ শেষ খণ্ডে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। Crisis ও Catastrophe-র মধ্যে ঐ যে গতিবেগের একটু বিশ্রাম এবং তজ্জনিত একটা আশা বা সংশয়ের অবকাশ, উহাও একটা নাটকীয় কৌশল; এই উপন্যাসেও গ্রন্থকার সেই কৌশল করিয়াছেন—আগ্রার রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র এবং মেহেরুন্নিসাকেও এই জন্য আবশ্যক হইয়াছে। অতএব 'কপালকুণ্ডলা'র ঐ নাটকীয় প্রকৃতিই লক্ষণীয়—"কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গন্ধরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক"—এ উক্তি যথার্থ। আখ্যানের জটিলতা থাকিলে উহা গ্রীক নাটক হইতে পারিত না। তথাপি নাটকহিসাবেও ইহার গঠনে একটু অসামান্যতা আছে, কারণ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম অঙ্কেই ইহার crisis শেষ হইয়াছে—বাকি সমগ্র ঘটনাধারা একটা বিলম্বিত catastrophe মাত্র।

এইবার ইহার অন্তর্গত চরিত্রগুলির কথা। কাপালিকের চরিত্র স্বাভাবিক বা সামাজিক মানব-চরিত্র নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে একপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় সকল মনুষ্য-সুলভ সংস্কার বিসর্জন দিয়াছে ; তাহার যে ইষ্ট-দেবতা—তন্ত্রে তাহার বহুতর নাম আছে ; সেই মহাশক্তিকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া সেও মহাশক্তিমান হইতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একটা বিকৃতমস্তিষ্ক নর-পিশাচমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার ঐ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন এবং দুই একটি তত্ত্বকথার মত বচন শুনিয়া, এবং তাহার অসীম দেহবল ও নিষ্ঠুর মনোবল দেখিয়া প্রথমে যেমন ভয় ও বিস্ময় জাগে, পরে তাহার দুরবস্থা দর্শনে তেমনই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। একটা অমানুষিক সংকল্প-সিদ্ধির জন্য তাহার যে একাগ্রতা তাহাও যেন একটা 'fixed idea' বা একপ্রকার মানসিক ব্যাধির মত। গ্রন্থকার এ-চরিত্রে মনুষ্যপ্রকৃতির বিকৃতিই বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন ; এ চরিত্র স্বাভাবিকও নয়, আবার স্বভাবকে অতিক্রম করার যে মহত্ব তাহাও ইহাতে নাই।

কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অসাধারণত্ব আছে, তাহার কারণ পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তথাপি, গ্রন্থকার তাহার সেই অনমনীয়, অতিমানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও যতদূর সম্ভব রক্তমাংসের বাস্তবতা রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নারী-প্রকৃতিসুলভ দুর্বলতা হইতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় ; পালক-পিতার প্রতি কন্যার মত স্নেহভক্তিও তাহার আছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারও একপ্রকার ধর্মবিশ্বাস ও তজ্জনিত মিথ্যা

ভয় (superstition) আছে—বিল্বপত্রের ঘটনা ও তাহার মনে সেই ঘটনার প্রভাবই তাহার প্রমাণ। তৃতীয়তঃ, শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে সে যে দুঃখ অনুভব করে, তাহাও একটা সহজ নারীসুলভ সহানুভূতি। এইজন্য যদিও তাহার চরিত্রের আর সকল লক্ষণ—অতিরিক্ত সরলতা, ঘোরতর স্বার্থশূন্যতা ও চিত্তের দুদমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা—এ সকলই তাহাকে কবি-কল্পিত একটি মানসী (Ideal) প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি ঐ অপর লক্ষণগুলি সেই আদর্শকে সম্পূর্ণ অবাস্তব হইতে দেয় নাই। কিন্তু এই সকলের অন্তরালে যে একটি গুণ অপরগুলিকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহার সেই কঠোর অনাসক্তি বা ঔদাসীন্য—তাহাই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির কারণ হইয়াছে; সেই ঔদাসীন্যের কঠিন বেষ্টনী অতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়াই তাহার সহিত কোন মানুষের কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারিল না, সেই পাষাণ প্রাচীরে প্রহত হইয়া নবকুমারও চূর্ণ হইয়া গেল।

আখ্যানভাগে আর যে দুইটি প্রধান চরিত্র আছে তাহাদের একটি—এই উপন্যাসের নায়ক নবকুমার, আর একটি ইহার অন্যতম নায়িকা—মতিবিবি। কপালকুণ্ডলার মূল ভাববস্তু ও তাহার গভীরতর কাব্যরসের কথা ছাড়িয়া দিলে এই দুইটি চরিত্রই ইহার উপন্যাস-ধর্ম বজায় রাখিয়াছে। নবকুমার-চরিত্র লইয়াই উপন্যাসের আরম্ভ, এবং আরম্ভেই লেখক তাহাকে নায়কোচিত গুণসম্পন্ন করিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি একজন সুস্থ ও সবলচিত্ত যুবকের মত; তাহার স্বভাবে যে সৎকর্ম-প্রবৃত্তি আছে তাহাও পৌরুষের লক্ষণ। সে অতিশয় স্পষ্টভাষী, তাহার চিত্তও উদার—ধর্মশাস্ত্রের আদেশ সে অন্ধভাবে পালন করে না, তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তীর্থদর্শনের ছলে সে সমুদ্র ও সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছে—সে ভাবুক ও কাব্যরস-রসিক। লেখক প্রথম দুই পরিচ্ছেদেই নবকুমারের চরিত্র-পরিচয় প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পরবর্তী ঘটনাগুলিতে, বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া তাহার উদ্ধারসাধন, এবং পরে পথিমধ্যে মতিবিবির সহিত প্রথম সাক্ষাতে তাহার কর্তব্যবোধ, স্ত্রীজনের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও সংযমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে, ইংরাজীতে যাহাকে আদর্শ gentleman বলে সে তাহাই। পুরুষ-চরিত্রের এই আদর্শ আমাদের সাহিত্যে অতিশয় আধুনিক—বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রুচির পরিচায়ক। মতিবিবির গৃহে তাহাকে সেই প্রত্যাখ্যান করার দৃশ্যে এই চরিত্রে যে দৃঢ়তা যুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও একটু আধুনিকতার ছাপ আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নবকুমার-চরিত্রের এই সর্বাঙ্গীণ বলিষ্ঠতার পরিচয় আমরা কাহিনীর প্রথম-ভাগেই পাই। শেষের দিকে তাহার সেই পুরুষোচিত উদারতা ও সুস্থ বিচারবুদ্ধির অভাবই লক্ষ্য করি। এইরূপ পরিণাম ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষেও ঘটিয়া থাকে; অধঃপতনের কারণও সেই চরিত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। পুরুষ যতই মহৎ হোক, তাহার মনুষ্যসুলভ দুর্বলতা থাকিবেই—কোন না কোন রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া তাহার সেই মহত্ত্বকে নিষ্ফল করিয়া দেয়। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার পর তাহার জীবনে যে নূতন একটি অবস্থার সূত্রপাত হইল—কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার সেই আকস্মিক ও অতি-প্রবল অনুরাগই তাহার চরিত্রের মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দিল। লেখক তাহার হৃদয়কে এই প্রেমের দ্বারা বিস্ফারিত করিতে চাহিয়াছেন—এ চরিত্রের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক বটে; প্রেম এমন পুরুষকে আরও নিঃস্বার্থ আরও শক্তিমান করিবে। কিন্তু নবকুমারের প্রেম স্বাস্থ্য না হইয়া একটা ব্যাধিতে পরিণত হইল—একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার মত, রিপুর মত, তাহাকে আত্মভ্রষ্ট করিল। সর্বশেষে সে নিজেও তাহা বুঝিয়াছে—প্রেমের পরিবর্তে রূপমোহকেই তাহার দুরবস্থার কারণ বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছে (উপন্যাসের শেষ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ হইবার কারণ কি?

লেখক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর। এ চরিত্রের এইরূপ পরিবর্তন সহসা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কারণ অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টি অভ্রান্তই আছে; তাঁহার সৃষ্টি কল্পনা সৃষ্টিই করে এবং সে কল্পনা অব্যর্থ বলিয়া তিনি নিজে এই সকল গভীরতর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। নবকুমারের এই অস্বাভাবিক চরিত্রভ্রংশ একটা অস্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে সে কারণ কপালকুণ্ডলা, সে-ই সকল অস্বাভাবিকতার নিদান। কিন্তু ইহার একটা স্বাভাবিক কারণও নির্দেশ করা যায়। নবকুমারের সেই প্রথম বিবাহের পরিণাম এমনই লজ্জাজনক ও দুঃখকর হইয়াছিল—তাহার মত পুরুষের হৃদয়ে তথা আত্মসম্মানে, এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার ফলে সে আর বিবাহ করে নাই; ইহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ। সম্ভবতঃ নারীর সহিত ঐ সম্পর্ক সে অতঃপর ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহার মধ্যেও এই সংস্কার জাগ্রত ছিল; তাহার অন্তরের অন্তরে যেন একটা ভয় ছিল যে, নারী-সংস্পর্শ তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। পরে বিবাহবিমুখ নবকুমার কপালকুণ্ডলার অসাধারণ রূপ ও অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া, এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেও—বিবাহ করিল; তখন এতদিনের নিরুদ্ধ, অথচ সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনপিপাসা যেন প্রকৃতির প্রতিশোধের মত তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করিল। তথাপি তাহার প্রথমা পত্নীর সেই স্মৃতি, সেই দাহচিহ্ন সে ভুলিতে পারে নাই; ফলে সে এই স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্দেহ-কাতর হইয়া ওঠে। বাহিরেও যেমন সেই পদ্মাবতী তাহাকে এখনও অনুসরণ করিতেছে, ভিতরেও সেই পত্নীর স্মৃতি তাহার প্রেমকে পঙ্গু করিয়া তাহার চরিত্রের এমন অবনতি ঘটাইয়াছে।

মতিবিবি-চরিত্র লেখক নিজেই এমন সবিস্তারে ও গাঢ় বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন এবং নিজেই তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার পর সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই বটে, তথাপি এই চরিত্র উপন্যাসের এক ভাগে এমন রসসৃষ্টি করিয়াছে যে, পাঠকের দিক দিয়া ওই চরিত্রের কাব্য-সৌন্দর্য-বিচার করিবার পৃথক প্রয়োজন আছে। এই চরিত্রসৃষ্টিতে নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে তাঁহার দৃষ্টি একটা ভাববস্তু বা তত্ত্বরসে নিবদ্ধ ছিল, এখানে তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছে—সেখানে যাহার অবকাশ ছিল না, এখানে তাহার পূর্ণ অবকাশ মিলিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া দেখিতে পাই, যে মুহূর্তে মতিবিবির আবির্ভাব হইয়াছে সেই মুহূর্তেই উপন্যাসের আখ্যান-গ্রন্থি দৃঢ়তর হইয়াছে; নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনের ঠিক প্রবেশপথে সেই পথের অন্তও দেখা দিয়াছে। মতিবিবি যেন নবকুমারের প্রাক্তন কর্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন—সেই কর্মশৃঙ্খলই এই উপন্যাসের ঘটনাকে প্রসারিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জীবনে এমনই করিয়া গ্রন্থি পড়ে এবং গ্রন্থিমোচন হয়; যেন তাহার আদ্যন্ত একটা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কর্মধারায় সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। জীবনের আলেখ্যরচনায় যে কবি এই তত্ত্বটি আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন—আদ্য, মধ্য ও অন্তকে এমনই একটা নিয়মাধীন দেখাইতে পারেন, তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর; ঐ প্লট বা আদ্যন্তযুক্ত কাহিনীনির্মাণই সেইরূপ সৃষ্টি-প্রতিভার প্রধান কৃতিত্ব।

আবার, এই চরিত্রই উপন্যাসের রসবস্তুকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি ও পল্লীসমাজের যে মূল বর্ণভূমিকায় এই আখ্যান চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপরে একটি বিপরীত বর্ণের অত্যুজ্জ্বল ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছে এই মতিবিবির আবির্ভাব। উহার দ্বারা মোগলযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিলাস ও ঐশ্বর্য, বৈদগ্ধ্য ও শিষ্টাচার যেমন ঐ পল্লী-প্রতিবেশের মধ্যে আরও প্রেক্ষণীয় হইয়াছে, তেমনই মতিবিবি-চরিত্রে নারীপ্রকৃতির যে আরেক রূপ—তাহার সেই দুরন্ত ভোগ-পিপাসা—তাহাও কপালকুণ্ডলা

চরিত্রের অতিশয় বিপরীত হইয়া, এই কাব্যের ভাববস্তুকে অতিশয় পরিস্ফুট করিয়াছে। আগ্রার রাজপরিবারের সঙ্গে সপ্তগ্রামের এক বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের যোগস্থাপন সহজ বা স্বাভাবিক নয়—কবি সেই দুঃসাহস করিয়াছেন; যোগটা একটু কষ্ট-কল্পিত হইলেও, ইহার দ্বারা উপন্যাসের পটভূমিকাও যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে, তেমনই তদ্দ্বারা রোমান্সের ইতিহাসরসও যুক্ত হইয়াছে।

মতিবিবি চিরন্তনী নারী—পুরুষের ভোগ-সহচরী, তাহার সুখদুঃখবিধায়িনী, বাসনাকামনাময়ী, মোহিনী, নায়িকা-রূপিণী নারী! নারীর এই মূর্তিই শ্রেষ্ঠ কবিগণের কল্পনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ, তেমনই মূর্ছিত করিয়াছে। এই নারী প্রকৃতির নিয়মে সর্বদেশে ও সর্বসমাজে মুকুলিত হয়, কিন্তু সর্বদা প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কবিগণ কাব্যে, নাটকে, সেই অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট মুকুলের পূর্ণস্ফুট রূপটিকে কল্পনা-চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আমাদেরও চক্ষের অতি সম্মুখে স্থাপন করেন। যে কয়টি গুণ এইরূপ নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার প্রায় সবই মতিবিবির চরিত্রে আছে—কামনা-উদ্রেককারী (voluptuous) রূপ, প্রখর বুদ্ধি, সাহস বা প্রগল্‌ভতা এবং সুনিপুণ রসিকতা-শক্তি। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মতিবিবির চরিত্র বড়, অর্থাৎ মহনীয় নয়; কবি নিজেই বলিয়াছেন, তাহার সকলই আছে, নাই কেবল—নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই হৃদয় বা প্রেম; তৎপরিবর্তে আছে এক দুর্দমনীয় ভোগলালসা। কিন্তু তাই বলিয়া মতিবিবি একজন সাধারণ নারীও নয়। সত্য বটে, ঐ সকল গুণ একজন উচ্চশ্রেণীর গণিকারও থাকিতে পারে, তথাপি মতিবিবি সেইরূপ সাধারণী নারীও নয়, নয় বলিয়াই সে এই উপন্যাসের খণ্ড-আকাশে সচন্দ্র-তারকা বিভাবরীর মত উদয় হইয়াছে; শেষেও অগ্নিময়ী উল্কার মত নিজে দগ্ধ হইয়া অতি তীব্র ও অশুভ আলোক-ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে। তাহার সেই প্রবল ভোগাসক্তির মধ্যেও দুইটি বিরোধী চরিত্র-লক্ষণ ছিল—একটি তাহার অত্যুগ্র আত্মাভিমান, আরেকটি তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য। এই দুইটিই তাহার ভোগ-জীবনের বাধা হইয়া শেষে তাহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। প্রথমটির জন্য সে আগ্রার বিলাস-জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, অথচ নবকুমারকে বশ করিবার মত নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতা তাহার ছিল না। দ্বিতীয়টির জন্য সে কাপালিকের সহিত ষড়যন্ত্রে সম্যক সম্মত হইতে পারে নাই; সেই দ্বিধা তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কতখানি অন্তরায় হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়; সে কপালকুণ্ডলার প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া এমন কাজ করিল যাহাতে অবস্থা আরো দারুণ হইয়া উঠিল—শেষে সব গেল। এইজন্য মতিবিবির চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীচরিত্রের জটিলতর গ্রন্থি-মোচন করিতে হইয়াছে; কপালকুণ্ডলায় যেমন প্রকৃতিধ্যানমূলক ভাবকল্পনার কবিত্বই অধিক, এই চরিত্রে তেমনই নারীচরিত্রের রহস্যগভীর তলদেশে কবি-কল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ আছে।

এই উপন্যাসে কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রও আছে; যথা—ভবানীমন্দিরের অধিকারী, মতিবিবির বাঁদী পেষমণ, মেহেরুন্নিসা ও শ্যামাসুন্দরী। এ সকলের মধ্যে মেহেরুন্নিসা-চরিত্রের সহিত এই উপন্যাসের ঘটনাগত সম্পর্ক নাই, গ্রন্থকার একটি সুযোগ-সৃষ্টি দ্বারা উপন্যাসমধ্যে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নারীর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে এ কাহিনীর শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। এ চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্যই যথেষ্ট। বাঁদী পেষমণ যেন মতিবিবিরূপ হীরকখণ্ডটিকে বসাইবার একটি রূপার আংটি; আংটিটি অতি সামান্য বটে, কিন্তু এই সাধারণ সামান্য নারীর সাংসারিক বুদ্ধি ও তাহার অবস্থা-অনুযায়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা মতিবিবির আভিজাত্য ও উচ্চাভিলাষকে তুলনায় অতিশয় লক্ষ্যগোচর করিয়াছে। যাহাকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছে তাহারও মূল্য কম নহে; এই উপন্যাসের কল্পনামণ্ডলটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য এই সকল খণ্ড-চরিত্র যথাস্থান অধিকার করিয়া শিল্পীর শিল্প-কৌশলের সাক্ষ্য দিতেছে। পেষমণের সহিত মতিবিবির কথোপকথন যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে মতিবিবির কাহিনী অঙ্গহীন,

হইয়া পড়ে। শ্যামাসুন্দরীও ঠিক এইরূপ চরিত্র, কপালকুণ্ডলা-চরিত্রকে তুলনায় উজ্জলতর করিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—এই দুইটিকে একত্র স্থাপন করিয়া লেখক, সমাজ-সংসার ও প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অতিশয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরীর পাশে না দেখিলে আমরা কপালকুণ্ডলাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিতাম না। আরও দুই কারণে শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য; প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই একটি মাত্র চরিত্রের দ্বারা এই উপন্যাসে একটু বাস্তব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন সরলহৃদয় স্নেহকাতর খাঁটি বাঙ্গালী নারী এ সমাজে এখনও সর্ব্বত্র সুলভ, দ্বিতীয়তঃ, শ্যামাসুন্দরীর সেই স্ত্রীজনসুলভ কুসংস্কার, সেকালের পক্ষে যেমন আরও স্বাভাবিক হইয়াছে, তেমনই, উহার ফলে উপন্যাসের ঘটনাধারা একটা অপ্রত্যাশিত গতি-বেগ লাভ করিয়াছে,—সে পক্ষে এই চরিত্র বড় কাজে লাগিয়াছে। অধিকারী চরিত্রটিও এই কাহিনীর পক্ষে বড় প্রয়োজনীয় হইয়াছে কপালকুণ্ডলার জীবনের গতি সেই ফিরাইয়া দিয়াছে; কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপরেও তাহার প্রভাব অল্প নহে। সংসারত্যাগী ঐ পুরুষটির মধ্যে যে হৃদয়মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেমন মুগ্ধ করে, তেমনই সে চরিত্রের নিরভিমান নম্রতা, সামাজিক শিষ্টতা ও ব্যবহার-জ্ঞান প্রভৃতি সদ্‌গুণে উহা আমাদের চিত্তে একটি গভীর রেখাপাত করে। কপালকুণ্ডলাকে বিদায় দেওয়ার কালে কণ্ব-কর্তৃক শকুন্তলা-বিদায়ের অনুরূপ দৃশ্য মনে পড়ে। অতএব এই অপ্রধান চরিত্রগুলিও বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কপালকুণ্ডলা যে কিরূপ উপন্যাস তাহা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। তথাপি ইহা যে খাঁটি রোমান্সধর্মী তাহাতে সন্দেহ নাই। রোমান্স জাতীয় পদ্য বা গদ্য-কাব্যে যে ধরণের রসসৃষ্টি করিতে হয়, তাহার পক্ষে দূর কাল ও অপরিচিত প্রতিবেশ বড়ই অনুকূল, এইজন্য ইহা কখনও বর্ত্তমানের কাহিনী হইতে পারে না, বরং সে কাহিনীর স্থানকাল যতই অনির্দ্দেশ্য হয় ততই সেই রস গভীর হইয়া উঠে। প্রাচীন আখ্যান-আখ্যায়িকার এই রসই ছিল মুখ্য। কিন্তু নব্য রোমান্স-কাব্য সেই কল্পনাকে একটা বিশিষ্ট দেশ কালের ছাপ দিয়া—যাহা সচরাচর ঘটে না তাহাকে একটু বাস্তবের রূপ দিয়া, পাঠকচিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে; যাহা কল্পনামাত্র তাহারও সম্ভাব্যতা বড়ই উপাদেয় মনে হয়। আখ্যান-রচনায় এইরূপ ঐতিহাসিকতার মাত্রা ও প্রকারভেদ আছে। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনীকেই গৌরবদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে অতিশয় মূল্যবান; তিনি লিখিয়াছেন—

'যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্ব্বর্তী তাহাকে কোন একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে; ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। ['ঐতিহাসিক উপন্যাস'—সাহিত্য]

'কপালকুণ্ডলা'কে কি অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে? ইহাতে কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক পটবিস্তার নাই, নায়কনায়িকার কেহই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহে। তথাপি ইহাতেও ইতিহাস-রস আছে। ইহার কাহিনী বর্ত্তমানের নহে,—তাহাতে মোগলযুগের আবহাওয়া রহিয়াছে; সংসার ও সমাজ-চিত্রে প্রাক্-আধুনিক যুগের ছাপ রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই কাব্যের ইতিহাস-রস বলিয়াছেন, ইহার অধিক না বলিলেও চলে।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে নানা রূপ ও ভঙ্গি দেখা দিয়াছে, তাহার কলা-কৌশলেরও অন্ত নাই; এখানে সে আলোচনা অবান্তর। 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে, ইহা কোন বিশেষ আদর্শের ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও, একরূপ ইতিহাস-রস যখন ইহার কাব্যরসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তখন এক অর্থে ইহাও 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বা ইতিহাসগন্ধী রোমান্স। বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কয়েকখানি উপন্যাসে ইতিহাসের সংশ্রব কিছু অধিক থাকিলেও, সেগুলিও ঠিক এই অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস—সেখানেও, ইতিহাসের সত্য নয়, ঐ ইতিহাস রস সঞ্চারিত করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য।

(আগামী বারে সমাপ্য)

এই বিরোধ

সিগ্‌ফ্রিড্‌ সিয়োর্ট   অনুবাদক ঃ শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

[কবি হিসাবে সাহিত্যিক জীবন সুরু করলেও আসলে ষ্টকহল্মের এই লেখক ছোট গল্প ও উপন্যাসেই তাঁর রচনার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তিনি সভ্যতার কবি, সহরের রাজপথে তাঁর রচনার পটভূমিকা প্রসারিত, সহরের যন্ত্রজীবনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেই তাঁর কবিতার ঝঙ্কার; কাব্যাদর্শের এই স্বীকৃতি নিয়ে আরম্ভ করলেও পরবর্ত্তী কালে তিনি নাগরিক মানুষকেই তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রধান করেছেন। আর সেই কারণেই সম্ভবতঃ দুঃখবাদ তার রচনার উপজীব্য। অবশ্য আরো অগ্রসর হয়ে তিনি বিপরীত ভাগ্যের বিরুদ্ধে মানুষের বলিষ্ঠ মননশীলতার চূড়ান্ত জয়কেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। 'ডাউনষ্ট্রীম' নামক উপন্যাসই লেখকের সর্বোত্তম সৃষ্টি বলে সমালোচক মহলের ধারণা। সমাজের যারা নীচুতলার বাসিন্দা তাদের জীবন নিয়েই আশ্চর্য শৈলীর সঙ্গে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। করেছেন তরবারীর তীক্ষ্ণতা নিয়ে। অবশ্য এক শ্রেণীর পাঠকের মত যে ছোট গল্পের মধ্যেই লেখকের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে।]

আজো নিজের ভার বইতে শেখেনি ছেলেটি। তবু সে-ই সন্তানের বাপ হবে। রেল লাইনের পাশের পার্কে বসে মেয়েটি এই খবর পৌঁছে দিয়ে গেছে তার কাণে। জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে-ওঠা এই আশ্চর্য অনুভূতির মুখোমুখী হয়ে ছেলেটির কেমন বিচিত্র বোধ আসে মনে। আগন্তুক শিশুটি অনাগত দিনরাত্রির জন্য কি মধুর রোমাঞ্চ আনবে ভাবতেই হৃদয়ের পাত্র গোপনে ভরে ওঠে।

ছেলেটির ঘরে বসে কথা হয়। অনর্গল কথা কয়ে ছেলেটি সাহস দেয় মেয়েটিকে। যদিও নিজের কথার অপদার্থতা সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে মনে। বাতায়নের বাইরে ঋজু দীর্ঘ পপলার গাছের ছায়া পড়েছে মাটিতে। মুমূর্ষু চাঁদের একটা মৃত্যুশ্বেত আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। নির্বাণী মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কি জানি হয়ত কাঁদছে, ছেলেটি মেয়েটির ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। চোখের দিকে তাকাতেই কেমন একটি অস্বস্তি হয় মনে।

সামান্য একটি ঘটনার ঝাপট লাগতেই মেয়েটির চোখে কেমন এক বিদেশী আলো আশ্রয় নিয়েছে, বদলে দিয়েছে চেনা জগতের সীমানাকে। যাকে চিনত ছেলেটি, এ মেয়ে সে নয়। নূতন পরিপ্রেক্ষিতে একে আবার চিনতে হবে, জানতে হবে, জয় করতে হবে।

জানলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে ছেলেটি ঘরের আলো জ্বাললে। কাঁধের দিকে হেলানো মাথার পিছনে চুলের রাশি শ্লথ হয়ে পড়েছে। গায়ের জামার প্রান্ত ঘেঁষে কণ্ঠের ভঙ্গীটি যেন চেনা বলেই মনে হয় না। মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটির চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়ায়।

'আমার জন্যেই কি দুঃখ পাচ্ছ তুমি? কথা কও। তোমাকে চিনতে দাও। কিছু বল।'

এতক্ষণে মেয়েটি হাসল। দিগন্তের ওপার থেকে।

'তোমার আমার এত ভাল লাগে এরিক। এই ছোট্ট ঘরে তোমায় নিয়ে....অথচ তোমার আমায় কত তফাৎ!'

পায়ের জুতা খুলে মেয়েটি জামার বোতামে হাত দিলে।

আরো কাছে ঘেঁসে এরিক মেয়েটির দেহের ভার নিলে। চোখে, হাতে, মুখে মেয়েটির সর্বাঙ্গের স্পর্শ নিতে লাগল। মেয়েটিও আদরের প্রতিদান দিতে লাগল। কিন্তু তার মধ্যে প্রীতির চেয়ে দাক্ষিণ্যই যেন বেশী।

ঘরের আলো নিভিয়ে ছেলেটি আগুন গনগনে করে দিলে। ততক্ষণে অন্তর্বাস অবধি খুলে মেয়েটি নির্মল নগ্নতায় সুন্দরী হয়ে দাঁড়িয়েছে

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছেলেটি চেয়ে চেয়ে দেখছে। অলজ্জতায় মেয়েটি মুখর হয়ে উঠেছে। এ মেয়ে মা হবে কে বলবে ?

চুলে হাত দিতেই বুকের ঔদ্ধত্য প্রখর হয়ে উঠল। মাথার জাল খুলেই গিছল, আস্তে পিছলে দিলে মেয়েটি।

'আমি চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবে ?'

মেয়েটির কণ্ঠে প্রগলভতা। খুব কাছে এসে ছেলেট তার হাত ধরলে। মেয়েটির চোখে যেন দূর দিগন্তের ইসারা। ধরা দিলেও যেন ধরতে পারা যায় না।

পরদিন থেকে মেয়েটির মধ্যে এক অপত্যাশিত চাঞ্চল্য দেখলে ছেলেটি। মনে মনে আতঙ্ক তোল হয়ত বা শেষ অবধি দুঃখ সে একাই পাবে। নিজেকে সে বোঝায় যে এ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। এখন মেয়েটির মধ্যে দুটি আত্মা। দুটি হৃদয়ের ব্যঞ্জনা মুখর হয়েছে ওর কথায়, ভঙ্গিমায়।

একদিন সকালে মেয়েটি ওর ঘরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্রুত কণ্ঠে বললে,—'আমি আমেরিকা যাচ্ছি।'

'আমেরিকা। কিন্তু ছেলে—ছেলে কোথায়—?'

'নিজের অবস্থা বুঝেই আমি শিকাগোতে আমার এক আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখি। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী আমার শিশুকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। সেখানেই আমার ছেলে হবে। তোমার-আমার কথা ভেবেই আমি এই ব্যবস্থা করলাম। তবে তাঁরা একটি সর্ত দিয়েছেন, অবশ্য আমি রাজীও হয়েছি। ছেলে আমাদের কথা কিছুতেই জানতে না পারে।'

দ্রুতকণ্ঠে কথা কইতে কইতে মেয়েটি সপ্রশ্ন চোখে ছেলেটির দিকে তাকালে।

ছেলেটি জানত এই প্রশ্নের কি উত্তর আশা করছে ভাবী মাতৃত্ব।

'তুমি যাবে না। যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করে আমরা স্বামীস্ত্রী হয়ে এখানে বাসা বাঁধব। তোমার চিন্তা কি ?'

কিন্তু মেয়েটি ওর একটি কথাও শুনল না। প্রশ্নমান চোখে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটির গলা কাঁপতে থাকে: 'তোমার মত সেই ছেলেটির উপর আমারও দাবী কম নয়—আমি চাইনা যে ।'

যেন প্রেতকণ্ঠে মেয়েটি বললে—'তুমি জান যে তোমার দাবী—,

ছেলেটি বুঝলে, মেয়েটি হয় কৌতুক করছে আর নয়ত নূতন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় প্রলাপ বকছে আনন্দে।

কাছে এসে মেয়েটিকে সে আদরে অতিষ্ঠ করতে লাগল।

'তুমি যাবে না—তোমায় আমি যেতে দেব না '

'সব বাঁধা হয়ে গেছে। পরশু যাবার দিন হয়েছে।' - মেয়েটি তেমনি অতল থেকে কথা কইলে—'চিঠি লিখো তুমি আমায়।'

শেষ অবধি ছেলেটি সব বুঝতে পারলে। একটা রুদ্ধ বেদনায় তার মুখ নীল হয়ে উঠল।

বিদায়ের কোন কথা না বলেই মেয়েটি চলে গেল।

তার নিজের ছেলেকে নিয়ে ঐ দস্যু মেয়েটা চলে গেল। অথচ তাকে আটকাতে পারলে না সে।

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ অবধি ছেলেটি পথে পথে ঘুরে বেড়ালো বিভ্রান্ত ভাবে। তারপর এক সময়ে মেয়েটির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তার চমক ভাঙল। দরজার চাবীতে হাত দিয়ে সে নেমে চলে এল। পথের ধারের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজের অস্বস্তিকে সে দমন করতে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরের রুদ্ধ দরজার বাইরে সেই পরিচিত প্রত্যাশিত পদধ্বনি শুনলে ছেলেটি। করাঘাত শুনলে দরজায়, কিন্তু উঠে স্বাগত করলে না।

'ঘরেই রয়েছ, তবে দরজা খুলছ না কেন ?'

এতক্ষণে ত্রস্ত হোল ছেলেটি। দরজা খুলে মেয়েটির

সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা শান্ত পরিবেশ লক্ষ্য করলে। এগিয়ে এসে মেয়েটি অধর দান করলে। ছেলেটিকে পিছিয়ে যেতে দেখে একটু স্মিত হাসলও।

'সব ব্যবস্থা করে যেদিন ফিরব, সেদিন কেমন হবে ভাবোত?'

একবার চলে গেলে আর যে মেয়েটি ফিরবে না, এ অপ্রিয় সত্য জানলেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছেলেটি খুসী না হয়ে পারলে না। ছেলেটিকে আদর করে কাছে নিলে মেয়েটি :

'সমুদ্র আর সেই সব বড় বড় সহর দেখবার জন্যে আমার প্রাণ উতলা হচ্ছে।'

'আমার কথা ভাবছ না তুমি। আর আমার ছেলের কথা, আমাদের ছেলের কথা। বিদেশী লোকেদের মধ্যে হয়ত তুমি—'

'বিদেশীই ত আমি চাই। এখানে ছেলে নিয়ে আমি ঘুরতে চাই না। আর এখানকার হাওয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এ সহরকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু ভালবাসি তোমাকে আর তোমার এই একটুখানি ঘরকে। সত্যি।'

'তবে চলে যাচ্ছ কেন?'

'যেতেই হবে আমাকে।'

একটা দূরের লোভ মেয়েটির কণ্ঠে ছাপিয়ে ওঠে। পিছনে একজন প্রত্যাশী মানুষ দুঃখ পাচ্ছে জানলে এগিয়ে যেতে তত কষ্ট হয় না।

'তোমায় আমি চিনতে পারলাম না।' নিজের অনুভূতির কোন একটি তারে আঘাত দিয়ে অপরের অনুভূতির মূর্চ্ছনা কেমন করে বুঝবে ও।

মেয়েটি জানুতে হাত দিয়ে বসে বললে—'আমাদের দুজনে কত প্রভেদ। তোমাকেই আমি কত সময়ে বুঝতে পারিনি। মনে পড়ছে একদিন এমনি সন্ধ্যাবেলা তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম জানলার ধারে। কি সব শান্তি, দারিদ্র্য আর কাছে-থাকার কথা বলেছিলে তুমি। ভাল লাগছিল শুনতে—কিন্তু সে সব কথার অর্থ আমি বুঝিনি। সবই আমার কাছে বিদেশী লাগছিল।'

মেয়েটির মুখে একটা চিন্তার ছায়া উপেক্ষার হাসিতে শেষ হয়ে গেল। চোখে পড়তেই মনে হোল মেয়েটি যেন মুখভঙ্গী করলে। বুঝবে? মেয়েমানুষ যদি বুঝত! কাছে-থাকা মেয়েটি যদি বুঝবে তবে রাত্রির আকাশের অগণ্য জ্যোতির্ময়তার উপর যবনিকা নামিয়ে কেউ কি রক্তমাংসের আবিষ্টতায় মুগ্ধমন হয়ে দিনরাত্রি কাটায়?

এই আপনসর্বস্ব মেয়েটির প্রতি কেমন একটা ঠাণ্ডা বীতরাগের ভাব আসতেই মন যেন মহত্তের স্পর্শ পায়। কিন্তু মেয়েটি চলে যাবার পর, তার মুখের কাকলী স্তব্ধ হয়ে যেতেই আবার ছেলেটির সত্তা মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে।

এর দুদিন পরে মেয়েটিকে ষ্টেশনে বিদায় দিয়ে, ছেলেটি ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে স্থির হয়ে বসল। আপন জগৎ থেকে ভালবাসার মানুষটিকে বিদায় দিয়ে একটা গভীর রিক্ততার সমুদ্রে সে যেন আপনাকে-হারিয়ে ফেললে। বিদ্রোহী মন ক্ষমাহীন নির্বোধিতায় ডুকরে কাঁদতে লাগল।

অনেক গুলি মাস কেটে যাবার পরে তবে চিত্তের শান্তি খুঁজে পেলে ছেলেটি। মেয়েটির কথা মনে পড়ত, মনে পড়ত তার লীলায়িত গ্রীবার বিলাস, মনে পড়ত তার নগ্ন-তনু দেহের আশ্চর্য সৌন্দর্য, মনে পড়ত প্রিয়নাম ধরে ডাকার সময় মেয়েটির চোখের অপূর্ব মোহ—কিন্তু দুঃখকে ততদিনে জয় করে ফেলেছে ছেলেটি। মনের মধ্যে কখনো কখনো একটা তীব্র নেশা সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। নিজের পরিবেশের বিরাট শূন্যতার মধ্যে আত্মার নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাঁচার দুঃখ হোত মর্মান্তিক। আবার কখনো কখনো নিজের ও প্রকৃতির মধ্যে একটা বন্ধ্যা দুস্তর আঁধার সমুদ্র গর্জে উঠত। মনে হোত, সবই মিথ্যা। জীবনের ঋদ্ধিশালিনী পুষ্পশাখা হতে সব দাক্ষিণ্য ঝরে গেছে। দুর্ভাগ্যের সব থেকে অসহায় মুহূর্তে বাঁচার দম্ভটুকুও বুঝি খান্ খান্ হয়ে যায়।

এমনি একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম সে দেখলে সূর্যকিরণ। নির্মল জ্যোতির্ময়তায় চিত্ত প্লাবিত হোল। যেন দুঃখসমুদ্রের মাঝখান থেকে চিত্তের সূর্যমুখী আকাশের স্নেহে বিকশিত হয়ে উঠল। লুপ্তির কুয়াসা সরে যেতেই আনন্দময় এক জগতে নূতন করে আবিষ্কার করলে সে নিজেকে।

শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়ালে সে অনেকক্ষণ। একটা নিঃশব্দ প্রসন্নতায় মন আশ্বস্ত হয়ে আছে। পুরাণো দিনের অর্থহীন দুঃখবেদনার জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সে নতুন হয়েছে। এখন থেকে আর ঝড়ের ঝাপট নয়—তরঙ্গায়িত দিন রাত্রির শান্তি।

আজ মনের মধ্যে এক না-জানা দৃঢ়তা এসেছে। সব দুঃখ, চাঞ্চল্য আর মোহের উপরে যে অনির্বাণ আলোক, তার দ্যুতি এসেছে মনের মধ্যে। নিজের পরিবেশের নিঃসঙ্গতায় আর ভয় নেই। এখন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে। নিজেকে নিয়ে বিলাস করে দিন তার কাটবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি চেনা সহরকে দেখবার চেষ্টা করলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে অবশেষে যে পথে সে পৌঁছল তারই পাশে এরিক বলে ছেলেটি বাস করত।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তার গর্বিত নারীত্ব। এরিকের বাড়ী যাওয়া যখন স্থির, তখন মেয়েটি গাড়ী ডেকে বাড়ী ফিরল।

নিজের ঘরে ঢুকেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত করলে সে নিজেকে। দেহের সেই তারুণ্য আজো ক্ষয় হয়নি। মুখের সেই উদ্ধত সৌন্দর্য স্তিমিত হয়নি এতটুকু। নিজেকে বিচার করে দেখলে মেয়েটি। কই, মনের সমর্পণ তো চোখের দৃষ্টিকে কোমল করতে পারেনি।

এরিকের ঘরে দুদিন পরে এল মেয়েটি।

'তোমার অসুখ শুনে এলাম।'

ছেলেটি হাসল। জোয়ার-নেমে-যাওয়া হাসি।

'সমুদ্র আর সহর দেখে এলে?'

'এত রোগা হয়ে গেছ তুমি। আমার জন্যেই কি দুঃখ পেলে তুমি?'

'প্রথম দিকে তোমার জন্যে দুঃখ পেয়েছি অস্বীকার করব না। বসন্তের মত তুমি আমার মনকে খুসীতে উপচিয়ে দিতে। কিন্তু তোমার সব দানের পিছনে উঁকি মারত শীতের রুক্ষতা। সেই দুঃখকে আমি জয় করেছি। এখন আমি শান্তি পেয়েছি। শূন্যতার মধ্যেও আমার মন নিরাসক্ত হয়ে থাকতে শিখেছে।'

মেয়েটি পাশের চেয়ারে বসে বিগলিত কণ্ঠে বললে—'আমিও সুখী হইনি।'

ক্লান্ত চোখ তুলে ছেলেটি বললে—'এ ত সুখের কথা নয়। সুখ আর আমি চাই না। সুখ আমি ঘৃণা করি। দীর্ঘ দিন ধরে যে সুখের বেঁচে থাকা তা আমি চাই না। আমি চাই আনন্দ—মনের গভীর অন্তহীনতা থেকে যে আনন্দ ক্ষণিকের জন্য মনকে দোলা দেয়—কিন্তু ধরা দেয় না।'

আনন্দময়তা। কে জানে, কখন কেমন করে এ আনন্দ মনকে তুলে ধরে মৃত্তিকার গ্লানি থেকে। মন যেন লঘু পক্ষপুটে উড়ে যেতে চায়। সারা জীবনের অভিযোগ একটি মুহূর্তের দাক্ষিণ্যে সার্থক হয়ে ওঠে।

মেয়েটির দিকে স্মিত হেসে ছেলেটি আবার বললে—'বয়স ছিল কম, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলতাম। সে তুমি বুঝতে না। আজ তোমায় বলছি আনন্দের কথা। তাও হয়ত তুমি বুঝছ না। তা হোক্। তবু আগের চেয়ে তুমি কত লাবণ্যময়ী হয়েছ। আমি তাই দেখছি।'

'তোমার কি খুব অসুখ হয়েছিল?'

'অসুখের সময় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, হয়ত বুড়ো হয়ে মরা আমার ভাগ্যলিপি নয়। আজ বুঝছি—'

বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে ছেলেটি ক্লান্ত গলায় বললে—'এবার তুমি যাও। তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

'আবার আসব, আমি। কিন্তু ছেলেটির কথা কি তুমি জিজ্ঞাসা করবে না?'

ছেলেটি কোন্ সাড়া দেয় না। আরও একটু অপেক্ষা করে মেয়েটি নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে যখন, ছেলেটি তাকে ডাকলে।

'আগেকার চিঠিগুলো আমি পড়েছি। কিন্তু ছেলেটিকে নিয়ে কি হোল তা ইচ্ছে করলে আমায় লিখে জানাতে পারো। তুমি যে বিয়ে করে স্বামীকে নিয়ে খুসীর জীবন পেয়েছ তাতে আমি খুব আশ্বস্ত হয়েছি। হয়ত সেই কারণে আর এখানে আসা তোমার পক্ষে ভাল নয়।'

'আমি এসে তোমার কি কোন কাজে লাগতে পারি না?'

গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ছেলেটি বল্লে—'না, তার প্রয়োজন হবে না।'

বিষণ্ন চিত্তে মেয়েটি বিদায় নিলে।

নদীর তীর ঘেঁসা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে বিতর্ক তোলে মেয়েটি। এখুনি নৌকো এসে পড়বে। নিয়ে যাবে তাকে নিভৃত সংসার জীবনে।

সে আজ একজনের জীবনে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। হয়ত তাকে ঘৃণাই করে সে। তাও কি করে সম্ভব হয়? সেই রুগ্ন শয্যায় বসে এক আশ্চর্য পৌরুষের দৃঢ়তার সম্মুখীন হয়েছিল সে। নিজের যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে বসেও ঐ রুগ্ন লোকটির সম্মুখে কত ছোট মনে হচ্ছিল নিজেকে। যে রুগ্ন মানুষটি বালিশে হেলান দিয়ে ছোট ঘরের সীমানা ডিঙিয়ে নিজের মনকে পাঠিয়ে দিয়েছে সুদূরের মহিমার অভিসার যাত্রায়।

আর তার যাবার প্রয়োজন হবে না। কথাটা যেন তার জাগ্রত নারীত্বের প্রতি অবমাননা। এ অপমান আগামী দিনগুলিতে আরো কটু হয়ে উঠবে, ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে দম্ভের জয় নিশানাকে।

আবার কয়েকদিন পরে চোরের মত চুপিসাড়ে মেয়েটি এসে দাঁড়াল ছেলেটির ঘরে।

চিঠি সে লিখতে পারে নি। তাই শেষবারের মত একটি প্রিয়তম মানুষকে দেখতে এসেছে।

জানলার ধারে বসে ছেলেটি কি যেন পড়ছিল। দেখেই হাতের বই সরিয়ে রেখে প্রশ্ন উৎসুক চোখ তুলে ধরলে।

অনেকটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই মেয়েটি কথা কইতে লাগল। বিদেশে নিজের হাজারো দুর্ভোগের কথা বিচিত্র ভঙ্গীমায় বলে যেতে সুরু করল। কথার দ্রুততায় মনের অস্থির লয়কেই প্রকাশ করতে লাগল।

শিকাগো পৌঁছবার আগে অবধি তার প্রতি জঘন্য ব্যবহার করেছিল সে দেশের মানুষ। এমনও মনে হয়েছিল হয়ত শেষ অবধি তাকে আবার দেশে ফিরে আসতে হবে।

অবশ্য তার আত্মীয় তাকে স্বাগত করেছিলেন। তিনি মেয়েটিকে গোলাবাড়ীতে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে ধানক্ষেতের ধারে কাজ করতে করতে তার মনে পড়ত শুধু আগামী মানুষটির কথা, যে তার জীবন ... জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করছে। তারপর যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হোল, তারা তাকে নিয়ে গেল। মায়ের আর ... দাবী রইল না।

'এর ওপর আমি অফিসের টাইপিষ্ট হোলাম। ... নিজেকে সর্বমতে বঞ্চিত করে আমি শুধু সঞ্চয় করতে লাগলাম। দেশে আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরতে হবে। এই সময় একটি নতুন লোকের সঙ্গে ... পরিচিত হই তাকে আমি চিনতাম না ভালো ... কিন্তু তাকে নিয়েই আমার মন মত্ত হোল।

এমনি করে দুটি বৎসর কেটে যাবার পর একদিন ... পেলাম, বাবা মারা গেছেন। সেই একটি মাত্র ... আমার বিস্মৃত অতীতকে যেন চোখের সামনে তুলে ... প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও আমার মন দেশের জন্য হাহাকার করতে লাগল। মনে হোল এ কি শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্যের ... আমার দিন কাটছে। সত্যি বলছি তোমায় সেই ... থেকেই আমার স্বামীকে আমি ঘৃণা করতে শিখলাম

তার মুখের কথা শোনার সময় তোমার কথা মনে পড়তে লাগল

এমনি অবস্থায় স্বামীকে নিয়েই দেশে ফিরলাম আমি। ফিরেছি আজ এক বছর। আমার স্বামী বাড়ী কেনাবেচা করেন, নানা সাধু-অসাধু উপায়ে দু হাতে পয়সা রোজগার করেন। যা তাঁর হাতের মুঠোয় আসে না, যা তাঁর ব্যবসা জগতের বাইরে, সবই তাঁর কাছে হাস্যকর। একটা তাচ্ছিল্যের হাসিতে তিনি সব উড়িয়ে দেন। সেই হাসি আর আমি সহ্য করতে পারছি না। পারছি না সহ্য করতে তাঁর চিত্তের রিক্ততাকে। সারা জীবনে তিনি কখনো দুর্যোগ দেখেন নি, কোন অনাগত অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাঁকে ভয় দেখায় নি। তাঁর নিজের দেশে থাকতে তাঁর চরিত্রের এই দিক কখনো আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু এখানে তাঁর সেই তাচ্ছিল্যের হাসিই আমার প্রতিদিনের অনুভূতিকে দোলায়। সারাদিন তাঁর সেই হাসি শোনবার জন্য কান পেতে থাকি। যখন শুনতে পাই না, কেমন একটা অস্বস্তিকর ঔৎসুক্যে কাঁপি, আর যখন শুনি, সমস্ত অন্তরাত্মা রি রি করে ওঠে।'

চেয়ার থেকে উঠে ছেলেটি আধো অন্ধকারে একটি সোফার মধ্যে আশ্রয় নিলে। ক্লান্ত গলায় বল্লে—'আমায় তুমি এ সব কেন শোনাচ্ছ বলত ?'

'কেন, বলতে পারব না। তবে শান্তি পাচ্ছি তোমাকে আমার গোপন কথা বলে. হয়ত এতদিন পরে আমার জীবন নূতন রূপ নিচ্ছে।'

'সত্যিই কি স্বামীকে ঘৃণা কর তুমি ?'

'সত্যিই।'

'তবে স্বামী-স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাচ্ছ কেমন করে ?'

'কাটাচ্ছি না।'

তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। নিজের জীবনের ধারা কেমন করে মরুভূমির পথ ধরেছে তাই ভাবতে থাকে মেয়েটি। সর্বনাশের ঢল নামছে অকল্যাণের শিখর থেকে।

'তুমি আমায় ত্যাগ ক'র না।' দুটি চোখে অশ্রু টলমল করে মেয়েটির।

ছেলেটি তার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরে মেয়েটির দিকে : 'কি চাও তুমি আমার কাছে ?'

'আমার জীবনে এলোমেলো ঝড় এসেছে। অস্থির হয়ে এতকাল আমি কাটিয়েছি। তুমি আমায় তুলে ধরো। তুমি আমায় আশ্বাস দাও নিজেকে আমি চিনি না, কিন্তু তুমি ত আমায় জানো।'

'আমি কি করব বলত ? তুমি আমায় বুঝতে চাও না বুঝতে পাবো না।'

তুমি নিজেকে খুলে ধরো বলো তোমার অতীত জীবনের গল্প। দুটি চোখ ভরে এত বিষণ্ণতা রেখেও, কেমন করে তুমি আনন্দের কথা বলো। এত বিশ্বাস আর হাসি তোমার। অমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাও কি করে ? তোমার কষ্ট হয় না ?'

আমার জীবন ?' যেন কান পেতে ছেলেটি কি শুনলে। তারপর বিস্মরণের গভীরতা থেকে তুলে আনলে হারানো পদ্মের পাপড়িগুলি। বললে—'নিঃসঙ্গতা ? তুমি বুঝবে না, যে মানুষ জীবন আর প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে ভালবেসেছে তার একাকীত্ব কত বিচিত্র অনুভূতি আর ঐশ্বর্যে ঝঙ্কৃত হয়। মানুষের মুখের অর্থহীন কথায় যার কান দিনরাত্রি ভরে না থাকে, সে ইচ্ছা করলেই এই সব বহুবিচিত্র মক মুখরতায় মনের পাত্র ভরে তুলতে পারে তুমি জান না এই গাছ, পাতা, মেঘ আর অন্ধকার কি আশ্চর্য বাণী পৌঁছে দেয় তোমার মনে। কানে তোলে সুরের শৃঙ্গার। সেই সব যে শুনতে পায় তার কাছে তারা আর দূরের জগতের বাসিন্দা থাকে না। তারা আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে। যা মনে হয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, যাদের ভিতরে কোন প্রত্যক্ষ বন্ধন দেখা যায় না, সব সেই আশ্চর্য লোকে এক নূতন ঐক্যে গড়ে ওঠে। মনে হয় ক্ষুরন্ত আয়ুর আফ্‌শোষ নিয়ে মানুষের কান্না সত্যি নয়, এক বিরাট অন্তহীন প্রতিবেশীত্বের মধ্যে মানুষ চিত্তের

শান্তি ফিরে পায়। মহতের স্পর্শে হৃদয় আনন্দময় লোকে উত্তীর্ণ হয়। মন বিশ্বাস করতে শেখে যে মানুষের চেতনা এক গভীর নীল অন্তহীনতা থেকে জন্ম নিয়ে বিরাটের চক্রতীর্থ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সারা সৃষ্টির সঙ্গে এই একত্ববোধ এক আশ্চর্য অনুভূতি।'

ছেলেটির পাণ্ডুর মুখে যেন আকাশভ্রষ্ট একটি আলোকের দ্যুতি শিহরিত হচ্ছে। চেয়ে চেয়ে তাই দেখে মেয়েটি। ছেলেটির কথা তার মনকে দোলায়, কিন্তু উপলব্ধির ধ্রুবলোকে পৌঁছে দেয় না।

বিদায় নিয়ে যখন মেয়েটি পথে এসে দাঁড়াল, ছেলেটির কথার বোঝা তার মনকে নিষ্কৃতি দেয় নি। পারঘাটার উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকাতেই মন এক মুহূর্তে স্থির হয়। চারিপাশের এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের একাকীত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে মগ্নচৈতন্য হওয়ার আনন্দ যেন মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। তাকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না সে। সে দুঃখ আজ যেন আরও মর্মান্তিক বোধ হয়।

এর এক মাস পরে আবার একদিন দুটি প্রাণী একতলায় একখানি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। অনেকদিন আগে এই ঘরে ছেলেটি থাকত।

বাড়ীওয়ালার হুকুম নিয়ে তারা দুজনে ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি চোখ তুলে তাকালে ছেলেটির দিকে, তার চোখে নিমন্ত্রণ।

'না, চলে এস। এখানে আমি থাকতে পারছি না।' ছেলেটির গলা কান্নায় ভেঙ্গে আসে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে দুজনে সহরের প্রান্তে মাঠে এসে পড়ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছেলেটি প্রিয়তমাকে বাহুর মধ্যে আশ্রয় দিলে।

বললে—'আমার দম্ভ ছিল নিজেকে নিয়েই আমি সুখী হয়ে থাকতে পারব, আর কারুর মমতায় আমার প্রয়োজন হবে না। একাকীত্বের কথা যখন বলতাম, মনের মধ্যে উপলব্ধি করতাম কোন অন্তস্থলবাসী অস্তিত্বের সঙ্গে দেশকালব্যাপী বিরাট প্রাণশক্তির মমতাময় বন্ধন। সমগ্র জগতের সঙ্গে চিন্ময় আত্মীয়তা। কিন্তু তুমি আমার এ কি করলে, বাকী জীবন কি করে আমার কাটবে? তোমার বোকামী, তোমার ছলনা, তোমার ক্রূরতা সব আমি জানি। জানি নিজেকে যখন তোমার নিরাপদ মনে হয় তুমি চরম নিষ্ঠুর হও। আবার যখন তোমার চারিপাশে অসহায় শূন্যতা মৃত্যুর মত ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে চায় তুমি আশ্রয়ের জন্য ভিক্ষা চাও। তবু তোমাকেই আমি নিলাম, তোমার অস্তিত্বকে ঘিরেই আমার বাকী জীবনের স্বপ্ন রূপায়িত হয়ে উঠুক। যে তুমি আমার জীবনে অনাবশ্যক, যাকে আমি ভালবাসি কিন্তু ঘৃণা করি।'

ছেলেটি মেয়েটির কম্পিত অধরে আবিষ্ট চুম্বন গভীর করে এঁকে দিলে।

চাঁপার মত আঙুল দিয়ে মেয়েটি ছেলেটির করতল নিজের বুকের ঔদ্ধত্যের উপর টেনে নিলে। নিবিড় আবেশে দুটি মানুষের মুগ্ধ তনু এক হোলো।

আগষ্টের দুইটি দিন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

খৃষ্টাব্দ ১৯৪২-এর ৯ই ও খৃষ্টাব্দ ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বলিয়া বর্ণিত থাকিবে। বর্ণভেদ, রুচিভেদ ও প্রকারভেদ থাকিলেও ঐ দুইটি দিন সাধারণ ভারতবাসীর চিত্তপটে 'ভুলিবার নহে' বলিয়া লিখিত হইয়া গিয়াছে এবং পাষাণে খোদিত লিপির মত মুছিবার নহে, মুছিবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান শতাব্দীর দুইজন প্রধান নেতার হাতের ছাপ ও অন্তরের ভাষা ঐ দুইটি তারিখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এমন একাকার হইয়া গিয়াছে যে ঐ দু'টি দিনের সঙ্গে ঐ দুই নেতার নামও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে, গান্ধীজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। "কুইট্ ইণ্ডিয়া" শব্দসমষ্টি আজ বিশ্বজনবিদিত ও বিশ্বমানববন্দিত হইয়াছে; অর্থ না বুঝে এমন অজ্ঞ ভূলোকে নাই। প্রস্তাব গৃহীত হইলেও "কুইট ইণ্ডিয়া" কার্যকরী করিবার সময়, সুবিধা ও সুযোগ কংগ্রেসের হয় নাই। যাঁহার প্রস্তাব, তিনি যদিচ বীজমন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন করিবার জন্য নিখিল ভারতবর্ষকে আহ্বান দিযাছিলেন—'ডু অর ডাই'—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র জন্য প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্রম নির্ধারণের অবসর তাঁহারও মিলে নাই। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি-সূত্রের সন্ধান বিফল হইলে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র কার্যসূচী দেশবাসীকে জ্ঞাত করাইবার অভিলাষ গান্ধীজী সেই রাত্রেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে অবকাশ তাঁহার হয় নাই। আমি তখন বোম্বাইতে; আমার মনে আছে, রাত্রি পৌণে বারটার সময় প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশী, চাল-চুঁয়ান কালীতে তুলোট কাগজে লেখা প্রস্তাব শুকাইতে না শুকাইতে ওয়ার্কিং কমিটিকে "তোল তল্পী, চল্ বাঁধাগাছি" করিতে হইয়াছিল। "যদি নিশি পোহাইত, কুমুদ মুদিত হোত, শশী যেতো নিজস্থান" সেকালের টপ্পা গানের অবস্থা হইবার পূর্ব্বে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দিদিভাইর ভাষায় দন্তধাবনের দ্রব্যসামগ্রী গুছাইয়া লইয়া নিরুদ্দেশযাত্রা করিতে হইল: গান্ধীজীও বাদ পড়িলেন না। সূর্যোদযে শয্যাত্যাগে জানা গেল (দেখা গেল বলিলে আমার পক্ষে আরও ঠিক বলা হইবে) যে 'শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর'।

আচম্বিতে ও আকস্মিক নিদারুণ আঘাতে প্রথমটা মানুষ হতবাক্ হতভম্ব হইয়া পড়িযাছিল। বিশাল জনসঙ্ঘের একাংশ—শিক্ষিত, ভদ্র ও সুস্থচিত্ত ব্যক্তিবর্গ নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে বড়লাট বাহাদুর অনতিবিলম্বে গান্ধীজীকে ডাকিয়া যুদ্ধকালে "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের বিপজ্জনক অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া অন্ততঃ যুদ্ধকালটা নিরস্ত থাকিতেই বলিবেন। নিশান্তে প্রতীতি জন্মিল যে তাহারা বিলাতের চার্চিল ও ভারতের লিনলিথগোর মতি-গতির স্বরূপ বুঝিতেই ভুল করিযাছিলেন। ভারতে তখন লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী শস্ত্রপাণি হামেহাল হাজির—বৃটিশ, মার্কিন, আফ্রিকান, ক্যানেডিয়ান—কে নাই ও কে নহে? "ডু অর ডাই"য়ের উত্তোর "নাউ অর নেভার" হাঁকিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কবে পাওয়া যাইবে? দুইশত বৎসরের ইতিহাসমধ্যে ৯ই আগষ্টের মত শুভদিন বৃটিশের পঞ্জিকায় আর আসে নাই।

বিস্ময়ের মোহ অবসানে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভঞ্জন বহিয়া গেল প্রবল স্বননে প্রবল বায় দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত কম্পান্বিত। উতলা বাতাস মাতালের মত টলিতেছে ও হাঁকিয়া হাঁকিয়া ফিরিতেছে "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" কি করিতে হইবে কেহ জানে না; কেহ কোন নির্দেশ পায় নাই, অথচ এই অভ্রভেদী অবিমৃষ্যকারিতা ও হঠকারিতা নিরুপদ্রবে মেষ-শাবকের মত সহ্য করিবে ইহাও পরিপাক হয় না। চার্চিলগোষ্ঠী নাগালের বাহিরে না হইলে "ডু অর ডাই" র পাবকশিখায় তাঁহারাও অব্যাহতি পাইতেন কি না সন্দেহ, তাঁহারা সীমার বাহিরে, স্পর্শাতীত। সীমাভ্যন্তরে চার্চিল লিনলিথগো ও বৃটিশ সংশ্লিষ্ট সমাগব দিকেই আক্রোশাগ্নি প্রধাবিত হইল চার্চিলগোষ্ঠী থানা-পুলিস, ফাঁড়ি, চৌকি রেল তারঘর সাহায্যেই স্বেচ্ছাচার পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইগুলাই ভস্মীভূত ধ্বংস হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে বোম্বাইতেও ট্রাম পুড়িল কলিকাতাতেও ট্রাম-সৎকার হইল। অথচ ট্রাম চার্চিল বা লিনলিথগোর প্রত্যক্ষ অথবা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু দারুণ চিত্তবিক্ষোভের সময়ে চুলচেরা সূক্ষ্মবিচারের কথা মনে থাকে না। বৃটিশের জ্ঞাতিগোত্রের সম্পর্কচ্ছেদই তখনকার লক্ষ্য। কলিকাতায় কত ট্রাম পুড়িয়াছিল জানি না বটে, তবে কিছুকাল পর্যন্ত ট্রামের সংখ্যাল্পতা তথা স্বল্প সংখ্যক ট্রামে সহরবাসীর লাঞ্ছনার গুরুত্ব দেখিয়া এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে মোটা অঙ্কেই ঘা পড়িয়াছে। এ কথাটাও এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না যে ট্রাম-বাস-মোটর সৎকার করিয়া সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয় না, নিজেদের কষ্ট ও দুর্দশাই বৃদ্ধি পায়। এ কথাটা এখন এবং ভবিষ্যতের উদ্দেশে বলা যাইতে পারে; তখনকার দিনে এমন কথা উচ্চারণ করিবার সাহস থাকিলে সতীদাহ প্রথা বিস্মৃত হইয়া সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আজ (১৯৪৭ সালে) গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। একটি ডাকঘর পুড়িলে, একটি রেল লাইন নষ্ট হইলে অথবা পুলিশ ফাঁড়ী ভস্মীভূত হইলে দেশের লোকেরই সমূহ অনিষ্ট। দেশের লোকের অর্থেই সেগুলির পুনর্গঠন হইবে; দেশের কল্যাণকর কাজের বরাদ্দ হ্রাস পাইবে।

কিছুদিন পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চলিয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, সে সময়ে যত শস্ত্রপাণি সৈন্য সামন্ত, যত অস্ত্র শস্ত্র, যত কামান, যত বিমান অগ্নিযান ভারতবর্ষে ছিল, (অবশ্য মাতুলালয়ের দৌলতে।) তেমন সমারোহ বোধ হয় কুরুক্ষেত্রোত্তর কালে ভারতে আর কখনও হয় নাই। ক্ষিপ্তাপ তেজমরুদ্ব্যোম পর্যুদস্ত করিয়া বৃটিশ অল্পকাল মধ্যেই সায়েস্তা করিয়া ফেলিয়াছিল। তা ফেলুক: তাহার পৈতৃক জমিদারীতে প্রজাবিদ্রোহ বরদাস্ত সে কেন করিবে? কিন্তু নিরস্ত্রের সেই "ডু অর ডাই" ও সশস্ত্রের "নাউ অর নেভারের" দক্ষযজ্ঞের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেও কি দেশী কি বিদেশী, কি শ্বেত কি কৃষ্ণ শোণিতবিন্দু মিলিবে না। বৃটিশ বর্বরের পুষ্পবরিষণে রেলের নিরীহ নির্দোষ কুলি মজুর দল বাঁধিয়া মরিয়াছে, ইতিহাসে লেখা আছে দেখা যায়; নিরপরাধ পল্লীবাসী বৃটিশ বেয়নেটের রোষানলে কাতারে কাতারে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়; গ্রাম জ্বলিয়াছে, ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, নারীর সতীত্ব বিপর্যস্ত হইয়াছে, বৃটিশের মারণ যজ্ঞেতিহাসে বহু কীর্তিই কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়াছে দেখা যায়; কিন্তু যে 'ক্ষ্যাপা কুকুরের দল' "ডু অর ডাই" করিতে বাহির হইয়াছিল তাহাদের হাতে গোটা দশেক অত্যাচারী পুলিস, দুটি কানাডীয় ও একটি বৃটিশ বৈমানিক ব্যতীত একটি প্রাণী হাতেও মরে নাই, ভাতেও মরে নাই।

লর্ড লিনলিথগো ও তাঁহার কীর্তিমান সভাসদ ম্যাক্সওয়েল-টটেনহাম কোম্পানি অতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে প্রলয়েতিহাস রচিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া গান্ধী ও কংগ্রেসের শাঠ্য ও নৃশংসতা বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে কালবিলম্ব করেন নাই তাহা আমরা জানি আছি। জালীয়ানবালাবাগে ডায়ার-ও'ডায়ারের কীর্তিকলাপ শ্রবণে যাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, গান্ধী

ও কংগ্রেসের নির্মম নৃশংসতায় তাঁহারাও মূর্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহাও আমরা শ্রুত আছি। কিন্তু যে কারণেই হৌক বৃটিশ সে পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটে না, ঘুণাক্ষরে সে কথা উত্থাপন করে না (করে না কারণ জানে কেঁচো খুঁড়িতে অজগর বাহির করিতে পারে।) কিন্তু মায়ের অধিক দরদী কায়েদে আজম কংগ্রেসের হিংস্র নৃশংসতার নাড়া স্মরণে ও অস্মরণে সময়ে ও অসময়ে ত দিয়াছেনই পাঁচ বৎসর পরেও ১৯৪৭ সালের ৭ই মে তারিখে সে দাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু কেন এই আক্রোশ? তাঁহার ত দারুণ কথা তাঁহার একচ্ছত্রাধীন মুশ্লিম লীগের একটি বাবুর্চির কেশ স্পর্শের কোনও খবর ত কেহ পায় নাই, তথাপি তিনি চিরকাল "রাই বোধ কলের কথা" গাহিয়া আসর সরগরম করেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিব না। মনে হয় তাহার প্রয়োজনও হইবে না, উত্তর আপনা হইতেই পরিস্ফুট হইবে।

তিনবৎসর পরে, কারাবাসান্তে মুক্ত আলোকে আসিয়া সর্বপ্রথম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুই ৯ই আগষ্টের ও পরবর্তী কয়েকদিনের ইতিহাসের পাদমূলে পূজার্ঘ্য দান করিয়াছিলেন। পৌরুষ পৌরুষের প্রশংসা করিবে না ত কে করিবে? দেশের লোক তো জড় পদার্থ নহে, পচা পুকুরের কলুষশীতল পঙ্ক নহে, পরন্তু জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মনুষ্য। মনুষ্যত্বে মহান ও গরীয়ান পুরুষ জহওরলালের বলিষ্ঠ অন্তঃকরণে তাহারা সাড়া না জাগাইলে বিস্ময়ের বিষয় হইত। চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ঠোঙ্গার খাবার, ঝুড়ির মাছ লইয়া উধাও হয়, দেশের সর্বজনপ্রিয় বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে সেই ভাবে, অতর্কিতে ছোঁ মারিবার দুর্মতি ও দুঃসাহস যে-বৃটিশের হইতে পারে, সেই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্মগত অধিকারের সমর্থন জওহরলাল করিবেন না ত কে করিবে? "কুইট ইণ্ডিয়া"র তরঙ্গাভিঘাতে বৃটিশের সাম্রাজ্য-সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ, তাহারই ফলে ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৪৭এর ২০এ ফেব্রুয়ারীর এ্যাটলি-নির্ঘোষ—"উই কুইট জুন নাইনটিন ফরটি এইট্"। বৃটিশ যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে দু'শ বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল যদি ছিন্নই হয়, তাহাতে কায়েদে আজমের ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের পুনরভিনয় ঘটে কেন?

আরও একটা কথা আছে। জওহরলাল ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট ও পরবর্তী কয়েকদিনের সাধুবাদ করিয়াছেন। কায়েদে আজমের নিকটও একটা স্পষ্ট সুযোগ আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিতেছি। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ও পরবর্তীকালের সাধুবাদ করিতে তিনিই বা বিরত হইবেন কেন তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কংগ্রেসের "ডু অর ডাই" অর্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, তাঁহারও 'ডাইরেক্ট এ্যাকসন' প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই নামান্তর। প্যারিটি ত অব্যাহত রহিয়াছে, তবে এই ব্যর্থ ক্ষোভ কেন? পলিটিক্সে চক্ষুলজ্জার স্থান নাই ইহা ত সকলেই জানে; তবুও, কায়েদে আজম ৯ই আগষ্টের চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার করিলেও ১৬ই আগষ্টের প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না কেন?

১৬ই আগষ্ট—১৯৪৬

কংগ্রেস ১৯২১ সাল হইতে বহুবার বহু আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে এবং দুইশতবর্ষব্যাপী ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসে ইহাও দেখা যাইবে যে কেবলমাত্র সসাগরা ভারতবর্ষই নহে, ছ'হাজার মাইল দূরের ইংলিশ চ্যানেল তটবর্তী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিত্তি পর্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছে। ১৯২৭এ সাইমন কমিশন, ১৯৩০ এ গান্ধী-আরুইন চুক্তি, ১৯৩১ হইতে লণ্ডনে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স, ১৯৪২এ ষ্টাফোর্ড-ক্রীপস্-আগমন, ১৯৪৫এ ওয়াভেল বৈঠক, পার্লামেণ্টারী মিশন ও ১৯৪৬ এ শেষ বেশ হিসাবে ক্যাবিনেট্ মিশন এবং ১৯৪৭ এ ধূলা-পায়ে ওয়াভেল বিদায়, এ সকলের মূলেই কংগ্রেসের কার্যকরিতা বিদ্যমান। ১৯৪৮ এর ৩০শে জুন (বলা যায় না। গান্ধীজী তৎ-

পূর্বেই কুইট ইণ্ডিয়া ধ্বনি তুলিয়াছেন।) অথবা তৎপূর্বেই যত্তপি বৃটিশকে আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতেই হয়, কৃতিত্ব কায়েদে আজমের নহে, কংগ্রেসেরই। তিনি কখনও, কাণাঘুষাতেও, ঘুণাক্ষরেও প্রাণাধিক লক্ষ্মণ-বর্জনের কথা চিন্তা করিতেও পারেন নাই! কংগ্রেসই নাগপাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং বৃটিশের নখদন্তের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যুগপৎ ভারত মহাসমুদ্রে ও ইংলিশ খণ্ডসাগরে জলকম্প হইলেও একটি ভারতীয় কি ভারতীয় হস্তে নিহত হইয়াছে? নিরীহ দেশবাসীর একখানি কুটীরও কি লুণ্ঠিত অথবা ভস্মীভূত হইয়াছে? একটি নারীর সতীত্ব কি মাতৃশোণিতপিপাসুর কামাগ্নিতে নিগৃহীত হইয়াছে? একটি প্রাণী কি বলে ধর্মান্তরিত হইয়াছে? যে বৃটিশ চিরদিন কংগ্রেসকে কঠোর হস্তে নির্যাতন ও নিপীড়ন করিতে কণামাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই, কংগ্রেস-বিদ্বেষ যে বৃটিশের স্নায়ুতে শোণিতে অণুতে পরমাণুতে মিশ্রিত, সেই বৃটিশও কি এমন একটি দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীকে প্রীতি-উপহার-স্বরূপ উপঢৌকন দিতে পারিল না!

দেশবাসীর হস্তে নিহত দেশবাসীর শবে আর কবে কোন্ রাজধানী নরদেহাকীর্ণ হইয়াছিল? রাজধানীর প্রাসাদ অট্টালিকা গৃহবিপণী আর কবে লুণ্ঠিত ও অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল? মাতৃক্রোড় হইতে শিশু সন্তান, স্ত্রীর বাহুবেষ্টনী বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামী, স্বামীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া স্ত্রীর হত্যা সাধিত হইয়াছিল? বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতীয়-বিদ্বেষী বৃটিশ শস্ত্রপাণি দস্যু আসে নাই, আফ্রিকার বনজঙ্গল হইতে কানিবল্ও আসে নাই, আমেরিকা হইতে রেড ইণ্ডিয়ানও আমদানী হয় নাই, এমন কি গড়ের সৈন্য গড়ে আবদ্ধ, পুলিশফৌজ কোতোয়ালীতেই নিস্তব্ধ রহিল বটে, কিন্তু ভারতীয়ের শোণিতে ভারতের ভূমি রঞ্জিত ও সিক্ত হইল। ভারতের ইতিহাসে অভিনব অবদান বটে!

১৯৪৬এর ২এ জুলাই বোম্বাই সহরে শূন্যে কর সঞ্চালন করতঃ কায়েদে আজম মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন, নিয়মতান্ত্রিকতা, বিদায়! আজ পিস্তল ধরিলাম; এখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বিঘোষিত হইল। কাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কায়েদে আজম তাহা বলেন নাই। লোকে সবিস্ময়ে ভাবিল, এ কি কথা! হায় হায়, এতদিনে বৃটিশ রসাতলে যায় বা!

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার দিন ধার্য হইল। কিন্তু পরমাশ্চর্য এই ১৯৪২এ ৮ই আগষ্টের নিশি শেষ হইতে দেয় নাই যে বৃটিশ, সেই বৃটিশ অত্যাসন্ন সমূহ বিপদ জানিয়াও একটুকু সতর্কতাও অবলম্বন করিল না। রত্নাকর যে সত্য সত্যই মহর্ষি বাল্মীকী হইতে পারেন ইহা কি শুধুই পৌরাণিক গালগল্প? মনে পড়ে ৯ই আগষ্টের কথা। বিবাহ বাড়ীর প্রয়োজনে পুকুরে বেড়া জাল ফেলিয়া মাছের বংশ নির্বংশ হইতে দেখিয়াছিলাম, কংগ্রেস নিধনং স্বাহা করিতে জালিকশ্রেষ্ঠ লিনলিথগোর জালের আস্ফালন দেখিয়া সেদিন ধন্য মানিলাম। দুই চারি বেলে, পাঁকাল ও বাণ (অরুণা অচ্যুত জয়প্রকাশাদি) ব্যতীত একটি প্রাণীও কি অব্যাহতি পাইয়াছিল? [illegible] সঙ্গে আর এক আগষ্টের আর একটি দিনের কথা না [illegible] পড়াই অস্বাভাবিক! অহিংসাবিবর্জিত প্রকাশ্যে না[illegible] চেঙ্গিসের পদাঙ্কানুসারক মুস্লিম লীগের ঘোররবে নিনা[illegible] প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তুরী ভেরী নির্ঘোষেও বৃটিশের কণা[illegible] চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইল না, এই অতি-ভূত ও অতি-[illegible] বৈলক্ষণ্য কি ভুলিবার?

কায়েদে আজম ও তস্য শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দীর্ঘকাল [illegible] স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন। ১৬ই আগষ্ট সরকা[illegible] ছুটি ঘোষিত হইলেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন তখনও [illegible] হয় নাই, কেবলমাত্র তাৎপর্য অনুধাবনের লগ্ন নি[illegible] হইয়াছিল। শুনিয়া অনেকে খেদোক্তি করিয়া বলিয়াছি[illegible] ভাইরে, এই যদি তোমার গোরাচাঁদ, না জানি কালাচাঁ[illegible] কেমন! ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতাকে মিথ্যাভাষণের [illegible]

ব্যাখ্যা করিবার দুঃসাহস আমাদের নাই; না থাকাই স্বাভাবিক; তবে মনে হইতেছে কথক ঠাকুরদের দ্বারা প্রচারিত মহাভারতের দ্রোণপর্বে "অশ্বত্থামাহতইতি"র পরে 'গজ' শব্দটি যেমন অনুচ্চারিত অথবা অর্ধোচ্চারিত থাকিয়া যাওয়ার ফলেই দ্রোণাচার্যবধের সুবিধা হইয়া গিয়াছিল, তেমনই প্রত্যক্ষ সংগ্রামটি অনুগত ভক্তবৃন্দ ঠিকই বুঝিয়াছিল, 'তাৎপর্য' শব্দটা হয় শুনিতে পায় নাই, না-হয় শুনিবার দরকার হয় নাই।

তারপর অক্টোবরে নোয়াখালি-ত্রিপুরা। ছয় মাস পরে বাঙ্গলার আইন সভায় দণ্ডায়মান হইয়া গভর্ণমেণ্ট সস্মিতাননে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র গৃহ লুণ্ঠিত, নয় সহস্র গৃহ ও কুটীর ভস্মীভূত, এক স্থানে দশ হাজার লোক ধর্মান্তরিত, অপরটিতে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই বটে, তবে অনুমান হয় হাজার হাজার লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লভিয়া ধন্য হইয়াছে। রাশিয়ায় নাৎসী তাণ্ডবের কথা কেতাবে পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, নোয়াখালি-ত্রিপুরা নাৎসীদেরও কাৎ করিয়া দিল। কিন্তু বাঙ্গলার লীগ গভর্ণমেণ্টের 'লী' পুণ্যের জোর। একটি ফাঁড়ী পুড়িল না; একটি চৌকী লুণ্ঠিত হইল না; একখানি রেল কেহ উপড়াইল না; গভর্ণমেণ্টের একখানা বাড়ীর একখানা ইট ধরিয়াও কেহ টান দিল না। একটি ইংরাজের বুটের একটি 'লেস'ও কেহ স্পর্শ করে নাই। "অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার"। কংগ্রেসের পুনঃ পুনঃ তুমুল আন্দোলনকালে ইংরাজের অঙ্গের কেশ স্পৃষ্ট না হইলেও ইংরাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, আর লীগের বীভৎস প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেই ইংরাজেরই সে কি উল্লাস! ক্লাবে ক্লাবে হোটেলে হোটেলে সুরা পেগের সে কি ফেনিলোচ্ছল মহামহোৎসব!

ঢিলের বদলে পাটকেল! বিহার পাটকেল হস্তে বাহির না হইলে নোয়াখালির হাল আরও কি হইত কে বলিতে পারে! বিহারের সাধুবাদ কেহ করিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই; বর্বর পাশবিকতার গুরুত্ব লাঘবের অণুমাত্র চেষ্টাও কেহ করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই; বরং পৃথিবীর লোক শুনিয়াছে গান্ধীর অনশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প; জওহরলালের কণ্ঠের বজ্রাদপি কঠোর তিরস্কারও পৃথিবী শুনিয়াছে। ভূতের মুখেও রাম নাম, চার্চিলও বারম্বার সেই কথাটা বলিয়াছেন। ফায়ার ব্রিগেডের প্রয়োজন হয় নাই, ঘড়া বালতির জলেই বিহারের অগ্নি অচিরে নির্বাপিত হইল। গান্ধীজী ও জওহরলালের অমিত প্রভাব দর্শনে বিশ্ব চমৎকৃত, কিন্তু কায়েদে আজম ও চেলাচামুণ্ডারা শিশুর ভূত দর্শনের মত ককাইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। আঘাতের সহিত প্রত্যাঘাতের সম্পর্ক যে দূর নহে সে বোধ জন্মিল কি-না কে জানে, আর্তস্বরে ধরিত্রী টলমল করিয়া উঠিল।

গান্ধীজী নোয়াখালি ছুটিলেন। একটি সত্যাশ্রয়ী সৎ মুসলমানও একটি সত্যাগ্রাহী নির্ভীক হিন্দুর সন্ধানে নগ্নদেহে নগ্নপদে গ্রামে গ্রামে, দ্বার হইতে দ্বারান্তরে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। স্বর্ণ নহে, রৌপ্য নহে, তাম্র নহে, অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, প্রেম ও মনুষ্যত্ব ভিক্ষা। অশীতিপর এই বৃদ্ধের তপঃক্লিষ্ট, অনশনশীর্ণ দেহে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা মর্ত্যে মানুষ ত ছার, স্বর্গের দেবতাও বোধ করি সম্মোহিতচিত্তে এই অপার্থিব দৃশ্য অবলোকন করিলেন। নগ্নপদে অজস্র ক্ষত, ক্ষতমুখে শতধারে শোণিত বিনির্গত, ধূলিধূসরিত গ্রাম্যপথে পরিক্রমার তবুও অন্ত নাই। লোকে বলে, রাবণের চিতার মত, নোয়াখালির আগুণও নিভিবার নহে; কিন্তু গান্ধীজীর কর্মজীবনের প্রথম পীঠস্থান বিহার, কত সহজে কত স্বল্পকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া গান্ধীজীকে সুখী করিল, নিজেও ধন্য হইল।

পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, বুঝি আসামেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। নোয়াখালি ও নর্থওয়েস্ট, পাঞ্জাব ও আসাম সর্বত্রই সংগ্রাম পদ্ধতি এক, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও অভিন্ন। মরিতে মরে তাহারাই, ঘরবাড়ী পুড়িয়া নিরাশ্রয় হয় তাহারা, নারী নিগৃহীত হয়

তাহাদের, ধর্মান্তরিত হয় তাহারা, যাহারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত—সেই সম্প্রদায়ভুক্ত—যে সম্প্রদায় ধর্মে কর্মে, স্বভাবে সহবতে, শান্ত ও মৃদু, ভদ্র ও শিষ্ট, বুদ্ধ হইতে চৈতন্য এবং গীতা হইতে গান্ধীর আদর্শেই আত্মনিবেদিতপ্রাণ।

কায়েদে আজম সম্প্রতি (আমাদের অদৃষ্টদোষে বড়ই বিলম্বে) একটি মহামূল্য উক্তি করিয়াছেন; লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দুর্বলের বিরুদ্ধে নহে এবং লীগবিঘোষিত প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের সহিত হিংসাদ্বেষবিদ্বেষের কোনই সংস্রব নাই। নিন্দুকে অসূয়াপরবশ অসত্য প্রচার করে মাত্র। বঙ্গদেশের উজীরে আজমও ঐ ধরণের কথা বলিয়া বলিয়া গলা প্রায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সার্ধচারিসহস্রবর্ষ পূর্বে রণস্থলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একজন মনুষ্য একবার বলিয়াছিলেন বটে, অহিংসা পরমো ধর্মঃ! ব্যাখ্যা করিতে অষ্টাদশাধ্যায় গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কায়েদে আজমের মুখে কি তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি?

অথবা সবই মায়া? ১৯৪৬এর ১৬ই আগস্ট হইতে আজ পর্যন্ত কলিকাতায়, নোয়াখালি-ত্রিপুরায়, পাঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে সবই কি শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্যদেব প্রচারিত মায়াবাদ মাত্র? যাহারা মরিয়া বাঁচিয়াছে তাহাদের কথা যাক, যাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া বৃক্ষতলাশ্রয় করিয়াছে তাহাদের কথাও যাক্, যে সকল নারী সতীত্ব হারাইয়া সর্বাঙ্গে কলঙ্ক-তিলক ধারণ করিয়াছে তাহাদের কথাও ছাড়িয়া দিই, পিতৃপিতামহাচরিত ধর্মে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়া জীবনে মরণের স্বাদ আস্বাদ করিয়াছে তাহাদের কথাও না হয় নাই তুলিলাম, যাহাদের পতি গিয়াছে, পিতা গিয়াছে, মাতা গিয়াছে সেই সব সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় নিঃসহায়ের সংখ্যাহীন দল দেশের চারিভিতে, রিলিফ ক্যাম্পে, আশ্রয় কেন্দ্রে যাযাবর সম ভ্রাম্যমান, যাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মেঘ ও গিরির মত একাকার, কই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্বে ত কেহ কোনদিন ইহাদের এই দশা প্রত্যক্ষ করে নাই। এ দশা তাহাদের কিসে হইল? কে করিল? সংখ্যায় দুর্বল, সামর্থ্যে দুর্বল, সঙ্ঘশক্তিতে দুর্বল বলিয়া হিংসানলে পুড়িয়াই কি এই দশা তাহাদের হয় নাই? না, সে নিছক ভ্রান্তি? নিছক মায়া? গল্পে শুনিয়াছি শঙ্করাচার্যদেবের প্রবল মায়াবাদ কাশীধামে একবার বিশ্বনাথের বাহন ঋজুশৃঙ্গ বলীবর্দের শৃঙ্গাগ্র সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, গান্ধীর জীবদ্দশায় কায়েদ আজম জিন্নার মায়াবাদের অবশ্য সে আশঙ্কা আদৌ নাই, তথাপি বড় দুঃখেই বলিতে হয়, "আর কি সময় নাহি রসময়?" ১৭ই আগষ্ট শনিবারের বারবেলাতে শুনিলেও হয়ত ফিরিবার পথ ছিল; কিন্তু হায়! মুদগরের ঘায়ে মায়ারও যে মোহাবসান ঘটিয়া গিয়াছে। এখন কেবল একটি আক্ষেপই বাকী আছে—'কি আর রেখেছ বাকীরে?"

ভুলভ্রান্তি কাহার না হয়? কংগ্রেস ভুল করে নাই? র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যেদিন ভ্রাতৃত্ব-তরুর মূলোৎপাটন করিয়া বিষবৃক্ষ রোপিত করিয়াছিল সেদিন পরম কারুণিক কংগ্রেসের তুষ্ণীভাবই কি ভারতবর্ষের সর্বনাশ করে নাই? ভারতের হিন্দুর শোণিততর্পণেই না সেদিনের কংগ্রেসের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে? এই লীগকে শক্তিশালী করিয়াছে কে? কংগ্রেস, না? বৃটিশ চার্চিলের কি সাধ্য ছিল যদি না কংগ্রেস ও গান্ধীজী

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার"

না করিতেন। লীগাধিপের যে দম্ভ আজ হিমাদ্রি শিখরকেও অতিক্রম করিয়াছে, তাহার মূলেও গান্ধীজীর বৈষ্ণব বিনয়ই কি জলসিঞ্চন করে নাই?

কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধীজীকে দোষী করিয়াই বা কি লাভ হইবে? ভারতের ভাগ্যলিপির পাঠান্তর তাঁহারাই বা কিরূপে করিবেন?

গান্ধী প্রবর্তিত ৯ই আগস্টের কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ ফল ১৯৪৮ সালের ৩০এ জুন মধ্যে বৃটিশের ভারত ত্যাগে দুইশত বৎসরের পরাধীনতার অবসান; আর জিন্না অনুষ্ঠিত ১৬ই আগস্টের প্রত্যক্ষসংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফ

অব্যবহিত ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের যে কণ্টকাকীর্ণ সুউচ্চ প্রাচীর উত্থিত হইল, কত যুগ কত শতাব্দীর সাধনায় সে ব্যবধান ঘুচিবে কিম্বা কোনকালে আদৌ ঘুচিবে কি না তাই বা কে বলিতে পারে?

'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া প্রতিভাশালী বাঙ্গালীকেও আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে দেখিতেছি কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। চক্ষুলজ্জার অবসর আজো আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। চক্ষুলজ্জার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও কি কলিকাতায় নাদিরশাহী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত? চক্ষুলজ্জার বালাই একটুও বাকী থাকিলে কি নোয়াখালি হয়? হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, পল্লীদাহ, ধর্মান্তরিতকরণও যেমন, তেমন নারীমাংসলোলুপ রক্তবীজ-পুষ্ট রাক্ষসের শোভাযাত্রা। মনে করুন তক্ষশীল, মনে করুন জয়চাঁদ; মনে করুন মানসিংহ, মনে করুন ভবানন্দ; মনে করুন মীর্জাফর। যে বিধাতা ভারতবর্ষ সৃজন করিয়াছিলেন সেই বিধাতাপুরুষই ভারতের অদৃষ্টে এই লিখনই লিখিয়াছিলেন। যে নারীর জঠরে জন্ম, যে মাতৃঅঙ্কে শয়ন, যে পুণ্যপীযুষধারায় জীবন ধারণ, সেই নারীর মর্যাদা, সেই জননীর পবিত্রতা, সেই মাতৃস্তন্যের মর্যাদা নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াও যে অজবৃত্ত পুরুষ লজ্জিত নহে, এককালে তাহার ছায়াস্পর্শে স্নানবিধি প্রচলিত ছিল। সে বিধান যে অকারণে রচিত হয় নাই ভারতের হিন্দু কি আজ মর্মে মর্মেই তাহা অনুভব করে না? হিন্দুর প্রাণে বাঁচিবার, সম্পত্তি সংস্কৃতি ধর্ম্ম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজন যদি আজ কঠিন বাস্তবের অঙ্গীভূত হইয়াই থাকে, তবে তাহার অন্তরের শান্তি, তাহার গৃহের শ্রী, তাহার সমাজের পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলা-নিকেতন, প্রেম ও প্রীতির নন্দন কানন হিন্দুর স্বর্ণ-সিংহাসনাধিষ্ঠিত লক্ষ্মীপ্রতিমাখানির মর্যাদারক্ষার প্রয়োজন আজ আরও অধিক। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ তাহা বুঝিয়াছে, বাঙ্গলার হিন্দুও কায়মনোপ্রাণে বুঝিয়াছে। বাঙ্গলার হিন্দু আজ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে একখানি সুখনীড় রচনায় তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়াছে।

হিন্দুর হৃদিবৃন্দাবনে আজ বংশীধ্বনি উঠিয়াছে; হৃদয়যমুনা আজ উজান বাহিয়াছে; আজ সে নিষ্কলুষ পবিত্র আবেষ্টনীমধ্যে নিধুবন মধুবন নিকুঞ্জবন গঠনে ব্রতী হইয়াছে। যে হিমালয়শিখরে গিরিবরগৃহে হিন্দুর দুহিতা উমার আবাস সেই হিমাচলমূল হইতে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর চরণচুম্বী যে বিস্তীর্ণ ভূস্বর্গ সেইখানেই সে তাহার ভূস্বর্গ সৃজন করিতে চাহিয়াছে। যে ভারতে তাহার ইহলোকের শান্তি পুণ্য বারাণসী যে ভারতের যমুনাতটে অক্ষয়বটমূলে তাহার হৃদয়ের রাসপূর্ণিমা, যে চিরনবীন প্রেমিকের প্রেমদোললীলায় আজও তাহার শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে ধমনীতে ধমনীতে দোলা লাগে, যে ভারতের শ্রীক্ষেত্রে রথারূঢ় পুরুষোত্তমদৃষ্টে জন্মজন্মার্জ্জিত পাপের শান্তি ও পুনর্জ্জন্মের যন্ত্রণার লাঘব হয়, যে ভারতের ত্রিবেণী সঙ্গমে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সে মৃত্যুভয় জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, যে ভারতের মানস সরোবরে স্নান করিয়া অমরনাথ প্রসাদে সে চির অমরত্ব লাভ করে, তাহার সেই স্বর্গাদপি গরিয়সী ভারত জননীর অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে হেন সাধ্য, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত তৃণাদপি তুচ্ছ, এ্যাটম্ বমেরও নাই।

হিন্দু চিরকাল আত্ম-হারা, আপন-ভোলা। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যক্ষে হিন্দুর যত সর্বনাশ সাধন করিয়াই থাক্, হিন্দুকে আত্মস্থ করিয়াছে সে সত্য অস্বীকার না করাই উচিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামবেশে নাদিরশাহী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলেই হিন্দুর আত্মচেতনা জাগিয়াছে। আত্মশক্তির অভাব তাহার কোনদিন ছিল না, এবং ছিল না বলিয়াই গান্ধীজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" ধ্বনিকে মূর্ত ও রূপায়িত করিতে সে সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিল। দুর্ধর্ষ ও বিশ্ববিজয়ী বৃটিশকেও সে কোনদিন ভয় করে নাই আজিকার সাম্প্রদায়িক হত্যালীলাকে ভয় না করিলেও ঘৃণাই সে চিরদিন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের

লেশমাত্র যেখানে অবশিষ্ট নাই, সেখানে মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শের মূল্য কে দিবে? ভারতের রাজনীতি যে কোন কালে আততায়ীর ছুরিকায়, যৌন ব্যাভিচারে ও ধর্মীয় অত্যাচারে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এ দৃশ্য কি কেহ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

এই অন্ধ ধর্মোন্মত্ততা, এই পৈশাচিক প্রভুত্ববিলাস, এই শোণিতপ্লাবন একদিন হয়ত স্তব্ধ হইবে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার অবসান ঘটিবে, কিন্তু ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা কয়খানি ইহা কলঙ্কিত করিয়া রাখিল অনন্তকাল কি অনন্তলোকসমাজে তাহা কলুষ বিস্তার না করিয়া পারিবে কি? পরাধীনতার লৌহনিগড় ছিন্নপ্রয়াসী স্বাধীনতাকামী জাতির আত্মদানের যে অবদান ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, অগণিত ভ্রাতৃশোণিতাপ্লুত, নারীর মর্মন্তুদ হাহাকারে বিমর্দিত, ধর্মান্তরিতের করুণ ক্রন্দনে কলঙ্কিত ১৯৪৬এর ১৬ই আগস্টের কাহিনীকে প্রশংসা ত দূরের কথা, প্রকাশ্যে সমর্থন করিবার মত হীন মনোবৃত্তি মনুষ্যালয়ে মিলিবে কি?

মানস মুকুরে সেই অনাগত ভবিষ্যকালের কালিমা লিখনই যে কায়েদে আজমকে বহু বিলম্বে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিলাপে যে প্রলাপেরই পদধ্বনি শুনিতেছি!

নবীন লেখকদের আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তার অন্তরে কতখানি শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটাতে পারলেই মানুষ তার নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সকল সাহিত্যের মূল। সুতরাং প্রতি নবীন লেখক যদি এই সংকল্প করেন যে, অন্যের মতামত আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, আমিই অন্যের মতামতকে প্রভাবিত করব, তহ'লেই তাঁর লেখার আর মার নেই।—প্রমথ চৌধুরী

ঢাকের বাদ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

'ঢাকের বাদ্য থামিলে মিষ্ট'—কে-বা হেন কথা বলে ?
শ্রোত্র তাহার চর্ম-মাত্র, শ্রবণ-নামে যা চলে।
অন্তরে মিলে রসের তত্ত্ব, বাহিরে যাহার দ্বার,—
মর্মের সাথে যোগ না থাকিলে সবই-যে ব্যর্থ তা'র !

*　*　*　*

দুর্গাপূজার বোধন বসেছে—ঘোষিছে ঢাকের বাণী,—
আধ ক্রোশ জুড়ি' সারা পল্লীর মনে-মনে জানাজানি !
উৎসাহ তা'র উথলিয়া উঠে নিরানন্দেরও ঘরে,
আনন্দ যেন দেহাতীত হয়ে আকাশে ছড়ায়ে পড়ে !

বৎসর-পরে গিরিরাজ-ঘরে মেনকা-মায়ের মেয়ে
আসিছেন ফিরে', সারা দেশ তাই পথপানে আছে চেয়ে;
মায়ের-মেয়ের মিলনোৎসবে নিখিলে পড়েছে সাড়া,
শিবপুরে শুধু শ্মশান জাগিছে হইয়া গৌরীহারা।

অম্বরে সেথা ডম্বরু বাজে গুরুগুরু-গরগর,
শিবানি শিবানি ডাকে শূলপানি, কণ্ঠে ফুটে না স্বর ;
—কি যেন কোথায়, ভুল হয়ে যায়—অতীত ভবিষ্যৎ,
ভূমিকম্পে কি সহসা কাঁপিল কৈলাশ পর্বত !

তিনটি দিনের বিরহ মাত্র, তবু মনে জাগে ভয়,
সতী-বিয়োগের বেদনার কথা ফিরে যেন মনে হয়
পাগল ভোলার ত্রিনয়নে তাই নিবে' আসে যেন আলো,
ভাবে,—যতদিন রত ছিনু যোগে,
　　　　ততদিনই ছিনু ভালো।

*　*　*　*

দেবদারু-পথে ঐ দেখা যায় গৌরীর রথখানি !
মন উচাটন, না মানে বারণ,—ছুটে' চলে হিমরাণী।
গিরিরাজ-গৃহে হুলাহুলি সাথে শত শাঁখে পড়ে সাড়া,
মাতে পুরনারী উমারে ভেটিতে উজাড়ি' পল্লী-পাড়া।

নানা কলরব—ঢাকিয়া সে সব ঢাকের বাদ্য বাজে,
ভুলাইয়া লাজ ভুলাইয়া সাজ ভুলাইয়া গৃহকাজে ;
কাঁপাইয়া মাটী ঢাকে পড়ে কাঠি, উঠে আগমনী-বোল,
মর্মে সবার ধ্বনি পশে তা'র ছাপায়ে গণ্ডগোল।

চারিধারে তারই প্রতিধ্বনিটি বারবার ফিরে' জাগে—
গৃহ হ'তে গৃহে, জন হতে জনে আনন্দে অনুরাগে ;
কেহ শোনে আর কেহ-বা শোনে না,
　　　　এ ধ্বনি সে ধ্বনি নয় ;
সবাকার সাথে সবারে মিলাতে বাণী এর দুর্জয় !

ষষ্ঠী হইতে দশমী প্রভাত মহাতিথি যায় যত—
পূজা, ভোগ, বলি, সন্ধি, আরতি—নানাবুলি নানামত,
আধক্রোশ ধরি' যেথায় যে আছে—পশিয়া সবার কাণে
মর্মের মাঝে পশি' কত প্রীতি কত স্মৃতি বহি আনে।

নাচে শিশুদল চলচঞ্চল তালে তালে মাথা নাড়ি',
বয়স্ক যারা মনে-মনে তা'রা শিশুদেরই অনুকারী।
নরনারী যত আরতি-সময়ে চাহি' প্রতিমার পানে
মায়ের মুখের হাসিটিও যেন সত্য বলিয়া মানে।

বিজয়া-দিনের ঢাকের কান্না জল আনে চোখে চোখে,
বেদনা তাহার ছড়ায় পবনে দিকে দিকে লোকে লোকে
যেখানে যাহার বিয়োগেব ব্যথা এক হয়ে যেন আজি ;
নূতন করিয়া উঠে উথলিয়া ঢাকেব আওয়াজে বাজি !

গত জীবনের দুঃখ-সুখের কত স্মৃতি-ইতিহাস--
মানবের মনে জমিয়া গোপনে বিজনে করে যা' বাস,
ঢাকের মুখের বাণীতে তাহারি প্রকাশ নিত্যকাল
আবালবৃদ্ধ নরনারী—মনে গাঁথি মমত্বজাল।

স্থূল-রুচি এই বাঙলার কবি জানে না সূক্ষ্ম কলা,
বেণু ও বীণার উচ্চাধিকার মিছা তাব কাছে বলা।
জনগণ সাথে কণ্ঠ মিলায়ে সে শুধু জানাতে চায়—
ঢাকের বাদ্য থামাতে বলিলে মনে সে বেদনা পায়।

মহানগরী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে মহানগবী, শুধাই তোমাবে প্রবঞ্চিতা
অবগুণ্ঠন উন্মোচনের লগ্ন আসিল
জানো না বুঝি ?
তুমি কি পারিবে দগ্ধ আনন দেখাতে সবে
নরনারী শিশু ভীড় ক'রে যবে দাঁড়াবে পাশে ?
তোমার অঙ্গে রত্নাভরণ
পরাইল যারা সকৌতুকে
অলঙ্কাবের জৌলসে বুঝি তোমারও নয়ন
ধাঁধিয়া গেল ;
তুমি দেখিলেনা ঝুটা মণি তার নকল সোনা,
রাঙতায় মোড়া মুকুট-শোভার অহঙ্কারে
অবনত মুখে জানাইলে তব কৃতজ্ঞতা।
তাহারা হেসেছে হেলার হাসি
আড়ালে কখনও সরিয়া গেছে ;
দূরে হ'তে কভু বিদ্রূপ করি
তোমারে বলেছে কলঙ্কিনী
তোমারে দেখেছে পসারিণী-নারী
চাহেনি তোমারে স্বয়ম্বরে।

ভরা গঙ্গায় পণ্যে সাজান
তরণীরে তুমি চিনিতে পার ?
সেথা কি দেখিছ বিজয়-নিশান
উড়িছে কাদের গর্ব ভরে' ?
বহু নীচে তার শুনেছ কাদের তৃষিত কণ্ঠে
আর্তধ্বনি !
পশ্চিমে মেঘ তারি ফাঁকে ফাঁকে
ছড়ান সোনার টুক্‌রো ঝরে।
হেথায় নিয়ে মাটি ভিজে ওঠে
তাজা রক্তের উষ্ণ ধারে।
ধুলায় ধুলায় তোমার কাহিনী

মানুষ চেননি তাই মানুষের এ লাঞ্ছনায়
তোমার বিরাম কুঞ্জতলে
সুধার পাত্র বিষ বলে তুমি
ছুঁড়ে ফেলনিক বিতৃষ্ণাতে।

মৃত্যুর পথে জীবনের পণ
শৃঙ্খল নিয়ে হাসির খেলা
তুমি ত দেখেছ জীবন ভ'রে—
অত্যাচারীর অগ্নি-অস্ত্রে কাঁচা প্রাণবলি
নির্বিকারে ;
তুমি ত দেখেছ রুদ্ধ কবাটে
আঘাত হেনেছে পাষণ্ডরা
তুমি ত শুনেছ চতুর্দিকে
দিবস রাত্রি ক্ষুধার কান্না ভোগগর্দভ ধনীর দ্বারে ;
তুমিত দেখেছ মার বুক হ'তে
স্নেহের শিশুরে ছিনায়ে নিতে
সম্ভ্রমহানি জননী-জায়ার
নিরুপায়ে শেষ আত্মবলি,
সত্যের পরে দম্ভ হেনেছে
শত পদাঘাতে উদ্ধতেরা
তাদের বিচার করেছে যাহারা
তাদের বিচার হোল না আর।

তুমি ব'সে ব'সে হায়গো জরতী
গত বৈভবে স্বপ্ন দেখ,
গৃহদাহ দেখি' ভাব বিবাহের আতসবাজী,
বিস্ফোরণের দমকা আওয়াজে
মনে ভাব বর নিকটে এল,
ভয়বিহ্বল কোলাহলে ভাব
বিবাহ-বাসরে হুলুধ্বনি।
হায় হতভাগী বিলাস-শয্যা
কন্টক হয়ে বিঁধে না গায়ে
প্রসাধনে তব নাহি আলস্য
নহ লজ্জিত অলঙ্কারে ;
তোমার ঘরের প্রদীপ নিবিছে
মালা-চন্দন শুকায়ে গেছে,
হয়ত এখনি প্রভাত হবে—
প্রভাত না হোতে দাঁড়াও বারেক দুয়ারে এসে
দর্পণে তব পড়ুক ছায়া
সে ছায়া দেখিয়া হয়ত আজিকে পড়িবে মনে
বহু আগেকার একটি প্রভাত
সে প্রভাতে তুমি রাজেন্দ্রাণী,
সপ্তদ্বীপের মরকত মণি মুকুটে জ্বলে
জ্বলে দু'নয়নে উদয়ভানুর স্নিগ্ধ আলো ;
মধুর হাস্যে মহিমান্বিতা তোমার দ্বারে
মনে কি পড়ে—
পূজার অর্ঘ্য বহিয়া আনিল বীরাঙ্গনা
অঙ্গনে তব মহোৎসবের দিবাবসানে
বীরবৃন্দের প্রণতি লভিলে
বসিয়া আপন সিংহাসনে— ?

তাইত শুধাই হে মহানগরী,
হয়ত এখনই প্রভাত হ'বে—
আলোকে জাগিবে বসুন্ধরা ;
তোমার লজ্জা কলঙ্ক তব ভাগ্যহীনা,
কেমনে ঢাকিবে সভার মাঝে ?

ধর্মান্ধ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হে ধর্মান্ধ ! ধর্মে অন্ধ ভাগ্য-পরিহাসে !
পতঙ্গেরা তেজঃপুঞ্জ বহ্নিশিখাপাশে
উদ্‌ভ্রান্ত যেমতি, তেমতি ধর্ম্মেরে চাহি
দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য রহ অবগাহি
গভীর গোঁড়ামি পঙ্কে !

অন্ধ-হস্তি-ন্যায়
দেবতারে বল স্তম্ভ কভু রজ্জু-প্রায়
কভু শূর্পসম কভু সর্পসম তায়
একান্ত একাঙ্গ দেখি। বুঝিনাক হায় !
আপনারে পোষ্যপুত্র মানো বিধাতারে
ভুলাইয়া মন্ত্র পড়ি কিম্বা কি-প্রকারে
উৎকোচে পূজায় ?

চড়ি কদলীর ভেলা
উত্তরিবে তুমি বুঝি করি অবহেলা
শাস্ত্রপারাবার পারে ?

তার চেয়ে বুঝি
নাস্তিকে স্বস্তিক বাক্য কহে সোজাসুজি
সর্বহিতবাদবাণী মুক্ত অভিমানে
সমুদার চিত্ত তার ছোট বড় জ্ঞানে
কোনো ধর্ম নাহি ভজে ; নাহি ত্যজে কারে
অনার্য কি আর্য গণি ; শিষ্ট সদাচারে
মিষ্টভাষে করে প্রীতি, আড়ম্বর-হীন
সম্প্রদায়ে অসংকীর্ণ কৌটুম্বে প্রবীণ,
বসুধৈব দেশ যার নভস্তলে ঘর
সংসারে সর্বস্বহীন চলে যাযাবর,
নাস্তিক তাহারে ধরি কানে কানে বলে
ধর্ম্ম না হইলে চলে, কিন্তু নাহি চলে
ধরাতলে হলে অর্থহীন, রাত্রি দিন
শান্তি হীন, দীন হীন, একান্ত মলিন
'হা-ঘরে' 'হা-ভাতে' পড়ি তরুচ্ছায়াতলে
খাদ্য যদি পায় কিছু খায় অশ্রুজলে
লবণাক্ত করি।

ধর্মান্ধ দুর্গের মত
ধর্মের পরিখা বেষ্টি রহে সে সতত
অচলায়তনপুরে, সহজে না চলে
সূর্য-রশ্মি মুক্ত-বায়ু, সুনির্মল জলে
কত না কদর্য বাধা ! পরধর্মপুরে
সতত শত্রুর মত আশে পাশে ঘুরে
কেমনে তাহারে আনি আত্ম-অধিকারে
উড়ায়ে বিজয়-ধ্বজা রক্ত-অত্যাচারে
করায়ত্ত করে পরে।

ডাকে পিতা বলি !
কে কাহার পিতা ? মিথ্যা ছলনায় ছলি
ডাকে ভগবানে !

মাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা
গতানুগতিক মতে করে আরাধনা
সুবিধা বিধায় শুধু মানে ভগবান
নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি করে ভাগ্যবান
পর ভাগ্য-নিষ্পীড়নে।

সাম্য স্বাধীনতা—
বিশ্ব-ভ্রাতৃ-প্রেম-ভাব বড় বড় কথা
কহে মুখে, কিন্তু বুকে হাতখানি দিয়া
দেখেনা দেবতা যেথা, আছেন বসিয়া
'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী'-সুহৃদের রূপে
নেপথ্যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে চুপে চুপে
লিখেন অমোঘ লিখা দিব্য তুলিকায়
কর্ম্মফল-ভোগ-লিপি, মিছে ভাবে তাঁয়
ভিন্নধর্ম্মে ভিন্ন রুচি।

বিবিধ চিহ্নকে
শ্রীঅঙ্গে ধারণ করি চাহে নিষ্পলকে
ধন্য মানি বরবপু, স্বর্গে সন্নিকট,
পরধর্মে জাহান্নম-স্বধর্মে কপট,-
ভক্তির দোহাই দিয়া।

আচারের চাপে,
অনাচারে, কদাচারে, যুক্তি অপলাপে,
কলুষিত করে সত্যে। ছুই করে ঢাকি,
অথবা অশ্বের মত চক্ষে ঠুলি রাখি,
সত্যেরে কি রোখা যায় ঝরোখার মত
অক্ষমের করে অসি নিরামিষ ব্রত
আবদ্ধ কৃপাণ-কোষে? অথবা যেমতি
কৃপণ লুকায় স্বর্ণে সুসংকীর্ণ মতি?
সবারে বঞ্চিতে গিয়া, ভূগর্ভে প্রোথিয়া
নিজেরে বঞ্চিত করে হিংসায় মরিয়া;
সুবর্ণের মত কভু দুর্ভাগ্য তেমন
ঘটেনা সত্যের ভালে, সত্য যে আপন
মহিমায় স্বয়ম্প্রভ। কোনো অন্তরালে
বাঁধা নাহি রয়, যদি রয় কোনো কালে
দীর্ঘকাল নাহি সহে।

মহা আড়ম্বরে
নানাধর্মে নানাচার বহুদিন ধরে
কতো কিছু তুচ্ছ নীচ বিচার-বর্বরে
মনুষ্যত্বহীন কর্ম করে গর্বভরে
অধর্ম ধর্মের নামে। করে রক্তপাত
অজস্র ধর্মের তরে। কৃষ্ণেরে আঘাত
করে সে খৃষ্টের নামে, অন্তর্য্যামী হাসে,
ক্রুশবিদ্ধ করি কারে গলরজ্জু পাশে
কাহারে করিয়া দগ্ধ অন্ধ স্বৈরাচারে
পরধর্মে বৈরাচার স্বর্গে যাইবারে
স্বধর্মে সুলভে, হেথা কর্ম যায় রেখে
'কৃতকর্ম প্রতিফল'—সেথা গিয়া দেখে
কোথা কৃষ্ণ, কোথা খৃষ্ট, পিতা-ভগবান?
একচক্ষু কী ভীষণ হাসে শয়তান—
বসি সিংহাসনে। ছদ্ম ভগবানে ভজি
'ত্রাহি'-রবে রৌরবের অধস্তলে মজি
দহে সে পাবকে।

বহু যুগে হল জমা
যুগে যুগে ধরিত্রীর পথ-পরিক্রমা
বহুস্মৃতি বহে স্মৃতি সংহিতা বিধানে

রাত্রির সঙ্গীত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বহু স্তব্ধ তারাভরা রাতে
যখন থেমেছে চলাচল
যানবাহনের,
সমস্ত সহর শুধু মূর্ছাতুর নিদ্রায় বিকল,
কার যেন হাত লাগে হাতে
কার ছোঁয়া চোখের পাতায়।
ভেঙে যায় অকস্মাৎ ঘুম,
চোখ মেলে দেখি ঊর্ধ্বে জ্বলে তারাদল.
নিরুত্তাপ আকাশ নিঝুম।
আর কোনো শব্দ নেই আর কারো সচকিত সুর
রক্তস্রোতে ঢেউ তুলে বাজে না হৃদয়ে,
মাঝে-মাঝে দূরাগত হাওয়ার আঘাতে
অশোকতরুর মূলে ঝরা পত্রদল
কাঁপে ভয়ে ভয়ে।
মানুষের সাড়া নেই সকলের চোখের পাতায়
যাদুকরী ঘুম এসে যাদুদণ্ড দিয়ে
ছোঁওয়া দিয়ে যায়।
দিনান্তের প্রাণকেন্দ্র সচেতন গভীর নিদ্রায়।

রাত্রির গহ্বর হ'তে চুপিসারে বার হ'য়ে আসে
নিরুচ্চার তন্দ্রাভাঙা সুর,
অপূর্ব সঙ্গীত যেন, পলাতক স্মৃতিতে বিধুর !
অশ্বত্থ পল্লব দোলে রাত্রির বাতাসে,
তারি ছায়া দূর্বাদলে, ঘাসে,
আকাশের নীলিমায় নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থেকে
বারংবার এ হৃদয় মৌন, তন্দ্রাতুর।
রক্তমাখা স্মৃতিতে বিধুর !

মনে হয় রজনীর নিরুচ্চার সঙ্গীতের এই
বারিধারা
সদ্যোজাত কিন্তু চিরন্তন।
প্রত্যেক রাত্রিতে নিক ধুয়ে হৃদয়ের প্রান্ত ছুঁয়ে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
গ্লানি আর জড়তাকে, সমুচ্ছৃত হোক না যৌবন।
জীবনের পথে-পথে দ্রুত চলে ভারবাহী রথ,
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে খুঁজে মরে ভ্রষ্টনীড় অযুত মানুষ
দুর্বার, বিচিত্রগামী পথ।
সারাদিন রৌদ্রালোকে ছায়াপ্রদ পথ খুঁজে-খুঁজে
শেষহীন মন্থর যাত্রায়
বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা পদতলে প্রবল মাত্রায়,
আমাদের চোখ আসে বুঁজে।
তারপর রাত এলে
যে মুহূর্তে নিদ্রাতুর গ্লানি আর জড়তাকে
দুঃস্বপন দূরে ছুড়ে ফেলে ;
তন্দ্রাঘোরে বনান্তের পথ যেন ডাকে,
পথে যেতে দেখি পথে ফোটে শতদল,
ফসলের শত ঢেউ মাঠের সবুজে।

নিস্তব্ধতা ঘনীভূত ঃ রাত্রির সঙ্গীতধ্বনি শুনি।
সঙ্গীতের শেষ নেই প্রণয়েরো শেষ নেই কোনো।
রাত্রির সঙ্গীত শেষে রক্তস্নাত দিন এসে
দাঁড়াবে আবার কাল ভোরে ;
পরমায়ু নেই তবু বেঁচেই যে আছি।
সেটা কোন্ জোরে ?

শতাব্দীর নিশি-যাপন

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যে সময় চলে গেছে, যে মানুষ মরে গেছে—
তাহাদের ঘন নৈশ সুর টানি চেতনার
চন্দ্রাতপ-তলে
ভঙ্গুর পাণ্ডুর ক্ষীণ সুন্দরী সে মেয়ে,
আসে সন্ধ্যা।
কেয়া-বনে জ্বলিল আরতি,—
গন্ধে গন্ধে ঘাসে ঘাসে, সুরাসম কেয়ার নিশ্বাসে,
জোনাকীর পাখার কিরণে,
দিবসের পথ হতে পলাতকা শব্দদের রেশে,
সহস্র-অস্ফুট-স্পর্শ-তীরে
নীলাক্ষী হেলেন কাঁদে, রূপের আগুন হতে
নীল শিখা উঠে,
সুন্দরী হেলেন বাতায়নে, ট্রয় হবে শেষ।

ক্রেসিডা, ঘুমায়ো নাকো, নিষ্ঠুর-নয়না,
আজ রাত্রে তাঁবু শান্ত রহিবে না,—
ট্রয়লাস চলিছে সে কতকাল যুগবর্ষ
ধরি তোমা লাগি,—
খেজুর গাছের শিরে আজ রাত্রে চাঁদ অস্ত গেলে
আসিবে সে, থেকো মেয়ে জাগি।

ক্লিওপেট্রা! ক্লিওপেট্রা!
—পদক্ষেপ শুনিছ কি তার?
কঠিন প্রাসাদ থেকে মৃত্যুর ঝরণা গলি পড়ে,—
নীল নদ লাল হয়ে গেল,—
আঁখি হতে কণ্ঠ হতে
যৌবনগন্ধেতে সিক্ত বক্ষপুষ্প হ'তে
বিলোল আগুন উপচিয়া পড়ে; রাণী ক্লিওপেট্রা!
কামনার বীজে ভরা সুগন্ধি চুম্বন,
ঈজিপ্টের নভোতলে আবেগে কাঁপিছে মধু-পাপ,
জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে যায়, সম্রাটের ঘুম
কেড়ে নেয়;—
রাত্রি যায় বেড়ে, গর্জে বায়ু,
নীলনদতীরে বসি
শতাব্দীর রহস্যনিষিক্ত গাত্রবাসে,
ললাটে স্বেদের বিন্দু, ক্লান্ত, ঢেউ গণে,
তীব্র ক্লিওপেট্রা।

পেনিলোপ্! পেনিলোপ্!
ঘড়ি কি দেখিছ?
উলিসিস্ সিন্ধুতীরে এলো।
তোমার কার্পেট-বোনা কতোখানি হ'লো?
উলিসিস্ আসিতেছে—
বহু দেশ, মানুষের, বনানীর ঘ্রাণ নিতে পারো
চর্মে তার, ওষ্ঠে তার, কেশে তার,
সত্তা তার বর্ণে ভরে গেছে।
তোমার দেহের যমুনায়
অবেলায় অতিথিরা ভিড়াইল তরী,
নির্লজ্জ পাখীর ভিড় যাক্ তবে সরি;
সুন্দর প্রতীক্ষা তব আমার শিরায় স্পর্শ দিল,
পেনিলোপ্।

* * * *

এরা এলো, আরো এলো অনেক নায়িকা
পশ্চিমের সাহিত্যের বহু মালবিকা;
তাহাদের প্রেম অশ্রু সাফল্য ও কারুণ্যের রঙে
বিগলিত, ছায়াময় বহু-দূর-কাল
আমার পড়ার ঘরে সেই রাত্রে
রেখে গেলো গভীর নিশ্বাস।
রোমান্সের যুগ শেষ, এটা বুঝি করেনি' খেয়াল?
অথবা সে মিছে কথা শতাব্দীরা করেনি' বিশ্বাস?

ষ্টার্লিং পাওনার পরিণাম

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে এ দেশের লোকের ধারণা এখন আর আগের মত অস্পষ্ট নয়। লোকে আজকাল এটাও বুঝতে শিখেছে যে, ব্রিটেনের কাছে ভারতের যে ১৬০০ কোটি টাকার মত পাওনা আছে, তাই ভারতের পর্বতপ্রমাণ দেনা পরিশোধের এবং যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করবার মূলধন হিসাবে একমাত্র সম্বল, এই পাওনা আদায়ে যত বিলম্ব হবে যুদ্ধের আঘাতে ভগ্নপ্রায় ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ততই ধ্বসে পড়বে। বর্তমান দুঃসময়ে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলে পাওনা ষ্টার্লিংগুলি আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যেমন আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন, ভারতের জনসাধারণও তেমনি এসম্বন্ধে আজকাল কিছু কিছু চিন্তাভাবনা ও আন্দোলন করতে আরম্ভ করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সমবেত আন্দোলনের ফলে ভারতের দাবী ক্রমেই বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলো কিভাবে জমে উঠলো তার একটা ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা দরকার। আগে ভারতবর্ষ বৃটেনের দেনদার দেশ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতসাম্রাজ্য কেনা হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মদেশ জয় করা পর্যন্ত নানা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় বৃটিশ সরকারের স্বার্থে ভারত সরকারের যে ব্যয় হয়, অসহায় ভারতের দেনার খাতে তার একটা বড় অংশ বরাবর জমা হয়েছে। ভারতবর্ষে রেলপথাদি বসাবার জন্যও চড়া সুদে বৃটেন থেকে একরাশ টাকা ঋণ হিসাবে আনা হয়েছিল। ভারতের জন্য ইংরেজ সৈন্যদের শিক্ষাদিতে, ইণ্ডিয়া অফিসের খরচ চালাতে, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য বা সিভিলিয়ানদের পেন্সন দিতে এবং এই ধরণের আরও নানা হিসাবে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ থেকে ৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড (৪২ কোটি টাকার মত) বৃটেনে প্রেরিত হত। এই সব ব্যয় নির্বাহ করতে এতদিনে যে খরচ হয়েছে, তার বহুলাংশই যোগান হয়েছে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত থেকে, বাকীটা দেনা করে পূরণ করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার বৃটেন গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা। বিলাতী আর্থিক দায়িত্ব মেটাতে ভারতসরকারের বৃটেনে থেকে বরাবর একটি স্থায়ী ষ্টার্লিং তহবিল রক্ষা করতেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই তহবিলে ৫ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং (প্রায় ৬৮ কোটি টাকা) জমা ছিল। তারপর যুদ্ধ বাধল। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এ দেশের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমরায়োজন নিয়ে আধুনিক যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়, জাপানী আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা কিন্তু বৃটিশ সরকারের মস্ত বড় স্বার্থ; কারণ এতে শুধু সাম্রাজ্য রক্ষাই হবে না, পূর্বরণাঙ্গণে জাপানকে রুখতে পারলে পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্মানীকে আটকানোও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এই সব কথা বিবেচনা করেই বৃটিশ সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকারের সঙ্গে একটা আর্থিক চুক্তি করলেন এবং স্থির হ'ল যে ভারতবর্ষের বাইরে ভারতসরকারকে যে যুদ্ধ চালাতে হবে তার সব খরচ বৃটিশ সরকার বহন করবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত

পরিস্থিতিতে সমতার সৃষ্টি করতে হলে মুদ্রাস্ফীতির জন্ম কমাতেই হবে, সেই মুদ্রাসংকোচনের দিক থেকে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস করা অত্যাবশ্যক।" একদল আবার মরিয়া হয়ে মাঝে এমন আন্দোলনও করেছিলেন যে, ভারতের নামে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছে, ততখানি ভারতের সত্যকার পাওনা নয়, শুধুমাত্র নিরুপায় বৃটেনের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসম্ভব চড়া এবং অন্যায়দরে ভারতবর্ষ তাকে পণ্যাদি জুগিয়েছে বলেই ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এত স্ফীত হয়ে উঠেছে। এই সব যুক্তি যে স্বার্থপ্রণোদিত এবং মনগড়া সে কথা না বললেও চলবে। প্রথম যুক্তির উত্তর হচ্ছে বৃটেন ভারতের সমরব্যয়ের একাংশ বহনে প্রতিশ্রুতি না দিলে ভারতের মত দরিদ্র দেশের যুদ্ধ করে সর্ব্বস্বান্ত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বৃটেন সমরব্যয়ের একাংশ দেওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যুদ্ধের খরচ চালাতে দেউলিয়া হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে স্বাধীন দেশ হিসাবে নয়, নইলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের জালে জড়িয়ে ফেলবার আগে একবার অন্ততঃ এ বিষয়ে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা হ'ত। বৃটেনের ঘরের পাশে আয়র্লণ্ড গত যুদ্ধে পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রথম ২। মাস নিরপেক্ষ ছিল, মুসোলিনীর ইটালী পর্যন্ত যুদ্ধের গোড়ার দিকে ৯ মাস যুদ্ধ করেনি, এইসব দেশ যখন এভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারে তখন দুর্বল ভারতবর্ষের পক্ষে জাপানী কামানের মুখোমুখী দাঁড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ না করাও অবশ্যই অসম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর হচ্ছে টাকা কমালেই ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমবে না, এ দেশে টাকা বাড়ার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হয় নি, হয়েছে পণ্যাভাবের জন্য। ষ্টার্লিং পাওনা যথাসম্ভব পুরোপুরি ফেরৎ চাই, কারণ এই টাকায় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে ভারতে শিল্পসম্প্রসারণ সম্ভব হলে তবেই এদেশে বাড়তি কর্মসংস্থান হবে এবং পণ্যাভাব কমবে। এ ছাড়া বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি জনিত দুরবস্থা প্রতিরোধের আর কোনই উপায় নেই। তৃতীয় যুক্তির উত্তর অবশ্য আমাদের দিতে হবে না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন তারাই মতপ্রকাশ করেছেন যে, ভারতসরকার যুদ্ধের সময় ভারতের বাজার দর অপেক্ষা সস্তাদরে ব্রিটিশ সরকারকে জিনিষপত্র যুগিয়েছিলেন।

ভারতের পাওনা নাশের অপচেষ্টামূলক এই সব বেসরকারী আন্দোলনের কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে এসম্বন্ধে এতদিন উল্লেখযোগ্য কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নি। আশঙ্কার বিষয় সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকারী তরফ থেকে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে যে সব বাণী উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছেন, তাতে ভারতের স্বাধীনমতাবলম্বী সকলেরই আতঙ্কিত ও বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। এই ধরণের প্রথম সরকারী আলোচনা হয়েছে গত ফেব্রুয়ারী বিলাতের কমন্স সভায়। এই সভায় ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষের সকল পাওনা দাবী মিটানোর অধিকার ব্রিটিশ সরকারের থাকা উচিত। এর পর গত মে মাসে লণ্ডনে ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অফ কমার্সের ভোজসভায় ডাঃ ডালটন পুনর্বার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, বৃটেনকে তার বিরাট দেনার বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে হবে। এই বিপুল দেনা অবাস্তব, অন্যায় এবং সমর্থনের অযোগ্য।

ডাঃ ডালটনের উপরিউক্ত মন্তব্য যে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে এবং ভারতবর্ষে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা বুঝিয়ে না বললেও চলবে। বৃটিশ অর্থসচিবের এই ধরণের মন্তব্যের পর ভারতসরকারের সাবধান না হয়ে উপায় নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের পাওনা প্রায় ১০০ কোটি টাকা বৃটেন একরকম ষড়যন্ত্র করে বাতিল করে দিয়েছিল। আশার কথা, বর্তমানে ভারতে জাতীয়তাবাদী অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই সরকার দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করেছেন যে, কোনভাবেই ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ

হ্রাস করা চলবে না। গত ২৮শে অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ এসম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতসরকার দৃঢ়তা বজায় রাখলে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৃটেনের পক্ষে পাওনা ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বৃটেন যখন আর্জেন্টিনার ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছে, তখন তার দিক থেকে ভারতের পাওনা পরিশোধে (এই পাওনা ষ্টার্লিংগুলিই দরিদ্র ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র আশাভরসা) অসম্মত হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার ব্রেটন উডস সহরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা পরলোকগত লর্ড কিনেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিলম্ব হলেও বৃটেন ভারতের দেনা অস্বীকার করবে না। ডাঃ ডাল্টনের উপরিউক্ত মন্তব্যের সঙ্গে লর্ড কিনেসের এই প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

যুদ্ধ অবসানে যুদ্ধকালীন ঋণ ও ইজারা চুক্তি বাতিল হওয়ায় বিপন্ন ব্রিটেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নূতন এক চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৪৪০ কোটি ডলার (১৪০০ কোটি টাকার কাছাকাছি) ধার করে। এই ঋণ গ্রহণের সময় বৃটিশসরকার প্রতিশ্রুতি দেন যে, অবিলম্বে তাঁরা বৃটেনের বিদেশী ঋণের একাংশ বাতিল করবার ও অবশিষ্টাংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এই চুক্তির ফলেই সম্ভবতঃ বৃটিশ সরকারের মতিগতি পরিবর্তিত হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে স্যার উইলফ্রিড ইডির নেতৃত্বে এক বৃটিশ প্রতিনিধিদল ভারতসরকারের সঙ্গে ষ্টার্লিং পাওনার মীমাংসা সম্পর্কে কথাবার্তা চালাবার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ অন্তর্বর্তী সরকারের ভারতীয় স্বার্থসংরক্ষক দৃঢ় মনোভাবের ফলে সেই আলোচনায় বৃটিশ প্রতিনিধিদল বৃটেনের দেনা কমাবার বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এই নিষ্ফল প্রয়াসের পরিণতিতেই বোধ হয় ডাঃ ডাল্টন তথা বৃটিশ সরকার এখন কতকটা মরিয়া হয়ে (এবং নীতিজ্ঞান ভুলে) সরাসরি বিদেশী দেনা কমিয়ে ফেলবার সংকল্প প্রকাশ করছেন। যাই হোক, এই ধরণের মন্তব্য যখন তাঁরা করছেন, তখন ভারতের মত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার পক্ষকে এই মন্তব্যের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অবিলম্বে পুরো পাওনা আদায়ের জন্য আন্দোলন বা চেষ্টা করতে হবে। ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ১৯১৯-২১ খৃষ্টাব্দ আর ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ যে একবস্তু নয়, ষ্টার্লিং পাওনা সমস্যার সমাধানের উপর একথার প্রমাণ নিঃসন্দেহে বহুলাংশে নির্ভর করছে।
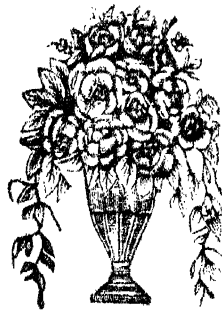
একটি শত্রুর কাহিনী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বড়পাদ্রী ডোনাল্ডস্ বুড়ো হয়ে গেছেন। চুল পেকেছে, দাড়ির রং হয়েছে ধবধবে সাদা। আগে ত্রিশ মাইল টাট্টু হাঁকাতেও কষ্ট হত না, আজকাল দু পা হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়েন। একবার শহরে গিয়ে সিভিল সার্জেনকেও দেখিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বলেছেন, ব্লাডপ্রেশারের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, সুতরাং সতর্ক হওয়া দরকার।

সতর্ক হওয়া দরকার তো বটে, কিন্তু সুযোগ কই? এ দেশটাই যে সৃষ্টিছাড়া। দশ মাইলের ভেতরে রেল-লাইনের কোনো বালাই নেই। আর শুধু রেললাইন কেন, পথঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। মাইল আষ্টেক দূর দিয়ে জেলাবোর্ডের একটা রাস্তা চলে গেছে, বোধ হয় ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তনের যুগে ওই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তারপরে ওর গায়ে কেউ আর হাত দেয়নি। দুপাশ দিয়ে রাস্তা ভেঙে নেমে গেছে, গোরুর গাড়ির অত্যাচারে একেবারে শতখান। গরমের সময় চলতে গেলে পায়ে পায়ে হোঁচট লাগে, ধুলোয় একেবারে কোমর অবধি গেরুয়া রঙ ধরে যায়; আর বর্ষাকালে মহাপঙ্ক—হাতীর পা ডুবলে টেনে তুলতে পারে না।

তা ছাড়া মাঠ আর মাঠ। দু এক ফালি ফসলের ক্ষেত, বাকী সবটাই বন্ধ্যা—অহল্যা পৃথিবীতে লাঙলের আঁচড় পড়ে না—পাষাণ মূর্তি পড়ে আছে হতচেতন হয়ে। তারি ভেতরে পায়ে পায়ে কতগুলো কিলবিলে পথের রেখা পড়েছে—এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তানাবুদ।

অথচ এই সব পথ ভেঙেই যাতায়াত করতে হবে। ভৌগোলিক শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই এ অঞ্চলে—টুকরো টুকরো এক একটা গাঁয়ের মধ্যে অসঙ্গত ব্যবধান, সেই ব্যবধানকে আরো দুর্গম করেছে এবড়োখেবড়ো ভূমি, টিলা, বিল, জলা, জঙ্গল আর অজস্র বিষাক্ত সাপ।

কিন্তু জ্ঞানের আলোয় অন্ধকার বিভাসিত হয়ে গেছে, এবং এই জ্ঞানের পুণ্য কিরণ বিতরণ করাই যার ব্রত, তার এসবকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করলে চলে না। পরোয়া ডোনাল্ডস্ও করেন নি। তখন মুখের চাপদাড়ির রং ছিল কুচকুচে কালো, মেরুদণ্ড ছিল লোহার ডাণ্ডার মতো, ওজন ছিল দুশো পাউণ্ডের ওপরে, ধৈর্য ছিল অমানুষিক এবং গলার জোর ছিল অসাধারণ। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন তিনি সুর ধরতেন, "এই যে মহাপ্রলয় আসিল, পৃথিবী জলে ডুবিয়া গেল, ঘন ঘন বজ্র পড়িল ও সর্বনাশ হইল", তখন সে বজ্রস্বরে হাটের বিপুল হট্টগোল পর্যন্ত চাপা পড়ে যেত। মুহূর্তে তাঁর চারদিকে ভিড় জমে উঠত, নগদ এক পয়সা দামের মার্ক লিখিত সুসমাচার কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যেতো তার ক্রেতাদের ভেতরে।

সে ডোনাল্ডস্ এখন অতীত বস্তু। এই কুড়ি বছরে গরম দেশের গরম বাতাস আর রুক্ষ রাঙা মাটি তাঁর বয়েস চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দু পা হাঁটলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে—হাটে হাটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবিশ্বাসীদের আলোর রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করা আর তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। তা ছাড়া ব্লাডপ্রেশারের আতঙ্কটা মনের মধ্যে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে, ওই অদৃশ্য শত্রুটির অলক্ষ্য মৃত্যুবাণের কথা ডোনাল্ডস্ কোনো মুহূর্তেই ভুলতে পারেন না।

সুতরাং ঘটনাস্থলে হ্যান্সের আবির্ভাব হল।

জাতে জার্মাণ। সোনালি চুল, নিবিড় নীল চোখ; দৈর্ঘ্যটা খাঁটি আর্যজাতির পক্ষেও একটু অতিরিক্ত, তাই খানিকটা কুঁজো বলে মনে হয়, বয়েস তেইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে, চঞ্চল, চটপটে, উৎসাহী। দেখলে পাদ্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় ইউনিভার্সিটি ব্লু, খেলার মাঠ থেকে ধরে এনে পাদ্রী সাজিয়ে তাকে এই অজগর-বিজেবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীর পোষাকটা তার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, যে কোনো মুহূর্তে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমানন্দে হো হো করে হাসি হেসে উঠতে পারে।

ডোনাল্ড্‌স্ তবু খুসি হলেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে বলে মনে হয়।

হ্যান্‌স অসঙ্কোচে জবাব দিলে, আমারও তাই বিশ্বাস।

—তাই নাকি ?—ডোনাল্ড্‌স্ হাসলেন: খুসি হলুম। তা ছাখো, এই প্যাগান আর হিদেনগুলোকে ম্যানেজ করা বড্ড শক্ত ব্যাপার। এই কুড়ি বছর চেষ্টা করেও আমি এগুলো মানুষ করতে পারলুম না। এবার তুমি চেষ্টা করো।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না—সোৎসাহে হ্যান্‌স উত্তর দিলে।

এতবড় মাঠের ভেতরে বেশির ভাগই মরা জমি। মাটিতে রাশি রাশি কাঁকর। বর্ষায় প্রায় সমস্ত মাঠ ভেসে যায়, দু চারটে উঁচু ডাঙা আর তাদের কোনো কোনোটার ওপরে আধখানা সিকিখানা গ্রাম কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে থাকে। দুর্গম এই খেয়ালী পৃথিবীর বেশির ভাগ বাসিন্দা হচ্ছে তুরী, মুণ্ডা, আর সাঁওতাল। যাযাবরের দল এসে মরা মাটিকে দখল করেছে—গড়েছে ছোট ছোট ক্ষেত খামার আর নগণ্য সব লোকালয়। তাদেরই প্রেমধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে এখানে খৃষ্টান পাদ্রীদের আবির্ভাব।

এই কুড়ি বছরে অবশ্য তাদের সকলেরই অন্ধকার থেকে আলোকে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমত সকলের আত্মা থেকে শয়তানকে তাড়ানো সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত এই চালচুলোবিহীন লোকগুলোর মতিগতি বোঝা প্রেমময় পিতারও অসাধ্য, আজ এখানে আছে, কাল দল বেঁধে মাদলে ঘা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে কোথায় কে অদৃশ্য হল কেউ বলতে পারে না; আর তৃতীয়ত আজকে ব্যাপ্‌টাইজড্ হয়ে কালকেই পরমোল্লাসে বোঙ্গার পূজো করতে এদের নীতিজ্ঞান আর্তনাদ করে ওঠে না। তাই কাজের কখনোই বিরাম নেই।

তাছাড়া মরা মাটি বলেই মানুষের স্রোত মরা নয়। সে স্রোত অবিরাম গতিতে বয়ে চলছে। তাই আজ তিনঘর বাসিন্দা বাড়ি ভেঙে উধাও হয়ে গেল তো কালকেই পাঁচঘর নতুন পত্তনি করে বসল। খাজনার লোভে জমিদার হাত বাড়ালে একদিন এরাও হয়ত অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু নতুনের আসবার বিরাম থাকবে না এবং কাজেও ছেদ পড়বে না কোনোদিন। সুতরাং কুড়ি বছর ধরে ডোনাল্ড্‌স্ নিত্য নূতন কর্মক্ষেত্র পেয়েছেন তাঁর—মরা জমিতে জীবন্ত মানুষের তরঙ্গ তাঁর চারদিকে প্রত্যেকদিন নতুন করে প্রতিহত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে এ জলের গায়ে ঘা দেবার মতো, একটুখানি ঢেউ উঠবে বটে, কিন্তু দাগ থাকবে না, এ চেষ্টার কোনো মূল্য নেই। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি ছেলেকে আলোকমন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি তাঁদের শহরের ইস্কুলে পাঠাতে পারেন নি; কিন্তু মিশনারীর ধৈর্যচ্যুত হতে নেই, অপেক্ষা করো সুফল ফলবেই এ তাঁদের মূলমন্ত্র।

তোমার পতাকা যারে দাও। ডোনাল্ড্‌সের অসমাপ্ত কাজের বোঝা সুতরাং হ্যান্‌সকে ঘাড়ে তুলে নিতে হল। তারপর যথানিয়মে একদিন তেঠেঙ্গে টাট্টুতে আরোহণ করে হ্যান্‌স্ বেরুল ধর্মপ্রচার করতে। তার পথিপ্রদর্শক হল ভূতপূর্ব ডোঙ্গা সাঁওতাল, বর্তমানে জোসেফ ইম্যানুয়েল এবং লোকের কাছে জোসেফ ডোঙ্গা। অবশ্য ডোঙ্গা নামের লেজুড়টা জোসেফ ইম্যানুয়েলের পছন্দ হয় না এবং পছন্দ হয় না বলেই লোকে তাকে কিছুতেই ওটা

ফুলতে দিচ্ছে না। দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা ডোঙ্গা সাহেব বলে চীৎকার করে এবং মুহূর্তে ডান-গাল বাঁ গালের নীতিবাক্যটা ভুলে গিয়ে জোসেফ তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য তাদের ধরতে পারা যায় না এবং রোষ-কষায়িত নেত্রে ফিরে আসতে আসতে জোসেফ ইম্যানুয়েল স্মরণ করতে থাকে: প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো, কারণ এরা জানেনা এরা কী করিতেছে।

তেঠেঙ্গে টাট্টুতে চড়ল হ্যান্‌স্ এবং তার সঙ্গে চলল জোসেফ। গন্তব্যস্থল রামগোপালপুরের হাট। শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবি-শস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে—সোনালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক—শীতের রোদের মতোই তার রঙ। সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা, সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা। সুতরাং সঙ্গে চলতে জোসেফের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারী খুশি মনে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল হ্যান্‌স। নতুন জগৎ—নতুন পরিবেশ। শহরে থেকে ভারতবর্ষকে একরকম চেনা যায়, কিন্তু এর রূপ আলাদা। এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—এর সঙ্গে কোথায় যেন ইয়োরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে। হ্যান্‌স্ আনন্দিত কণ্ঠে বললে, মিস্টার জোসেফ, তোমার দেশটা ভারী চমৎকার।

জোসেফের মনে কাব্য নেই। এদেশের চমৎকারিত্ব-টাও তাকে যে খুব রোমাঞ্চিত করে তোলে তাও নয়। তবু স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষার জন্য জোসেফ ইংরাজি ভাষায় জবাব দিলে, ইয়াশ্।

—ম্যাক্সমুলারের বই পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারী মোহ ছিল আমার। এখন দেখছি ঠকিনি।

জোসেফ আবার বললে ইয়াশ্ সার।

কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফের কাণ খাড়া হয়ে উঠেছে, বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। মাঠের ওদিকটাতে যেখানে বিলের জল মরে গিয়ে এক কোমর কাদা আর আধহাত ঘোলা জল থক থক করছে আর যেখানে একদল কালো কালো নেংটিপরা ছেলে জিওল-মাছের সম্বন্ধে দাপাদাপি করছে, ওখান থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই. এ ব্যাপারে ভুল হতেই পারে না। পরিষ্কার নির্ভুলভাবে চীৎকার উঠছে: ডোঙ্গা ডোঙ্গা, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি!

ঠোঙ্গাটা হচ্ছে ডোঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস, আর ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি ডোঙ্গা সাহেবের ইংরেজি বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত। মুহূর্তে জোসেফের মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে গেল, বিড় বিড় করে খানিকটা অশ্রাব্য এবং অখৃষ্টানোচিত গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—কী হল মিস্টার জোসেফ?

—নাথিং শার্।

—ওরা ওখানে চীৎকার করছে কেন?

—গ্রামের সব ত্যাঁদোড় ছেলে শার্। মাছ ধরছে।

—মাছ ধরছে? ওঃ—লাভ্‌লি! চলো, মাছ ধরা দেখব।

মনে মনে জোসেফ শিউরে উঠল। তবে একমাত্র ভরসা সাহেবের বাংলা জ্ঞানটা টনটনে নয়, তা ছাড়া ডোঙ্গা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু ডোঙ্গা সাহেব শেষ চেষ্টা করলে একবার।

—ও দেখবার কিছু নেই শার্, নোংরা ব্যাপার।

—নোংরা? নোংরা কেন? নেভার মাইণ্ড, চলো।

সাহেবের গোঁ আর বুনো শুয়োরের গোঁ—এদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এতদিনে সে অভিজ্ঞতাটা আয়ত্ত

হয়েছে, ডোঙ্গা সাহেবের। কিন্তু ওদিক থেকে সমানে সোল্লাস চীৎকার আসছে : ডাঙ্গা ডোঙ্গা ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—এসপার কিংবা ওসপার। মনটাকে বড় করে আনন্দ করে নিয়ে জোসেফ বললে চলুন—

কিন্তু ওরা সেদিকে এগোতেই ছেলের দল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিলে।

—কী ব্যাপার জোসেফ, ওরা পালালো কেন?

—জানিনা শার।

—বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই নয়?

—ইয়াস শার্।

—কিন্তু কেন? বাঘ না ভালুক? ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতে হলে আগে তো ওদের ভয় ভাঙানোটা দরকার—কী বলো

জোসেফ বললে, সে পরে হবে শার্ এখন চলুন, নইলে হাটে পৌঁছুতে বেলা ডুবে যাবে।

—নেভার মাইণ্ড।—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল হ্যানস। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, তারপর ছেলের পালকে লক্ষ্য করে উর্দ্ধশ্বাসে মাঠের ভেতরে ছুটতে সুরু করে দিলে।

—কি হচ্ছে শার্!

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই হ্যানসের। ততক্ষণে সে প্রাণপণে ছুটেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। ছেলেরা পরিত্রাহি চীৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর হ্যানস তাদের অনুসরণ করছে। টাট্টুর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে জোসেফ ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

পাঁচহাত লম্বা মানুষ, সেই অনুপাতে লম্বা লম্বা তার ঠ্যাং; তা ছাড়া লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু, দৌড়ে তাকে হারানো অসম্ভব। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহেব দুহাতে দুটো ছেলেকে ধরে ফেলল। ছেলেদুটো আর্তনাদ করে উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে হ্যানস বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি খৃষ্ট জাতি—ইয়োরোপ হইতে আসিয়াছি। আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসি নাই। নরমাংস খাই না।

ছেলেদুটো কথাগুলো বুঝতে পারল না, কিন্তু চোখের ভাষা বুঝতে পারল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে গেল দৃশ্য। দলে দলে ছেলেরা এসে হ্যানসের চারদিকে এসে জড়ো হয়ে গেল।

নিজের চোখকে কি বিশ্বাস করতে পারে জোসেফ? বিশ্বাস না করার অবশ্যই [illegible] মিশনারীদের কাছে নতুন কথা নয়, বরং তাদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাই বলে এতটার জন্যে ঠিক প্রস্তুত থাকতে পারেনা, জোসেফও নয়

গায়ের সাদা সারপ্লিসটা খুলে ফেলেছে হ্যানস, খুলেছে জুতো মোজা। তারপর পায়জামাটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরমোল্লাসে সেই এককোণের খানায় মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। পোষাকের অবস্থা তার অবর্ণনীয়, সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে—এমনকি গালে মুখে পর্যন্ত ছোপ লেগেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হ্যানসের—একটা সৃষ্টিছাড়া আনন্দে সে মশগুল হয়ে গেছে

টাট্টু ঘোড়ার লাগামটি ধরে ডোঙ্গা সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা শ্বেতাঙ্গ মানুষের এই ব্যবহার! এমন করলে কি সম্মান থাকবে না লোকেই কদর করবে নাহবে। যদি মিছরি নামাজমার সঙ্গে সাহেব যে একদম হয়ে যান শেষ পর্যন্ত।

সাহেব যখন উঠে এল মাঠের ওপর দিয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পেছনে ছেলের দল চীৎকার করছে, ও সাহেব, কাল আসবে তো?

সাহেব সোৎসাহে সাড়া দিয়ে বললে হাঁ, আসিব

এতক্ষণ পরে গম্ভীর থমথমে গলায় কথা বললে জোসেফ: সন্ধ্যে হয়ে গেল—আজ আর হাট হবেনা।

—আমি বাস্তবিক ভারী দুঃখিত—লজ্জিত স্বরে হ্যানস জবাব দিলে, লোভ সামলাতে পারলামনা।

ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় কাদার ভেতরে বল নিয়ে আমরাও রাগবী খেলেছি। তারপর বিশপদের কাছে গিয়েই ওসব ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু ওদের দেখে আমার পুরোণো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল—

—ইয়াশ্ শার—তেমনি জলদগম্ভীর গলায় জোসেফ বললে, এবার ঘোড়ায় উঠুন, রাত হয়ে গেল। মাঠের রাস্তাঘাট বড় খারাপ, ভয়ঙ্কর সাপের ভয়।

—সাপ? ওঃ—লাভ্লি! আই অ্যাম্ ভেরি ফণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ান স্নেক্স—

মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে মাতৃভাষা সাঁওতালীতে বিড়বিড় করে ডোঙ্গা সাহেব বললে, একবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে।

জোসেফের মুখে সব শুনে ডোনাল্ড্স্ একটু হাসলেন মাত্র।

—এখনো বয়েস অল্প, তাই—

—ইয়াশ্ শার, কিন্তু আপনি বুঝছেন না—এরা সব ছোট লোক, ব্ল্যাক্ প্যাগান্—

ডোনাল্ডের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল, অপাঙ্গদৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল জোসেফের ওপরে; ট্যান করা চামড়ার ওপরে ঘোর কালো রঙের বার্ণিশ লাগানো, পুরু পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো নিগ্রয়েড্ চুল। মোটা আর আড়ষ্ট জিভে অশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ। তবু দু বছরের মধ্যেই কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে জোসেফের। ব্ল্যাক প্যাগানদের সঙ্গে তার নিজের সীমারেখাটা একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ঘৃণা করতে শিখেছে ছোট লোকদের। ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা আছে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলব এখন।

—ইয়াশ্ শার্। উনি তো নতুন লোক, কিছুই জানেন না—

—আচ্ছা।

জোসেফ চলে গেল, ডোনাল্ড্স্ চুপ করে বসে রইলেন। হাদের উদ্দামতা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলেনি, চিন্তিতও না। মনের দিক থেকে একটা বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছেন ডোনাল্ড্স্। এক একটা শান্ত সন্ধ্যায় বসে বাইবেল পড়তে পড়তে এই শূন্য দিগন্তবিসারী মাঠটা তাঁর মনকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্ট করে তোলে। আবছায়া অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে দিগন্তটা, উঁচু উঁচু টিলা, এলোমেলো জঙ্গল নিরবয়ব হয়ে আসছে ক্রমশ, তার ভেতরে চোখে পড়ছে দূরে কতগুলি অস্পষ্ট মূর্তি—দেহাতী মানুষগুলো দিনান্তে তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

তখনি মনে হয়। মনে হয়: এমনি অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, এমন সংশয়বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন মানবপুত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আরো তেরোজন শিষ্য, তাদের একজন জুডাস্ ইস্ক্যারিয়ট। সঙ্গে তাঁদের অস্ত্র নেই, জয়বাদ্য নেই। চারদিকের অন্ধকারে ইহুদীদের কুটিল হিংসা সরীসৃপের মতো তাঁকে ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু সত্যের আলো তাঁর মন থেকে মুছে নিয়েছে সমস্ত সংশয়, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ভয়ের অণুতম বিন্দুটুকুকেও। তিনি এগিয়ে চলেছেন, মাথার ওপরে তাঁকে পথ দেখাচ্ছে বেথেলহেমের শিয়রে জাগ্রৎ সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি।

ডোনাল্ড্সের মনে হয় এ প্রচার অর্থহীন, এই উপদেশের ঝুলি কাঁধে বয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সত্য মূল্য নেই কণামাত্র। এই মন্ত্র যিনি প্রচার করেছিলেন তূরী ভেরী পটহ তাঁর ছিল না, পাদ্রীর দল ছিলনা। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে সূর্য উঠেছিল, তার কিরণ আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল; তার কণ্টকজর্জরিত দেহের প্রতিটি রক্তকণা ঘোষণা করেছিল তাঁর বাণী। আজ এই অন্ধকারে এই যে ছায়ামূর্তি মানুষেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে। একদিন নিজের প্রয়োজনেই ওই দরিদ্র—ওই নির্বাকের মধ্যে তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে। এই

অজ্ঞাত অনাদৃত গ্রামগুলির মধ্যে কোনটি যে নতুন কালের বেথেলহেম সে কথা কে বলতে পারে। যিনি আসবার নিজের প্রয়োজনেই তিনি আসবেন, অনর্থক কেন আর—

কিন্তু সৌভাগ্য এই যে মনোভাবনা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয়না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে প্রবলভাবে ধমকে দেন ডোনাল্ডস। এ অন্যায়, এমন ভাবে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ভারতবর্ষের জলমাটি তাঁর রক্তের মধ্যেও দুর্বলতা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাকি। নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, নিরুৎসাহ আর [illegible] করে দিচ্ছে এ দেশের হিন্দুমুসলমানদের মতো? চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা, [illegible] থাকলে ঈশ্বরপুত্রের রিসরেকশন হবে কী করে, কেমন করে সার্থক হবে [illegible]মের ভবিষ্যদ্বাণী।

—শুভসন্ধ্যা ফাদার।

—শুভ সন্ধ্যা—মুখ ফিরিয়ে ডোনাল্ডস তাকালেন: এসো, বাবা।

হ্যানস এসে নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটাতে বসল।

—কেমন লাগছে এখানে?

—চমৎকার। এ একটা আশ্চর্য দেশ।

—প্রথম প্রথম তাই মনে হবে—ডোনাল্ডস স্নিগ্ধভাবে বললেন: কিন্তু তারপরেই মত বদলে যাবে তোমার।

আমার তো মনে হয় না—জোরের সঙ্গে জবাব দিলে।

—বেশ, তাহলেই ভালো—ডোনাল্ডস আর কথা বাড়ালেন না, বললেন, বিস্তর কাজ আছে, এতদিনে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ভালো করে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—তা নেব, কিন্তু—ডোনাল্ডস হঠাৎ থেমে গেল।

—কী বলছিলে?

—মাপ করবেন ফাদার, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

—কী কথা?

—জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ কী ভাবলে হ্যানস্। অন্যমনস্ক হয়ে কামড়াতে লাগল বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা।

—এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে?

—কিসের?

—এই প্রিচিংয়ের?

ডোনাল্ডসের দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল

—হঠাৎ একথা বলছ কেন?

—আমার মনে হয়—একটু থেমে হ্যানস বলে চলল—আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করে কাউকে ভালো করতে পারিনা। প্রত্যেকেই নিজের মতে করে ভালো হতে পারে, আর সেইটেই সব চাইতে ভালো।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখ হ্যানসের মুখের ওপর ফেলে ডোনাল্ডস বললেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারছিনা।

—আমি বলছিলাম—হ্যানস আগের আঙুলটা কামড়ে নিল: জোসেফ ইমানুয়েলের মতো কতগুলো জীব তৈরী করে ক্রিশ্চিয়ানিটির মর্যাদা বাড়ানো যায় না। ওরা যেমন আছে তেমনি থাকলেই ওদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে।

—এসব কী বলছ তুমি। ডোনাল্ডস আর্তনাদ করে উঠলেন: এই তো আমাদের কাজ—অন্ধকারের মানুষকে আলোর পথ তো আমাদেরই দেখাতে হবে। তুমি কি বলতে চাও এই পৌত্তলিক হিদেনগুলো চিরকাল শয়তানের শিকার হয়ে থাকুক?

—ঠিক বুঝতে পারছিনা—

আলোচনাটায় আকস্মিক একটা ছেদ টেনে দিয়ে হ্যানস উঠে দাঁড়ালো। কোথায় যেন অনিশ্চিত একটা অস্থিরতা পীড়ন করছে তাকে। তারপর সোজা সম্মুখের প্রায়ান্ধকার মাঠটার ভেতরে সে গিয়ে পায়চারী করতে লাগল।

পাকা ভ্রূ কোঁচকে একটা সেকেণ্ড ব্যাবেজের মতো একজ করে ডোনাল্ডস তাকিয়ে রইলেন। নতুন এ পথে এসেছে, এখনো ফিলানথ্রপি আছে খানিকটা। কিন্তু ডোনাল্ডস হাসলেন: বেশিদিন এসব থাকবেনা। আস্তে আস্তে রোমান্স কেটে যাবে—যেমন করে ডোনাল্ডসেরও একদিন কেটেছিল।

ছ চোখ বিস্ফারিত করে হান্‌স বললে, ব্যাপার কী ?

—কিছু না।—তিক্ত তীব্র স্বরে ডোনাল্ডস্ বললেন, চার্চ তোমার জন্যে নয়। ইউ ট্রাই ইয়োরসেল্‌ফ এল্‌স-হোয়্যার।

জোসেফ নিশ্চিন্তে বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছে—যেন অনাসক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ। তার দিকে একটা বক্র-দৃষ্টি ফেলে হান্‌স বললে, বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এই ডোঙ্গা চ্যাপ্—

ডোঙ্গা চ্যাপ্! সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াটা ঘটে গেল জোসেফের শরীরে। তীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে : আই ওয়ার্ণ ইউ শার্—আই অ্যাম নো ডোঙ্গা!

শব্দ করে হান্‌স হেসে উঠল—তার গভীর স্বচ্ছ হাসি লহরে লহরে মুখরিত করে তুলল তরল অন্ধকারকে।

—নিশ্চয় ডোঙ্গা! শুধু ডোঙ্গা নয়, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা—

পরের ঘটনাটা ঘটল চক্ষের পলক ফেলবার আগেই। বুনো একটা রক্তলোলুপ জানোয়ারের মতো ভয়াবহ হুঙ্কার করে জোসেফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হানসের ওপরে। কিন্তু লাইপ্‌জীগ্ ইউনিভার্সিটির ব্লু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক একটা সরীসৃপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল; তারপর পুরু একতাল লোহার মতো প্রচণ্ড একটা হেভিওয়েটের আঘাত এসে নামল জোসেফের চোয়ালে। ঠিকরে একটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল জোসেফ, সেখান থেকে কুমড়োর মতো ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে।

ক্রোধে, জ্বরের উত্তেজনায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ডোনাল্ডস্। অমানুষিক কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইউ বোথ! এটা চার্চ—গুণ্ডামির জায়গা নয়।

—সত্যিই চলে যাবো ফাদার?

—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে। ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিস্‌ওনস্ ইউ। বেরিয়ে যাও—

নিজের চীৎকারে নিজের কথাটা বোঁ করে পাক খেয়ে গেল ডোনাল্ডসের। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে—শিরাগুলোতে ব্লাড্-প্রেশারের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ তুলে তাকাবার মতো স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এল, তখন দেখলেন পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোসেফ ; পুরু ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, আর সেই রক্তাক্ত মুখে একটা বিগলিত হাসির রেখা! এ অবস্থায় হাসা শুধু ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব!

কিন্তু হান্‌স? তার চিহ্ন-মাত্রও নেই। শুধু অভিশপ্ত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে খা-খা করছে অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকার। সে অন্ধকারে এতটুকুও দৃষ্টি চলে না!

*　　*　　*

ছ মাস পরে—পনেরো মাইল দূরের হাটখোলায়।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছের তলায় লোকে লোকারণ্য। ঢোল আর কাঁসরের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। শিবের গাজন চলছে ওখানে।

"বুঢ়া শিবের নাচ লাগিলে
নাচ লাগিলে ভোলানাথের—"

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভোলানাথের নৃত্য। মাথায় লাল চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পাকানো পাটের জটা। রঙ দিয়ে আঁকা বাঘছাল শিবের শরীরে আশ্চর্য সুন্দর মানিয়েছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ শিবের আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে পরমোল্লাসে ঢোল আর কাঁসর সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে।

"প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব,
গোলাতে নাই ধান,
কী দিয়া বাঁচাব ও শিব
ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো—"

নাচতে নাচতে শিবের চোখে জল এল। পেটে ভাত নেই, গোলায় ধান নেই। একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই এর ভেতরে—এই ছ মাসেই নিজের চোখেই সে তা পরিষ্কার

পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পুজোমণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভক্তিভরে দাঁড়ালেন সেখানে।

হ্যান্‌স জিজ্ঞাসা করলে, এ কী?

পাশের সশস্ত্র গুর্খাটি বুঝিয়ে দিলে। যুদ্ধজয়ের কামনাতে এখানে কালীপুজো করা হচ্ছে। টাকা দিয়েছেন গবর্ণমেণ্ট—ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

—তাই নাকি? লাভ্‌লি।—হ্যান্‌সের নীল চোখ-দুটো একবার ঝকঝক করে উঠল: তোমার জলের বোতলটা দাওতো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সরলমনে গুর্খা তার ফ্ল্যাস্‌কটা তুলে দিলে হ্যান্‌সের হাতে। কিন্তু জল খেলোনা হ্যান্‌স, তার বদলে একটা কেলেঙ্কারী করে বসল। বোঁ করে তার হাত থেকে উড়ে গেল ফ্ল্যাস্‌কটা—একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যে। বিশ্রী শব্দ করে কালীমূর্তিটার মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে, ঘটে গেল একটা খণ্ড প্রলয়।

নিমেষের মধ্যে একটা উল্‌কার মতো মোটর থেকে মাটিতে যেন উড়ে পড়ল হ্যান্‌স। উন্মাদ ছন্দে শিবের গাজন নাচতে লাগল: নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি—অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান! অ্যাম আই নট?

"বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে,—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে প'ড়ে রয়েছে।

—সুভাষচন্দ্র

বাংলা দেশের বেসরকারী কলেজগুলি

শ্রীতিনকড়ি ওঝা

জাতির আপাত প্রয়োজনীয়তা তথা সুদূরপ্রসারী কল্যাণ যে কোন দিক্ দিয়েই বাংলাদেশের বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের বর্তমান ধারা ও তার মূল ফলকে 'প্রোডাক্টিভ্ লেবার' এর পর্যায়ে ফেলা অত্যন্ত আংশিক অর্থেই মাত্র সম্ভবপর। ফসলের রূপ দেখেই সাধারণতঃ মাটী, সার ও বীজের উৎকর্ষ এবং কর্ষণ ও বপনকৌশলের তারিফ বা নিন্দা করতে আমরা উৎসুক হই। এই উপমাটীকে যদি আমরা সম্প্রসারিত ক'রে বাংলাদেশের স্কুল কলেজের শিক্ষার সকল স্তরে প্রয়োগ করি, তবে আমরা দেখব যে আশা করবার চাইতে হতাশ হবার কারণই জমছে বেশী, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চারিধারে। এসবের কারণ কী? সেই কথা বলতে গিয়ে এখানে আমি কলেজগুলোর ভেতরকার ব্যাপার নিয়ে দু'এক কথা বলব। তাও আবার শুধু বাংলার বেসরকারী কলেজ সম্পর্কে। সরকারী কলেজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ আরো সীমাবদ্ধ। তাছাড়া অন্যকারণেও সেগুলোকে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হল না। আপাততঃ এটুকু মাত্র বলি যে বেসরকারী কলেজের কোন কোন দোষ থেকে সেগুলো অপেক্ষাকৃত মুক্ত। কিন্তু যেহেতু দেশের সহিত যোগরহিত, জবরদস্ত আমলাতন্ত্র ও সরকারী দপ্তরেরই অংশরূপে সরকারী কলেজগুলোর জন্ম, পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধি, তাই তাদের স্বভাবেও আমলাতান্ত্রিক ছাপ স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে।

বেসরকারী কলেজগুলোকে বিশেষভাবে আলাদা করে আমরা গোড়াতেই বেছে নিলুম। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে সমগ্রভাবে প্রচলিত ধরণে নিন্দা করা বা সার্জেন্ট-পরিকল্পনা, বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিলের পরিকল্পনা কিংবা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ মনীষীদের বিভিন্ন পরিকল্পনার তুলনামূলক সমালোচনা এবং পরিশেষে সুধীজনোচিত সাধারণ প্রথায় আমাদের নিজেদের একটী প্ল্যান আবার ওগুলোর পাশে খাড়া করে দেওয়া কিন্তু এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এখানে শুধু বাংলাদেশের বেসরকারী কলেজগুলোর ভেতরকার গড়ন, আবহাওয়া, অর্থ-সংগ্রহ ও খরচাদির হালচাল, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ এবং বেতন প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোভাব, গভার্নিং বডির গঠন ও স্বরূপ এসব সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা হচ্ছে। কেন যে কলেজগুলোর নৈতিক আবহাওয়া ও মান এরকম নেমে গেছে, তার কিছুটা কারণ এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

প্রধানতঃ আমলা-কেরাণীকুল সৃষ্টির জন্যই বিদেশী সরকার আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, এই পুরাণো সত্যটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কি করে যে এই বহু-ত্রুটিপূর্ণ, দেশের জীবন ও বৃহত্তর কল্যাণ থেকে বিচ্যুত শিক্ষা পদ্ধতি হতেও যথাসাধ্য সম্ভব ভালো ফল আহরণ করা যায়, সেইটে আমরা যথেষ্টরূপ জানতে চেষ্টা করিনি এবং যেটুকু জেনেছি তাও প্রায়ই কার্যে পরিণত না করবারই চেষ্টা করেছি। এতে করে আমাদের যূথবদ্ধ স্বার্থপরতা, সমাজ ও জাতির প্রতি অন্ধ উদাসীনতা, এবং শিক্ষিত ও কিছু অর্থে শিক্ষানিয়ন্ত্রক হওয়ারূপ সুযোগের চরম অপব্যবহার-ই সূচিত হয়। সরকারের এ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড দায়িত্ব রয়েছে, আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দেশের কলেজগুলোর

বেসরকারী পরিচালকরা আমাদের নিজেদেরই লোক হয়ে অনেকে যেভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির নামে কলেজের ব্যবসা চালাচ্ছেন, তা দেখে সরকারকেও যথেষ্ট তীব্র ভাষায় নিন্দা করা কঠিন হয়ে পড়ে যেন।

কলেজগুলোতে অধ্যাপক নিয়োগের কথা প্রথমে ধরা যাচ্ছে। মিল, ফ্যাক্টরী বা সাধারণ অফিস প্রভৃতির কর্মচারী নিয়োগের বেলাতেও বেতনাদির উল্লেখ ক'রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলেদের কাছ থেকে অধ্যাপক পদের জন্য যখন আবেদন আহ্বান করা হয়, তখন অনেক জায়গাতেই বিজ্ঞাপনে হয় বেতনের উল্লেখ করা হয় না, অথবা বলা হয়, কত কম টাকায় তাঁরা আসতে রাজী আছেন তা জানাতে। অর্থাৎ পদের সম্মান বা গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন নয়;—অধ্যাপকের চাকুরী সম্বন্ধে তাদের মোহ এবং আগ্রহাতিশয্যের সুবিধা নিয়ে মাছের বাজারের নিয়মে তাদের দর ঠিক করার ব্যাপার। দীর্ঘকাল ধরে এ কাণ্ড চলেছে। এ যে ন্যায় নয়, এযে নীতি নয়, সে সমীচীনতা বোধের প্রশ্নও যেন বহু ক্ষেত্রেই জাগেনা। আমার একাধিক অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে বাংলা-দেশের এক সুবিখ্যাত এবং বিশেষ স্বচ্ছল-অবস্থার বেসরকারী কলেজে একবারকার চাকুরীর ইন্‌টারভিউ সম্বন্ধে যা জেনেছি এখানে বলি। ইন্‌টারভিউ-বোর্ডে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন কলেজটার অধ্যক্ষ এবং তা ছাড়া ছিলেন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্। ইন্‌টারভিউতে শুধু বেতন সম্বন্ধে দরকষাকষি ছাড়া আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি, এবং তাও অত্যন্ত বিশ্রীরূপে। একজন চাকুরীপ্রার্থীকে শিক্ষাবিদ্ বললেন, 'দেখুন আপনার আগে যারা এসে গেলেন, তাদের মধ্যে একজন আপনার চাইতে দশটাকা কমে রাজী আছেন। সুতরাং ভেবে বলবেন আশা করি।' সে বেচারা কিছু কম বলে ফেলল। তখন পরবর্তীকে ডাকান হলে তাকে বলা হল, 'আপনার আগের ভদ্রলোকের প্রার্থিত টাকার অঙ্ক এই। অতএব তার চাইতে কমই আপনি চাইবেন, আশা করি।' তখন টাকার অঙ্ক আরও নামল। এই পদ্ধতিতে অনেকক্ষণ চলে আবার প্রথম দিক্‌কার উমেদারদের একাধিককে ডাকিয়ে জানানো হ'ল যে, তাঁদের দাবীতে সম্ভবতঃ এঁরা (কর্তৃপক্ষ) রাজী হতেন। কিন্তু তাদের সমান যোগ্য অন্য প্রার্থীরা আরও কম টাকায় চাকুরী নিতে প্রস্তুত। সুতরাং তারা আরও নামবেন কিনা ইত্যাদি। এইভাবে একই প্রার্থীকে দু' তিনবার ডাকিয়ে চূড়ান্ত দর কষাকষি করে (কোনও স্যাকরার দোকানের কর্মচারী হ'তেও এরূপ বিসদৃশ ordeal-এ যেতে হয় কি?) শেষ নির্বাচন সমাধা করা হল। চাকুরীপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকের সন্দেহ জাগাতে তাঁরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ ও তুলনামূলক আলোচনা ক'রে পরে দেখেছিলেন যে ইন্‌টারভিউ-বোর্ডের ভদ্রমহোদয়েরা বেতনের দাবী সম্বন্ধে তাদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা বলেছিলেন! বাংলার আর একটা নামকরা বেসরকারী কলেজে ইন্‌টারভিউয়ের শেষে একজন চাকুরীপ্রার্থীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে তাঁকেই কথিত বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল এবং হপ্তাখানেকের মধ্যে তাঁর ঠিকানায় এই মর্মে আনুষ্ঠানিক চিঠি যাচ্ছে কলেজ থেকে। এক সপ্তাহ গেল, দু সপ্তাহ গেল, তিন সপ্তাহ গেল, ভদ্রলোক নিয়োগপত্র আর পান না। তিনি কলেজকে লিখলেন। প্রথম চিঠির জবাব পেলেন না। দ্বিতীয়বার লিখলেন। তখন তাঁকে জানানো হ'ল কলেজে গিয়ে দেখা করতে। তিনি গেলে পর কলেজের অধ্যক্ষ সলজ্জভাবে (!) জানালেন যে যতজন প্রোফেসার নেওয়ার কথা ছিল, ততজন এবার নেওয়া হ'লনা; তাই তাকে আর খবর দেওয়া হয়নি। ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ হয়ে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানলেন, তারও চাইতে কম টাকাতে একজন অধ্যাপক মেলাতেই পাকা কথা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর ডাকা হয়নি!

কোলকাতা থেকে একশ' মাইলের মধ্যেকার একটা

প্রথম শ্রেণীর কলেজের কথা বলি। এখানে একজন বাংলার অধ্যাপককে, দু'শ টাকা মাসিক দক্ষিণা এবং এ'বছর অর্থেক বেতন পাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, নিয়োগ করা হয়। ঐ কলেজেই এক জন সংস্কৃতের অধ্যাপককে তাঁর শাস্ত্রনিপুণতার সুযোগ নিয়ে একবছর ধরে বিনা মাইনেতে খাটানো হয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে একবছর পর তাকে পুরো বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। এক বছর পরে তাকে বলা হল, তোমাকে আপাততঃ কিছু মাইনেতে লাইব্রেরীয়ান্ করা গেল, পরে এর পর অধ্যাপক বানানো যাবে। (!) নিয়োগকালে অধ্যাপকদের যে বেতন নির্দিষ্ট করা হয়, এ কলেজে তাঁরা যোগদান করতে এলে পর নানা ফিকিরে ঘুরিয়ে সাক্ষাৎ প্রতারণা করে না থেকে ৫০।৬০ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়। তাদের উপর চাপ দেওয়া হয় তাদের বলা হয় যে কলেজের আর্থিক অবস্থা শীঘ্র ভাল হয়ে যাচ্ছে। তখন এ ক্ষতি তাদের পুষিয়ে দেওয়া হবে বেতনের স্কেল উচু হবে, গভর্ণমেন্ট ফাণ্ড করে এর আপাততঃ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পরীক্ষক হতে সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য, কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি কথার কথাই থেকে যায়, অবশ্য আর কখনই কাজে লাগে না। উক্তরূপ ব্যাপার সব যখন ঘটতে থাকে তখনই পাশাপাশি কলেজের রিজার্ভ ফাণ্ডেও বহু টাকা জমতে থাকে। সে টাকার কতকাংশ নাকি সম্পাদক যুগ্ম-সম্পাদক প্রভৃতির কলেজ সংক্রান্ত (?) কাজে মধ্যে মধ্যে বাংলা ও ভারত-ভ্রমণাদির খাতে বের হয়েও যেতে থাকে।

আর এক জায়গার কাহিনী। একটী বেসরকারী খুব বড় কলেজের স্থায়ী একজন অধ্যাপক গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যে কলেজ খোলবার একমাস আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, কলেজ খোলার এক সপ্তাহ পরে তিনি এক বছরের ছুটির দরখাস্ত করবেন যেহেতু তিনি অন্যত্র ভাল কাজ পেয়েছেন। তাঁকে উত্তরে জানানো হ'ল যে সেক্ষেত্রে ছুটীর পরে তাঁর কলেজে ফিরবার আদৌ দরকার নাই, তিনি অবিলম্বে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে পারেন, কারণ উক্তরূপ ছুটী তাকে দেওয়া হবে না। তার ছুটীর মাসের ন্যায্য প্রাপ্য বেতনটা ফাঁকি দেবার অভিসন্ধিই এরকম উত্তরের উৎস। ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঐ কলেজে অনেক বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন একথা আবো মনে করলে ঐ উত্তরটা যে কতোখানি অন্যায় ও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কতোখানি গ্লানিজনক তা বোঝা যাবে। গ্রীষ্মের ছুটির ৩ মাসের বেতন অধ্যাপকদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাংলার বহু বেসরকারী কলেজই একটা অতি অসাধু কাজ করে থাকেন। বছরের পর বছর তারা একাধিক অধ্যাপককে এক সেসনের নামে— আসলে শুধু দশমাসের জন্য— (জুলাই থেকে এপ্রিল) নিয়োগপত্র দেন। এইভাবে একই অধ্যাপককে ছই তিন বছর বার বার অস্থায়ী ভাবে নেওয়া হয় এবং প্রতিবছরই তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য ২ মাসের বেতন থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। ঐ একই উদ্দেশ্যে অন্য রকমও কোথাও কোথাও করা হয়। কোন একটা পদে বছরের পর বছর প্রতিবার নূতন অধ্যাপকদের নেওয়া হয় শুধু এক সেসনের জন্য (অর্থাৎ উক্ত অর্থে)। তা ছাড়া, খাতায় সওয়াশ' লিখে আসলে দিতে হয় একশ' টাকা এরকম বেসরকারী কলেজ এখনও বাংলায় আছে।

অধিকাংশ বেসরকারী কলেজের গভর্ণিং বডিগুলো এক অপূর্ব পদার্থ। গভর্ণিং বডির সভ্যদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি থাকেন, এমন সব ভদ্রলোক যাঁরা হয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না, নয়ত শিক্ষা সম্বন্ধে মাথা ঘাটানোকে সম্ভবতঃ হাসির ব্যাপার মনে করেন। কলেজ সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকার চাইতে লোন অফিসের মিটিঙে, দাবা পাশার আড্ডায়, ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশসুপারের বাংলোতে যখন তখন হাজির থাকা বা চর্বি মেশানো ঘিয়ের ব্যবসা, চাল কাপড়ের সাদা বাজারকে রাতারাতি মিশ-কালো-

বাজারে পরিণত করা, ইত্যাদি বিষয়েই তাঁদের উৎসাহ ও দক্ষতা অবিসম্বাদিত ভাবে অনেক বেশী। এঁরা নিঃসন্দেহে ধনবান্ ব্যক্তি। কলেজীয় শিক্ষায় দীক্ষা লাভ না করেই এরা টাকা করেছেন অনেক। টাকা দিয়ে এরা অনেক বিদ্বান্ লোককে কিনে থাকেন; তারা তখন এদের সেরেস্তায় বেশীকম বেতনে কেরাণীরূপে শোভা পান। কিন্তু 'আদর্শবাদে'র মরীচিকান্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন একশ্রেণীর ছেলে আছে, কম টাকা সত্ত্বেও অধ্যাপনার পথে তারা আসে। কলেজ-গভার্ণিং বডির সভ্য হতে পারলে এদের কবলস্থ করা যায়, এদের চাকুরীরূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে শিক্ষাসমস্তার প্রতি প্রতিহিংসা বা ঐ জাতীয় একটা মনস্তত্ত্বঘটিত সুখ অনুভব করা যায়। তাই কলেজের এই সব কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের মধ্যে আজকাল দালাল, কন্ট্রাক্টার, অল্প-শিক্ষিত কুখ্যাত ব্যবসায়ী, স্থূলরুচি দাম্ভিক জমিদার, কলেজে অনেক-টাকাদানকারী নিরক্ষর জোতদার প্রভৃতির প্রচুর সংখ্যাধিক্য। কলেজের অধ্যাপকদের বিদ্যা ও শিক্ষাদানের গুণাগুণ বিচার করে এরাই তাদের কাউকে বহাল রাখেন, কাউকে বিদায় দেন। মফঃস্বল কলেজের গভার্ণিং বডি সম্বন্ধেই অবশ্য এ কথাগুলো বিশেষ করে প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়া দু' একজন সরকারী কর্মচারীও গভার্ণিংবডিতে কোথাও কোথাও থাকেন। বাকি অংশটা ভরাট হয় স্থানীয় বেসরকারী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দ্বারা। অধিকাংশ স্থানেই এদের অধিকাংশ হচ্ছেন উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি। এখানে সভ্য হওয়ার উদ্দেশ্য প্রায়ই এঁদের বিবিধ। মিউনিসি-প্যালিটি জিলাবোর্ড প্রভৃতি ব্যাপারে স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাব ও সাফল্যলাভের উপায়ের অন্যতম ঘাঁটী হিসাবেই এটার ব্যবহার এদের কাছে প্রধানতঃ গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ বাজেটের মধ্যে নানা ফাঁক রেখে, ফাঁক সৃষ্টি ক'রে বা ফাঁক দেখিয়ে বেতন-বর্ধনেচ্ছু অধ্যাপক তথা অন্যান্য কলেজ কর্মচারীদের সুচতুর কৌশলে দমিয়ে রাখা এবং প্রধানতঃ খিড়কির দরজা দিয়ে বিবিধ টাকার অঙ্ক নিজেদের নামে খরচ লিখিয়ে নেওয়ারূপ চমৎকার লাভের খেলা কয়েকজন দলবদ্ধ হয়ে খেলবার সুযোগের জন্যও এদের কেউ কেউ এখানে ঢোকেন। মফঃস্বলের একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজের অন্যতম কর্তার কথা আমি জানি। বাংলার পাব্লিকের হিতকর কর্মে তাকে একাধিকবার জড়িত হতে দেখা গেছে। তবে পাবলিক অর্থের ব্যয় সম্বন্ধে গভীর দুর্ণামও তার নামের সঙ্গে একাধিকবার জড়িত হয়েছে। এখানে সেখানে সখ বা ব্যক্তিগত কাজে ভ্রমণের টাকা অন্ততঃ কখন কখন কলেজ তহবিল দোহন করে সংগ্রহের অভ্যাস তাঁর বহুদিনকার পুরানো। কলেজ পে-বুকে অবশ্য লেখা হয় "on duty",—অর্থাৎ কলেজের কাজে তার এই ভ্রমণ এবং খরচ! কলেজের আয় এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে জমার অঙ্ক যথেষ্ট বাড়া সত্ত্বেও নির্জলা অসত্য সব বলে কলেজের অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি, গ্রেড সৃষ্টি বা প্রভিডেণ্টফাণ্ড প্রভৃতির অত্যন্ত ন্যায্য দাবীকে বছরের পর বছর দাবিয়ে রাখার চেষ্টাতে গভার্ণিংবডিতে তিনি নেতৃত্ব করেন। এদিকে আবার তিনি সম্প্রতি নিম্নবেতনের স্কুল-শিক্ষকদের করুণ অবস্থার উন্নতির আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত ক'রে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বিবৃতির মারফৎ এদের জন্য নিজের বিগলিতচিত্ততার পরিচয় দিয়ে জনসাধারণের সামনে ন্যায়ের জন্য একজন উৎসাহী সংগ্রাম-কারীরূপে প্রতিভাত হতে চাচ্ছেন। অবশ্য সমগ্র গভার্ণিং বডিতে মুষ্টিমেয় হ'লেও অল্প কয়েকজন সভ্যকায় বিদ্যোৎসাহী, সমাজব্রতী, কালচারের সেবক থাকেন, যাঁরা এই স্বার্থ ও সংকীর্ণতার বিষাক্ত বেষ্টনীকে লজ্জাকর বলেই অনুভব করেন এবং একে সৎসিদ্ধান্তে প্রভাবিত করবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় থাকেন অনেক কম,—এবং অনেক সময়েই টাকা আর চলিত অর্থে সামাজিক প্রতিপত্তিও থাকে তাদের কম। ঘোঁট পাকানোর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণগুলিও (!) এদের চাইতে গভার্ণিংবডির উক্তরূপ অন্যান্য সব সদস্যের মধ্যে

মল্লারাজ রায়ের অট্টালিকা

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেকক্ষণ—

আমি কিছু খাব না দিদি। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে।

খাওয়ার কথা সরযূ কিছু বলল না। রক্তাক্ত নীল-রতনের চেহারা দেখে অবধি খাওয়াদাওয়ার প্রবৃত্তি আর নেই।

রান্নাঘরে শিকল এঁটে নিজের ঘরে গিয়ে পিছন-দরজা খুলে দিল। সুপারি বনের প্রান্তে নিমাই দাঁড়িয়ে ছিল, এসে ঘরে ঢুকল।

একটা কথা বলবার জন্য সরযূ আঁকুপাঁকু করছিল। দরজায় খিল এঁটে অশোভন ব্যগ্রতার সঙ্গে সে বলে উঠল, তুই বলেছিলি নিমাই, আমাদের বাড়ি কেউ আসবে না। অনেক লোক এসেছিল, তুই দেখতে পেলি না।

জানি। কিন্তু এর পরও কাচের চুড়ি পরে আছ কেন দিদি? ভেঙ্গে ফেল। শাড়ির প্রান্ত টেনে চুড়ি-পরা হাত ঢেকে ফেলল। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, কেমন আছে সেই লোকটা, বেঁচে আছে তো?

মরলে ঠিক কানে আসত।

আহা বেচারা! সরযূ কালীবাড়ীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

মা কালী সেরে তুলুন ওকে।

নিমাই বলে, সেরে উঠে লাভটা কি দিদি? জীবনে ঘেন্না হয়ে যাচ্ছে আমাদের।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলে, বন্দেমাতরম্ বলতে মানা—মাকে ডাকব, তাও ডাকতে দেবে না ওরা। আমরা মুখে বলিনি, শুধু বুকের উপর লিখে নিয়েছিলাম। সেই দোষে ক্ষ্যাপা কুকুর যেমন পিটিয়ে মারে তেমনি বেদম পিটতে লাগল। এমন ঘেন্নার বাঁচা বাঁচতে চাইনে আমরা। মরাই ভালো—মরে যাক দেশ-শুদ্ধ সকলে, একটা মানুষ বেঁচে না থাকে এই পোড়া দেশে।

কান্নায় নিমাইর গলা বুজে এল। বিছানা পাতা হয়ে গেছে। মা-মরা ছোট ভাইটিকে পাশে নিয়ে সরযূ শুয়ে পড়ল।

নিমাই বলে, তোমার কাপড় ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করেছে বলে রেগে গেছ, বাবার কাছে নালিশ করেছ। ওদের জীবন যাচ্ছে, আর তোমার তো গেছে শুধু একখানা কাপড়—

সরযূ বলে, এ-ও তোমার কানে গিয়েছে? খুব বলাবলি করে বেড়াচ্ছে বুঝি ওরা?

পরম আগ্রহে নিমাই জিজ্ঞাসা করে, মিছে কথা? আমিও তাই বলছিলাম, কখনো হতে পারে না—আমার দিদি সে রকমের নয়।

ভ্রূকুটি করে সরযূ বলে, হৃষিকেশ মাষ্টার এদেশ সেদেশ এই সমস্ত রটিয়ে বেড়াচ্ছে বুঝি?

কথা বন্ধ হল। দৈবচরণ উঠে এসেছেন, বাইরের দালানে এসে খোঁজ নিচ্ছেন, নিমাই আসে নি?

সরযূ বলে, না বাবা—

দৈবচরণ গর্জন করে উঠলেন, বড্ড বাড় বেড়েছে—

সরযূ বলল, বিকেলের দিকে একবার এসেছিল তুমি বেরিয়ে যাবার পর। তুমি রাগ করেছ শুনে তখুনি আবার পালিয়ে গেল।

দৈবচরণ বললেন, বেঁধে রাখলিনে কেন? কেন যেতে দিলি। ধরতে পারলে হাড় একজায়গায় মাংস এক জায়গায় করব হারামজাদার। ক'দিন পালিয়ে থাকতে পারে, কোন্ সুহৃৎ ভাত জোগায় দেখি।

দৈবচরণের চটির শব্দ মিলিয়ে গেল। ভাই বোন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর নিমাই ফিসফিস করে বলল, আর আমি আসব না এ বাড়ি।

ছিঃ!

সরযূ সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। বলে, বাবার কথায় রাগ করে! কাল-পরশুর মধ্যে ওঁর রাগ জুড়িয়ে যাবে। বুঝিস না, তুই হৈ-হল্লা করে বেড়ালে

ওঁর চাকরিতে সুদ্ধ টান পড়ে যাবে। না খেয়ে মরবার দাখিল হতে হবে আমাদের। সেইজন্য উনি রাগ করেন।

নিমাই বলল, তাই তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকব দিদি। আমি দেশের কাজ করব।

সরযূ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এ সব কু-মতলব কে মাথায় ঢোকাচ্ছে শুনি? অঙ্ক না শিখিয়ে মাষ্টার আজকাল এই সমস্ত শেখায় বুঝি?

নিমাই জবাব দিল না, চুপচাপ পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—সমস্তটা দিন যা ছুটোছুটি করেছে!

কিন্তু সরযূর ঘুম আসে না, বড় ভয় করছে। যে কথা বলল, ঐ সব কি ঘুরছে এখন এদের মাথায়? বাজার-খোলার পথের ধুলো রক্তে ভেসে গেল—তবু কাণ্ডজ্ঞান হল না এদের, এই দুধের ছেলেটা অবধি ভয় পায় নি। কি অভাবিত ব্যাপার ঘটল আজকে—এই বয়সেরই এমনি কত ছেলে নির্ভয়ে এগিয়ে দাঁড়াল রক্তমুখ হ্যামিল্টনের মুখোমুখি, কালেক্টর মার্টিনের আদেশ অবহেলা করে। মার খেয়ে ভয় পায় না, অপমান-বোধ তাতে প্রখর হয়ে ওঠে। অন্নবস্ত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি এই সকলের ভাবনা এতকাল প্রকট ছিল, এ কি নূতন ভাবনা, অমোঘ কঠিন সংকল্প দেখা দিচ্ছে দেশের ছেলেদের মধ্যে!

সকালবেলা সরযূ দেখে, নিমাই তার আগে উঠে বেরিয়ে চলে গেছে। দৈবচরণ জিজ্ঞাসা করেন, এসেছিল?

সরযূ ঘাড় নাড়ে। উদ্বেগের স্পষ্ট ছায়া সে দেখতে পেল বাপের মুখে। কিন্তু মুখের দম্ভ ছাড়েন নি তিনি। বললেন, আচ্ছা, যায় কোথায় দেখি। অনিলকে লাগিয়ে দিচ্ছি—

অনিল চক্রবর্তী লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে—হাঙ্গামার আঁচ পেয়ে এই থানায় তাকে স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে পাঠিয়েছে সদর থেকে। অল্পদিনের চাকরি, কাজকর্ম ভাল বোঝে না। এ লাইনের ঝানু লোক দৈবচরণকে প্রথম দিন থেকেই খুব খাতির করে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত রকম কৌশল শিখে নিতে চায়। একলা একটিমাত্র প্রাণী, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল—দৈবচরণ নিজে থেকে তার কাছে প্রস্তাব করলেন, তাঁর বাড়ি থেকে দু-বেলা দুটি দুটি খেয়ে যেতে। কথাবার্তায় খবরাখবর নিয়েছেন, পালটি ঘর এরা, আর দেশে ঘরবাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। দৈবচরণের মনে মনে গভীরতর মতলব আছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারো কাছে তা প্রকাশ করেন নি।

অনিলকে খবর দিয়েছিলেন, সে এসে হাজির হল। দৈবচরণ বললেন, সন্ধান নাও বাবা, এই তো এইটুকু জায়গা—যাবে কোথায়? আমি হলাম চুণোপুঁটি মানুষ—চোর ঠেঙিয়ে আর হ্যামিল্টনকে দিনের মধ্যে বিশ বার সেলাম ঠুকে দিন গুজরান করি, আমার ছেলে গ্যারিবল্ডী হবেন, এঁটোপাতের খোয়া স্বর্গে যাবে। ধরতে পারলে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো হারামজাদাকে।

অনিল তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করল। যাবে আর কোথায়? কালকে বলেন নি যে! রাতে একদল ইস্কুল ঘরে পড়ে ছিল, ঠিক ঐ দলে গিয়ে জুটেছে—হানা দিলে ধরে ফেলতে পারতাম—

দৈবচরণ বললেন, পালের গোদা হৃষিকেশ—ওকে ধরে নাড়া দাও, সমস্ত খবর বেরিয়ে আসবে।

সমস্ত দিন নিমাইর দেখা নেই, রাত্রেও বাড়ি এল না। সরযূ ঘুমের মধ্যে উঠে বসে পিছনের জানলা দিয়ে বারম্বার সুপারি বনের দিকে তাকায়। কারও ছায়া দেখতে পাওয়া যায় না। যা বলেছে সত্যি সত্যি তাই করল নাকি, সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিল?

পরদিন দুপুরে অনিল খেতে বসেছে। সরযূ তার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলে না। সঙ্কোচ কাটিয়ে আজ সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, খোঁজ পেলেন?

অনিল ঘাড় নাড়ল।

কি বললেন মাষ্টার মশাই?

কোথায় আছে কি বৃত্তান্ত কিছু বলল না। কথা আদায় করা বড় শক্ত ওরকম লোকের কাছ থেকে।

ছেলেদের নিয়ে আখড়া তৈরি করছে, ডনবৈঠক করবে কুস্তি লড়বে মুগুর ভাঁজবে সেখানে। মাথার প্যাঁচে প্যাঁচে ওর মানা মতলব। আবার কি অঘটন ঘটিয়ে বসে দেখ।

সরযূ বলে ফেলল, ও মাথাটাও সেদিন দিলেন না কেন চৌচির করে?

পড়েনি সামনের মাথায়। তা হলে কি ছেড়ে দিত? পুলিশের কাছে খাতির-উপরোধ নেই, বাপকেও আমরা ছেড়ে কথা কই নে।

সরযূ বলল, তা সত্যি, খাতির-উপরোধের ধার ধারেন না আপনারা। উপবাসী নিরস্ত্র কয়েকটি ছেলে—তা বলে এক বিন্দু রেহাই নেই। বরঞ্চ যার হাতে কিছু নেই তারই বিরুদ্ধে আপনাদের বীরত্ব খোলে ভাল।

এত কথা কি করে বলল সরযূ জানে না। আড়ালে এসে সে লজ্জায় মরে যায়, তার বাচালতায় অনিল না জানি কি ভাবছে মনে মনে।

বিকালবেলা অসময়ে হঠাৎ দৈবচরণ এলেন।

এল নিমাই?

না।

বাপের মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হল সরযূর। বলে, ঘামে যে নেয়ে গেছ বাবা।

চড়া রোদ। দত্তকোনায় একটা এনকোয়ারিতে গিয়েছিলাম, তিন ক্রোশ পথ ঘোড়ার পিঠে আসতে হল।

সরযূ ছুটে গিয়ে হাতপাখা নিয়ে এল।

জামা খোল, শুয়ে পড় বাবা।

দৈবচরণ বললেন, কায শেষ হয়নি; আবার এক্ষুনি যেতে হবে।

ঐ অত পথ আবার এক্ষুনি ঘোড়ায় যাবে?

ম্লান হেসে দৈবচরণ বললেন, নইলে পালকি-বেয়ারা সাজিয়ে কে বসে রয়েছে বল্?

নিমাইর উপর সরযূর রাগ হচ্ছে। বুড়ো বাপ এতটা পথ অকারণ ছুটোছুটি করে এসেছেন, নিমাই ফিরেছে কিনা সেই খবরটা জানতে। আর হতভাগা ছেলে স্বচ্ছন্দে কিনা বলল, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেশের কাজে যাবে। সত্যি সত্যি করেছেও তাই।

তিন দিনের দিন নীলরতন চোখ মেলে তাকাল। এ ক'দিন অসাড় অচৈতন্য হয়ে ছিল, নাড়ি ধরে অনুভব করতে হয় সে বেঁচে আছে। চিকিৎসা ব্যাপারে কৃপণতা নেই। এখানকার একমাত্র বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার ভবনাথ নন্দন—রোগীর এমন ভিড় যে অগ্রিম চার টাকা দক্ষিণা দিয়েও তাঁকে সপ্তাহে একটিবার বাড়িতে আনা দুর্ঘট—এ হেন নন্দন মশায় কালীনাথের খাতিরে সকালে বিকালে দু-বার দেখে যাচ্ছেন। দালানের জন্য কড়ি বরগা কেনা হয়েছিল, সেগুলো প্রায় অর্ধেক দামে মহামায়া বিক্রি করে দিলেন। তালুক কিনে নগদ টাকায় টান পড়ে গেছে, কার কাছে এখন হাত পেতে বেড়াবেন? এ বিপদ সামলে উঠুক, ছেলে ভাল হয়ে যাক, আবার সমস্ত আয়োজন হবে। ছেলে বেঁচে না উঠলে কার জন্য তালুক-মুলুক দালান-কোঠা?

নীলরতন চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিক তাকাতে লাগল। মহামায়া গাই দুইছিলেন, কালীনাথ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠতে ছুটে তিনি ঘরে এলেন। আছড়ে পড়লেন বিছানার উপর।

কষ্ট হচ্ছে? কথা বল্, ও বাবা কথা বল্ একটিবার।

শূন্য দৃষ্টি নীলরতনের। ভাব দেখে মনে হয়—কোন কিছুরই সে অর্থ বুঝতে পারছে না, মায়ের কথা কানেই যাচ্ছে না হয়তো। ধীরে ধীরে আবার সে চোখ বুজল।

কালীনাথ বললেন, ছেলেমানুষ হ'য়ো না বোন। এই অবস্থায় কান্নাকাটি করলে খুব খারাপ হবে রোগীর পক্ষে।

সাত নয় পাঁচ নয়—আমার এই একটা গুঁড়ো দাদা। পুলিশ লাঠি মেরে মাথা ভেঙে দিয়েছে। প্রাণে বাঁচলেও মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাবে।

কালীনাথ প্রতিবাদ করে উঠলেন, পুলিশ লাঠি মারতে যায় কি সাধ করে? পুলিশের দোষ কি? সাধ করে

রূপে সকল সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। ভয়ের অপচ্ছায়া বিদূরিত হয়ে বলদৃপ্ত আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ ফুটে ওঠে। এত মার খেয়েছে কিন্তু এদের মুখের প্রসন্নতা মিলায় নি। সেদিনের হাঙ্গামায় শেষ অবধি পিছিয়ে যেতে হয়েছিল জনতাকে; তবু জয়ী তারাই। হেরেছে হ্যামিল্টনের দল। বাংলা দেশের শতাধিক জায়গায় অবিকল এই রকম ঘটেছে। সব জায়গায় ঐ এক খবর। লাঠি পরাজিত হয়েছে। লাঠি হাড়-পাঁজরা ভেঙেছে কিন্তু লাঠির আঘাত নূতন ভরসা এনে দিয়েছে পাঁজরার নিচে।

হৃষিকেশ উঠলেন। উঠান ছাড়িয়ে গলিতে পা দিয়েছেন—পায়ের শব্দে পিছন ফিরে দেখলেন, মহামায়া অনুসরণ করে এসেছেন এদ্দূর অবধি। হৃষিকেশ বলে উঠলেন, আপনার ছেলের মাথায় গোলমাল হয়েছে কালীবাবু বলছিলেন। কোথায়? দিব্যি টরটরে—কত কথা বলল। ঠিক আগেকার মতোই—সাহস-ভরা কথা, আশার কথা।

মহামায়া বলে উঠলেন, আপনি আর আসবেন না এ বাড়ি। ওকে টানবেন না। অনেক দাগা পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি, শান্তিতে আমাদের ঘর বসত করতে দিন। ঐ আমার একমাত্র ছেলে—শিবরাত্রির সলতে—

কান্নায় ভিজে এল কথাগুলো, মহামায়া শেষ করতে পারলেন না। হৃষিকেশ হেসে উঠলেন।

কি বলছেন মা, রাজাধিরাজ আপনার ছেলে—আপনি রাজমাতা। রাজদর্শন থেকে বঞ্চিত করাতে চান কেন আমায় মা?

মহামায়ার অনুরোধ হেসে উড়িয়ে দিলেন। আসা-যাওয়া চলতে লাগল। কথা বললে কানে নেয় না, অপমান গায়ে মাখে না—কি করা যায় এদের নিয়ে? মহামায়ার ইচ্ছা করে, পাখীর মতো আনত রুগ্ন সন্তানটিকে মুখে করে পালিয়ে চলে যান আবার কালনা অঞ্চলে, এদের সান্নিধ্য থেকে অনেক দূরে সেই মামলাবাজ কৌশলী শরিকগুলোর মধ্যে। তাদের সঙ্গে হাঙ্গামা এড়াতে এইখানে চলে এলেন, কিন্তু খোদ কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধাচ্ছে এরা এখানে। কুমীরের সঙ্গে কলহ করে জলে বাস করা চলবে ক'দিন?

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঐ যে মাস ছ'েক বিছানায় পড়ে ছিল আর হৃষিকেশ মাষ্টার রাজাধিরাজ বলেছিলেন, মহারাজ নামকরণের এই বোধ করি গোড়াকার ইতিহাস। নামটা চলিত হয়েছিল অবশ্য অনেক পরে হ্যামিল্টন সাহেব মারা পড়বার পর থেকে। গোড়ায় ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ক্রমশ ঐ নাম রাষ্ট্র হয়ে গেল। আজকে নীলরতন রায় বললে কেউ আর চিনতে পারবে না তাঁকে।

মাস কয়েক পরে হৃষিকেশ মাষ্টার আর নীলরতন একদিন অভাবিতভাবে দৈবচরণের বাসায় এসে উপস্থিত। দৈবচরণ এ সময় থানায় চলে যান; সেখানে সম্ভবত দেখেও এসেছে তাঁকে।

কে আছ?

সরযূ দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াল। বঙ্গবাসী কাগজে মোড়া একটা পুঁটলি নীলরতন রোয়াকের প্রান্তে রেখে দিল।

কৌতূহলী সরযূ বেরিয়ে এল।

কি ওটা? কাপড়? কাপড় কি হবে?

নীলরতন বলে, তোমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এঁরা—

সরযূর মুখ ছাইয়ের মতো পাংশু হয়ে গেল।

এদ্দিন পরে শোধ দিতে এসেছেন? আমার ছিল ফরাসডাঙ্গার শাড়ি—মিহি মোলায়েম আর অনেক দামি।

নীলরতন বলল, কিন্তু পুরাণো শাড়ি। আর এ হচ্ছে নতুন আনকোরা।

কাপড় নয়, গুণ চট। এ আমরা পরিনে, এ জিনিষ মানুষে পরতে পারে না।

পা দিয়ে সরযূ ঠেলে দিল কাপড়টা।

প্যালেষ্টাইন

শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটেনের ম্যাণ্ডেট শাসনে সাতাশ বছর কাটিয়েও প্যালেষ্টাইনের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন ক'রে নিজেদের অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান এক কমিশন নিযুক্ত করেছে। এই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছেন সুইডেনের প্রধান বিচারপতি মঃ এমিল স্যাণ্ডষ্ট্রোয়েম্। সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই কমিশন প্যালেষ্টাইনে গিয়ে সরেজমিনে সেখানকার সমস্যার তদন্ত করবেন।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে উঠেছে এবং দুপক্ষ থেকেই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমা হয়েছে। ইহুদীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং তা দমনে বৃটিশ শক্তির সদম্ভ প্রচেষ্টার রহস্যময় ব্যর্থতা পৃথিবীতে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। বেআইনীভাবে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ, সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দৃঢ় পণ, আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষ আর বৃটিশ শক্তির প্রতি তাদের বেপরোয়া হিংসামূলক কাজ দেখে মনে হয় শুধু নিছক ইহুদী বা আরবদের সমস্যাই প্যালেষ্টাইনে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠেনি, এই ব্যাপারের অন্তরালে দুনিয়ার প্রভুত্বকামী রাষ্ট্রশক্তির লোভও লুকানো আছে।

সত্যই প্যালেষ্টাইনে নরক সৃষ্টি হ'য়েছে। কাঁটাতারের বেড়া, সামরিক আইন, প্রকাশ্য বেত্রদণ্ড, গোলাগুলি, বোমা-কামানে ভর দিয়েও বৃটিশসিংহ সেখানে কম্পমান। এমনও ঘটনা ঘটেছে, ইহুদী সন্ত্রাসবাদীকে তেল্ আবিব্-এর বাজারে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ড করার প্রতিশোধ বৃটিশ-সিংহের সিংহত্বের প্রতীক এক সামরিক অধিনায়ককে জোর ক'রে আটকে তাকেও বেত্রদণ্ড দেবার পর ইহুদীরা সেই বৃটিশ অধিনায়ককে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। এই রকম বহু ঘটনাই ঘটেছে। যারা অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার সৃষ্টি করেছে এবং নিজেদের রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না ব'লে যাদের গর্বের সীমা নেই সেই বৃটিশ ভাগ্যাকাশে যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে. তা এই রকম ঘটনা থেকে বেশ আন্দাজ করা যায়। গত মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেও বৃটিশ শক্তির খর্বতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে এই ইহুদীদের টেনে আনলো কে? ইহুদীদের সমস্ত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বৃটিশই দিয়েছিল, আরবদেরও কায়দা ক'রে বিপরীত প্রতিশ্রুতি দিতেও তারা কসুর করেনি। এরকম ভেদ সৃষ্টি করার মূলে কোন্ অভিপ্রায় লুকানো ছিল? আজ বৃটিশ হাইকমিশনারের অধীন প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপনের মধ্যেই বৃটিশের বহু প্রচলিত "সদিচ্ছা" (?)ই কি কাজ করছে না?

দুর্বল বৃটেনের হাতে আর চাবিকাঠি নেই। সবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার সঙ্গে মতে না মিললেও, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে প্যালেষ্টাইন সমস্যা জাতি প্রতিষ্ঠানে তুলতে হ'য়েছে।

প্যালেষ্টাইনে বিরোধ আর সংঘর্ষ কেমন ক'রে সমস্যার আকারে দেখা দিল তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান সমস্যা বিশদভাবে আলোচনা করার পূর্বে এখানে ইহুদী সমস্যা আনুপূর্বিক আলোচনা করা দরকার।

মধ্য দিয়ে তেলের পাইপ লাইন শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তেল-সংগ্রহের উপায় অব্যাহত রাখার আবশ্যিক প্রচেষ্টা বৃটিশের পক্ষে স্বাভাবিক। আমেরিকাও এই তেলের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছে। শুধু তেল নয়, আরও অন্য প্রয়োজন আমেরিকার পক্ষে জরুরী হয়ে পড়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা দুনিয়ার বুকে নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম ক'রতে চায়। বৃটেনের কথা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কারণ বৃটেন শুধু দেনদার হ'য়েই পড়েনি, তার সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় চারিদিকেও ফাটল ধরেছে। এই ঘর সামলানোর তাগিদে তাকে আমেরিকার কাছে বিরাট ঋণের জন্য হাত পাততে হয়েছে। কাজেই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে পেরে উঠবে না। হতাশ-ভাবে আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে তাই সে মুক্তির পথ খুঁজছে। এই দুই শক্তি মিলে মিশে তাকিয়ে আছে শঙ্কিত সম্ভাবনার দিকে, রাশিয়ার বর্ত্তমান শক্তির আড়ম্বরের দিকে। তাই প্যালেষ্টাইনে আমেরিকার লোভ আছে। কিন্তু বৃটেন আমেরিকার তাঁবেদারী ক'রতে পারে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদা আমেরিকার হাতে তুলে দিতে বেদনা বোধ করে। এজন্য বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্যালেষ্টাইন নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা চলেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আরব ও ইহুদী উভয় দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৃটিশ আলোচনা ব্যর্থ হয়। তাই বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী কমন্স-সভায় ঘোষণা করেন, বৃটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন-প্রসঙ্গ সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন করবেন। প্যালেষ্টাইন-সঙ্কট সমাধানের বাধার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সমাধানের বিলম্বের জন্য তিনি মার্কিন সরকারকেই দায়ী করেন। আমেরিকা এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে। প্যালেষ্টাইনে বৃটেনের মত সমান স্বচ্ছন্দ অধিকার আমেরিকার পক্ষ থেকে দাবী করা হয়, আর জানানো হয় যে, প্যালেষ্টাইনে আমেরিকার স্বার্থ বহুদিন থেকে গ'ড়ে উঠেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদে আমেরিকার স্বার্থ যুদ্ধের পরে বিশেষভাবে সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমেরিকা খুব বেশী সচেতন হয়েছে। হাইফা বন্দরে আমেরিকার তৈল সম্পদের কেন্দ্র করার পরিকল্পনা আছে। তাই 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' আভাষ দিয়েছিল যে, যুদ্ধোত্তর জগতে প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ গঠন করতে হবে বৃটিশ ও মার্কিন তৈলসম্পর্কিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেজন্য শক্তিশালী বৃটিশ ও মার্কিন সেনাবাহিনীর উপযোগী ঘাঁটি প্যালেষ্টাইনে থাকা দরকার। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আরবদের মনোভাবের বিচার ক'রে আমেরিকা আরবদেশগুলিকে ঋণ দেবে, এমন কথাও শোনা গেছে।

তাই আমেরিকা ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই প্যালেষ্টাইন-প্রসঙ্গ সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন করার প্রস্তাব তার মনোমত নয়। দুই শক্তিরই কিন্তু প্যালেষ্টাইন সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোন বিরোধ নেই। প্যালেষ্টাইনকে শোষণের একচেটিয়া অধিকারের অংশ নির্ধারণ নিয়েই গোলযোগ। আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রভুত্ব করার দাবীও এই বিতণ্ডার মধ্যে জড়িত। তাই বৃটিশ ও আমেরিকার বর্ত্তমান মতভেদের সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের নিজস্ব সমস্যা জড়িত নয়।

প্যালেষ্টাইন-প্রসঙ্গ সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য হ'য়ে উঠেছে। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসন যে স্থানীয় অধিবাসীদের কল্যাণ করেনি এতেই তা স্বীকার করা হয়েছে। প্যালেষ্টাইনে খবরদারির অংশ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বৃটেনের বিরোধ 'এহ বাহ্য'। দৃষ্টিভঙ্গী তাদের এক, একথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। বৃটেন সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে একটু বোঝাপড়া

ক'রে নিয়ে নিজেদের ও মার্কিন শক্তির বশংবদ রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে মতলবমত পরিকল্পনা সমর্থন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বৃটেনের এই মতলব বেশ স্পষ্ট, তাই নিরাপত্তা পরিষদে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় নি। কারণ, সেখানে রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতা আছে। আরব-ইহুদীদের সংঘর্ষ বাড়িয়ে তুলে প্যালেষ্টাইনকে নরকে পরিণত করেছে ফন্দীবাজ বৃটিশ। মানুষের নিরাপত্তা সেখানে আর নেই। কাঁটাতারের বেড়া আর পুলিশ ও মিলিটারী জুলুম সেখানে সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায় স্বরূপ গান্ধীজি পরামর্শ দিয়েছেন ইহুদীদের হিংসা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বর্জন ক'রতে হবে। গান্ধীজীর দূরদৃষ্টি কাজে লাগাবার মত অবস্থা সভ্যতার চরম সঙ্কটে পৌঁছে পৃথিবী আজও অর্জন ক'রতে পারেনি। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ কখনও এত তীব্রতা লাভ করে নি। পরস্পর একই দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতীয় কৃষ্টির ধারারক্ষী দুইটি জাতির বসবাসে সামান্য সাময়িক গণ্ডগোল ঘটেছে, কিন্তু প্যালেষ্টাইনে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যেদিন থেকে বৃটিশ সরকার ইহুদীদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা কাজে লাগাতে চেয়েছে সেদিন থেকেই আরব ও ইহুদীদের মধ্যে দুর্নিবার আগুন জ্ব'লে উঠেছে। সমস্ত সমস্যা মিটে যায়, যদি বৃটেন প্যালেষ্টাইন ছেড়ে চ'লে যায়। কিন্তু সে ইচ্ছা তাদের নেই।

জাতি প্রতিষ্ঠানে আলোচনার প্রথম দিকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা আসফ আলি দাবী করেন যে, প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে জাতি প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যাডোগ্যান তাতে সম্মত হন নি। এমন কি প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব ২৪-১৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, ইউক্রেন, বাইলোরাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

জাতিপ্রতিষ্ঠানের যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তাকে শুধু প্যালেষ্টাইনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই হবে।

বৃটেন কোন উপায়ে বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ক'রতে চায়। প্যালেষ্টাইনের শিল্পৈশ্বর্যের শতকরা চল্লিশ ভাগ দুটি বৃটিশ কোম্পানীর দখলে, প্যালেষ্টাইন ইলেকট্রিক কর্পোরেশন আর প্যালেষ্টাইন পটাস কোম্পানী বৃটিশের স্বার্থে ডেড, সি-এর খনিজ সম্পদ কাজে লাগায়। এর জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হয় না, এমন কি কাষ্টম ডিউটিও কিছু দিতে হয় না। হাইফার তৈলখনির জন্যও কোনো ট্যাক্স প্রভৃতি লাগেনা। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এবং ট্রান্স আরেবিয়ান অয়েল কোম্পানীর একচেটিয়া সুবিধার জন্য কোনো ট্যাক্স লাগে না। এত বড় স্বার্থের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, সুদূরপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ স্বার্থের সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের যে রকম সংযোগ ঘটেছে তাতে সেখান থেকে ছেড়ে যাওয়ার সদিচ্ছা (?) বৃটেনের না থাকাই সম্ভব। আমেরিকাও বলদর্পিত হয়ে উঠেছে। তাই আমরা খুব আশান্বিত নই। জাতি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত কমিশন স্যাণ্ডষ্ট্রোমের নেতৃত্বেও সমস্যার সমাধান করতে পারবে ব'লে আমরা ভরসা করি না।

তৈল সম্পদ নিরাপদ রাখা, সুয়েজখালের কর্তৃত্ব, মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতা প্রসারের ঘাঁটি প্রভৃতি যে কোন স্বার্থের অজুহাতে প্যালেষ্টাইনের দেশীয় সমস্যা অবহেলা করা অপরাধ। বিশ্ববাসীর সম্মিলিত দাবী হওয়া উচিত যে, ম্যাণ্ডেট শাসন অবসান ক'রতে হবে, বৃটিশ সেনা অপসারণ ক'রতে হবে এবং মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন ক'রতে হবে। সেই রাষ্ট্রে সকলের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে, আরব-ইহুদী নির্বিশেষে সকলের ধর্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা থাকবে। পরস্পরের কৃষ্টি রক্ষা ও উন্নতি বিধানের সমান সুবিধা থাকবে। তবেই প্যালেষ্টাইনের সঙ্কট কেটে যাবে। ইহুদীরাও ভ্রান্তভাবে অন্যায় আবদার করবে না, বা আরবরাও বিভ্রান্ত হবে না। সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান এই ভাবেই সমস্যার সমাধান করতে পারে। নচেৎ, বিগত মহাযুদ্ধের বিরাট ক্ষত উপশম হওয়ার পূর্বেই হয়তো প্যালেষ্টাইনকে সামনে রেখে পৃথিবীতে আবার প্রলয়ানল প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। সেই সম্ভাবনার কথা মনে হ'লেও আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠা কি অসঙ্গত?

স্বপ্ন

চুন-চান-ইয়ে অনুবাদক ঃ—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

[চুন-চান-ইয়ে একজন তরুণ চৈনিক লেখক, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে টোকিওতে ছিলেন এবং জাপানীগণ কর্তৃক সৈন্যদলে যোগদান করিতে বাধ্য হন। পরে চীনে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিনের জন্য চীনা জাতীয় বাহিনীতে কার্য করেন এবং অতঃপর তিনি পরিব্রাজকরূপে অধিকৃত চীন হইতে স্বাধীন চীন পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা ও শিক্ষকতা করিয়া বেড়ান। ১৯৪৪-৪৫ সালে শীতকালে তিনি তথ্যবিভাগ (Ministry of information) কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া দেশভ্রমণের জন্য এবং চীন সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য ইংলণ্ডে আসেন। বর্তমানে ইনি কেম্ব্রিজের 'কিংস্ কলেজে' ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত আছেন। ইংরাজী ভাষায় প্রথম গল্প ১৯৩৮ সালে নিউ রাইটিং পত্রিকায় বাহির হয়। তাঁহার 'স্বপ্ন' গল্পটিও মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মনুষ্যজীবনের সমস্যাসঙ্কুল কাহিনী অবলম্বনে এই গল্প রচিত এবং ইহাতে লেখকের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কবিদৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। —অনুবাদক]

পাহাড়ে তখন ভীষণ গরম। এত গরম যে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। আমি সারাদিনই হাঁটছিলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে এবং পা দুটোতেও ফোস্কা পড়েছে। কিন্তু অবশেষে এক অপ্রশস্ত ঢালু জায়গায় এসে পৌছলাম এবং তার নীচুদিকে চলতে গিয়ে 'টুংটিং' হ্রদ দেখতে পেলাম। সূর্য তখন অস্তাচলে চলে পড়েছে এবং মন্দমন্দ বাতাস বইছে—নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস। এখানে কোন আশ্রয়প্রার্থী নেই, রাস্তায়ও লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে না এবং মাথার ওপরও জাপানী বিমান উড়ছে না। যুদ্ধটা অন্ততঃ পিছনে পড়ে আছে। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম—সত্যিকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস। পরে জলের ওধার থেকে কুকুরের একটা ডাক শুনতে পেলাম। তারপরই সব শান্ত হয়ে গিয়ে হ্রদের চারদিকে একটা পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল।

আমি পিঠ থেকে ময়লা কাপড়ের পুঁটুলিটা নীচে নামালাম এবং সেটাকে বালিশের মত পিছনে রেখে ঘাসের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিলাম। আকাশটা এতক্ষণ নীচেকার জলের মত নীল ও শান্ত দেখাচ্ছিল, এবার তা যেন লজ্জার রক্তিম আভায় ভরে উঠল। ঘরমুখো একঝাঁক হাঁস শোকার্ত ক্রন্দনে ডানা ঝাপটিয়ে পূবদিকে পার হয়ে গেল। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

কিছুক্ষণের জন্য কোন শব্দই শোনা গেল না, এমনকি সেই গঙ্গাফড়িংয়ের শব্দ যা এখানকার পথে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু ক্রমশঃ দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল প্রথমে যা মোটেই বোঝা গেল না কিন্তু পরে স্পষ্টই ঘণ্টার শব্দ বলে মনে হল। একটা দমকা হাওয়ায় সেটা বেড়ে চলল। অবশেষে সেটা যে কি তা খুঁজে পেলাম। সেটা একটা গান, খুবই পরিচিত গান যা আমি গোপালক থাকার সময় মধ্যচীনের বিশাল গোচারণ ভূমিতে মেয়েদের গাইতে শুনেছি এবং যে গানটা আমাকে উন্মনা করে দিত। গানটা এই রকম ঃ

দাওগো আমায় তোমার সাথে আকাশ পারে যেতে
দাওগো আমায় তোমার সাথে সাগর পারে যেতে।
সাগর যাক শুকিয়ে,
পাহাড় যাক ফুরিয়ে;
তবু মন আমার কভু টলবে নাকো,
ওগো মন আমার কভু টলবে নাকো।

এই নির্জন স্থানে এ গান শুনে আমি বিস্মিত হলাম। আরও বেশী বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে কাছাকাছি এমন কোন মানুষ আছে যে এত সুন্দর গান গাইতে পারে। মানুষ! একথা ভাবতেই আমার খাবারের কথা মনে পড়ল। যতই ভাবলাম ততই খিদে বাড়তে লাগল।

সমস্ত দিনটা কিছুই খাওয়া হয় নি। ভাবতেই মনে হল যেন আমি অনেক সপ্তাহ ধরে অনাহারে আছি। ভাবতে লাগলাম কি করে আমি বোকার মত এখানে ঘাসের ওপর পড়ে আছি আর মূর্খের মত আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'তে দেখছি। তাই লাফিয়ে উঠে পায়ের ওপর ভর দিলাম এবং যেদিক থেকে গানটা আসছিল সেদিকে এগিয়ে চললাম।

হ্রদের ডানদিকে একসারি থেপলগাছের পিছনে একটা গ্রাম দেখতে পেলাম। একদল লোকের ভিড় তখন সবেমাত্র ভেঙ্গেছে—অল্পবয়সী চাষী এবং ছেঁড়া পোষাকপরা ছেলেদের ভিড় আর বুড়োরা পাইপে ধোঁয়া টানছে, কারও বিষণ্ণদৃষ্টি, কেউ বা বিস্ময় ভরা চোখে দণ্ডায়মান নর্তকীদের দিকে তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে গ্রামের মাঝে নিজেদের ফেলে চারদিকের রহস্যময় অন্ধকারভরা দূরের পানে চেয়ে রয়েছে। এই সরলা বালিকাদের মধ্যে কারও চোখের কোণে অশ্রুও আছে। গানটা যে তাদের সরল ও কোমল মনকে নাড়া দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এটা যে একটা বিষাদের গান তা আমার জানা আছে, কেন না এর কাহিনী শোকাত্মক। পরে যখন আমি পিঠের ঝুলান পুঁটুলিটা নিয়ে কাছাকাছি এলাম তখন আর এ ভিড় রইল না। তারা সকলেই নৈশভোজনের জন্য ঘরে ফিরে গেছে। ভাবলাম—ওরা ভাগ্যবান লোক, যুদ্ধের কিছুই জানে না। এবং কেন জানি না মনে মনে একটা বিষাদ অনুভব করলাম।

একা আমি বোকা গোছের একজন ভবঘুরে বুড়ো ও দুজন তরুণী নর্তকীর সামনাসামনি দাঁড়ালাম। তাদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত মোটা হলেও দেখতে খুবই সুন্দর—যেন বাতাসে আন্দোলিত কুমুদ ফুল এবং অপর জন অজানা সুদূরের পানে তাকিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকলেও নমনীয় বেতসের মত তন্বী বলেই মনে হল। কোনও কথা না বলে আমরা পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়ালাম এবং ধীরে ধীরে গ্রামের চারদিকে অন্ধকার নেমে আসতে দেখলাম যতক্ষণ না তা আমাদের ও আমাদের আশপাশের সমস্ত জিনিষকে ঢেকে দিল।

'তুমিও কি আমাদের মত গৃহহীন যাযাবর?' অবশেষে বুড়ো নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

'হুঁ' আমি বল্লাম 'জাপানী আক্রমনের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। সেদিন ওরা মধ্যচীনের রাজধানী উচাং অধিকার করল।'

'বেশ তাহলে আমরা দুর্দিনের বন্ধু। এস রাত কাটাবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বার করা যাক্।'

সে এগিয়ে চলল। সম্মোহিতের মত আমি পিছনের মেয়ে দুটীর সঙ্গে তাকে অনুসরণ করলাম। পরক্ষণেই কিন্তু আমি বিশেষ অপ্রস্তুত ও অস্বস্তি বোধ করলাম। সত্যি বলতে কি প্রথম প্রথম আমি সব সময়েই অপরিচিতা মেয়ে দুটীর সামনে একটু আড়ষ্টতা অনুভব করছিলাম, বিশেষ তারা যখন পিছন থেকে আমার পদক্ষেপ লক্ষ্য করছিল। সৌভাগ্যক্রমে বুড়ো কথা বলতে আরম্ভ করল। তার কথাগুলো একটু অস্পষ্ট, কেননা তার সামনের দাঁতগুলো সব পড়ে গিয়েছে। সে বল্লে:

'অপরিচিত যুবক, আমি একজন যন্ত্র-বাদক—বুঝলে?'

'হাঁ বুঝেছি।' আমি বল্লাম এবং সরু চামড়ায় বাঁধা কাঁধে ঝুলান তার একটা ছোট ঢাকের দিকে চাইলাম, যেটা দুলানো বাজন-কাঠির ধাক্কায় বারম্বার বেজে উঠছে। কিন্তু তবুও ওপরপড়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রকম স্বপ্ন যন্ত্র আপনি বাজান খুড়োমশাই?'

'কেন, আমি ঢাক বাজাই। তুমি কি তা দেখ নি?' সে খুব প্রত্যয় নিয়ে বললে। তারপর কিছুক্ষণ থেকে যেন আমাকে নিশ্চিতভাবে বোঝাবার জন্য বললে, 'আমি একটা কোম্পানীর ম্যানেজারও বটে, বুঝলে?'

'কোন্ কোম্পানীর?' আমি বাস্তবিকই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

'একটা থিয়েটারের দল অবশ্য! পিছনের দুজন মেয়েকে দেখে বুঝতে পারছ না? যদিও ওরা আমারই মেয়ে তবু ওরাই

'চাঁদের দিকে দেখ। আজ তাকে সুন্দর মনে হচ্ছে।'

মাথা তুলে দেখলাম প্রাঙ্গণের ওপর মেঘশূন্য আকাশে একটা সুন্দর চাঁদ আলোক বিতরণ করছে। মধ্যচীনের ভূমিতে জাপানী আক্রমণ হবার পর থেকে এই ক'মাস আমি এ সমস্ত ভুলে গিয়েছি।

'কি সুন্দর!' আমি সজোরে বলে উঠলাম, 'এমনকি আমি দেখতে পাচ্ছি যে চন্দ্রদেবী ক্যাশিয়া গাছের পাশে কুয়াশাভরা সুদূরের দিকে স্বপ্নাতুরার মত চেয়ে রয়েছে।' আমার কথায় এতটা জোর ছিল যে স্প্রিং রাগের ভাব দেখিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

প্রাঙ্গণের বুড়ো দেবদারু গাছটার দিকে তাকিয়ে সে বল্লে, 'চুপ! দেখ ওখানে কি হয়েছে।'

আমি গাছটার দিকে চাইলাম। একটা বীভৎস জটপাকানো বুড়ো গাছ—এত জটালো যে সেটা নিশ্চয়ই একশ বছরের বেশী দিনের হবে। তারই একটা নুয়ে পড়া ডাল থেকে কতকগুলো পাতা পালকের মত ঝরে পড়তে দেখলাম। আর তার ওপরের শাখাগুলোয় ডানার ঝাপটানি শব্দও শুনলাম। 'ওঃ বুঝেছি!' মনে মনে ভাবলাম, 'আমার চীৎকারে একটা ঘুমন্ত পাখী ভয় পেয়েছে—আহা বেচারী!'

'একটা কথা আমার মনে পড়ছে', স্প্রিং তার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বল্লে, 'যদি কেউ ঘুমন্ত পাখীর ডানা ঝাপটানি তিনবার শোনে, তাহলে সে একটা ভাল স্বপ্ন দেখবে যা পরে সত্যি হবে।'

আমি উৎসুক হয়ে বল্লাম, 'তুমি তাহলে ক'বার শুনলে?'

'ঠিক তিনবার।'

'তবে তুমি একটা ভাল স্বপ্ন দেখবেই।'

'আমার সন্দেহ হয়।' সে ক্ষীণকণ্ঠে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে। 'এই ক'বছর আমরা কেবল দুঃস্বপ্নই দেখে আসছি।'

'একটাও ভাল স্বপ্ন দেখ নি? কি আশ্চর্য। কেন বল ত?'

বুঝলাম আমার স্বরে একটু বেশী উদ্বেগ দেখা গেল। আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি যে কেন আমি অপরের স্বপ্ন ব্যাপারে এতবেশী আগ্রহ দেখাব বা অধৈর্য হব।

স্প্রিং কোনও উত্তর দিল না। সে তার চুলের মত কালো এবং বেড়ালের মত উজ্জ্বল একজোড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এমন একটা জিনিষ তাকে হতবুদ্ধি করল যা সে নিজেই বুঝতে পারল না। তার এই হতবুদ্ধি ভাব দেখে আমিও এত হতভম্ব হলাম যে তার দীপ্ত অকপট দৃষ্টির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তাই সেই থমথমে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে চতুরা ভায়লেট একটা কৈফিয়ৎ উপস্থাপিত করল।

'আমাদের জীবনে বিরামের অভাবই এর কারণ। চার বছর আগে জাপানীরা আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেবার পর থেকে আমরা একদিনের জন্যও শান্তি উপভোগ করি নি। যেখানেই আমরা যাই না কেন, শত্রু ঠিক পিছনেই আছে।'

'তবে এখন আমরা কিছুটা শান্তি পেয়েছি।' স্প্রিং হঠাৎ বলে উঠল। মনে হ'ল তার ভেতরে নূতন একটা ভাবের উদয় হয়েছে। এখানে তিনদিন আমরা জাপানীদের কোন খবরই পাইনি।'

এ বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। নিজের ঘাড় নাড়লাম এবং মনে মনে বল্লাম 'অপেক্ষা কর, বুঝতে পারবে।' কিন্তু তাদের ধারণা ভেঙ্গে দেবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। তাই বল্লাম, 'তাহলে ত তুমি ভাল স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু কি রকম স্বপ্ন আশা করছ? সেটা কি একটা ঐন্দ্রজালিক যষ্টি যা ঠেকান মাত্র সবকিছু সোনা হয়ে যাবে? না এক জোড়া ডানা যাতে ভর দিয়ে তুমি স্বর্গরাজ্যে উড়ে যেতে পারবে?'

'ভবঘুরের মেয়ে আমরা, আমাদের অত বড় অভিলাষ নেই।' স্প্রিং মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে। 'আমি কেবল একজন ছাত্রী হতে চাই যাতে করে লিখতে পড়তে পারি। বুঝলে, যাতে গানগুলো পড়তে পারি আর সেগুলোকে লিখতেও পারি। আহা, মা যখন আমাদের গান আবৃত্তি করে শোনাত তখন আমার কি ভাল যে লাগত। মা একজন ভাল

নর্তকী ছিল এবং বাবার চেয়েও বেশী রোজগার করত।' সে হঠাৎ থামল এবং স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে হারিয়ে যাওয়া তার সেই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চেয়ে রইল। ভায়লেটও উৎফুল্ল হল কিন্তু পরক্ষণেই একটু বিমর্ষ হয়ে গোপনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে যা আমার দৃষ্টি এড়াল না। সে বল্লে, 'আমারও ছাত্রী হবার ভারী ইচ্ছা হয়।'

'সত্যিই একজন ছাত্রী।' শিং তার অবসাদ কাটিয়ে বল্লে, 'এই যে জমিদার—কি নাম তার···যে তোমাকে সেদিন গ্রামের ভেতর নাচতে দেখে তোমাকে প্রশংসা করল এবং বাবার কাছে বলল যে তোমাকে দত্তক নিয়ে মেয়ের মত পালন করবে, স্কুলে পাঠাবে, কেন না তার স্ত্রী মারা গিয়েছে আর তার অন্য কোন ছেলেমেয়েও নেই। কিন্তু তুমি এমন দুষ্টু যে বলেছ তুমি যেতে চাও না, বরং বাবার সঙ্গে কষ্টকর জীবনের ভাগী হয়ে থাকতে চাও।'

ভায়লেট পরাভূত হয়ে অপ্রস্তুতে পড়ল এবং কি উত্তর দেবে কিছুই ভেবে পেল না। সে কেবল আমতা আমতা করে বল্লে, 'সেই বদমাইশ বুড়োটা মুখে যা বলেছিল কাজে সেটা করতে চায় নি। তার মতলব ছিল "অন্য রকম···'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও!' আমাদের কথাবার্তা ভেঙ্গে দিয়ে বজ্রের মত একটা চীৎকার কানে এল। এটা সেই বুড়োর কাছ থেকে এল যে ঘাসের গাদায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার মনে হল হয়ত কোনও সাপ তার ঘাড়ে কামড় দিয়েছে, কেন না এরকম নির্জন জায়গায় ত প্রায়ই সাপ বেরিয়ে থাকে। তাই একটা লাঠির খোঁজে ছুটতে যাব মনে করলাম, কিন্তু ভায়লেট থামিয়ে দিল।

'কিছু ভাবতে হবে না।' সে বল্লে, 'ও দুঃস্বপ্ন দেখছে। যেদিন জাপানীরা গ্রামে এসে আমার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার পর থেকে ও প্রায়ই এ রকম স্বপ্ন দেখে থাকে। আমরা আর তার সম্বন্ধে কিছু শুনি নি, মনে হয় সে মারা গেছে।'

আমি বুঝলাম। কাহিনীটা নিশ্চয়ই দুঃখের। তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না যাতে তারা বেশী রকম আঘাত পেত এবং আমারও কষ্ট হত। যুদ্ধের সময় মানুষ আশ্চর্যরকম কোমলমনা হয়ে যায়। তাই আমি শুধু বল্লাম, 'এখন আমাদের শুতে যাওয়া উচিত। আমার মত বাড়তি লোকের খোরাক জোগাতে কাল নিশ্চয়ই তোমাদের একটু বেশী খাটতে হবে।' তারপর শুভরাত্রি না জানিয়ে তাদের তরুণ হৃদয়ে একটু আশা জাগিয়ে তোলবার জন্য বল্লাম, 'যখন আমাদের দেশ শত্রুর কবলমুক্ত হয়ে আবার স্বাধীনতা ফিরে পাবে তখন আমাদের সবার জন্যই অবৈতনিক স্কুল খোলা হবে এবং সকলেই গান নিখতে পড়তে পারবে।' এরপর আমি শয়ন করলাম। পরদিন ভোরে আমরা কাছাকাছি একটা গ্রামে পৌঁছলাম। আমি একটা দু-তারের যন্ত্র বাজালাম এবং বুড়ো তার ছোট ঢাকটা পিটল। আমার মনে হল আমি ভালই বাজালাম, যদিও অনেকদিন এর কোন কসরৎ হয় নি। এর একটি অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া ভায়লেটের মধ্যে দেখা গেল, সে যখন গ্রামের মাঝে শিংয়ের গানের সঙ্গে তাল রেখে নাচল। আগে বলেছি যে সে (ভায়লেট) চেহারায় একটু মোটা, কিন্তু আমার বাজনার সুরের তালে তালে তার নাচ এত সহজ ও সুন্দর লাগল, মনে হল যে একজন জলপরী জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। যখন সে নেচে নেচে গান গাইল তার সেই হাল্কা নারীসুলভ কণ্ঠস্বর তরুণ গ্রামবাসীদের হৃদয়েও নাড়া দিল। আর তার পপি গাছের মত লাল ঠোঁট দুটির অস্ফুট সাময়িক হাসি, কখনও কৃত্রিম কিন্তু স্বভাবতঃই ম্লান, নিঃসন্দেহে তাদের আকর্ষণ করল। তবে দর্শক বেশী হয় নি।

পাকা বাজিয়ের মত বাজনা বাজাতে বাজাতে এবং বেচারা ভায়লেটকে নির্জন মাঠের মাঝে একাকী নাচতে দেখে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনকে দুঃখভারে পীড়িত করল।

আমাদের বুড়োটা শেষ কয়েক মিনিট ভীষণ জোরের সঙ্গে ঢাকটা পিটে হঠাৎ কাঠি দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং

একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে ক্লান্তস্বরে ভায়লেটকে বল্লে 'এই জিরিয়ে নাও বাছা।' নর্তকী ছুটে গিয়ে তার বাবার পাশে বসল এবং তার সমস্ত মুখমণ্ডলে আগের মত বিষাদের সেই ভাবহীন হাসি জেগে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা সমস্ত যন্ত্রগুলো বেঁধে ফেলে অন্য একটা গ্রামের দিকে রওনা হলাম। তখন দুপুর হয়েছে। রাস্তায় লোকের ভিড় চলেছে, তাদের মাথা দুলছে; তাদের ঝুড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে বসান, পিঠে পুঁটুলি এবং পিছনে লম্বা জিব নাড়তে নাড়তে কুকুর ছুটছে। তাদের পীতাভ কপোলে সূর্যকিরণ পড়াতে স্বেদবিন্দু চক্‌চক্ করে উঠল এবং পরে তা গালের খাঁজ বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা আমি এখন বুঝতে পারলাম। তবু সঠিক জানবার জন্য একজন বুড়োকে থামালাম।

'জাপানীরা আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে', সে বল্লে। 'একটা বড় লোহার ঈগল পাখী আজ সকালে আমাদের গ্রামে একটা ডিম ফেলেছে। সেটা ফেটে গিয়ে পঁচিশজন লোককে মেরেছে, তার মধ্যে ছজন শিশু ও তিনজন মেয়েছেলেও আছে।'

'আশ্চর্য দুনিয়া।' আমাদের বুড়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে। 'আমি গত চার বছর ধরে এই সব বিভীষিকার কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছি, কিন্তু কোথাও শান্তি মিলছে না।' পরে সে তার মেয়েদের দিকে ফিরে বল্লে, 'তোমাদের জন্য আর কি করতে পারি, বল বাছা? আমার হাড় জর্জরিত হচ্ছে আর এদিকে তোমাদের বয়সও বাড়ছে।'

মেয়ে দুটী জবাব দিল না। তারা দুজনেই মাথা নীচু করে রইল। আমরাও এগিয়ে চললাম। আর একটা গ্রামে এসে পৌছলাম। এটা একেবারে জনশূন্য। তৃতীয় একটা গ্রামে এলাম। সেটাও পরিত্যক্ত। কিছু রোজগার করতে পারি নি ব'লে সেদিন আমাদের কিছুই খাওয়া হয় নি। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং আমাদের পা-ও অবশ হয়ে যেতে লাগল।

'চল, কাল আমরা যেখানে ছিলাম সেই মন্দিরে ফিরে যাই', অবশেষে বুড়ো বল্লে। 'পালাবার চেষ্টা করে কোনও ফল হবে না। আমিও বিশেষ পরিশ্রান্ত হয়েছি।'

সুতরাং আমরা তার পিছনে পিছনে চললাম। মন্দিরে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন আর আমাদের দাঁড়াবার শক্তি রইল না। মেয়ে দুটী ঘাসের গাদায় বসল, আমি তাদের পাশে দেওয়াল ঘেসে এলিয়ে পড়লাম এবং বুড়ো আমাদের বিপরীত দিকে বসল। আমাদের কথা বলবার ক্ষমতাও লোপ পেল। যেন জিবগুলো পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। তবুও আমি সেই মেয়ে দুটির নিরীহ চোখে এমন কিছু দেখতে পেলাম যা অসহায়, মিনতিপূর্ণ, দুঃখে ভরা এবং যা কথার চেয়েও বেশী ব্যক্ত। তাদের চাহনি বুড়োর ওপর নিবদ্ধ, সে কেবল পাগলের মত টাকপড়া মাথা চুলকাচ্ছে এবং তুরস্কের স্নানাগারের মানুষের মত ঘামে নেয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল এবং বল্লে:

'আমাদের খাওয়ার কিছু চাই-ই। আমি জমিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করার চেষ্টা করি।' সে ভায়লেটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তাকে খারাপ লোক বলে মনে হয় না। যখন সে তোমাকে দত্তক নেবে বলেছিল আমার মনে হয় তখন তার ইচ্ছাও সেই রকম ছিল।'

বাতাসে ছায়ার মত সে বেরিয়ে গেল। বাস্তবিকই তাকে খুব ক্লান্ত মনে হল এবং একদিনের মধ্যে তার বয়সও বেশী হয়েছে। কিন্তু আর কেইবা একাজ করবে? এই প্রথম আমি বুঝলাম যে আমরা কত অসহায়।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে সে ছোট্ট এক থলি চাল নিয়ে ফিরল। আমরা সকলেই উৎফুল্ল হলাম। আমি ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে খাবারটা নিলাম যা এখন সত্যই সোনার মত মূল্যবান মনে হল। লিং তাকে ধরে ঘাসের ওপর বসাল, ভায়লেট আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগল এবং তার কপাল থেকে ধোঁয়া উঠে যেন শরৎকালের জলাভূমি থেকে কুয়াশার মেঘ কেটে গেল। কিন্তু বুড়ো ব্যক্তিকে খুব খুসী দেখাল না। সে কপাল কুঁচকে বল্লে:

'বস বাছা!' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভায়লেটের দিকে তাকাল এবং তাকে বল্লে:

'ভায়লেট! আমি তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। খারাপ কিছু নয়, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হল বলে দুঃখ হচ্ছে।

'কি বলছ তুমি, বাবা?' ভায়লেটের চোখে চঞ্চল দৃষ্টি।

'যে জমিদার আমাকে চাল দিল সে বলেছে—তুমি বুঝতে পারছ আমি কার কথা বলছি—তোমাকে তার খুব ভাল লাগে। কিন্তু সে বল্লে যে এখন তোমাকে দত্তক নেবে না, কেন না তোমাকে পাঠাবার মত কোন স্কুল এখন নেই। সে তোমাকে বিয়ে করবে এবং তোমার জীবন যাতে সুখের হয় তার সমস্ত চেষ্টা করবে।'

'তুমি কি তাকে কথা দিয়ে ফেলেছ?' ভায়লেট জিজ্ঞাসা করল—তার কণ্ঠস্বর তার চোখের মতই গম্ভীর।

'নিশ্চয়ই।'

'বাবা! আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই।'

'দূর বোকা!' বাবা অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বরে বললে। কিন্তু ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আবার ধীরভাবে আরম্ভ করল, 'জানি সে তোমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কিন্তু বাছা আমার সঙ্গে এই ভাবে বেঁচে থাকার কথা একবার ভেবে দেখ। তুমি তোমার যৌবনকে হারিয়ে ফেলছ। আমিও তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এজীবনে আর অবস্থার উন্নতি করতে পারব না। হাজার হোক সে বড় লোক। তার কাছে তোমার কোন কষ্টই হবে না। তোমার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে এবং লেখাপড়া শিখবে। আর দেখ আমি তোমার জন্য কিই বা করতে পেরেছি একটা ভবঘুরের মেয়ের মত পালন করা ছাড়া।' এবার তার বৃদ্ধ বয়সের স্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে গেল। ভায়লেট তার মাথা নামিয়ে মমীর মত স্থির হয়ে বসে রইল। বাইরে একটা ছোট ঝড় বয়ে গেল, তার একটা শব্দও হল। বুড়ো বাপ তার মাথা তুলে ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে, 'জমিদার তোমার জন্য লোক পাঠাচ্ছে। শত্রুও কাছাকাছি এসে গেল বাছা। নষ্ট করবার সময় নেই। জমিদার শীঘ্রই একটা শান্তিপূর্ণ এলাকায় সরে যাচ্ছে। বোকামি ক'রো না। যাবার জন্য তৈরী হয়ে নাও।'

দরজার কাছে একটা ডুলি এল—বেশ কাজ-করা ঝালর দেওয়া লাল ডুলি। কিন্তু সেটা বিয়ের ডুলি নয়। দ্বিতীয় পত্নীর জন্য লোকেরা ডুলি পাঠায় না। একটা তুষ্টু গোছের যুবক দুজন বাহক নিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই লোকটা জমিদারের নায়েব। ডুলি বাহকেরা শক্তিমান পুরুষ, তাদের কোমর পর্যন্ত দেহ অনাবৃত এবং হাতের পেশীগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে। মনে হল তারা যেন কাউকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে।

বুড়ো নড়লও না কিম্বা বদমাইশ নায়েবকে অভিবাদনও জানাল না। সে মূঢ়ের মত নীরব হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বল্লে, 'ভায়লেট, যদি সত্যিই তুমি আমার স্নেহের সন্তান হও, তবে শোন। এই ডুলিতে গিয়ে ওঠ। আমি তোমার বাপ, তোমাকে এই জগতে আসতে দেখেছি এবং বড় হতেও দেখেছি। আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আশীর্বাদ করি তুমি জমিদারের জন্য একটা ভাল ছেলে ধারণ কর।'

ভায়লেট কোনও কথা কইল না। সম্মোহিতের মত উঠে গিয়ে ডুলিতে বসল। বদমাইশ নায়েব ডুলির দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং শক্তিমান বাহক দুজন সেটাকে একটা সাধারণ বোঝার মত কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার হয়ে এল। পশ্চিম দিগন্তে একটা অসম্পূর্ণ রামধনু দেখা গেল। নিশ্চয়ই কোথাও ঝড় হয়ে গেছে। কেন না বাতাসটা ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। মেপ্‌ল গাছের পাতাগুলো আধা গান ও আধা নালিশের সুরে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ একটি ভীষণ কান্নার রব উঠল। এ যেন এড়ো রাস্তায় মা-হারা শিশুর কান্না, বাতাস বিদীর্ণ ক'রে দেয়। এর আর

তার চোখের পাতা ভয়ে কাঁপছে, যেন সে গোপনে কাঁদছে। সুতরাং আমি কথা বলতে সাহস করলাম না। স্প্রিংও পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি বিদায় না জানিয়ে চলে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্তু যখন আমি ফিরতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ মেয়েটা চোখ মেলল—একজোড়া বিষণ্ণ চোখ, অশ্রুভরা এবং যা দিনের আলোককে প্রতিফলিত করছে।

'তা হলে তুমি চললে?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'শোন! অবশেষে কাল রাত্রিতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'ভাল স্বপ্ন ত?' আমি তার মনে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ, ভাল।' তার বিষণ্ণ মুখে জোর করে হাসি টেনে সে বল্লে 'আমি স্বপ্ন দেখলাম যে ভায়লেটের সঙ্গে একটা সুন্দর যুবক ছাত্রের বিয়ে হয়েছে এবং সে এখন গান লিখতে পড়তে পারে……।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আশা করি তাই সত্য হোক, কিন্তু একটা অনাদি শক্তি আমার জিভটা টেনে ধরল। আমি মূঢ়ের মত মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম কথা না বলে।

'তা হলে বিদায়!' অবশেষে সে আমাকে বল্লে। কিন্তু তার চাহনি ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে এমন কিছু বলতে চাইল যা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি তাকে তার বাবার কাছে ফেলে রেখে ফিরলাম।

অনেকক্ষণ ধরে তার দৃষ্টির অর্থ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। এখন কেবল মনে হচ্ছে আমি তা বুঝতে পেরেছি।

অখণ্ডের মোহ

রেণু মিত্র

ভারতবর্ষ একের উপাসক, অখণ্ডের উপাসক। অদ্বৈতবাদ আমাদের রক্তের মধ্যে, আমাদের সর্বত্র—আমাদের ব্রহ্ম বা ভগবানের ধারনায় আমরা অদ্বৈতবাদী বা অখণ্ডের উপাসক, আমাদের পরিবারে আমরা অদ্বৈতবাদী একান্নবর্তী। আমাদের এই মনোবৃত্তিই আমাদিগকে রাষ্ট্রক্ষেত্রেও অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরণা দেয়। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই অখণ্ড সাম্রাজ্য ছিল। সুবিস্তীর্ণ ভারতের বিভিন্ন অংশ নিজেদের সকল শক্তি অর্পণ করিয়া ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই সকল অংশভাগকে একের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ঐ একেরই গৌরব বাড়নোতে আমরা চিরদিন অভ্যস্ত। তাই আমাদের ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বহু জাতি, বহু ভাষা ও বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা থাকিলেও আমাদের মধ্যেকার একটি ঐক্যের সুর, অখণ্ডের সুর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বাজে, সেইখানে আমরা মিলি। আর সেই ঐক্যের মধ্যেই, সেই অখণ্ডের টানে পড়িয়াই ভারতবর্ষের দুয়ারে আগত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন কৃষ্টি হজম হইয়া যায়। তাই তো কবি বলিতে পারেন :

> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
> শক হুন দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

এই একান্নবর্তী, অখণ্ড থাকিবার আগ্রহের ফলেই মুসলমানকে আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক করিয়া দেখিতে চাহিয়াছি, উহাদের উৎপীড়ন নিপীড়ন সত্ত্বেও পৃথক হইবার কথা ভাবিতে পারি নাই। তাই আমরা প্রাণপণে পাকিস্থানী দাবিকে ঠেকাইয়া আসিয়াছি। আজও মহাত্মা গান্ধী কোনরকম বিভাগের বিশেষ ভাবেই বিপক্ষে।

তথাপি গণচেতনার বক্ষ ভেদ করিয়া আজ বঙ্গবিভাগ ও পাঞ্জাববিভাগের এ নিবিড় ক্রন্দন কেন উঠিয়াছে? কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রস্তাব এত শক্তিশালী হইয়া পড়িতে পারিয়াছে? ইহার লৌকিক কারণ স্পষ্ট। একত্র থাকিতে, অখণ্ড থাকিতে প্রাণ চায়। কিন্তু একত্র থাকিতে যাইয়া যেখানে প্রাণেই মরিতে হয়, অস্তিত্ব রক্ষা, কৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেখানে নিজের প্রাণ, নিজের সংস্কৃতি, সব কিছু বিসর্জন দিয়া শুধু অখণ্ডই থাকিতে হইবে, একত্রই থাকিতে হইবে এই একত্বের মোহ কেন? আমি চাই সকলের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে, অথচ আমার ভাই তাহা চায় না, সে গায়ের জোরে বলিবে সে আমার সঙ্গেও থাকিবে না, অপর সকলের সঙ্গেও যুক্ত হইবে না। স্পষ্ট বুঝিতেছি, ইহাতে তাহার ও আমার উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি। তখনও ভাইকে পরিত্যাগ করিতে নাই, ঐক্যই সত্য, বিভক্ততাই মৃত্যু—এই অজুহাতে কি আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর মঙ্গলকে বিসর্জন দিব? আমরা পরিষ্কার বুঝিতেছি ভারতীয় অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের পক্ষে সকল দিক দিয়াই মঙ্গল। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা ও তাহাদের প্রগতিশালী করিয়া তোলার পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন আজ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু মুসলীম লীগ ও নির্বিকার মৌন থাকিয়া সমগ্র মুসলমান সমাজই যদি তাহাতে বাধা দেয়, সে যদি কোনমতেই সেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে না চায়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তখনও যদি ঐক্যের দোহাই অখণ্ডতার দোহাই আমাদিগকে সম্মুখে চলিতে বাধা দেয়,

হবে সে ঐক্য, সে অখণ্ডতার বোধ মোহ। এ মোহ আমাদিগকে কল্যাণ আনিয়া দিতে পারিবে না। তাই তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ঐক্যের দোহাইয়ে, অখণ্ড ভারতবর্ষের দোহাইয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তাহাদের সহিত মিলিত করিবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যোগ্য করিয়া না তুলিয়া কেবল সুযোগসুবিধা দিলে তাহা ক্লৈব্যেরই প্রশ্রয় দেয়। তাহাকে পথে উঠিবার জন্য কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া অপরিহার্য। তাহা দেওয়া হইয়াছেও, কিন্তু এইবার পথচলার ঐ ধারা শেষ করিবার দিন আসিয়াছে।

জীবন্ত যন্ত্রের, যেমন দেহের, বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার কোনও একটি অঙ্গ বা অঙ্গাংশ অসুস্থ হইলে অপর সুস্থ অঙ্গ বা অঙ্গাংশগুলির একটা স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে তাহাকে সুস্থ করিয়া লওয়ার। কেননা দেহযন্ত্রটি একটি সমগ্র (whole) বস্তু। উহার এক প্রান্তে নখের কোণে তীব্র আঘাত লাগিলে যেমন সমস্ত দেহই পীড়িত হয়, সমস্ত দেহেই জ্বর আসে, তেমনিই সুস্থ অঙ্গগুলির মধ্যে অসুস্থকে সুস্থ করিয়া লওয়ারও একটি স্বভাবগত প্রেরণা ও চেষ্টা থাকে। কংগ্রেস পরিকল্পিত সমাজদেহ ও তথা রাষ্ট্রদেহও এমনি জীবন্ত যন্ত্র। আজ সেই জীবন্ত অখণ্ড রাষ্ট্র-ও সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত হইতে চাহিয়া মুসলীম লীগ যে অসুস্থতার পরিচয় দিতেছে, আমরা প্রদেশাংশ যদি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সুস্থ থাকি, শক্তিশালী ও যোগ্যতর হইয়া উঠি, তবে আমাদের সেই সুস্থতার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া লইবার স্বাভাবিক প্রেরণাটি জাগিয়া উঠিয়া অদূর ভবিষ্যতে ঐ অসুস্থতাকে নিরাময় করিয়া লইবে।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। আজ পূর্ববঙ্গকে শক্তির দম্ভে উন্মত্ত একদল বাতুলের কাছে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল। মুসলীম লীগ একদিন তাহার যে পরিচয় দিয়াছে রাতারাতি তাহা নিশ্চয়ই বদলাইতে পারিবে না। বহু নারীর মান, বহু মানুষের প্রাণ এবং বহু ধনসম্পদ হয়তো বিনষ্ট হইবে। তথাপি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়েরই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বর্তমান আবেষ্টন বিচার করিলে বঙ্গবিভাগ ছাড়া উৎকৃষ্টতর পন্থা আজ আর নাই। তারপরে একদিন একাংশ সুস্থতা দ্বারা পূর্ববঙ্গেরও এই বিভক্ত হইয়া থাকার অসুস্থতা নিরাময় করিয়া লইবে—একাঙ্গ সুস্থ হইলেই অপরাঙ্গ সুস্থ হইতে পারে। ইহা ছাড়া আজ আর কোন উপায়ই নাই। পৃথক হইয়া পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হইয়া বাংলার জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী না করা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গকে কোন সাহায্যই করা যাইতেছে না, যাইবেও না। যাহার নিজের কণ্ঠাগত প্রাণে তৃষ্ণার জল দিবার ক্ষমতা নাই, অপরকে সাহায্য করিবার, অপরের মরণ দূর করিবার শক্তি তাহার কোথায়? পূর্ববঙ্গ এই ব্যবস্থাতে ভীত হইয়া মুশড়াইয়া না পড়িয়া সংঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণকে প্রতিহত করিবার বল সঞ্চয় করুক। পূর্ব ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি গণপরিষদে যোগ দিতেছে, আসাম গণপরিষদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পূর্ববঙ্গের নিরাশ হইবার কারণ নাই। পৃথক না হওয়া পর্যন্ত যুক্ত থাকিবার প্রয়োজনীত বোধ ইসলামিক কালচার রিভাইভ্যালের উষ্ণ মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠিবে না। তাই অপরিহার্য অসুবিধা জীবন-মরণ পণ করিয়াই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু এই পৃথক হওয়ার পশ্চাতে একটি অখণ্ডের বোধ, একটি ঐক্যের তৃষ্ণা আমাদিগকে ক্রমাগতই বাধা দিতে পারে। সাধারণতঃ যাহারা আজ বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের সে প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই। তথাপি এতদিন পর্যন্ত যে অখণ্ডতাকে আমরা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, আজ সেই অখণ্ডতার মোহ আমাদের অন্তরেও প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতে চাহিবে, আমাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে চাহিবে। যাহাকে বাস্তব প্রয়োজনের জোর

যতই সে নিজেকে যোগ্যতর করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে, এবং সেইসঙ্গে যতই সে স্থানীয় আবেষ্টনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অর্থাৎ সকলের প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রীতিসম্পন্ন হইয়া সকলকে প্রতিবেশী করিয়া লইয়া যতই নিজের শক্তিকে গুছাইয়া স্বচ্ছন্দে তাহা প্রয়োগ করিয়া যাইতে পারিবে ততই পৃথক একটি কেন্দ্রের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া আসিবে, তাহার প্রয়োজন মন্দীভূত হইয়া পড়িবে। প্রদেশগুলির এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই একদিন কেন্দ্রের সমস্ত ক্ষমতাই প্রদেশগুলির মধ্যে নামিয়া আসিবে, কেন্দ্রের অস্তিত্ব একেবারেই থাকিবে না।

তবে কি কেন্দ্র একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে? তবে কি খণ্ডের সত্য পর্যন্তই শেষ কথা? অখণ্ডের বা কেন্দ্রের তবে কি কোন প্রয়োজনই নাই? খণ্ডের বা অংশের সত্য পর্যন্ত স্বীকার করিলে পারস্পরিক হানাহানির অন্তহীন প্রসঙ্গকে কিভাবে ঠেকান যাইবে? এক প্রদেশ অপর প্রদেশের উপর অকারণ চড়াও করিলে কে তাহা ঠেকাইবে? প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার তখনই সত্য ও বাস্তব, যখন প্রতি প্রদেশ অন্য সকল প্রদেশের সহিত মিলিত হইতে পারে—ইহা ছাড়া বিচ্ছিন্ন প্রদেশের অধিকারের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি বাস্তব নয়। কিন্তু এমন কি কোনদিন হইবে যে প্রতি মানুষ বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছে, প্রতি প্রদেশ অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়াছে, কেহ বাদ পড়ে নাই? এমন কি কোনদিন হইবে যে প্রতি মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়া পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের মূল্যের পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে সক্ষম হইয়াছে? এখন হইতেই মানুষ চেষ্টা করিবে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রতি প্রদেশের আদর্শও তাহাই। তবু বাস্তবের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ইহা কোনদিন সম্ভব হইবে না। তাই অখণ্ডের স্থান, কেন্দ্রের স্থান রহিয়াই যাইবে। বাস্তবে যেমন ব্যক্তি, তেমনি প্রদেশও এখনও সর্বাঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তাই আজও কেন্দ্রকে স্বীকার করিতেই হইবে। যতটা সম্ভব ক্ষমতা আজ প্রদেশগুলি পাইবে বটে, আবার একসময়ে প্রয়োজন হইলে তাহাদের ক্ষমতা কেন্দ্রে প্রত্যার্পণও করিতে পারিবে—এমন নমনধর্মশীলতা থাকিলেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি স্বাধিকারসম্পন্ন—autonomous—হওয়ার ফলে কোন প্রদেশ কোনদিন এই মূল তত্ত্বকে অস্বীকার করে, যদি সে নিজের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবেশী অথবা অপর সকল প্রদেশেরই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের মর্যাদাকে রক্ষা করিতে না পারে, পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইতে না পারে, তবে সেদিন কাহারও একার শক্তিতে ঐ আক্রমণকে বাধা দেওয়া সম্ভব না হইতে পারে। তখন সমস্ত প্রদেশগুলি তাহাদের ক্ষমতা কেন্দ্রে অর্পণ করিয়া কেন্দ্র হইতেই ঐ আক্রমণকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

বাংলা autonomous হইতে চায়, কিন্তু autonomyর ধর্ম পালন করিতে সে রাজী নয়! সে কেন্দ্রকে স্বীকার করিবে না, অথণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইবে না, আবার প্রতিবেশী বা অপরাপর প্রদেশগুলির সঙ্গে তাহাদের মর্যাদা দিয়া পারস্পরিক প্রীতির মধ্যে হাত ধরিয়াও চলিবে না। অথচ সে বাঁচিতে চায়। ইহা যে একেবারেই অসম্ভব, খণ্ড ও অখণ্ডের, কেন্দ্র বা প্রদেশের কি বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক কোন তত্ত্বই জানা না থাকার জন্য ইহা সে আজ বুঝিতে পারিতেছে না। সে জানে না যে খণ্ড বা প্রদেশ যদি কেন্দ্রানুগ না থাকে, তবে অপরিহার্যভাবে তাহাকে অপরাপরের হাত ধরিয়া পারস্পরিক সদ্ভাবের মধ্যে দাঁড়াইতেই হইবে। কোন একটি অবস্থাই স্বীকার না করিয়া যে সে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না, এ সত্যদর্শন তাহার আজও ঘটে নাই। সে কি তাহার সাময়িক সুবিধার গর্বে স্ফীত হইয়া অপরকে আত্মসাৎ করিবার, তাহাকে নিপীড়ন করিয়া তাহারই ধনে ধনী হইবার সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? কিন্তু এমন ভাবে অস্তিত্বরক্ষার অর্থহীন অবাস্তব চেষ্টা বাস্তবের

গ্রামের নিজস্ব পোষ্ট আফিস আছে। একটা পাকা দালান ও বড়ো কম্পাউণ্ডে অবস্থিত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গত যুদ্ধের সময় এখানে গবর্ণমেণ্ট কতগুলো 'এমারজেন্সি বেড্'ও খুলেছিলেন। গ্রামের নিজস্ব বাজার তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের সীমান্তে প্রায় গ্রামসংলগ্ন ঘোড়দৌড়ের বড়ো বাজার রয়েছে, এবং তা থেকে আর আধ মাইলটাক এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় ব্যবসাবাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র বিখ্যাত দীঘলির গঞ্জ। ঘোড়দৌড় এবং দীঘলির সুবিধে কনকসারের লোকেরা স্বভাবতঃই পেয়ে থাকে। তারপাশা ষ্টেশনও দীঘলির কাছাকাছিই। সুতরাং কনকসারের অধিবাসীদের বিদেশ যাতায়াতের পক্ষে বেশ সুবিধেই রয়েছে বলতে হবে। যেমন সারা বিক্রমপুরের তেমনি এই গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোই, পদ্মার প্রাণপ্রদ হাওয়ার এলাকার মধ্যেই সারাটা পরগণা কিনা। এ গ্রাম থেকে একাধিক জজ, অধ্যাপক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সংবাদপত্র সম্পাদক, বড় উকিল, ডাক্তার ও বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন। জীবিতদের মধ্যেও ওরূপ অনেক আছেন, তবে তাঁরা সাধারণতঃ বিদেশে থাকেন।

একটা গ্রামের পক্ষে বর্ধিষ্ণু ও সুখী হতে হলে যা যা সাধারণতঃ থাকা দরকার, ওপরকার বর্ণনা থেকে মনে হবে, কনকসার গ্রামের তার অনেকগুলিই আছে। কিন্তু এই মোটের ওপর সুন্দর খোলসটার অন্তরালে আসলে বর্তমানে কি ঘটছে, তাও খুঁজে দেখা দরকার, বুঝে দেখা দরকার। বর্তমান লীগ গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট বহুবিধ দুর্নীতি, দুর্ভোগ ও বিপর্যয়ের দায়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলকেই ভুগতে হয়েছে অনেক বেশি। তারপর এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, একটা সর্বধ্বংসী ঝড়ো হাওয়া বিশেষ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল, পোকা-মাকড়ের মত মানুষ মরল লাখে লাখে। যারা বেঁচে রইল, গবর্ণমেণ্টের 'ক্রনিক' অব্যবস্থা, পারহীন দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা এবং তারই সুযোগে দেশী চোরাবাজারী বড়োলোকদের সীমাহীন মুনাফা-মৃগয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারাও দ্রুত মৃত্যুপথের দিকেই এগোতে লাগল। কনকসার গ্রামের ক্ষেত্রেও স্বভাবতঃই অনুরূপ ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের ক'মাস কনকসারের খাল দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজ অগুণতি মানুষের মৃতদেহ ভেসে গেছে, জল তীব্র-পূতিগন্ধ হয়ে গেছল। সেই মন্বন্তরের ধাক্কায় কনকসার ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোর হিন্দুমুসলমান কিষাণ, জোলা তাঁতী কামার কুমোর জেলে ছুতোর প্রভৃতি বিভিন্ন সাধারণ বৃত্তিজীবি সম্প্রদায় ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কতো যে মরল, সহায়-সম্বলহীন হয়ে মেয়েদের ও শিশুদের বিশেষ করে সে যে অবর্ণনীয় রকমের দুর্দশা হ'ল, তার কাহিনী প্রতিবেশীদের কাছে থেকে শুনে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু সেবারের যারা বেঁচে গেল, তাদেরই বা বর্তমান অবস্থা কি? দুর্ভিক্ষের জের এবং যুদ্ধোত্তর ও বাংলার লীগ সরকারসৃষ্ট বহুবিধ দুর্গতির জন্য গত ক'বছর ধরে সাধারণ লোকের আয়ের পথ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, অথচ জিনিষপত্রের দাম ক্রমেই চড়ছে। সারাটা দেশের সঙ্গে কনকসারের জনসাধারণও তাই কষ্ট পাচ্ছে খুবই। যেমন বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রামে, তেমনি এ গ্রামে উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্নদের অনেকেই থাকেন বিদেশে চাকুরীব্যপদেশে। পূজোয় বা গরমের ছুটীতে এক আধবার মাত্র তারা বাড়ী আসেন,—তাও সবাই সব বছর নয়। সাধারণ সময়েও তাঁরা গাঁয়ের লোকের সুখ দুঃখের খোঁজখবর খুব কমই নিয়ে থাকেন। বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় তো আরো নেন না, যদিও গরীব গ্রামবাসিদের পরামর্শ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজন আজই সব চেয়ে জরুরী ছিল।

গড়পড়তা বেশির ভাগ লোকেরই আয় অত্যন্ত কমে যাওয়াতে (অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায়) কনকসারের সবকটা স্কুলেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে। শুধু মাষ্টারীর আয়ে সংসার চলে না দেখে মাষ্টারমশায়দের প্রায় প্রত্যেকেই আরো হরেকরকমের কাজ করেন নানাবিধ খুচরো আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য। তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না, কিন্তু ঐ কারণেই আবার স্কুলে পড়ানো ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই

[illegible]

[এই বিভাগে আমরা সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা সম্বন্ধে চিঠিপত্র আহ্বান করছি। চিঠিপত্র সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দরকার হ'লে সম্পাদক যে কোন চিঠি ছোট করতে পারবেন। চিঠিতে লেখক লেখিকারা তাঁদের নাম ঠিকানা দিয়ে দেবেন। চিঠির প্রকাশকালে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও। চিঠির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।—সম্পাদক]

মেয়েদের চাকুরী করা কি ভাল ?

'বর্ধমান' সম্পাদক সমীপেষু,

মেয়েদের চাকুরী করার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন। প্রতিভা মিত্র-মহোদয়া এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দান করিবেন এই আশাই করিয়াছিলাম, কিন্তু লেখিকার পত্র পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছি। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে 'মেয়েদের চাকুরী ক'রতে যাওয়াটা খারাপ না হ'তে পারে' 'অনেক ক্ষেত্রে তা জরুরী দরকারও হতে পারে' কিন্তু তাঁর আশঙ্কা আছে যে 'চাকুরীতে বেরিয়ে মেয়েরা 'মেয়েত্ব' হারিয়ে ফেলে' ইত্যাদি। 'বেদনার সঙ্গে' তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠার কারণ যতদূর আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় পত্র-লেখিকা নিজে চাকুরী করেন না। গৃহস্থ সংসারে আত্মীয়-স্বজন-সর্বস্ব পরিবেশের মধ্যে তাঁহার যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে উপার্জনশীলা মেয়েরা স্বনির্ভরতার ফলে যে আত্মপ্রত্যয় লাভ করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অসহ। এই জন্যই তিনি ভাবিয়াছেন যে, চাকুরী করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা 'মেয়েত্ব' হারাইয়া ফেলে। বাঙালী সমাজে মেয়েদের যে অবস্থা, তাহা যে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে নাই তাহা স্বীকার করা কষ্টদায়ক হইলেও সত্য। বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিশেষ মূর্তির মোহ জাগাইয়া মেয়েদের মনুষ্যত্বকে অমর্যাদা করার অধিকার পুরুষ যতটা জোর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা জড় অসহায়তার ফলে নারী তাহার অনেক বেশী মানিয়া লইয়াছে। এই মনোভাবই পত্র-লেখিকার অমূলক আশঙ্কা জাগাইয়াছে। প্রতিভা মিত্র মহোদয়ার জানা উচিত যে অর্থনৈতিক অধীনতায় পুরুষ বা নারী যে কেহই আবদ্ধ হোন্ তাঁর মনুষ্যত্বের বিকাশ লাভ ঘটাই অসম্ভব, সুতরাং সেই অবস্থায় নারী বা পুরুষের বিশেষ ব্যক্তিত্বের কথা ভাবাই চলে না। কাহাকেও সহ্য করিতে না পারার মত সঙ্কীর্ণতা সেই অবস্থায় জন্মায় এবং এই জন্যই তিনি আতঙ্কগ্রস্তা হইয়াছেন যে, চাকুরী করার ফলে সংসারের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া যায়।

আমরা জানি, এ সময়ে মেয়েদের চাকুরী করার বহু বাধা ও অসুবিধা আছে। প্রধান বাধা আসে আমাদের সমাজের নায়ক পুরুষদের অসৌজন্য ও অসহনশীলতার জন্য। এতে মেয়েরা অসুবিধায় পড়েন বটে কিন্তু তাঁরা দায়ী নহেন। আর যে বাধা আসে তা মেয়েদের প্রথম প্রচেষ্টার জড়তার ফলে। তাহাও ক্রমশ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু মেয়েদের আর্থিক পরনির্ভরতা দূর করার জন্য মেয়েরাই যদি চাকুরী করা ভাল নয় বলেন, তবে আমাদের কি যে হইবে, তাহা ভাবিতেও ভয় পাই। প্রতিভা মিত্রের ন্যায় মহীয়সী মহিলাদের মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিবার জন্য আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, আর তাঁদের এই আশ্বাস দিই যে, তাঁহাদের সমস্ত আশঙ্কা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া যে সব মেয়েরা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবেন তাঁহারাই শুধু সংসার শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া পর্যুদস্ত বাঙালী জীবনে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন।

দমদম
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

ইতি—
অসীমা সুর

২

'বর্ত্তমান'-সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

প্রতিভা মিত্র মহোদয়া আপনাদের বৈশাখ সংখ্যার 'বর্তমানে' মেয়েদের চাকুরী করা ভাল কি না এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এখন কয়েকজন মেয়ে চাকুরী করে বটে কিন্তু এ প্রশ্ন সমস্যার মত জটিলতা পাকাইবার অবস্থায় আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। চাকুরী করা মেয়েদের পক্ষে ভালো স্বীকার করিতে পত্র-লেখিকারও আপত্তি নাই, কিন্তু মেয়েদের নিজের ব্যক্তিত্ব গঠনে চাকুরী করা বাধাস্বরূপ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার আপত্তি। কিন্তু মেয়েদের চাকুরী করার মত অনুকূল অবস্থা যে নাই, এবং তার জন্য মেয়েরা যে মোটেই দায়ী নহেন, এ প্রসঙ্গটি তিনি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন।

আমি নিজে চাকুরী করি। গৃহ-সংসার আমার অন্য কোন মেয়ে অপেক্ষা ত' কম নহেই, বরঞ্চ বেশী। আমাদের সংসারে সুখ ও সংহতি বৃদ্ধির কোন বাধাই তাতে হয় নাই। বরঞ্চ বাঁচিয়া থাকিবার সামান্য প্রয়োজন সংগ্রহে স্বামী ও দেবর ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, আমি এখন তাঁহাদের কিছুটা উপশম করিতে পারিয়াছি। দম্ভের কথা আমি ভাবিতেই সময় পাই না। সংসারে খুঁটিনাটি কাজ আজও আমি করি। আগেও সকলের কাছে যেমন পাইতাম, এখনও তেমনি সাহায্য পাই, বরঞ্চ আগে দয়ার পাত্রী হিসাবে সাহায্য পাইতাম, এখন পাই সহযোগিতার সূত্রে। নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দুর সংসারে দুবেলা খাওয়া জুটাইতে যখন বর্তমানে পুরুষরা অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন, তখন মেয়েদের চাকুরী করার মধ্যে সাংসারিক শান্তি সুখ নষ্ট হইতে পারে, একথা কেমন করিয়া মিত্র মহোদয়ার মনে আসিল তাহাই ভাবিতেছি। আমাদের মত সংসারে আদর্শ সুখ শান্তি ও নারী-জীবন আগে হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে এই কথা তিনি ধরিয়া লইয়াছেন এবং যে কয়জন মেয়েরা চাকুরী করিতে সুরু করিয়াছে তাহারাই ইহা ভাঙ্গিতে চলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। যাঁহারা অভাবের তাড়নায় চাকুরী করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা চাকুরী না করিয়াও দাম্ভিকা, ও নারীত্বের মর্য্যাদা অক্ষয় রাখিতে তাঁহারা সব সময় যে যত্নশীলা তাহাও মনে হয় না। অভাব দূর করিতে যাঁহারা চাকুরী করিতে যান তাঁহারাও যে স্বচ্ছন্দ কাজকর্মে বাধা পান, তাহার প্রতীকারের পন্থা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেই আমি সুখী হইতাম।

একে তো বাহিরের জীবন বাঙালী মেয়েদের অনভ্যস্ত। সে ত্রুটি কিছু দিনে কাটিবে। কিন্তু পুরুষ সমাজের বিরাট অংশের মধ্যেই নিপীড়নের ফলস্বরূপ যে ক্লিন্ন দীন মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে মেয়েরা ট্রামে, বাসে বা পথে বাহির হইতেই সঙ্কোচ বোধ করেন এবং অনেক ব্যাপার সহ্য করেন যা কোন সভ্য-সমাজ বরদাস্ত করে না। এই অবস্থায় মেয়েদের চাকুরী করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে নারী পুরুষ সকলের সহযোগিতাই প্রয়োজন। নচেৎ যে আর্থিক দুর্গতি বাঙালী সমাজের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই।

কলিকাতা ইতি—

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ কনক বসু

শিক্ষক হওয়া কি অপরাধ?

(১)

'বর্তমান-সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের 'পত্রলেখা'য় বেশ ভালভাবেই বলেছেন। সত্যি, প্রাথমিক শিক্ষক অনেক-ক্ষেত্রে বেয়ারা পিয়নের চেয়ে কম বেতন পান। তাঁদের অনেক দুর্ভোগ যে আছে, তা সাম্প্রতিক ধর্মঘটের প্রচেষ্টায় বোঝা গেছে। তবে শিক্ষকদের দাবিটা শুধু তুলনা ক'রে মাইনে বাড়ানোর মধ্যেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এসব প্রসঙ্গ না

আমাই ভালো। কেন না, তা হ'লে সত্যিই শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে হতাশ হ'তেই হয়। আমি বলছিনা, যে এর জন্য শিক্ষকরাই দায়ী। তাঁদের অর্থাভাব অনেক সময় তাঁদের যোগ্যতা বজায় রাখতে দেয় না। সেইজন্যই ত তাঁদের উচিত জীবনধারণের মত পারিশ্রমিকের জন্য আন্দোলন করা। তা নয় তো তুলনা ক'রতে গেলেই, লোকে প্রশ্ন করবে, বেসরকারী কলেজ স্কুলে কমিটির দলাদলিতে শিক্ষকেরা অনেক সময় লোলুপ হিংস্রতার পরিচয় দেন কি নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দেবার জন্য? অনেকরকম দুর্নীতি স্কুল কলেজে শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে সব কথা না তোলাই ভাল। সুতরাং তুষারবাবু নিজের মন্তব্য সম্বন্ধে যদি আন্তরিক হন তবে অনাবশ্যক কথা না তুলে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি ও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার কোন বাস্তব পরিকল্পনা গঠন করবার চেষ্টা করুন।

কলিকাতা ইতি
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ নরেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ

(২)

বর্তমান সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, বাংলা দেশে শিক্ষকেরা 'আদর্শ' শিক্ষাদান ক'রে ছাত্রদের যে নৈতিক উন্নতি (?) সাধন করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ অভিভাবক সমাজের উচিত তাঁদের সবাইকে দূর ক'রে নতুন শিক্ষকমণ্ডলী গঠন করা এবং স্বভাবতই তাঁদের কোন অর্থাভাবও রাখা হবে না, এই কথাটাই আপনাদের পত্রলেখককে জানিয়ে রাখি।

হাওড়া ইতি—
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ জনৈক অভিভাবক।

কলিকাতার সামাজিকতা

'বর্তমান'-সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়, অনেকদিন কলিকাতায় বাস করিয়া একটি অসুবিধার কথা জানাইতে চাহি। আমরা ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দা। এখানকার বাড়ীওয়ালা সম্প্রদায় আমাদের ঘৃণা করেন। অবশ্য, মর্যাদার তারতম্যে তাঁহারা ঘৃণা করিলেও আমাদের ক্ষুন্ন হওয়া সাজে না। তবে পাশাপাশি ভাড়াটে বাসিন্দাই ত বেশী। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন সামাজিকতা গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দাঙ্গার সময় সম্মিলিত প্রতিরোধের চেষ্টায় আমরা অনেক লোক দেখিলাম যাহাদের নিজ পল্লীর অধিবাসী বলিয়া প্রথম জানিতে পারিলাম। পাশাপাশি বাড়ীতে মৃত্যু ও সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান কলিকাতার পল্লীতে বিচিত্র নয়। এজন্য কেহ কাহাকেও দোষ দেয় না। আমার মনে হয় প্রয়োজনের তাগিদে কর্মব্যস্ত জীবনে অনুভূতি ও সামাজিক বোধ জাগ্রত করার কথা কেহ ভাবেন না। এর ফলে অপ্রীতিকর ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে অপরিচয়ের সুযোগে অনেক শান্তপ্রকৃতির লোক দুর্ধর্ষ বিরোধী হয়ে উঠিতে পারে। কলিকাতায় যাঁরা বাস করেন, তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। একেবারে এই সম্পর্ক যে নাই এমন কথা আমি বলি না। বড় বড় সভা, অনুষ্ঠানাদির মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের আন্তরিকতা খুব গভীর নহে। এই আন্তরিকতা সামাজিক জীবনে বড় বেশী প্রয়োজন। আপনাদের পত্রিকায় আমার বক্তব্য জানাইলাম। আশা করি চিন্তাশীলগণ এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া আমাদের পথ নির্দেশ করিয়া দিবেন।

বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ইতি
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ নাগরিক

সাহিত্য-সেবা ও অর্থার্জন

'বর্ত্তমান' সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, আজকে মানুষের ভাবধারা ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত অত্যাচারের হাত থেকে কেমন করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, বলতে পারেন? আমি একজন সাহিত্য-সেবী। সাহিত্যের আরাধনা করতে গিয়ে কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রতে প্রস্তুত হতে হচ্ছে। যে কাজেই আজ আমি মনে হয় সব কাজই ব্যর্থ, যেখানে অর্থ নেই। কেন এই নীচতা হীনতা বলতে পারি না। সত্য-সত্যই আমার সাহিত্য সাধনা হয়ত সফল হবে না। অর্থের দিকে দেখতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার অপর দিকে অর্থ না হলেও কোন উপায় নেই।

এই পরিস্থিতি থেকে কেমন করে উদ্ধার পেয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারি বলতে পারেন? নমস্কার,

ইতি—

ললিত মিত্র লেন, শঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্যামবাজার
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

বিভূতিভূষণের "দেবযান"—সম্পর্কে প্রশ্ন

'বর্ত্তমান'-সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবযান" গ্রন্থটির একটি জায়গায় আমার খটকা লেগেছে:

"পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা তাঁকে সৃষ্টির প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ ক'রে বল্লেন—দেখচ?"

"পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অদ্ভুত পৃথিবী, বিশাল জলভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দমে ওলোট পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প সূর্য্যের তেজ অতিশয় প্রখর…তারপর ছবির পর ছবি….কত দেশ কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল….কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন….প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর….পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই,….ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কি বীভৎস দৃশ্য!

আত্মা বল্লেন—বহুদূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব্বজন্ম। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়, আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহানায় বসে তাদের মনে পড়েছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।"—(পৃঃ ২৬)

মৃত্যুর পর আত্মা যখন পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে গমন করে তখন কি সে বুঝতে পারে মৃত্যুর পূর্বে সে কি অবস্থায় কোন্ স্থানে এবং কোন্ আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁচে ছিল?—ম মানুষের পুনর্জন্ম স্বীকার করি; কিন্তু পুনর্জন্মের পর তো আমরা বুঝতে পারিনা—জন্মের পূর্বে আমরা কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম—ছিলাম কোন্ আবেষ্টনীতে? তবে, মৃত্যুর পরে কি ক'রে উল্লিখিত আত্মা তার জীবিত কালের ছবি দেখতে পেল?—'দেবযান' গ্রন্থটির আগাগোড়াই 'থিওরী'র উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মৃত্যুর পর জীবিতকালের কথা স্মরণ ক'রতে পাবে—এটাও কি কোন সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত?—জানাবেন তো। নমস্কার, ইতি—

পঞ্চাননতলা রোড, বালিগঞ্জ, শ্রীমতী কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ই আষাঢ় ১৩৫৪

৩৩/এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রেস থেকে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।